পরীযান
ও
অন্যান্য গল্প

অনিল ঘড়াই

পরিবেশক :
পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ :
১ বৈশাখ, ১৩৬১

প্রচ্ছদ : শ্রীসুকান্ত রায়

প্রকাশক :
পূর্ণেন্দু বসু
আনন্দ নিকেতন, নববারাকপুর
২০২/২, রামকৃষ্ণ সরণী (অধুনা বিধানচন্দ্র রায় সরণী)
উত্তর চব্বিশ পরগণা, কলকাতা ৭০০ ১৩৯

মুদ্রণ :
বাণী আর্ট প্রেস
৫০এ, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলকাতা - ৭০০০০৯

উৎসর্গ

অগ্রজ কথা সাহিত্যিক,
নবীন লেখকদের উৎসাহদাতা,
'কোজাগব' এর স্রষ্টা

লেখকের অন্যান্য বই

নুনবাড়ি
বনবাসী
মুকুলের গন্ধ
বক্ররেখা
কলের পুতুল
দৌড়বোগাড়ার উপাখ্যান
জন্মদাগ
স্বপ্নের খবাপাখি
বিপরীত যুদ্ধের মহড়া
মেঘজীবনের তৃষ্ণা
পরীযান
জার্মানের মা
কাক
আকাশ মাটির খেলা
লু
জলচুরুণী
আগুন
জ্ঞানবৃক্ষের ফল
অনিল ঘড়াইয়ের গল্প
গর্ভ দাও
কটাশ
কামকুঠিয়া
তিন ভুবনের গল্প
ভারতবর্ষ
তরঙ্গলতা
বোবাযুদ্ধ
প্লাবন
কাননে কুসুমকলি
খেলাঘর
ধর্মের কল
এক মুঠো রোদ
অন্ধকারের কুশী-লব
অক্ষরমালা
গোদানা

ছোটদের বই

লালি দুলি
ফড়িং সিংয়ের বাহাদুরী
শেরু
এরফান চাচার ঘোড়া

অনুবাদ গ্রন্থ (হিন্দি)

টিকলি
ডঙ্ক

৯ □ পরীযান
২০ □ বিলভাত
২৯ □ বগলাহুট
৩৮ □ কুঠ
৪৯ □ লাশ খালাস
৫৮ □ চাতক
৬৯ □ খোঁয়াড়
৭৩ □ দ্বন্দ্বযুদ্ধ
৮৫ □ খরা
৯৮ □ ন্যাসা বাগদি শেয়াল ধরতে যায়
১০৬ □ সমুদ্র কাকড়া
১১৫ □ জ্ঞানবৃক্ষের ফল
১২৬ □ মুগনিপাথর
১৩৮ □ লু
১৫০ □ টিকলি
১৭৪ □ রক্ত
১৮৩ □ নাগর
১৯৩ □ জঠরযুদ্ধ
২০৪ □ খালাসী
২২০ □ চরণ
২৩৪ □ সমুদ্র
২৪৩ □ থাবার বাইরে
২৫১ □ কুন্তী
২৫৭ □ রণক্ষেত্র
২৬৩ □ পশু বিষয়ক
২৭১ □ হপ্তা গোলামী
২৮২ □ আগোলদার
২৯০ □ কটাশ
৩০৭ □ পোকাপার্বণ

পরীযান

পরীযান চলেছে দাউদপুর মুখো।

নানকা গাঁ ছাড়িয়ে সামনে মাঠ। ফাঁকা ধূ ধূ। শুকনো হাওয়ায় আঁচ গনগনে তাপ। গা পোড়ে, পা পোড়ে-টান ধরে চামড়ায়। ট্যাকাটি গাছগুলোর মরমর দশা। তাঁতী বাড়ির পাশ দিয়ে মাকুর মত সরু রাস্তা। এ রাস্তাটা পেরুতে পারলেই ডাঙ্গা-পড়িয়ার মাঠ। হাঁটু সমান উঁচু আল, গোরুর গাড়ির চাকার দাগে পথ। সেই পথ বুক চিতানো ঢোঁড়া সাপ হয়ে পঞ্চায়েতী বাঁধের উপর হামলে পড়েছে। শ্যালো ঘর পেরিয়ে গেলে বাজ পড়া খেজুর গাছ। টিপি ডাঙ্গাটার উপর আদ্যিকালের শ্মশান। পরীযান চলেছে ছিরিছাদহীন সেই পথ ধরে। লক্ষ্য দাউদপুরের নোনা খালের বাঁধ, কাঠের পুল, কিছুটা ভেতর ঢুকেই মুরালীমোহনবাবুর কোঠা দালান।

সময় বড় কম। তার উপর খরা চড়লে মুশকিল। তাতে চড়চড় করে পিঠের চামড়া। ছ' বেহারার তাই তাড়াহুড়োর শেষ নেই। বাঁক বোঝাই ভার গিয়েছে আগে। বিশ সের ওজনের পাকা রুই-এর কানকোয় রশা বেঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে গেছে বরের বড় মামা। ফুল আঁকা ট্রাঙ্ক বোঝাই মেয়ের সাজ-গোজের সরঞ্জাম। লড়াইটা সেয়ানায় সেয়ানায়। হাওয়াই ফুটল আকাশে। বরপক্ষের চোঙ্গা প্যান্টুলুন পরা ছোকরাটা ভেরেন্ডা গাছে ঝুলিয়ে দিল দোদমা। তারপর দেশলাই কাঠি জ্বেলে সলতেয় আগুন। মাঠ ডাকল—দুম্..ফটাস..অ-অ-অ। তারপর আবার উড়ল হাওয়াই। ফুস-ফটাস—! পিলপিল করে ছুটে আসল মানুষ। হাতে কাজের গন্ধ। বেসামাল পোষাক-আষাক। সবচেয়ে অসুবিধে বৌ-ঝিওড়িদের। ওদের মাথায় ঘোমটার ঠিক নেই, পায়ের বাসি আলতায় ধুলো। ফাটা আলে পা ঢুকিয়ে কেঁদে উঠল গায়ে গেঞ্জি হাতে শ্লেট—পাঠশালা ফেরৎ মুখ।

এ গাঁয়ে বহুদিন পরীযান যায়নি। সামর্থ কোথায়? চাষ নেই, জলের লেয়ার কমে কদাকার মাঠ। চাষা-ভুসোর কাজ নেই। যাদের পাঁচ-দশ বিঘে আছে তাদেরও শান্তি নেই। আইরেটের গোড়ায় মাটি ফাটছে, সার ছিটুলেও লাভ নেই। লাভ যাতে নেই তাতে লক্ষ্মী নেই। এ গাঁয়ে তাই অনেকদিন ধরে পরীযান নেই।

শেষ পটকা ফুটেছিল ভোটের পরে। উপলক্ষ ঃ বিজয় মিছিল। নানকা হাতীদা, রুক্মিনীপুর আর এরান্দার আশপাশ ঘিরে হৈ হুল্লোড়। ধুলোর পথে সেদিনও পটকার আওয়াজে চমকে উঠেছিল দেশ-গাঁ। এ সব পুরনো কাসুন্দি, চটকালেও সুগন্ধ বেরয় না।

হরি মন্দিরের পাশ থেকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল ময়না। পাতা কুড়োতে এসেছিল বটতলায়। জ্বাল দেবার বড় অভাব। দুটো ভাত ফুটাতে গেলেও এক পাছিয়া (ঝুড়ি) বাঁশ পাতা কমসে কম দরকার। বাঁশঝাড়ে এখন কেউ আর ওকে ঢুকতে দেয় না। বাঁশ পাতার

আগুন বেশ। ওর শরীরের আগুনের চেয়েও নাকি বেশী আগুন। ওর কোলে তিন সাড়ে-তিন বছরের বিশু, হাড় লিকলিকে—বড্ড ক্ষিদের বাই। শাড়ি বেসামাল, ঢ্যাঙা চুল নড়ে হাওয়ায়, ঘাড়ের কাছ বরাবর ঘামের ফুসকুড়ি, তবু সে ছুটছে।

পরীযান দেখেনি তা নয়। ওর বিয়ে হয়েছিল কাঁথিতে। ঘরের মানুষটার সাথে দারুয়া হাসপাতালে পেট দেখাতে গিয়ে বাস-স্ট্যান্ডে পরীযান দেখে। হাঁটতে হাঁটতে ছুটতে ছুটতে তালগোল পাকিয়ে যায় অনেক ছবি। হাওয়ায় বুকের কাছটা পুরো ওদলা। বিশুটা দুধের জন্য কাঁদছে। চুলের মুঠি ধরে গুমাগুম ঘা তিনেক লাগিয়ে দিলেও বিশু থামে না।

—মারতে পারুনি। হাড়-মাস চুষি চুষি খাইনিলুরে-এ! গোঙানীর মত শোনায় ময়নার কথাগুলো। অগত্যা দুধ ধরিয়ে দেয় ছেলের মুখে। কোৎ কোৎ করে ঢোক গেলে বিশু। ওর আর কি দোষ? ক্ষিদে পেলেই মায়ের বুক দুটো তার ভরসা। বুকে টান পড়তেই ময়না দাঁড়িয়ে পড়ে শ্যাওড়া ছায়ায়। তাকে পাশ কাটিয়ে লোক যাচ্ছে হরদম। হাজার গন্ডা প্রশ্নে ঝা ঝা করে তার কান।

—কাদের ঘরের পরীযান গো?

—বাঃ, সাজিয়েচে তো মন্দ লয়। কইতে হিবে রুচি আচে—

লাঠিতে ভর দিয়ে ছ' বেহারা শুনছে সব। একদম সামনের মানুষটার লাল টুকটুকে মদ-মেদো চোখ। ভরাট বুকে ভুলভুলি লোম, কচুরিপানার শেকড়ের চেয়েও ঢ্যাঙ্গা-ঢ্যাঙ্গা। ময়নার দিকে তাকিয়ে লোকটা বাঁকা চোখে হাসল। ইশারা করল। ঘেন্নায় বেঁকে চুরে উঠল ময়নার মুখ। সবাই এখন তাকে চকচকে চোখে দেখে। সে যেন খুঁটি উপড়ানো গোরু, কে আগে ধরতে পেরে গোয়ালে ঢোকাবে তারই ধান্দা। কপাল যখন পোড়ে তখন পুরোটাই পোড়ে। নইলে অমন শান্ত শিষ্ট মানুষটাই বা তাকে খেদিয়ে দেবে কেন? সে তো কোন অন্যায় করেনি? বুড়ো হাবড়া বাপটা বিয়ের পরে পাঁচশো টাকা জামাইকে দেবে বলেছিল। দিতে পারেনি। তার আগেই ডাঙ্গা পড়িয়ার আগুন ছাই করে দেয় শরীর। বাপ চলে গেল, সেও বাপের ঘরে ফিরে এল। জমি-জমা কিছু নেই। শুধু মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই। বাস্তু ভিটেয় পেট ভরে না। এদিক ওদিক গতর খাটাতে হয় তাকে। সবাই তো সুযোগ বুঝে ঘাই মারার ধান্দায়। তার উপর শরীরটাও কাল হয়েছে। আষাঢ় মাসের নোনা খালের মত কেবল ঢেউ। কত চিঠি গেল। মানুষটা তবু এল না। সাতমাইলে সাইকেল ঘড়ি আংটি নিয়ে বিয়ে করেছে। সংগে হাজার এক নগদ। বিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে পরাণটা তাতা কড়াই-এর কৈয়ের মত কেঁপে ওঠে। কেন এমন হয় সে নিজেও বোঝে না। কপালে সাবুদানার মত ঘাম ফুটে ওঠে মুহূর্তে। চোখের তারা থিরথির করে। মরা বাপকে গাল দিতে সাধ যায়।

—ও বাপ, তুই তো ওলাউঠায় মরলু, মোকে কেনে মারি গেলু রে-এ-এ-এ।

ছ' বেহারা বিড়ি টানে, ঘ্যাস ঘ্যাস শব্দ। চোয়াল ঢুকছে, চোয়াল নামছে। দাঁতে দাঁত চেপে ময়না এগিয়ে গেল। এখন মাথার উপর চক্কর খায় উড়োজাহাজ। বিশুর মুখ দুধ ছেড়ে এখন আকাশের দিকে। পুব পাড়ার মুরুব্বি বলল, দিন-কাল বড় খারাপ হে! যুদ্ধ বাঁধবে।

হাওয়া আসে। পাতলা শাড়িটা সরে গিয়ে কলা গাছের চেয়ে মসৃণ দাপনাটা বড় বেকায়দায় ফেলে দেয় তাকে। টেনে টুনে লজ্জা ঢেকে আড়াল খোঁজে ময়না। পুব পাড়ার মুরুব্বি বলে, আহারে, বেচারীর কি দুঃখ্য! সোমায়ী খেদিই দিলা মিচামিচি, বাপ বি মরলা। ম্যায়া ঝিটা এখুন সোমত্ত বয়সে কুথায় যায়।

—যাওয়ার কি জায়গার অভাব? ভিড়ের মধ্যে ফোড়ন কাটে কানু। ওর বাবা সুরেন জানা। পরীযানের মালিক। মুচিয়ার বাবার কাছ থেকে কথার মার প্যাঁচে পরীযানটা কিনে নিয়েছে সস্তায়। মুচিয়ার পেটে অনেক দিনের ব্যামো। কেউ বলেছে ফোঁড়া, কেউ বলেছে ঘা। পেট না কাটলে এ রোগ সারবে না। অথচ পেট কাটাতে গেলে কমসে কম হাজার টাকার দরকার। সদর হাসপাতালের ডাক্তার লম্বা ছাপানো কাগজে লিখে দিয়েছে কত নামী-দামী ওষুধের নাম। এ সব ওষুধ না পেলে মুচিয়া বাঁচবে না। বুড়োটা দোর দোর ঘুরেছে। কেউ দেয়নি। সবাই মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। শেষটায় সুরেন জানা শ'টাকায় পনের টাকা সুদ—এই শর্তে বন্ধক নিয়েছে পরীযান। মাস ঘুরল বছর ঘুরল। মুচিয়া ফিরে এল পেটে বিঘোৎ খানিক কাটা দাগ নিয়ে। কিন্তু পরীযান আর ফিরল না। কানুর কথায় কটমট করে তাকিয়ে জ্বলতে থাকে ময়না। শরীরটা আইঢাই করছে বিরক্তিতে। তরলা বাঁশঝাড়ে পাতা কুড়োতে গিয়ে কানু তাকে জাপটে ধরে ন্যাসা খাদটার দিকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। তার হাতে কড়কড়ে একটা বিশ টাকার নোট। ময়না মাটিতে এক গাদা ছেপ ফেলে লেজে পা দেওয়া সাপিনীর মত রুখে দাঁড়িয়েছে, মরণ হয়নি তুমার? টাকা রইচে বলিকি ধরাকে সরা জ্ঞান করব-অ? সেই কানু পাশে এসে দাঁড়াতেই রাগে-ঘেন্নায় রি-রি করে উঠল ময়নার শরীর। বিশুকে কাঁখে নিয়ে সে যেন পালাতে পারলে বাঁচে। ভিড়ের অছিলায় পায়ে পা ছুঁয়ে দেয় কানু। ময়না পা'টা সরিয়ে নিতেই আরো একবার।

এর পরে আর দাঁড়ানো চলে না। বিশুকে কাঁখে নিয়ে আলের উপর উঠে আসে ময়না। ধানের নাড়ার চেয়ে ফ্যাকাসে দেখায় তার মুখ। জিভটা বারবার শুকনো টাগরায় গিয়ে ঠেকে। নিজের ভাগ্য ছাড়া সে আর কাউকেই দোষ দিতে পারে না। স্বামীর ঘর-সংসার সব মেয়ের কপালে জোটে না। মাঝে মাঝে তার মনে হয় বিশুটা মরে গেলেই ভাল হতো। ক্ষিদের দু'মুখো সাপের হাত থেকে রেহাই পেত তাহলে। শাক-লতা-পাতা খেয়েও গতরটায় ধস নামছে না তার। ধস নামলেই সে যেন বাঁচে। রাতে দরজায় খুট খুট শব্দ হলেই ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকে সে। হাতে শক্ত করে ধরা পনিক (বটি)। এক লাথি মারলেই কবাট খুলে হা হয়ে যাবে একথা সে তখন ভুলে যায়। ফাঁকা মাঠের হাওয়ার মত সে যে সবার জন্য নয়—একথা সে কাউকে বোঝাতে পারল না। আজকাল মুচিয়া তার সঙ্গে ভাল মত কথা বলে না। পরীযান সুরেন জানার দুয়ারে যাওয়ার পর থেকে সে যেন হাওয়া ছেড়ে দেওয়া বেলুন। মুনিষ খাটতে পারে না। এক ঝুড়ি মাটি মাথায় তুলতে গেলেই টান পড়ে পেটে। নাভির কোল বরাবর বেদনা শুরু হয়। মুখ দিয়ে ঘোলা জল ওঠে। শুকনো বমির ভাবটা কিছুতেই কাটে না। সেবার এরেন্দা থেকে মাটি কেটে সাঝবেলায় কোনমতে ফিরে এসে দাওয়ায় পেট চেপে বসে পড়েছিল। অসহ্য বেদনা। কাটা মুরগির ধড়ের মত ছটফট করছিল। ময়না ভেবেছিল আসবে না। শেষটায় না এনে পারল না।

সরযের তেল আর জল নিয়ে পেটে বুলিয়ে দিয়েছিল যত্নে। তাতে ও বেদনা কমেনি। শেষটায় বাঁশ ডোবা পুকুরের পাঁক তুলে এসে লেপে দিয়েছিল পেটে। ঠান্ডা পাঁকে যন্ত্রণা কমেছে কিন্তু সারারাত ভেজা শাড়িতে ময়নার সে কি হয়রানি।

এতদূর থেকে কানুকে আর দেখা যায় না। ময়নার আর পরীযান দেখতে সাধ যায় না। ছায়ার মত কালো মানুষগুলো তখনো ঘিরে রয়েছে পরীযান। ময়না যেন এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারলে বাঁচে। কিন্তু ফাঁকা মাঠে আড়াল মেলে না, ময়না তাই ছোটার মতন হাঁটছে। তাঁতী ঘরের বিয়ে গিয়েছিল পালকিতে। মুখোমুখি ময়না আর তার স্বামী। তখন বর্ষা মরসুম। মাঠ ভর্তি চাষ। সবুজ মাঠগুলোর দিকে তাকিয়ে হু-হু করে কেঁদে উঠেছিল ময়না। এদের ছেড়ে সে থাকবে কি করে? টোপর পরা মানুষটা বোঝ দিয়েছিল তাকে, কাঁদো কেনে? শাশুঘর গেইলে কেউ আবার কাঁদে নাকি? বরের মুখ দেখতে দেখতে ক্যানেল পাড় ধরে বালিঘাই। পালকি থেমে ছিল পাকা সড়কে। চেনা-জানারা ভিড় জমিয়ে দেখছিল তাকে। ময়নার তখনো ফুঁপানী থামেনি। বুড়ো বাপটা চোখ রগড়ে ধরা গলায় বলেছিল, শ্বশু-শাশুর কথা মন দিইকি শুনবু। মোর জন্যি ভাববুনি। মুই তাঁতশাল চালিই কি ঠিক বাঁচি রইবা।

হাঁটতে গিয়ে ময়নার চোখ ছাপিয়ে যায় জলে। শাসমল-ভুঁই পেরিয়ে খিরিষ গাছের ওপাশটায় ঝাঁপড়ি আর হাগুরির সাথে দেখা হয়ে যায়। ওরা এসেছে চিকনি শাক খুঁটতে, হাতে বেত-চুপড়ি। দু' জনেই আঁটো-সাঁটো করে শাড়ি পরেছে। মাটির ঠাকুরকে ডুরে শাড়ি পরালে যেমন দেখায় তেমন দেখাচ্ছে ওদের। এই খরানী সময়টায় শাক-লতা পাতার বড় অভাব। কলপাড়ের কচু শাকগুলো শুয়োরে না খেয়ে এবার মূল সমেত মানুষই খেয়েছে। পরপর দু'বার চাষ নেই। একবার খরা, অন্যবার বন্যা। মাঠ এখন বাঁজা মেয়ের মত। খাল পাড়ের ও দিকে টাকার জোরে চাষ হয় ঠিকই তবু সেখানে ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রির জোগাড়। হাগুরির বাপ ভিখ মাঙ্গে গাঁয়ে গাঁয়ে, ঝাড়-ফুঁক করার স্বভাব আছে। খরাতে মানুষের অসুখ বিসুখ কম হয়। গোরু-ছাগলের ব্যামো এখন নেই বললেই চলে। বুড়োর তাই রোজগারপাতি কমের দিকে। ঝাঁড়-ফুঁক ছেড়ে এখন হাতে চটা ওঠানো সানকি। যে যা দেয় তাই নিয়ে ঘরে ফেরে দুপুরে। হাগুরি চিকনি শাক খুঁটে নিয়ে গেলে সেই শাকের ভাজি দিয়ে পাখাল ভাত খাবে গোটা সংসার।

—হায়, পরীযান যায়টেরে হাগুরি, যা যা দেখি আয়।

নিজে ভাল মতন পরীযান দেখতে পায়নি। হাগুরি আর ঝাঁপড়িকে পাঠিয়ে ময়না যেন কিছুটা শোধ তুলতে চায়। ঝাঁপড়িটার হুজুগে স্বভাব। সে প্রায় নেচে উঠে বলল, হঁগো, কুনটি গো ময়নাদি?

—ডাঙ্গা পড়িয়ার মাঠে। আঙ্গুল উচাঁনো ময়নার চোখ সেই দিকে।

ডাঙ্গা পড়িয়ার বাঁ দিকে চিতা জ্বলছে। মাইতিদের নবটা তিন মাস ভুগে চিতায় উঠল। মরার সময় বড় জ্বালিয়েছে ছেলেটা। যা কিছু ছিল সব নিয়ে গেল সংগে। গুনিণে পারল না, বদ্যিতেও পারল না। এগরার বড় ডাক্তার বলল, হয় কাঁথি নয়তো কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে। এ রোগের চিকিৎসা নেই। শ্মশানের ধুঁয়োর দিকে তাকিয়ে টালিখোলার ধুঁয়োর

দিকে নজর যায় না ওদের। শকুন দুটো মরা বাবলা -গাছে হা-পিত্তেশ তাকিয়ে। নবর দাদা নতুন কলসী আর গামছা ঢোলকলমি গাছের গোড়ায় নামিয়ে ঢিল ছুঁড়ে মারে শকুনদের। পরীযানের দিকে ওর কোন লক্ষ্য নেই। চোখে মুখে রাগ নিয়ে নবর বাবা লগায় করে খুঁচিয়ে দিচ্ছে আগুন। এতদিন টালি-ভাটায় আগুন দিয়েছে। আজ ছেলের চিতা খুঁচাতে গিয়ে হাত পা কাঁপছে থরথর।

হাগুরির ঠোঁটের মাঝামাঝি তার ধারাল দাঁত। মুখ ঘুরিয়ে নেবে তারও উপায় নেই। ঝাঁপড়ি উদাস গলায় বলল, সবাই কেনে তাড়াতাড়ি মরি যায় রে?

—জানি না যা—! ঝ্যানঝ্যান করে হাগুরির কণ্ঠনালী।

ময়না অধৈর্য হয়ে বলে, কি দেখুটু কি? যা না খপখপ যা। নইলে পরীযান যে—

পরীযানের কথা শুনে হাগুরি যেন ঝিমিয়ে যায়। এ গাঁয়ে কেবল তাদেরই পরীযান ছিল। সেই পরীযান এখন সুরেন জানার ঘরে। চারজন লোক এসে খালি পরীযান তুলে নিয়ে গেল দাওয়া থেকে। হাগুরি সেদিন কান্না আঁটকাতে পারেনি। ঘরে ঢুকে কেঁদে উঠেছে। বুড়ো বাপ বোঝ দিয়েছে তাকে। মুচিয়া ফিরে আসার পরে পরীযান আবার ছাড়িয়ে আনবে এমন আশ্বাসও দিয়েছে। এখনও পর্যন্ত পরীযান ঘুরল না। আর কোনদিন তাদের খড়ের চালার নীচে পরীযান জিরুবে না। বুড়ো বাপটা সাদা কাগজে টিপ ছাপ দেয়। সুরেন জানা আর একটা শ'টাকার নোট গুঁজে দেয় তার বাবার হাতে। টাকাটা নিতে গিয়ে বুড়োটা মাটির মত ধীর স্থির হয়ে গিয়েছিল। তারপর কি ভেবে টাকাটা নিয়ে নেয় আবার। সুরেন জানা যাওয়ার সময় একটা সিগ্রেট খাওয়ায় বুড়োকে। সান্ত্বনা দিয়ে বলে, এ পরীযান খালি তুমার ঘর থিকে মোর ঘরে গেলা মুরুব্বি। খালি ঘর বদল হিলা। মন খারাপ হিলে মোর দুয়ারে যাইকি দেখি আসব। মোর কুনো আপত্তি নেই।

—হাতের ঢিল ছুঁড়ি দিলে তা কি ফিরি আসে বাবু?

সুরেন জানা এ প্রশ্নের উত্তর দেয়নি। পাঁকাল মাছের চেয়ে ধূর্ত তার চেহারা, বাঁকাপথে সটকে গেছে তৎক্ষণাৎ।

চিকনি শাকের ঝাঁপিটা নিয়ে হাগুরি বড় বেশী চুপচাপ। ঝাঁপড়ি গলার ঘাম মুছে শুধোয়, কিরে যাবুনি? চল, দেখি আসি চল—কত লোক যায়টে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঝাঁপড়ির পিছ পিছ চলে আসে হাগুরি। খুব কাছ থেকে পরীযানটা দেখে। না খেতে পাওয়া মেয়ে বড় লোকের ঘরে বিয়ে হলে যেমন হয় তেমনি দশা হয়েছে পরীযানের। সাজ-গোছ একেবারে রাজরানীর মত। সামনে প্লিকের ঝালর, দু'ধারের হাতলে রুপালী পাত, হাতির শুঁড়ের মত বেকানো। তাতে ফুল-লতাপাতা আঁকা। পুরো শরীরেই সোনালী রং, তার মধ্যে রূপালী ছিটে। পাশ খোলা দু' দরজা। নক্শা কাটা শটিং-এর পর্দা সরিয়ে দিলেই ভেরতটা একেবারে তালশাঁসের চেয়েও স্পষ্ট। দরজার উপরে প্লাস্টিকের লিচুফুল আর রকমারি সাজ। চারধারে রং বেরং-এর পুঁতির ঢেউ। চকমকি কাচ আঁটা কাঠের গায়ে গায়ে। রঙ্গিলা শাড়ি পরা মেয়ের চেয়েও সুন্দর দেখায় পরীযানকে।

ছয় বেহারা লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। ধুলো তাতছে, হাওয়ায় আগুনের হলকা। শ্মশানের পথ পেরিয়ে পরীযান যাবে দাউদপুর। আর এই পথেই বর-কনে নিয়ে ফিরে

আসবে রাতে। বাজি পুড়বে, ভটভট করবে ডায়নোমো। ঝমর ঝমর বাজনা বাজবে। বুকে মালাই চাকি লাগিয়ে নেচে উঠবে নিতাই ড্যান্সার। ঝুমুর পার্টি যাবে আগে আগে। বাজির গাছ ধরিয়ে দেবে সুরেন জানা। দু'চোখ ভরে দেখবে গাঁয়ের মানুষ।

হাগুরির চোখ আর বশ মানে না। চিপকানো সরবতী লেবুর মত চুঁইয়ে চুঁইয়ে ধারা নামে এক ফোঁটা দু'ফোঁটা।

মুচিয়া ঘরে ফিরে এসেছিল দু'মাস পরেই। পেটের কাটা দাগটা আক্রোশে খামচে ধরে বিড়বিড়িয়ে উঠেছিল, হায় ভগমান, হায় বুড়ি শীতলা, তোর মেনে কেনে মোর কলজেটো কাড়ি নিলুনি? কি দোষ করথিলি তোর মেনকার?

দুলকি চালে পরীযান চলে যায় পঞ্চায়েতী বাঁধ ধরে দাউদপুরের দিকে। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে হাগুরি। দাউদপুরে উড়াপাঠ দেখতে গিয়ে ময়নাকে লুকিয়ে কান-পাশা কিনে দিয়েছিল মুচিয়া। হাগুরিকে কিনে দিয়েছিল মচমচে একটা পাঁপড়। সেদিন থেকেই ময়নার উপর হাগুরির একটা মেয়েলী রাগ যা দিনের আলোর মত স্পষ্ট নয়। পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছিল, মুচিয়া ময়নাকে ভালবাসে। ধান উঠলেই ওরা গাঁ থেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করবে। পালিয়ে না গেলে এ বিয়ে কখনোই হবে না। ময়নার বাবা কোনো মতেই সায় দেবে না এ বিয়েতে। শেষটায় কেউ-ই কারোর কথা রাখতে পারেনি। ময়না কাঁথি চলে যায় বরের হাত ধরে। মুচিয়া অর্জুন গাছটার কাছে এসে বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকে। যেন পা দুটো মাটির সাথে গাছের মত আটকে গেছে।

দৃষ্টির বাইরে পরীযান চলে যেতেই ঝাঁপড়ি বলে, চল্। খাড়িই রইলে কি হিবে? ঘর যাবুনি?

আজ আর ঘর ফিরতে ইচ্ছে করছে না হাগুরির। ঘরে ফিরে দাদাকে সে কি বলবে? দাদা যখন শুধোবে, হ্যাঁরে, হাগুরি। কাদের ঘরের পরীযান গেলারে? তখন সে কি জবাব দেবে?

জ্ঞানপড়ার পর থেকে মুচিয়াকে সে সুস্থ দেখেনি কোনদিন। কিছু না কিছু লেগেই আছে। সেবার বালিঘাই হাট থেকে ফেরার পথে পেটের ব্যথায় দুমড়ে মুচড়ে খাল পাড়ে গড়িয়ে গিয়েছিল মুচিয়া। চোখে মুখে ধুলো বালি লেগে যাচ্ছেতাই অবস্থা। ঠা-ঠা রোদে খাল পাড়ের জন-মজুররা মুচিয়াকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সে যাত্রায় পুনর্জীবন পায় মুচিয়া।

ঘটনাটা বুড়ো বাপটার কান অব্দি পৌঁছেছিল। ছেলের জ্ঞান ঘুরোণ পাবার পর শীতলাতলায় মানসিক করেছে কেঁদে কেঁদে।—বাজা বাজিইকি পূজা দিবা মা শীতলা বুড়ি! তু মোর ছুয়াটারে ভালা করি দে। পরীযান তো কাড়ি নিলু, কিচ্ছু কইনি। এবার মোর চোখের মনিটা কাড়ি নিলে মুই কার মুখ দেখিকি বাঁচি রইবা ক?

মুচিয়ার জন্য হাগুরিরও কষ্ট হয়। তার দাদা ভাল মতন ছুটতে পারে না। বেড় কুপাতে গেলে দু চটাং দেড়োর কোপ মেরেই হাঁপিয়ে ওঠে। মোটে দম রাখতে পারে না। বাসি ভিজে ভাত খেলেই চুয়া ঢেকুর ওঠে। সারাক্ষণ কেবল বমি বমি ভাব। ডাক্তার টক-ঝাল বাসি খাবার খেতে বারণ করেছে। অথচ ছোটবেলায় মুচিয়া টক খেতে ভালবাসত।

আমসীতে নুন মরিচ ডলে কিংবা লহ্‌রা শুকা পুড়িয়ে এক থাল তানু ভাত সাপড়ে নিতে পারত। খাওয়া-দাওয়ার কোন বাছ-বিচার ছিল না, তাই তাগড়াই হাড় খাঁচাটা এখন খালি পড়ে আছে। উদোম গায়ে থাকলে বুকের সব কটা হাড়ই এখন গোনা যায়। পাতলা চামড়া ভেদ করে হাড়গুলো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসবে। চর্বিহীন পেটের চামগুলো সর্বদা কুর্চকে থাকে যেন কত ক্ষিদে ওর। চোয়ালের হাড় জেগে ওঠাতে মুখের শ্রী হারিয়ে বয়স্ক কঙ্কালের মত চেহারা। ফলে কে বলবে মুচিয়ার এখন তেইশ বছর বয়স। বড়ো অল্প বয়সেই বুড়ো হয়ে গেল সে; নইলে চোখের পাশটা এত কালচে হল কি করে?

তার দাদু যখন বেঁচে ছিল তখন মুচিয়া আর হাগুরির আদর আব্দারের শেষ ছিল না। জব্বর ভালবাসত চোখে ছানি পড়া বুড়োটা। হাটে গেলে চনা ভাজি আর জিলিপি কিনে আনত। দড়িওলা প্যান্টের ঝুলিমনিতে চনাভাজি ঢুকিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে ফিরে খেত মুচিয়া আর হাগুরি। ড্যামা ড্যামা চোখ তুলে পরীযানের উপর চড়ে বসে শুধোতো, ও দাদু, দাদু গো-ও কও না পরীযান কারে কয়? মহাফাঁপড়ে পড়ত খরা আর দুর্ভিক্ষ দেখা বুড়োটা। টাকটা চুলকে কোন মতে উত্তর সাজাত, যাতে চাপিকি বর ব্যা করতে যায়। উত্তরটা নিজের কানে এবড়ো-খেবড়ো শুনাত, মাড়িতে জিভ বুলিয়ে সময় পার করত বুড়ো, পরীযান হিলা পালকি। সাজিই গুছিই রাখা পালকি। এতে চাপিকি তোর মেনকার মত ছুয়া-মায়াঝি'রা ব্যা হিতে যায়। যাওয়ার সময় গাল ফুলিই কি কাঁদে—।

হাঁটতে হাঁটতে বটতলার কাছে এসে যায় ওরা। এ জায়গাটা নানকা হাতিদা গাঁয়ের সব চাইতে সুন্দর জায়গা। বুড়ো বটের ছায়া এখন পাতলা, তার ফাঁকে ফোঁকরে হরিয়াল আর বনটিয়া ডাকে মরজি-মাফিক। হলুদ বটপাতা লুট্টুর মত ঘুরতে ঘুরতে নেমে আসে মাটিতে। নিকনো তকতকে দাওয়ার মত ধবধবে জমিন। একটুও ঘাস নেই। বেলেমাটি আর খোলাম কুচিতে ভর্তি। বট গাছের গা ছুঁয়ে হরিতলা। মরা শেকড়গুলো সময়ের সাক্ষী। রোগা পেটকা তুলসী গাছটার জান যাই যাই দশা! মাটির ভাঁড়ের তলা ছ্যাঁদা করে জল ঝরছে এক ফোঁটা দু' ফোঁটা।

হাগুরি কল্তলার পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে শাসমল পুকুরে নেমে গেল। পাতা পচে পচে পুকুরের জল এখন না সবুজ না কালো। খরানীকালে পুরো গাঁটার আব্দার এই একটা পুকুরে। আর যা আছে সে-গুলোর তো নাড়ি ভুঁড়ি বেরিয়ে যাই যাই দশা। শুকনো বালিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা রগড়ায় হাগুরি আর ঝাঁপড়ি। শাক ঝাঁপি জলের মধ্যে চুবানো। কতগুলো বোষ্টমী মাছ সাহসে ভর করে পাড়ের কাছাকাছি চলে এল।

হাঁটু সমান জলে এসে কচলে-মচলে শাক ধুলো হাগুরি। চুলের কালো ফিতেটা অভ্যাস মত পাড়ের দিকে ছুঁড়ে দিল। এই শাকগুলোই তার সারা দিনের মজুরী। এগুলো ভেজে দিলে ঘরশুদ্ধু লোক পাখাল খাবে। যখন পরীযান ছিল তখন খাওয়া দাওয়ার কোন অভাব ছিল না। প্রায় সময়েই বায়না লেগে থাকত। দু' দশটা গাঁ থেকে লোক আসত বাড়িতে। পরীযানের জন্য বায়না দিয়ে যেত। দাওয়ায় শীতলপাটি বিছিয়ে হুঁকো সেজে দিত তার বাপ। তামুক টানার ফাঁকে ফাঁকে চলত দর দাম, পাকা কথার মারপ্যাঁচ আর টাকা নিয়ে

টানা হিঁচড়া। শেষটায় কাচের গ্লাসে সরবৎ আসত। গ্লাসের ওপরে মাছের ডিমের মত থক্‌থক করত লেবু কোঁয়া। সরবৎ শেষ করে আবার হুঁকো। দেশী তামাকের গন্ধে ম ম করত উঠোন। কোড়ক লাগা মুরগির মত দুয়ারে ঠেস দিয়ে সব শুনত হাগুরি। 'মোর কথাটা মানি লাও দাসের পো। খুব একটা অলায্য কিছু কইনি।' শ্লেষ্মা উগলে ভিন পাড়ার মুরুব্বি গালে হাত বুলোত।

—অত কমে পারবুনি বাবু। ঘাড় নাড়ত হাগুরির বাপ, সাজের দাম বাড়েটে। ছ'জনকে মুজরি দিতেই সব ফুতুর হি যায়।

—তাহলে আরো পঁচিশ টঙ্কা ধরি লাও।

—মাপ করো বাবু, মুই পারবানি। সাজগোজের দাম বাড়েটে। দেশ-গাঁ ঘুরি আইলে আর গটে অমন পরীযান মিলবেনি—।

শেষে ফয়সালা হোত। বুড়ো দেওয়ালে কাঠ কয়লার দাগ দিয়ে তারিখের হিসাব রাখত। ঠিক দিনে পরীযান নিয়ে মুচিয়া চলত আগে আগে। তার মাথা চুপচুপ করত নারকেল তেলে, গা-ময় জিওল মাছের ঝলক। ঘাড়ের উপর থাকত নতুন পাট করা গামছা। ডান হাতে ছড়ি। নতুন ধুতি গেঞ্জিতে তাকে তখন রাসযাত্রার সং'এর মত দেখাত।

শাক ঝাঁপিটা ডাঙ্গার উপর রেখে হাগুরি পিছু পায়ে আবার জলে নেমে আসে। হৃদি সরিয়ে ভুস করে ডুব দেয় গলা জলে। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। মুখের মধ্যে জল ঢুকিয়ে আঙুল দিয়ে দাঁত রগড়ায়। কুলকুচি করে। তারপর পিচকারির মত ফেলে দেয়।

ঝাঁপড়ি ডুব সাঁতার দিতে দিতে মাঝ পুকুরের জলমাপা বাঁশ খুটিটার কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। ভুস করে উপরে উঠে হাফ ছেড়ে বলে, জানু, এই মস্ত গটে মাছ—। বলেই হাত উঁচিয়ে দেখাল, মোর পায়ে ঘাই মারিকি কুনঠি (কোথায়) চালি গেলা।

মাছের গল্প শুনে হাগুরির চোখ দুটো লোভী হয়ে ওঠে মুহূর্তে। বহুদিন তারা মাছ খায়নি। কি করে খাবে? চুনো-চাঁদা মাছই এখন ন' টাকা দশ টাকা। মুচিয়া আজ হাটে গেলে নোনা মাছ আনতে বলবে হাগুরি।

ঘরে ফিরে এসে হাগুরি দেখে দাওয়ায় বসে সুতো তুলছে মুচিয়া। চুনা জাল হবে। একটা চুনা জালের দাম শ' টাকার উপরে। বেচে দিলে যাতে কিছু নগদ টাকা আসে। ভেজা কাপড়ে দাওয়ায় উঠে গেল হাগুরি। পায়ের জলছাপ পড়ল মেঝেয়। যাওয়ার সময় দেখল দাওয়ার শেষ দিকে মুচিয়া দেখেও না দেখার ভান করে সুতো তুলে যায় অনবরত, বিয়ের পরে ময়নার সাথে তার প্রায় কথা বন্ধ। ওকে দেখলে শরীরটা কেমন জ্বালা জ্বালা করে। শিঙ্গি মাছের কাঁটা মারার মত ভেতরটা কোঁকাতে থাকে শুধু।

—গুটে পুষ্টকার্ড আনি দিব। আর খড়ে লিঠি লিখতি। এই শেষবার। ঢোক গিলে নিজেকেই যেন কথা শোনায় ময়না। গলার ভেতরটা চষা ভুঁই-এর মত খড়খড়ে।

সুতো তোলা বন্ধ করে কঠিন চোখে তাকায় মুচিয়া, পয়সা দাও। মুচিয়ার কাঠ কাঠ কথায় খুঁট খুলে সিকিটা এগিয়ে দেয় ময়না। গায়ে জামা নেই, তাই হাত বাড়াতেই বুকের কাছটা ওদলা হয়ে যায় অনেকটা। ঠোঁটের উপর দাঁত বসিয়ে চোখ ঘুরিয়ে নেয় মুচিয়া।

হাগুরি তার বাপের ছেঁড়াখুড়া ধুতিটা পরেছে। ওর একটাই শাড়ি। কেচে দিলে পরার আর কিছু থাকে না। মুচিয়ার বুকটায় কেউ যেন ব্লেড দিয়ে টেঁড়া কাঠি দিল, কেন্নোর মত কুঁকড়ে গিয়ে হাগুরির খুন্তি নাড়ার শব্দ শোনে। শুকনো কলা বেগোর উপর তুষের জ্বাল, হাত চিতিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে উনুনে, পড়পড় করে জ্বলছে তুষ। চিকনি শাকের গন্ধে মুচিয়ার ক্ষিদে ক্ষিদে লাগে।

তাঁতী ঘরের ময়না শীতলা বুড়ির মাথা ছুঁয়ে কিরে কেটেছিল, মুচিয়াদা, তুমাকে ছাড়িকি বাঁচি রইতে মোর কষ্ট হয়। তুমি কাছে রইলে মোর কখনো ভোখ লাগেনি।

মিথ্যে বলেছে। ডাহা মিথ্যে বলেছে ময়না।

রাগে বিরক্তিতে কপালে ভাঁজ পড়ে মুচিয়ার। ময়না দেওয়ালে পিঠ রগড়াচ্ছে। পিঠ ভর্তি ঘামাচি।

—ফুটায় মিঠা তেল হিবেরে? মুচিয়ার প্রশ্নে ঘাড় বাঁকায় হাগুরি। তেল গিনাটা এগিয়ে দিয়ে বলে, জানলু দাদা, আজ মোর ঘরের পরীযান গেলারে। সুরেন জানা আগে আগে। দাউদপুরের মুরালীবাবুর বড় মায়াবির ব্যা ঘর। আজ রাতে রাতেই ব্যা-ঘর ফিরি যাবে পশ্চিম পাড়ায়—।

তেল মাখতে মাখতে মুচিয়ার হাত দুটো পেটের কাটা দাগটার কাছাকাছি এসে থেমে যায়।

—তুই থাম তো। পরীযানের কথা আর মোকে কইবুনি।

হাগুরি থামে না। ভূতে পাওয়া মেয়ের মত অনর্গল বকে, কি সোনদর সাজিইচে জানলু, দাদা?

মুচিয়ার শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। শাকটা ধরে এসেছিল কড়াই-এ। গামছাটা ঘাড়ের উপর ফেলে সে বিচিকলার পাতাগুলোকে ফেঁসে যেতে দেখে। এমন সময় রোদ মাথায় বুড়ো বাপটা ঘরে ফেরে। গামছায় হাওয়া খেতে খেতে বুড়ো বলে, বাপো কি রোদরে! তালু ফাটি গেলা। খরায় মানুষের চিঁচি শুকিই যাবে মনে হয়টে।

রা কাড়ে না মুচিয়া। বুড়োটা তবু বকে যায় অনবরত।

—দেখচু নাকি বাপো, পরীযান গেলা বড় বাঁধের উপর দিকি?

—দেখচি! হাগুরি চটপট উত্তর দিয়ে মুচিয়ার মুখের দিকে তাকায়, জানা ঘরের পরীযানটা সাজিইছে ভালা। লোকে হা-হইকি দেখেটে—

জানা ঘরের পরীযান? কাটা পেটটার কাছে নখগুলো বসে যায় ধীরে ধীরে। এইটুকু পেটে অতবড় পরীযানটা হজম হলো কি করে? মুচিয়া আকাশ দেখে। সর্বত্র ফর্সা ফাতারফাই মেঘ। মাঝে মাঝে কালোর ছিটে। হঠাৎ তার মনে হয় সে অনেক দিন আকাশ দেখেনি। হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পরে তার ঝিমুনি ভাবটা কাটেনি। জোর করে হাসতে গেলে পচা সুতোর মত হাসিটা ছিঁড়ে যেত বারবার। হাগুরির আঁচলটা চোখের কাছ থেকে কিছুটা সরে যায়। ওর পাতলা ঠোঁট দুটো ফুলে ফুলে উঠছে অভিমানে।

—কি হিলারে? পরীযানের জন্য তুর বুঝি কষ্ট হয়?

হাওয়ায় চুলা থেকে উড়ে আসে আগুন। মুচিয়ার কথায় হু-হু করে কেঁদে ওঠে হাগুরি,

বড় কষ্ট হয় দাদা, মা মরি গেলেও অত কষ্ট পাইনি...।

পঞ্চায়েতী বাঁধ নয়—সর্টকাট পথ ধরেছে মুচিয়া। হাতে তেল শিশি। শিশির মুখে সুতলী বাঁধা। চলার সাথে সাথে নড়ছে। আসার সময় হাওরি বলেছে, তেল নুন মরিচ কিছু নেই। চালের হাঁড়িও ফাঁকা। খপখপ সাঁঝবেলায় ফিরলে তবে আবার জাউভাত চড়বে।

এই রাস্তায় পরীযান গিয়েছে দুপুরে। এখন শূন্যে কোন চিহ্ন নেই। তবু, মুচিয়ার মনে হয়, সুরেন জানা যেন হেঁটে যাচ্ছে আগে, ছ'বেহারার গলায় অশ্লীল সুর, (চাল ভাজা তিলে খাজা/ বর্ষা রাত বৌয়ের হাত/ হেই আ হে'ও হৈ আ হো-ও-ও হৈ-ই-ই-হা হো-ও-ও-ও) হাত পা নাড়িয়ে ছুটে যাচ্ছে। চুপটি করে বর-বউ বসে আছে সামনে। কাঠের ফুল আঁকা সিংহাসন। দু'মুখ খোলা পরীযানে প্লিকের ঝালর। ঝালরের গায়ে পুঁতির কাজ। ভুলভুল করে গন্ধ বেরুচ্ছে আতরের। মাঠের গন্ধের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে সেই সুগন্ধ।

হাঁটতে হাঁটতে হোঁচট খায় মুচিয়া। ময়নার ফ্যাকাশে সিঁথির কথা মনে পড়ে। শাঁখার উপরে ময়লা জমেছে। গলার কণ্ঠীহাড় জাগানো।

হাটের মধ্যে পিয়ন তাকে খুঁজে পেতে একটা পোষ্টকার্ড দেয়। বড় বড় অক্ষরে লেখা নিষ্ঠুর কতকগুলো কথা। ময়নার স্বামী লিখেছে। এ চিঠি সে কি করে ময়নাকে দেবে? যদি নিজেকে শেষ করে ফেলে মেয়েটা। বিশুকে কে দেখবে তখন? সে জানে তাঁতী বাড়ির ময়না বড় অভিমানী। অল্পতেই আগাছার মতো উপড়ে দেবে নিজেকে।

সন্ধ্যা নামছিল। সস্তায় নোনা মাছ পেয়েছে একটা। বহুদিন আঁশ জলের স্বাদ পায়নি। মুরালীমোহনবাবুর মেয়ের বিয়েতে খাসী কাটা হয়েছে ত্রিশটা। পুরো দাউদপুর খাওয়াবে। জোরে জোরে পা চালায় সে। বৌ নিয়ে এই পথেই পরীযান ফিরবে। ফাঁকা মাঠের মধ্যে অন্ধকার বিছিয়ে দিচ্ছে শরীর। এই অবস্থায় পরীযান দেখা মানে ভূত দেখা। এর থেকে কাঁটার ঝোপে লাফিয়ে পড়া সহজ।

বাজার গব গব করছিল মুরালীমোহনবাবুর সুনামে। সুরেন জানার পা যেন মাটির এক বিঘোৎ উপরে পড়ছে। সবাই বলছে, অমন সাজানো গোছানো পরীযান অনেকদিন দেখেনি কেউ।

নোনা মাছের স্বাদই আলাদা!

হাওরি বলল, যা না দাদা, ময়নাদিকে ডাকি আন। বিশুটা বহুদিন থিকে মাছ মাছ করথিলা। আজ ওর মেনকে খাইতে কইবা মোর দুয়ারে।

চিঠির কথাগুলো ভুলে গিয়েছিল মুচিয়া। ঘরের চালা থেকে ভাঁজ করা পোষ্টকার্ডটা এনে আর একবার পড়ে। কানের পাশটা গরম হয়ে ওঠে ধীরে ধীরে। পোষ্টাপিসে গিয়ে পোষ্টকার্ড না কিনে ফিরে এসেছে সে। কি হবে আর পোষ্টকার্ডে?

হাওরি আর একবার বলে কথাটা। তখন নোনা খালের ধারে হাউউ ফোটে, কোলাহল ভেসে আসে মানুষের।

—হা পরীযান আসেটে। কান খাড়া করে অন্ধকারে তাকিয়ে থাকে হাওরি।

—পরীযান আসেটে...? মুচিয়ার বিমর্ষ গলা, এই পথ দিকি পশ্চিম পাড়ায় যাবে নাকি?

—হ্যাঁ, এ পথ ছাড়া আর কুন পথে যাবে? মাত্র তো ওটে পথ। মুচিয়া আর দাঁড়ায় না। পুকুরপাড় দিয়ে সোজা চলে আসে তাঁতী পাড়ায়। ব্যান্ডের শব্দ কানে বাজে। হাজার বোলতা যেন হুল ফোটায় একসাথে।

মরিয়া হয়ে ডেকে ওঠে সে, ময়না। এ ময়না...।

ফাড়া বাঁশের ভেজানো কবাট খুলে যায়।

—আইসো, ভেতরে আইসো।

মুচিয়া দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর কি ভেবে ঢুকে যায়। ময়নার শরীর ঝাঁকিয়ে নেমে যায় চাপা নিঃশ্বাস।

—দাউদপুরের বৌ আসেটে মনে হয়টে।

—হয়ত হিবে।

দু'জনে বসে পড়ে। ভোঁস ভোঁস করে ঘুমাচ্ছে বিশু। ওর ক্ষিদের পেটে মশা বসেছে।

—আজ যে বড় আইলো। ময়না হাত ছুঁয়ে দেয় মুচিয়ার, নষ্ট মায়াঝির ঘরে আইল লোকে কিছু কইবে না তো?

দেশলাই ঠুকে বিড়ি ধরায় মুচিয়া। স্পর্শকাতর চোখে তাকিয়ে থাকে ময়না। বিয়ে আসছে। কাঁচা পথে এক গন্ডা হ্যাচাকের আলো পড়ে চকচক করছে খোলামকুচি। পুরো পাড়া হুমড়ি খেয়ে পড়ে কলতলায়। ব্যান্ড বাজছে। হাওয়াই উঠছে আকাশে। হ্যাচাকে পাম্প দেয় সুরেন জানা। সামনে কোঁচা ফুলিয়ে বরকর্তা। হাতে চার ব্যাটারীর টর্চ, মুখে জর্দাপান। বুকে ঢেউ তুলে নেচে যাচ্ছে নিতাই ড্যান্সার।

দু'হাতে কান ঢেকে মুচিয়া যেন চিৎকার করে উঠতে চায়। পারে না। হকচকিয়ে ময়না বলে, কি হিলা কি?

—সরি আয়। মোর পাশরো সরি আয়। ভেজা চিলের মত কাঁপছে মুচিয়া, চোখের ভাষা অন্য। নিশ্বাসে বুনো একটা গন্ধ।

কাছে আসতে গিয়ে কাছে আসতে পারছে না ময়না। পা থেকে যেন শিকড় নেমেছে মাটিতে। ফ্যাকাসে শাঁখা সিঁদুরের কথা ভেবে সে কেঁদে ওঠে।

বিলভাত

গাবতলায় দাশুর চায়ের দোকানে বসে কথাটা প্রথম শোনে বাদলা। পুতলি তখন চাঁচারি বেড়ায় ঠেস দিয়ে বাসি পাউরুটি চায়ে ভিজিয়ে খাচ্ছে। খাওয়ার সময় ওর কোন জ্ঞানগম্যি থাকে না। ফলে, বাঁ পাশের বুকটা পুরো ওদলা। দেখেও না দেখার ভান করে সেই দিকে তাকিয়ে ছিল দাশু। শেষে ধরা পড়ে যেতে, গরম জল ছিটিয়ে বলল, যা ভাগতো তোরা, এখানে দাঁড়িয়ে কি পেট ভরবে?

রোজকার মত গাঁ ঘুরতে বেরিয়েছিল বাদলা। হাটখোলায় ক্যাচকেচি পাখির মত লাফাতে লাফাতে সাত সকালে পুতলি এসে হাজির, ও মুরুব্বি, কোথায় চল্লে গো। আমাকেও নে চল, আমি তোমার সাথে যাব।

দু'দিন ধরে ভাতের মুখ দেখেনি দু'জনেই। মুখ শুকিয়ে খসখস করছে চামড়া। তখন আতাগাছের মটকা থেকে রোদ নামছে ধুলোয়, কাঁটানটের খাটো গতর চকচক করছে সেই রোদে।

বুক নাচিয়ে পুতলি বলে, যা পাব আধাআধি ভাগ। কি গো মুরুব্বি, রাজি আছো তো?

রাজি হয়েছিল বাদলা। কেননা সে ভালভাবেই জানে, দুর্যোগের পরে ভিক্ষে দেওয়াটা গোদের উপর বিষ ফোঁড়া। টানা চারদিন ধরে ঘূর্ণিঝড়। তার সংগে বৃষ্টি। ঘর-বাড়ি সব মাটি ছুঁয়েছে। মাঠের ফসল নষ্ট। ভাঙ্গা চালাঘরের মত মানুষের মেজাজ এখন তিরিক্ষি। তাই, দোর দোর গিয়েও লাভ নেই, ফিরে আসতে হয়। কেউ আর দয়ার চোখে দেখে না, উল্টে হাজারগণ্ডা কথা শোনায়। খিঁচিয়ে তেড়ে মারতে আসে কেউ কেউ।

চায়ের কাপটায় শেষ চুমুক দিয়ে বাদলা বলে, একটু জল দাও দাশুদা, কাপটা ধুয়ে দিই।

উঁচু করে কাপে জল দেয় দাশু। কচলে মচলে কাপ ধোয় বাদলা। এ দোকানে তার জন্য একটা হাতল ভাঙ্গা কাপ। রোজ সকালে এই কাপটায় চা ভরে দেয় দাশু। অথচ পুতলির জন্য আলাদা কোন কাপ নেই। মেয়ে বলে পুতলি বাবুদের কাপে চা খায়।

পুতলি যখন কাপ ধুতে কলতলায় গেল, বাদলা তখন বাঁশের মাচায় বসে বিড়িতে দম দিচ্ছে। দাশু কেটলিতে ঠাণ্ডা জল ঢেলে বলল,—বাদলা খুড়ো, বুঝলে হে কাল হর ঘোষের শেরাদ্ধ। পেল্লাই আয়োজন, পুরো গাঁ খাওয়াবে।

শ্রাদ্ধবাড়ির খাওয়া মানে পেটপুরে খাওয়া। বাদলা তা জানে। আর জানে বলেই নড়েচড়ে বসে। ঘনঘন দম দেয় বিড়িতে। তার পা দুটো অনবরত দোলে।

শ্রাদ্ধের আগেরদিন ভাত যাবে বেনাগাছ তলায়। হর ঘোষের বেনাগাছ পোঁতা হয়েছে

পূব বিলে। হর ঘোষ যা যা খেতে ভালোবাসতো সেগুলো রেঁধে-বেড়ে বিলপাড়ে পৌছে দেবে তার ছেলে।

ভাবতে ভাবতে ক' মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে যায় বাদলা। ঢোক গিলে দাশুর মুখের দিকে তাকায়। দাশু চামচটা চায়ের গ্লাসে নাড়তে নাড়তে বলে,—কি হল, বড় যে ফেকাশে হয়ে গেলে?

—কিছু না, এমনি। বাঁশের মাঁচায় দু'হাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায় বাদলা। চিন্তা-ভাবনার মধ্যে শ্রাদ্ধ বাড়ির হৈ—হট্টগোল মিশে যায়।

বড় দয়ার মানুষ ছিল হর ঘোষ। তার স্তানমান ছেলে পাঁচু ঘোষ গ্রামের প্রধান। গরীব দুঃখীদের নিশ্চয়ই পেটপুরে খাওয়াবে!

আঁচলে ভেজা হাত মুছে পুতলি দাঁড়ায় সামনে, চলো, বড় যে দাঁড়িয়ে রইলে?

—কোথায় যাবি?

—কেনে, ইলিফে!

—আমি যাবনি, গনশাবাবু মারে।

—মারলেই হল, এবার মারলে তুমিও মারবা।

কথাশুনে ফিক্ করে হেসে ফেলে দাশু। তারিয়ে তারিয়ে পুতলিকে গেলে। বাদলা আর কথা বাড়ায় না। তার মতে, দায়ের উপর কুমড়ো পড়লে কুমড়োরই বিনাশ। ক'দিন আগেই ঘাড়ে হাত দিয়ে লঙ্গরখানা থেকে ভাগিয়ে দিয়েছে গনশা। হৈ-হুজ্জোত করে বলেছে, মাগনা খেতে আসিস, লাজ লাগে না! এবার দেখলে মেরে হাড় গুড়ো করে দেব।

গনশার মুখ না তো, কাঁকড়া বিছের পেছন! মাথা বনবনিয়ে উঠেছে কথাটা শুনে। লোহার ডেকচিতে তখন ফুট ধরেছে খিচুড়ির। চারদিক জুড়ে চাল-ডালের গন্ধ। লোভ হচ্ছিল তবু, দাঁড়ায়নি। তার কপালটাই এমনি। অনেকেই বলে, হ্যাঁরে বাদলা, ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়িয়ে কি লাভ? যা না, গতর খাটা ভাত পাবি।

সব শুনে চুপ করে থাকে সে। বোবার শত্রু নেই। তাছাড়া, কার জন্য খাটবে? কে আছে তার? বউটা গত হয়েছে পাঁচ বছর। পৈতৃক ভিটেটা গনশাবাবুর বাবার কাছে বাঁধা আছে কোর্ট কাগজে। ছাড়িয়ে নেবে তেমন উপায় নেই, ইচ্ছে নেই। দেড় দু'বছর এদিক সেদিক ঘুরে সে আবার গাঁয়ে ফিরে এল। তখন তার বাবরি চুল, লম্বা দাড়ি। ভরঘুরে চোখ মুখ। হাসলে তাকালে চোরের মত দেখায় মুখটা। লম্বা রেখাগুলো একেবারে মোচের কাছাকাছি এসে বিশ্রী ভাবে মেশে। চোখের কোণে অজান্তে ভরে যায় পিচুটি। খুব বেশী কথা বললে মুখের দু'পাশে খেজুর রসের গাদের মত ফেনা জমে। তার উপরে, সামনের একটা দাঁত নেই। চোর সন্দেহে কিলিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছে লোকে। এখন কথা বলার সময় সেখান থেকে হরদম ছিটকে আসে থুতু। পুরো মুখটাই দুর্গন্ধ। হাঁটলে, চললে সামান্য বেঁকে যায় মাজা। আগে জোগালদার ছিল ঘরামীর। ঘর ছাইতে গিয়ে পড়ে যায় মটকা থেকে। সেই থেকে মাজায় লাগে। তা আর সারল না। গোড়ালী ফাটা পা দুটোয় টায়ারের চটি। তাতে পাটের সুতলি বাঁধা। এতে ছুটতে গেলে জোর পায়। পা ফসকে যায় না। চটি পরার অভ্যাসটা জন্মেছে শহরে গিয়ে। ওখানে ধারাল খোয়ায় পা ছড়ে যেত হরদম।

দেরী দেখে পুতলি হাটের মাঝখানের পোকাড়ে বকুল গাছটার কাছ থেকে আর একবার ডাকল, কি হল মুরুব্বি, চলো। রোদ চড়ছে।

তাড়াহুড়ো করে চটের থলিটা কাঁধে গলিয়ে নেয় বাদলা। তারপর, লেংচাতে লেংচাতে হাঁটে। দাশুর চায়ের দোকানে ভিড় জমছে। সদর থেকে আসা খবরের কাগজটা ছুঁড়ে দিয়ে গেল বই দোকানী। সেই কাগজের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে অনেকেই।

পুতলি কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বলে, তুমি বাপু পার বটে। এক জায়গায় এতটা জু'নিলে চলবে? রোদ চড়লে যে বেজায় হাঁপু লাগে, তেষ্টা পায়।

এ গাঁয়ে রোদ-বৃষ্টি সব সমান। যখন ঝড় আসে তখন মনে হয় এটা ঝড়ের দেশ। যখন বানবন্যা হয় তখন ডাঙ্গা পাওয়া দায়। গোরু ছাগলের সাথে মানুষ মিশে যায়। কিসের মোহে এই গ্রামে ভিক্ষে করতে এসে পুতলি আর ফিরে গেল না। একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই তবু এ গাঁ তার আপন গাঁ।

অনেকক্ষণ পরে বাদলা একটা বিড়ি ধরায়। সংগে সংগে পুতলি বলে, আমায় এট্টা দাও না কেনে?

—তুই খাবি?

—কেনে, খাবোনি কেনে? আমি সব খাই।

পুতলির কথা গুলো বেশ চোখা চোখা। অনেকটা ভদ্রলোকদের বউ বিটিদের মত। শুনতে ভাল লাগে বাদলার। পুতলি প্রায়ই বলে, বড় ঘরের বৌ ছিল সে। কয়লা ধরতে গিয়ে ঘরের মানুষটা বেকায়দায় ঢুকে যায় ইঞ্জিনের তলায়। খেঁতলান শরীরটা ধরে কেঁদেকেটে ফল হল না। অপয়া বলে শাশুড়ি খেদিয়ে দিল শাঁখা ভেঙ্গে। তারপর, ঝিগিরি, ভিক্ষে। শেষটায় সাতঘাটের জল খেয়ে বানে ভাসা গাছের গুঁড়ির মত আটকে গেছে এখানে। শরীরটা ওর কাল হয়েছে! যে দেখে সেইই নুলিয়ে ওঠে, টাকা পয়সার লোভ দেখায়। আগে বারোয়ারী তলায় শুতো। সেখানেও মানুষের বাজনজর। মাঝরাতে হ্যাঁচকা টানে ঘুম ভাঙ্গিয়ে আলুওয়ালার সেকি ইতরামি! চোখ রগড়ে পুরো ব্যাপারটা যখন বুঝল তখন আলুওয়ালার এখন যাই তখন যাই দশা। কোমর জাপটে খনখনে গলায় সেকি কাকুতি-মিনতি। পুতলির মন গলেনি। উল্টে 'ড্যামনা' বলে গাল দিয়েছে। যখন একদম নাছোড়বান্দা, গতর ছুঁয়েছে দুটো অবাধ্য হাত— নিরুপায় হয়ে কামড়ে দিয়েছে পুতলি। 'খ্যাক শেয়ালী' বলে 'বাপরে-মারে' চিল্লিয়ে জান বাঁচিয়েছে লোকটা।

বাদলার তাই পুতলিকে ছুঁতে ভয়। মেয়েটার রাগ গোখরো সাপের মত। চোরের চাহুনি দেখে বুঝে ফেলে সব। খাওয়া পরা নেই, অথচ ইজ্জোত আছে। আর কি কাটা কাটা কথা! মাথা চুলকে উঁই উকুন মেরে পুতলি বলে, আজ বড় রোদ গো। দেখ দিনি, তালু তেতে উঠচে। বড্ড গুমসা গরম।

—তাহলে, আম বাগানের পথটা দিয়ে চল। ছায়ায় ছায়ায় যাওয়া যেত।

কথাটা মনে ধরে পুতলির। বাঁক পেরিয়ে আম বাগানের ভেতর ঢুকে যায় ওরা। বিঘে চারেক কলমে আম বাগান। তার মধ্যে দিয়ে চাঁচা ছোলা পথ। আমের হলদেটে পাতায় সেই পথ এখন গোমরা। চলতে গেলে মচ্‌মচ্‌ শব্দ হয়!

—বড় বাহারে ছায়া তাই না? পুতলির চোখে মুখে আনন্দ।

—হুঁ! গম্ভীর উত্তর দেয় বাদলা। তার এখন পেট জ্বলছে। গত দু'দিন থেকে ভাতের দেখা নেই। একটা বাসি পাউরুটি দাশু ভিক্ষে দিয়েছিল। তার অর্দ্ধেকটা তো জিভে লেগে থেকে গেল। পেট অব্দি যেটুকু পৌঁছেছিল তার দৌড় আর কতদূর? ভরপেট জল খেয়ে তবে গিয়ে নিস্তার!

—এমন ছায়ায় হাঁটলে ঘরের মানুষটার কথা মনে পড়ে যায় মুরুব্বি। ঝড় হলেই বোরা নিয়ে তোমার দাদা আম কুড়োতে বেরুত। কখনো খালি হাতে ফিরত না।

—সেই আম দিয়ে কি করতিস?

—কেনে, আমচুর, অম্বল! তোমার দাদা আমচুর খেতে বড় ভালোবাসত গো! ছলছলিয়ে ওঠে পুতলির চোখ। বাদলার জিভের ডগায় তখন জল, ঢোক গিলে বলে বহুদিন কচি আম দিয়ে কুচো মাছের টক খাইনি, একদিন রেঁধে খাওয়াবি?

—চাল নেই চুলো নেই, রাঁধব কি দিয়ে? ঘাড় ঘুরিয়ে পুতলি হাসে, এখন তো আমের সময় নয়! সময় হলে ঠিক খাওয়াব।

মনে মনে হিসেব কষে বাদলা দেখে আমের বোল আসতে অনেক দেরী। এখন শীত। শীতকালে কত যে শাক-সব্জি। ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমাটো আরো কত কি। পৌষমাসের সবজেটে কুমড়োর কথা মনে পড়ে! আহা, কি নরম! একসেদ্ধতেই গলে জল! কি তার সুয়াদ!

জিভের জলটা ভেতরে পাচার করে বাদলা কোথায় যেন হারিয়ে যায় নিমেষে, লক্ষ্মী বেঁচে থাকতে একবার কুমড়োর ঘন্ট রেঁধে খাইয়েছিল। এখনো মুখে লেগে আচে।

লক্ষ্মীর কথায় পুতলির চোখটা ঈর্ষায় টনটন করে। শুকনো আম পাতাগুলো পা দিয়ে সরিয়ে বলে, তা লক্ষ্মীর মত কি আমি তোমায় রেঁধে বেড়ে খাওয়াতে পারব? তোমার দাদার আমার হাতের রান্না পছন্দ ছিল না!

—তা, দাদা বুঝি আপিসে কাজ করত?

—তা করত বৈকি! রোজ ভোর হলে দাঁতন করতে করতে চলে যেত ইস্টিশানের কয়লা ধরতে। ইন্‌জিনবাবুর সাথে সাঠ ছিল। লাঠির ডগায় টাকা ধরলেই ঝুড়ি ঝুড়ি কয়লা। সেই কয়লা পুড়িয়ে ঘরে ঘরে বেচতো। মাঝে মাঝেই সিনেমা নিয়ে যেত আমাকে। জানো মুরুব্বি, আমি না দারা সিং-এর বই দেকেচি।

—দারা সিং, সেডা আবার কে?

—হেই মাগো! কিচু জানো না দেকচি। শাড়িটা কোমরে গুঁজে নিয়ে গোটা গোটা চোখে তাকায় পুতলি, নিমেষে ছলছলিয়ে ওঠে চোখ।

—মুরুব্বি, ঘরের মানুষটা আমার দারা সিং-এর মত পালোয়ান ছ্যালো গো। কিন্তু কাঁখে এট্টা খোকা এলনি! কত যে মানত করলাম দু'জনে। কানিতে নাকের জল মুছে ফোঁপানী থামায় পুতলি।

—তুই কানচিস্? আম বাগানের মাঝখানে পুতলির বাঁকা ছায়াটাকে যেন প্রশ্ন করে বাদলা।

সিঁদুরে আম গাছের মগডালে তখন একটা ঘুঘু, ঘুঘুর-ঘু ঘুঘুর-ঘু ডাকে। চোখ মুছে পুতলি বলে, কাঁনব কেনে, কার জন্য কাঁনব? এই পোড়া সংসারে আমার আর আচে কে?

বেগমখাশ আর বাদশাভোগ আম গাছের গোল্লা ছায়ায় পুতলির দুঃখী মুখটা দেখে ভেতরে ভেতরে ভেঙ্গে যায় বাদলা। কাঁদব না বলেও পুতলি কাঁদছে। চোখের দু'পাশ থেকে জলগুলো নেমে আসছে থুতনি অব্দি। থেকে থেকে গলার কণ্ঠী হাড়টা নড়ছে। হাত দুটো বুকের কাছে চেপে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে সে।

বাদলা ওর হাতটা ধরে। বাধা দেয় না পুতলি। শুধু একবার চোখ তুলে তাকায়। তাতেই ধ্বক করে ওঠে বুক। ভিক্ষের ঝুলিটা ঠিকরে পড়ে মাটিতে।

—তুমি আমায় ছুঁলে, হ্যাঁ গা? পুতলির ঠোঁট দুটো বেজায় কাঁপছে। বাদলা আরো শক্ত করে আঁকড়ে ধরে তার হাত। বিড়বিড়িয়ে বলে, আমার ভাগ্যটাও ফোঁপরা। লক্ষ্মীটা তিনবার পোয়াতি হলো, তিনবারই লাউজালির মত পচে গেল।

কথা শুনতে শুনতে ক্রমশ ঘোলাটে হয়ে ওঠে পুতলির চোখ। পায়ের দশ আঙ্গুলে দাঁড়িয়ে কখন যে সে বাদলার হাতটা নিজের হাতের মুঠোয় চেপে ধরেছে নিজেও জানে না। শুকনো আম পাতার উপর হাত-পা এলিয়ে এক সময় শুয়ে পড়ে পুতলি। ওর মুখোমুখি অধৈর্য বাদলা। কুঁইকুঁই করে বলে, ই মারে, ই পুতলিরে, তোর মাথাটায় যে তাপ বেরয় রে। তুই আর বাঁচবিনে মাইরি।

আম গাছের মগডালে ঝটপট করে মাঠঘুঘু। এদিক সেদিক তাকিয়ে দাড়িভর্তি মুখটা বাদলা ঠুসিয়ে দেয় পুতলির ভরাট বুকে। তলপেটটায় চাপ লাগতে ঝাঁকিয়ে ওঠে পুতলি, দু'হাত দিয়ে বাদলার ফিনফিনে শরীরটা ঠেলে দিয়ে ফুসে ওঠে নিমেষে। উঃ, কেরে আমার? ভাত দেবার মুরদ নেই, ঘাপ দেবার রাজা!

—চুপ যা। মাঠঘুঘুটার মত অস্থির বাদলার চোখ।

পুতলি চুপ করে না, অনর্গল বকে। তার মাথা থেকে চুলোর ভাপ বেরয় হরদম। কাপড় চোপড় সামলে নিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়, দু'দিন ধরে খাইনি, মুরুব্বি। খিদে পেটে কি ওসব সুখ ভাল লাগে?

দাঁতে দাঁত চেপে বাদলা বলে, তোরে আমি ভাত দেব। আয় কাছে আয়।

পুতলি কাছে আসে না। পিছাতে পিছাতে চলে যায় আম বাগানের শেষে। হাড়মটমটি আর পুটুস ঝোপের মাঝে গিয়ে সামনের পানে তাকায়। টলটলে জলেভরা মস্ত একটা পুকুর। বাঁধান ঘাট। নাকছাবির মত মাঝের জলে ফুটে আছে শাপলা।

তরতরিয়ে পুকুরে নেমে যায় পুতলি। কুলকুচি করে জল দাপিয়ে সাঁতার কাটে। জলের ভেতর রুইমাছের মত তার পায়ের গোছ দেখা যায়। বঁড়শি বেঁধা মাছের মত ঘুরপাক খায় অনবরত। পাড়ে দাঁড়িয়ে বাদলা চেল্লায়,—উঠে আয়, এ পুতলি উঠে আয়। দিনকাল খারাপ—জ্বরজ্বালা হলে কে তোরে দেখবে, এ্যাঁ?

ডুবসাঁতার দিয়ে পুতলি মাঝপুকুর থেকে তুলে আনে মূলসমেত শাপলা। তারপর, ভেজা কাপড়ে ডাঙ্গায় উঠে নিজের দিকে তাকায়। শাপলা লতিগুলো দু'ভাগ করে। একটা

ভাগ বাদলার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, এই নাও, খাও। খিদের সময় খারাপ লাগবেনি।

ছাড়া চুলটা খোপা করে ফুলটা গুঁজে নেয় খোঁপায়। হাসতে হাসতে বলে, দেখ মুরুব্বি, আমি রাণী সেজেচি!

বাদলা চোখ ঘোরাতে পারে না।

হাওয়ায় কাপড় শুকাতে শুকাতে পুতলি বাঁকা চোখে হাসে, তোমায় রোগে ধরেচে। ঠিক আছে বাপু, সাঁঝবেলায় ভাত নিয়ে ইস্কুল মাঠে এসো ক্ষণ। দেখব তোমার কত মুরোদ।

কোমর দুলিয়ে চলে যায় পুতলি। ওর বাঁকা ভ্রু'র ইশারায় গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে ঝিমাতে থাকে বাদলা। একথাল ভাত মগজের ঘিলুতে জেবড়ে যায়, সাঁতার কাটে রক্তে। ক্রমশ তাকে অবসাদ ঘিরে ধরে। শিথিল হয়ে যায় স্নায়ুকোষ। অকস্মাৎ মাথাটা হেলে পড়ে গাছের গুঁড়িতে, কিছুক্ষণ পরে মুখ দিয়ে লালা গড়ায়। বেলা গড়াতেই কাঠপিঁপেড়ের কামড়ে ঘুম ভেঙ্গে যায়। তাকিয়ে দেখে পুতলি নেই, অন্ধকার।

ধড়ফড়িয়ে হাতের তেলোতে লালা মুছে নিয়ে গা-হাত-পা ঝেড়ে উঠে দাঁড়ায় সে। এ সময় এককাপ চা হলে ভাল হত। চা-দোকানীর কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে, আজ হর ঘোষের আদ্যশ্রাদ্ধ। বিলভাত যাবে সন্ধ্যেয়।

পড়িমড়ি করে ছুটতে থাকে বাদলা। পাকুড়তলার কাছে এসে আর যেন তার পা সরে না। শীতকালে কেউটে সাপের মত নাড়িভুঁড়ি গুলো শুয়ে থাকে চুপচাপ। দাশুর কথাগুলোয় নেশা ধরে। অমনি সে হর ঘোষের দোতলা বাড়ির দিকে এগোয়। খেঁকি কুকুরটা তার চেহারা দেখে দু'বার ডাকে। ভয়ে কোমরের বেদনাটা শিঙ্গিমাছের কাঁটা মারার মত কনকন করে বেজায়।

পুতলি প্রায় বোঝ দিয়ে বলে—ও কিছু না, বাতের বিদনা। শুয়রের তেল, বারো বছরের পুরনো ঘি মালিশ করলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

কোথায় পাবে শুয়রের তেল, বারো বছরের পুরনো ঘি? খিড়কি দরজা দিয়ে উঁকি মারে বাদলা। লোহার কড়াই-এ গরম রসগোল্লা ভাসছে। কাল শ্রাদ্ধ। আজ তার প্রস্তুতি। হর ঘোষের নাতিটা তাকে দেখতে পেয়ে নাক কুঁচকে বলল, ও বাবা,—ও মা, দেখ বাদলা পাগলা এসেছে। ইস্, গায়ে কি গন্ধ!

সঙ্কোচে সরে গিয়ে নিজের গায়ের গন্ধ শো'কে সে। পায় না। চিটে ময়লা জামাটার উপর তার বরাবরের মায়া। এখন রাগ হয়।

হর ঘোষের ডাক্তারী পড়া বড় নাতি এসে ঠেলা মেরে ফেলে দেয় তাকে। হুমড়ি খেয়ে মাটি আঁকড়ে ফিরে তাকায় সে। চোখের কোণে জল।

রকম সকম দেখে খিল-খিল করে হেসে ওঠে ঘিরে থাকা ছেলে-ছোকরার দল। কোনক্রমে উঠে দাঁড়িয়ে পড়িমড়ি করে ছুটতে থাকে সে। পিছন থেকে আদলা একটা ইঁট তার মাজার কাছে এসে লাগে।

কোঁক করে শব্দ হয় আচম্বিতে। গোবর গাদার মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে যায় বাদলা।

আধঘন্টা পরে যখন হুঁশ আসে তখন দেখে হ্যাজাক জ্বালিয়ে পূব বিলের দিকে ধামায় করে ভাত নিয়ে যাচ্ছে পাঁচু ঘোষ। ওর পেছনে দশ-বার বছরের একটা ছেলে। দাঁতে

দাঁত চেপে উঠে দাঁড়ায় বাদলা। গোবর মাখা শরীরটা খড়গাদায় মুছে দূরত্ব রেখে হাঁটতে থাকে সে। অর্জুন গাছটার কাছে আসতেই ভয়ে ছমছম করে গা। শীত লাগে বেজায়। সামনে ফসল শূন্য মাঠটা তার ফাঁকা বুকের মত হা-হা করে। চেনা ভয়টা লতিয়ে পেঁচিয়ে জাপটে ধরে তাকে। গতবার পটাই মোড়লের বিলভাত খেতে এসে অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছে। বিলপাড়ে পটাই মোড়লের পোষা কুকুরটা ভূতের মত তাকে ভাত খেতে দেখে ছুটে গিয়েছিল আক্রোশে। বাদলা কোনক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জলে, নইলে ছিঁড়ে ফেলত কুকুরটা।

কাজটায় ঝুঁকি আছে। ঝুঁকি ছাড়া আজকাল কোন কাজ হয় না। অর্জুন গাছের শুকনো পাতার উপর পাতা মুড়ে নিজেকে গোপন করে সে। বিশহাত তফাৎ দিয়ে হর ঘোষ-এর বড় ছেলে খরখর চলে যায় বিলের দিকে। তার হাতে বেত-ধামা। কাঁসার থালায় কলাপাতা চাপা। তার পেছনে ছোট ছেলেটার হাতে পান-সুপুরি, ভেড়ার লোমের আসন আর নতুন গামছা। হর ঘোষ গামছা কাঁধে ফেলে মাঠ দেখতে যেত। বগলে থাকত বেত বাঁটের ছাতা, তাই ছাতা আর নতুন গামছা বিলের পাড়ে রেখে আসবে তার উপযুক্ত ছেলে।

অর্জুন গাছটা ছাড়িয়ে এসে মাঠে নামল বাদলা। পুরো মাঠে ঢ্যাঙ্গা আলের ছড়াছড়ি। কানের পাশ দিয়ে চামচিকে উড়ে যায় শ্যালো ঘরটার দিকে। ভট-ভট করে জল তুলছে দশ ঘোড়ার মেশিন। আর একটু পরে এখানেও ইলেকট্রিক আলো জ্বলবে।

অতএব এ পথ দিয়ে যাওয়া নয়, অন্য পথ দিয়ে। আখক্ষেতটার পাশে এসে মেঠো পথে সে নামলো। আল ধরে সে যেতে পারত। কিন্তু যদি মুখোমুখি হয়ে যায়?

ঘুর পথে বিলের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে পড়ে বাদলা। চাঁদ নেই, আকাশে ফুটকি ফুটকি তারা। জল-শোলার পাশ দিয়ে কলমী ফুলের ঝাড়। ঘাস পচার গন্ধ ছাড়ছে বিল। জলা ঘাসগুলোর মধ্যিখানে বসে পড়ে ভয়ে হাল্কা হয় একবার।

হর ঘোষের ছেলে নেমে গিয়েছে বিলের হাঁটু জলে। ফের হাত কচলে উঠে এল ডাঙ্গায়। প্রদীপ জ্বেলে বেনাগাছটা উপড়ে ফেলে দিল জলে। মালসা হাঁড়িটা আছাড় দিয়ে ভেঙ্গে কলাপাতা ভর্তি ভাতটা নামিয়ে রাখল মাটিতে। পাতায় সাজিয়ে দিল মাছের মাথা, আলু-কুমড়োর ঘন্ট, কলমীশাকের ভাজি আর আমআদার চাটনি।

—দাদুরে এট্টু নুন দেবা না বাবা? রোগা প্যাটকা ছেলেটা অনেকক্ষণ পরে কথা বলল, দাদুরে এট্টু জল দেবা না বাবা?

জলের কথা একদম ভুলে গিয়েছিল পাঁচু ঘোষ। ফলে সরায় করে জল এনে দিল বিল থেকে। ধুতিটা হাঁটুর কাছ থেকে নামিয়ে গড় করে বলল, খাও বাবা, তোমার জন্য এনেছি।

—বাবা, ছাতাটা তো কৈ দাদুরে দিলে না!

—ওটা বামুনকে দিয়ে দেব।

—গামছাটা?

—ওটাও।

মুখ দিয়ে ইস' করে ওঠে বাদলা। হাতছাড়া হয়ে গেল দুটো নতুন জিনিস। আর একটু হলে ইস' শব্দটা পৌঁছে যেত ওদের কানে। জলের শব্দে ভাগ্যিস ওরা শোনেনি!

—ও বাবা, বলনা ভাতগুলো কে খায়? নেড়ামুণ্ডির কৌতূহলের শেষ নেই।

—কে আবার খাবে? তোর দাদু।

—দাদু! দাদু কি আকাশ থেকে ফিরে আসবে? আকাশ যে অনেক দূর।

—ক্ষিদে পেলে সবাই ফিরে আসে।

ওরা চলে যেতেই জলো ঘাসের ভেতর থেকে নিজেকে কাছিমের মত টেনে আনে বাদলা। চোখের মণি দুটো চকচক করে খুশীতে। ভাতের জন্য বড় ইস্কুলের মাঠে অপেক্ষায় আছে পুতলি। কক্ কক্ করে ডাহুক ডাকে। মাছ ঘাই দেয়। বাদলার বুকের ভেতরটাও ধক ধক করে। পুতলি আজ তাকে সব দেবে। ফসল শূন্য মাঠের দিকে তাকিয়ে ফসলের গন্ধে নাক সিঁটিয়ে পড়ে থাকে সে।

হ্যাজাক দুলিয়ে মন্থর চালে এক ভুঁই থেকে আরেক ভুঁই-এ চলে যায় হর ঘোষের ছেলে। ঢিস ঢিস বুকে হামা দেয় বাদলা। খাড়া হয়ে দাঁড়ালে কেউ যদি তাকে দেখে ফেলে এই ভয়ে মাথা তুলেও দাঁড়ায় না। বিল থেকে উঠে আসে জলের শব্দ, বাতাসে ঝিঁঝির ডাক।

ভেজামাটিতে পা ছুঁইয়ে বাদলা দেখে সরযে তেলের প্রদীপ জ্বলছে। মোটাকানি তেলে ভিজে একটা কুঁচো পোকা ফড় ফড় করে পুড়ছে। আলোর শিসটা হেলেছে-খেলছে বাতাসের তালে তালে।

একটা কুঁচো পোকা সেই আলোর নেশায় মাতাল হয়ে নাচছে। যাওয়ার সময় পুতলির চোখের চাহুনিতে যে ধার ছিল তা বাঁশের পাতি নয়, ইস্পাতের ফলা। হাসি হাসি ঠোঁটটায় অন্য সুঘ্রাণ। নেশা ধরান শরীরের ভাপ ছিটিয়ে পলকে সে নিরুদ্দেশ হয় পথের বাঁকটায়।

আঁধার চুয়ান সেই পথের দিকে তাকিয়ে ভার ভার ঠেকছিল বাদলার হামা দেওয়া ন্যুব্জ দেহ। সারাদিনের ক্লান্তি আর অবসাদকে সে যেন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে গড়িয়ে দিতে চাইল জলাক্ষেতে। তার নেশা ধরান রক্ত টগবগ করছিল হঠাৎ গুপ্তধন পাওয়ার আনন্দ উত্তেজনায়। কিছুটা এগোতেই সে টের পায় ভিজে মাটি আর জলা ঘাসের স্পর্শ। অমনি ছ্যাং করে ওঠে কলজেটা। মনে হয় সে যেন পুতলির দু'গালের উপর তার খেওড়ে হাতটা চেপে ধরেছে, সোহাগের ভাত খেতে খেতে কুই কুই করে উঠছে খোঁটা উপড়ান মেয়েটা।

প্রদীপের আলোয় সে দেখে সজনে ফুলের মত গোটা গোটা ভাতের পাশে শোভা পাচ্ছে মাছের মুড়ো। হর ঘোষ নাকি মাছের মুড়ো খেতে ভালবাসত। মাছের মাথা খেলে নাকি বুদ্ধি বাড়ে। শুকনো খরখরে ঠোঁটটা জিভের ডগায় মুছে নিয়ে লোভটাকে শরীরের গর্তে লুকিয়ে রাখে বাদলা। পুতলিও মাছের মুড়ো খেতে ভালবাসে। পুতলি তো প্রায়ই বলে,—জানো মুরুব্বি, মাছের মুড়ো খেলে খোকা হয়।

আজব কথা, আজব যুক্তি! এই সব ভাবতে গেলেই এই কুয়াশা ছায়া রাত্রিতে লোমকূপ জেগে ওঠে বাদলার, হড়হড়িয়ে গরম নিঃশ্বাস নেমে আসে মাটিতে। ময়দা লেচির চেয়েও মেয়েটার নরম শরীর, তুলো তুলো আয়েসে হাঁটা চলা; তুরপুন হয়ে ফুটো করে দেয়

পুরুষ-মন। স্তূপাকার সাদা ভাতের দিকে তাকিয়ে বাদলা কেবল পুতলিকেই দেখে, দেখে ভাসা ভাসা ডাগর দুই চোখ আর মৃগেল মাছের সাঁতার দেওয়ার মত ছটফটে নগ্ন দুই উরু।

আর দেরী নয়, কাঁচা খোকাকে কোলে নেওয়ার মত ভাতটা তুলে আনে বুকের কাছে। ধরেই থাকে। খসখস শব্দ হয় কলাপাতার। মসলা-ঝোল, ডালের জল, পুতলির তাতান ঠোঁটের শীতল ছোঁয়া হয়ে গড়িয়ে নামে বুকে। ধুঁকো বকের চোখ নিয়ে শ্বাস ফেলে বাদলা দেখে, একটা শুনশান উদোম বিল, বিলের ঢ্যাঙা আড়ে জেলে বস্তি। জেলে বস্তির ভেতরে বিন্দু বিন্দু আলোর ফুলকি। এমন আলোর ঝিলিক প্রায় সে পুতলির চোখের তারায় দেখে। দূরাগত সেই তারার দিকে তাকিয়ে অনেকদিন পরে বাদলার মনে হয়, এই পৃথিবীটা তার।

বগলাহুট

সানকি আর ডেকচি হাতে আলুথালু চেহারার দুটো মেয়ে কদবেলতলার পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে হাসপাতালের মাঠে নেমে এল। ওদের একজনার কুঁড়ি ধরা বুক, দশ ছুঁই ছুঁই। অন্যটির চৌদ্দ ছাড়িয়েছে, তেলচিটে ব্লাউজের নীচে কাঁচা বেলের সুঘ্রাণ। দু'জনেই কপালের ঘাম মুছে খাবার-ঘরটার দিকে তাকাল।

বড় মেয়েটির নাম গংগা। তার ঘাড় ছাপিয়ে পিঠের উপর এক দঙ্গল চুল। ডগা ফাটা। তেলের অভাবে পাটের ফেঁসোর মত জট, চুলগুলোয় আঙ্গুল চালিয়ে নাক কুচকোয়, ই, মারে মা, কি ভ্যাবসা গরম রে! এ কুড়ুনী শরীলটা যে পুড়ে গেল মোর।

শরীর না পড়ুক ধরিত্রী পুড়ছে। পুরো আষাঢ় মাসটাই শুখা। এখন শ্রাবণ। তবু মেঘের কোন গুষ্টি নেই। চারদিক জুড়ে গরম হাওয়ার ধারা। কাৎলা মাছের মত দম নেয় গংগা। পিরাণের কোনা চিবোয় কুড়ুনী। খাটো মাপের পিরাণটা মুখের কাছাকাছি তুলে আনতেই বুকের কাছটা তার বেবাক ফাঁকা। ফলে পাতলা চামড়ার কোল বরাবর নাভিটা কুঁকড়ে মুকড়ে একসার। দুপুরবেলায় ভাল মতন খাবার জোটেনি তার। বড় আক্কারা চলছে। বাপটা কাঠ ফাড়তে গিয়ে বেকায়দায় পা ফেড়ে ঘরে এসেছে। দশ দিনেরও বেশী হল এখনও নরম পড়েনি ঘা। হাঁটা-চলা করলেই রস চুঁয়োয়। কাঁচা রক্তে জড়ানো তেনাটা ভিজে যায়। পা থেবড়ে বসে পড়ে, 'বাপরে মারে, মরে গেলাম রে- এ-এ' বলে চেঁচায় ডাকাতের মতন তাগড়াই মানুষটা।

চোখের ছিমুতে সব দেখেছে গংগা। তবু কুড়ুনীকে নাড়তে গিয়ে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে, ও মাগো, দেখদিনি মেয়ের কি ছিরি! হাঁরে কুড়ুনী, তুর বাপ এট্টা পিরাণও কিনি দিতে পারে না?

পেটের কাছে ডেকচিটা চেপে মলিন হেসে কুড়ুনী, বাপরে কত্তো বলি, বাপ যে দেয় না।

— কি বলে তুর বাপ?

— বলে পিরাণ কুতায় পাব মা? এখুন বলে পেটই চলে না। ছলছলিয়ে ওঠে কুড়ুনীর চোখ। সে নিজেও জানে পিরাণটা তার ছেঁড়া-খুঁড়া। সেই বড় পূজোয় পাট বেচার পয়সায় কেনা। এট্টা পিরাণ হরসময় পরলে কতদিন আর টেঁকে?

গংগা আর কথা তোলে না। খরাণীকালের কথা শুখা ভুঁইর চেয়েও দড়। দুপুরবেলায় তারও ভাল মতন খাওয়া জোটেনি। পোয়াটাক চালের ফেন-ভাত মা বিটিতে খেলে কত আর ভাগে পড়ে? তার সঙ্গে কুমড়ো শাকের ভাজি। কানাই মোড়লের বেড়ের ধারে পড়েছিল হাড়লিকলিকে মরাটে কুমড়োলতি। জ্বাল দেবার কুড়োতে গিয়ে ওগুলো তুলে

এনেছিল সে। তারপর ঘন্টা দুয়েক পুকুরে চুবিয়ে, সামান্য তাগড়াই হতেই মা বিটিতে খুঁটে খুঁটে খাওয়ার যুগ্যি শাকলতিকে খুঁটে নিয়েছে চুপড়িতে। তারই কোপে দুপুরটা গড়াল। শুধু রাতের জন্য চিন্তে। তার বাপ বলে, যে দিন যায় সে দিনই ভাল। তাব মা বলে, দিন আর যায় না রে বিটি, ছিনে জোঁকের মত চেপে বসেছে চামে।

দিনও যায়, রাতও যায়। কেবল ক্ষিদে যায় না। গংগার হাতে তাই কলাই করা সানকি। এলানো চুলের চুলবুলে নিকিটা খুঁটে নিয়ে নখের ডগায় চেপটে মারে। ঘেন্না হয়। নিকির উপর নয়, বাপের উপর। চোর বাপটা তাব মুখে কালি লেপটে দিয়েছে। তার মা রাতকালে ফাড়ানো বাঁশের কবাট ভেজিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। গংগার নিজেরও অনেক দুঃখ। লোকে তাকে বলে, চোরের বিটি। সইরা এট্টু কাজিয়া হলেই ছড়া কাটে, বদনা চোরের বিটি/তাকায় মিটিমিটি/দিনমানে ভালই/রাতকালে গিরিগিটি। চোরের মেয়ে বলেই যে সে চোর হবে তার তো কোন মাথার দিব্যি নেই। তবু লোকে বোঝে না। দোকানে নুন-মরিচ এটা-সেটা কিনতে গেলে দোকানী আড়চোখে দেখে। কারোর দুয়ারে ঘুরতে গেলে তারাও কেমন দেখে।

গংগার মনে তাই সুখ নেই। হাসপাতালের খাবার-ঘরটার সামনে দাঁড়িয়ে বুক ফেঁড়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। নজর যায় পোড়া কয়লার ছাই ঢিপিটার দিকে। অনেক সময় ঐ ঢিপিটার কাছে শুকনো বেগুনটা মুলোটা পচা-ধচা দু'চারটে কাঁচা মরিচ কখনো সখনো পেনিসিলিনের শিশি কুড়িয়ে পায় ওরা। রিলিফবাবু হপ্তা শেষে পচা-ভ্যাবসা মালগুলো ওখানেই ফেলে দেয়। ফেলে দেওয়ার সাথে সাথেই কাড়াকাড়ি পড়ে যায় চারদিকে। কে আগে খুঁজে পেতে মুখে দেবে তারই হুড়োহুড়ি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখে মালবাবু। সিগ্রেট ধরায়। ধুঁয়ো ছাড়ে। গাঁ জুড়ে এখন হাহাকার। গাছের পাতায় পাতায় যেন ক্ষিদে। নইলে ঐ পোকাড়ে মালগুলো নিয়ে কেন এত চেল্লামেল্লি? গংগা থাকলে কেউ ওর থাবা থেকে এক মুঠো খাবারও সটকে নিতে পারবে না। যারা খিচুড়ি নিতে আসে তারা প্রায় সবাই ভয় পায় গংগার গতরকে। সময় মত খেতে না পাক তবু শরীরটা ঠিক আছে। একবার রেগে মেগে মুখ খুললে দশদিক আঁধার করে ছেড়ে দেবে গালিতে।

আজ আর ছাই গাদায় কিছু নেই। পোড়া কয়লা বাছছে জমাদারের বিটি। খাবার ঘরের সামনে মস্ত একটা লাইন। এখনো খিচুড়ি নামেনি চুলা থেকে। বড় ডেকচিতে ফুট ধরেছে সবে। জ্বাল দেবার ঠেলে দিচ্ছে ভিখারী গোছের একটা লোক। মালবাবু টুলের উপর বসে হিসেব নিকেশ করতেই ব্যস্ত। গংগা গিয়ে সবার পিছনে দাঁড়াল। তার পিছনে কুড়ুনী।

আগে বড় ইস্কুলে খিচুড়ি দিত। মাথা পিছু দু' হাত। কার্ডে সই করে লতলতে খিচুড়ি থালে দিত বাবুরা। দু'মাস চলেই বন্ধ হয়ে গেল সে সব। মালবাবু নাকি বেলাকে দশ বস্তা মাল বেচে দিয়েছিল। সেই মাল বেচার পয়সায় একটা বাইক কিনেছে বাবু। সেই নিয়ে কত থানা পুলিশ। শেষে ঘুষ খাইয়ে সব শান্ত। এখন আর বড় ইস্কুলে খিচুড়ি দেয় না। হাসপাতালে দেয়। গাঁয়ে গাঁয়ে ছড়িয়ে গিয়েছে খবরটা। গাঁ ভেঙ্গে লোক আসে খিচুড়ির লোভে। বুড়ো থুড়োদের কপালে এসব খাবার নেই। এ সব শিশুখাদ্য। গংগাকেও বাতিল করে দিচ্ছিল কার্ডবাবু। কত ইনিয়ে বিনিয়ে গংগা কেঁদেছে। তার বিনিময়ে একটা সবুজ

কার্ড। একটা সবুজ কার্ড মানেই তো দু'হাতা তেল থলতলে সুয়াদ ভরা খিচুড়ি।

ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে কোনকালেই ভাল লাগে না গংগার। ছটফটে স্বভাব, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে কুটকুট করে পা। সানকি দুটো নামিয়ে রেখে সে একেবারে কুড়নীর হাত ধরে লাইনের সামনে। মালবাবু মুখ তুলে তাকায়, কিরে, আজ্ঞ যে বড় দেরী?

—ঘরে কাজ ছেলো। ঝ্যানঝেনিয়ে কথা বলে মুখ ঘুরিয়ে নেয় গংগা। লোকটাকে সে দু'চোখে দেখতে পারে না। বড় গায়ে পড়া। খাবার-ঘরে একা পেয়ে সাঁঝবেলায় জাপড়ে ধরেছিল তাকে। তারপর চারটে পাঁচটা হামি। সারা শরীর আলু মাখার মত কচলে মচলে একাকার। ভয় দেখাতে চার হাতা বেশী খিচুড়ি দিয়েছিল সেদিন। টলানো পায়ে ঘরে ফিরে এসে মায়ের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারেনি গংগা। মা যেন সব বুঝে ফেলবে। তাই আগে ভাগে পা ধোয়ার নাম করে সে চলে গিয়েছিল পুকুর পাড়ে। ঘাটের উপর পা থেবড়ে বসে কোন মতেই সে আর কান্না আটকাতে পারেনি!

চিমনি বেয়ে ধোঁয়া উঠছে গলগল। কালো মেঘের মত সেই ধোঁয়া। খিচুড়ির ডেকচিটা নামিয়ে সোয়াবিনের কাঁচা তেল ছিটিয়ে দেয় মালবাবু। হলুদ খিচুড়ির উপর থলথলে তেল ভাসে। জিভটা বারবার ঠোঁটের কাছে চলে যায় গংগার। শাড়িটা গুছিয়ে নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে সে। মালবাবু বলে, কি হল রে তোর? আজ যে বড় চুপচাপ। চোখের মধ্যে চোখ ফেলে হেসে ওঠে বাবুটা। গংগাও জোর করে হাসে। জোর করে হাসলেও তার গালে টোল পড়ে। আর টোল পড়লে ভারী সুন্দর দেখায় তাকে।

লোকে বলে, সে নাকি খুব সুন্দরী। যাত্রা দলের সীতার মত তার চোখ-মুখ। আর গর্ব করার মত চাওড়া বাধা ঘন চুল। এঁটেল মাটিতে মাথা ঘষলে হাওয়ায় ফুরফুর করে ওড়ে সেই অবাধ্য চুল।

তার মা বলে, মেয়ে না তো হাতি। চৌদ্দ না পেরুতেই দেখদিনি কেমুন ডাগর হয়ে উঠেচে।

সেই ডাগর গতরের পানে চুকচুক করে তাকিয়ে আছে মালবাবু। কলম থামিয়ে তার আর দেখার আশ মেটে না। গংগা মুখ নামিয়ে চলে যায় খেজুর ঝোপটার দিকে। তল পেটটায় চাপ লাগছে।

ঝোপের আড়ালে হালকা হয়ে গংগা যখন ঘাড়ের কাছে লুটানো চুলগুলো খোঁপা বাঁধছিলে তখন কুড়ুনি তাকে একটা ফণীমনসার ফুল ছিঁড়ে হাতে দিল। বড় বাহারে এই ফুল। অনেকটা তার গায়ের রং'-এর মত।

কুড়নী বলে, এ দিদি, ফুলটা তুই খুঁপায় দে না কেন? বড় সোন্‌দোর দেখাবে তুরে। দে না দিদি।

শেষটায় জোরাজুরিতে ফুলটা খোঁপায় গুঁজে নেয় গংগা। ব্লাউজের উপর লেপ্‌টে থাকা শাড়িটা মাথায় তুলে বৌ সেজে দাঁড়ায়। হাসতে হাসতে বলে, তুই বায়েসকুপ দেখেছিস বুন? এই দেখ, আমি হলাম গিয়ে বায়েসকুপের দিদিমনি। তুরে ইনজিসীন দিয়ে দেবখন।

—হ্যাঁ মা, ঠিক তো! ঠিক তোর মতুন। অবাক চোখে কুড়ুনী তাকায়, এ দিদি, দিদিরে, গো-হাটায় কেনে বায়েসকুপ দেখায় রে এ?

—হেই মা গো, তুই বুঝি কিচু জানিস নে?

কুড়নী ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। আকাশ দেখে। গংগা বলে, বায়েসকুপে এটটা কটাপারা দিদিমনি থাকে তাই না বুন?

— হুঁ।

— বায়েসকুপে গলায় নল পরা এট্টা ডাক্তার থাকে তাই না, বুন?

— হুঁ।

— বুঝলি বুন, দিদিমনিটা খালি পেট কাটে। মোর মায়েরও পেট কেটেলো। কত্তো টাকা দিয়েচে।

— উঃ, পেট কাটলি পরে মানুষ আবার বাঁচে নাকি?

কুড়নীর প্রশ্নে মহাফাঁপড়ে পড়ে গংগা। সেই সময় ঢং ঢং করে ঘন্টা বাজে রিলিফের। এবার খিচুড়ি দেওয়া হবে। গংগা আর দাঁড়ায় না। পোষা বেড়ালের মত কুড়নী এখন গংগার পেছন পেছন।

ডেকচি-হাতায় শব্দ হয়। কেন্নোর মত সরসর করে সামনের দিকে এগোয় খিচুড়ির লাইন। এতক্ষণের মরা-লাইনটা যেন জীয়োন কাঠির ছোঁয়ায় নড়ে উঠছে। হৈ চৈ, কান্না, চুলোচুলি। প্রমাণ মাপের সরকারী ডেকচিতে হাতা ডুবিয়ে মাথা পিছু দু'হাতা খিচুড়ি। তাই নিয়ে হেঁট মাথায় ফিরে যাচ্ছে অনেকেই। কেউ আবার লাইন থেকে সরে এসে হাত ডুবিয়ে দিয়েছে খিচুড়ির থালায়। যেন কত দিন খাইনি।

গংগা চোখ ঘুরিয়ে নেয়। তার ডাক আসতে অনেক দেরী। সবার শেষে সে নেবে। মালবাবু তাকে রোজ রোজই চার পাঁচ হাতা খিচুড়ি এমনি এমনি দিয়ে দেয়। বিনিময়ে খিচুড়ি বাঁধার ডেকচিটা ধুয়ে দিতে হয় তাকে। কেউ ওর মত সাফ-সুফ করে ডেকচি ধুতে পারে না। ডেকচি ধোয়ায় কষ্ট যত তার চেয়ে লাভ বেশী। ডেকচির গায়ে লেগে থাকা খিচুড়িগুলো তার। লাইন এগোয়। সিমেন্টের বেদীটার কাছে দুপ করে আড়মোড়া ভেঙ্গে বসে পড়ে সে। সংগে সংগে বাধা দিয়ে ওঠে কুড়নী, এ দিদি, উকানটায় বসিস নে। গংগা যেন ঠাকুরথানে আকাচা কাপড়ে উঠেছে, কুড়নীর চোখে মুখে তেমন ভয়!

— কেনে, উখানে বসলি পরে কি হয়?

— গুনা হয়। বাপ বলেচে

— কি বলেচে তুর বাপ?

— বাপ বলেচে, ইখানটায় ডাকতারবাবুরা বাঁশের ডগায় তেনা জড়িয়ে ফুল ছিটোয়। আর রেগে মেগে বলে, বুনদি মাতরম....বুনদি মাতরম।

হই হই করে শরীর দুলিয়ে হেসে ওঠে গংগা, দূর পাগলি! ঐ তেনাটারে বলে পুৎকা। বুন্দি মাতড়ম—ফুলুড়ি খেয়ে টিক্কি গরম বল্লি পরে পুৎকা ওড়ে ফৎ ফৎ করে। প্রধানবাবু তখুন লেবেনচুস আর বিসকুট খেতি দেয় উগীদের।

—বাবুরা খুব ভাল হয়, বল কেনে দিদি?

রাগে ফুঁসে ওঠে গংগা, আক্রোশে চোখ মুখ কঠিন হয়ে ওঠে তার, কচু ভাল! এই আমার ঘেচু ভাল। দেখিসনে ইলিফবাবু কেমুন তাকায়। ছুঁতোনাতায় খালি মাই-এ হাত।

আমি কিচু বুঝিনে, হ্যাঁ বুন—তুই বল?

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে রাতে ঘরে ফেরে বদনা। গংগার প্রসঙ্গ উঠতেই মুখ ঝামটায় পদ্ম, মেয়ে না তো আক্কস! যা দেবা কুনোটাতে রা নেই। হরসময় পেটে যেন আঁখা জ্বলচে।

খিচুড়ির থালে হাত চুবিয়ে পদ্ম'র দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে থাকে বদনা। কথা গুলোয় জ্বলুনী ধরে শরীরে। বহুদিন পর জেল ফেরৎ এসে পদ্ম'র এমন অঙ্গার মূর্তি তার ভাল লাগে না। তবু মুখ ফুটিয়ে সে কিছু বলে না, ঘাড় গুঁজে দাঁড়ের ময়নার মত খেয়ে যায়।

মন্দ লাগে না খাবারগুলো। তেল তেলা হাতে বৌকে শুধোয়, হ্যাঁরে পদ্মো, এমন খাবার তোরা রোজ খাস?

—খাই তো! এক মুখ হাসে পদ্ম, তুমার বিটি আনে গো। এই খেয়েই তো বেঁচে আছি—

শেষের কথায় বিষয় খায় বদনা। বৌরে মুখের দিকে ইচ্ছে করেই তাকায় না। কি করেছে সে সংসারের জন্য? কিচ্ছু করেনি। বরং যা ছিল শুষে খেয়েছে। সে একটা রক্তচোষা। থালাটা চেটে পুটে খেয়ে আর এক খাবলার জন্য বউ'এর দিকে তাকিয়ে ছিল বদনা। পদ্ম বরাবারই কড়া ধাতের মেয়েমানুষ। সুবিধে হবে না এসব বুঝে উঠে দাঁড়ায় বদনা, ঢেকুর তুলে বলে, বড় ভাল খেলাম রে! জেলের ভেতর এমন জিনিস একদিনও খাইনি।

আঁচিয়ে এসে বিড়ি ধরিয়ে সে বৌকে বলে, তুর বিটি কুথায়? তারে তো দেকচিনে?

সানকিটা কোলের কাছে টেনে এনে সাপড়ে-মাপড়ে খাচ্ছিল পদ্ম। খাওয়ায় বাধা পড়তেই রাগে ঘিনঘিনিয়ে ওঠে তার গা, আহারে, কি আমার বিটি সোহাগী গো! যাও গে যাও, টেরের ঘরে শূয়ে আচে।

হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে গংগার শরীরটা ভাল ঠেকছিল না। কেমন গা পাকমোড়া মেরে উঠছিল ঘন ঘন। খিচুড়ির সানকিটা নামিয়ে রেখে সে তার মাকে বলেছিল, আচ রেতে কিচু খাবো না মা। মোর শরীলটা ভাল্ নেই। মুই শুতে চললেম।

অবেলার তালাই বিছিয়ে শুয়ে পড়েছিল গংগা। শোওয়ার সাথে সাথেই ঘুম। সারা দিনের খাটা গতর এট্টু আরাম পেলেই নেতিয়ে কাদা। দেখে শুনে মানা করেনি পদ্ম। এখন মালবাবুর বাসায় দু'বেলায় বাসন মাজে গংগা। মাস গেলে পনের টাকা মাইনে।

বিড়িটা নিভিয়ে বদনা চলে গেল টেরের ঘরে।

হুমড়ানো আঁধারের শরীর কেটে ডিবরি জ্বলছে একটা। তালাই-এর উপর কুকুর কুন্ডলী হয়ে শুয়ে আছে গংগা। পরনের শাড়িটা তার হাটুর কাছ অব্দি গোটানো। এক মাথা চুল। টিপ বোতাম দেওয়া ব্লাউজটার একেবারে প্রথম আর শেষ ঘাট ছাড়া বাদবাকি সব বেপাত্রা। বদনার এগিয়ে যেতে সাহসে কুলোয় না। এ কার মেয়ে? অমন ধবধবে জ্যোৎস্নাবরণ, টিকালো নাক, ভরাট স্বাস্থ্য—এ কার মেয়ে?

সাহসে ভর করে কোনমতে মেয়ের মাথায় হাত রাখে সে। চুলের মধ্যে আলতো আঙুল চালিয়ে গন্ধ শোঁকে, বড় মিষ্টি একটা সুবাস ছুটছে চারদিক জুড়ে।

কুয়োতলায় এঁটো বাসনকোসন রেখে হাত-মুখ ধুয়ে দাওয়ায় উঠে আসল পদ্ম। কতদিন পরে মানুষটা ঘরে ফিরল। আজ তারও যেন সুখ ধরে না। এত দিন একা শুয়ে হাত পা ছুঁড়েছে। এ যে কি যন্ত্রণা তা সে মুখ ফুটে কাউকে বোঝাতে পারেনি। আজ যেন হাতে চাঁদ পেয়েছে। হোক সে চোর, হোক সে খুনী তবু তো চাঁদ। হালকা হাওয়ায় পদ্ম'র বুকের আঁচল সরে যায়। ইচ্ছে করেই আঁধারের মধ্যে আঁচলটা আর তোলে না। গা-হাত পা আজ বড় কাঁপছে। সন্ধের পর থেকে সব ভুল হয়ে যাচ্ছে কাজ। গুনগুনিয়ে গাইতে গাইতে দাওয়ায় বিছানা পাতে পদ্ম।

বিছানা পেতে পা টিপে টিপে এগিয়ে যায় টেরের ঘরে। মানুষটা গালে হাত দিয়ে বসে আছে তখনো। আজ কি এত ভাবে মানুষটা? পদ্মও ঠিক বুঝতে পারে না। তাকে আজ অন্য নেশায় পেয়েছে। ঘরে ঢুকে গরম শ্বাস ফেলে সে মুখোমুখি দাঁড়ায়। চেনা চোখের ইশারায় হাই তুলে পদ্ম'র পিছ পিছ চলে আসে বদনা। বিছানায় বসে আর একটা বিড়ি ধরাতে গেলেই বদনার হাতটাকে আচমকা বুকের কাছে টেনে আনে পদ্ম, গাল ফুলিয়ে বলে, এখুন খেয়ো না গো। তুমার পায়ে পড়ি। বড় গন্ধ লাগে। বিড়ি ধরায় না বদনা, অন্ধকারের মধ্যে চাপা কথা আর নিঃশ্বাসের তাতা শব্দ ছড়িয়ে পড়ে শুধু। উভয়ের শরীরের ক্ষিদেটা চাগিয়ে ওঠে বহুদিন পর। ঘাম শরীরে কাটা গাছের মত লুটিয়ে ছিল পদ্ম। দু' হাতে তাকে বুকের কাছাকাছি টেনে আনছিল বদনা।

ঠিক সেই সময় টেরের ঘর থেকে শুকনো কাশির আওয়াজ ওঠে। একবার, দুবার, বারবার। পদ্মর বুক থেকে দাড়ি ভর্তি মুখটা তুলে শুশুকের মত দম নেয় বদনা। সময় পার হয়। ভয়ানক রকমের কাশির শব্দটা কানে ধাক্কা দেয় আবার। ধীরে ধীরে হাত আলগা হয়ে যায় তার। দু' হাত দিয়ে পদ্মকে ঠেলে সটান উঠে দাঁড়ায় বদনা। লম্বা লম্বা পা ফেলে সে একেবারে টেরের ঘরে।

ডিবরি বাড়িয়ে উঠে বসেছিল গংগা। উসকো-খুসকো চুল মুখের ঘামে লেপটে বড় করুণ দশা। ঠোঁট নড়ছে অনবরত, চোখের কোণে খেৎলানো জল। উলঝাল দাড়ি ভর্তি ঢাঙ্গা বাপটাকে দেখে তার বিশ্বাস করতে মন চায় না। শেষটায় ঘোর কাটলে নামিয়ে নেয় মুখ। অভিমানে চোখের কোণটা আবার ভিজে ওঠে।

— এ বিটি, তুর হলোটা কি? বাপের কথায় ভ্যালভ্যাল করে তাকায় গংগা, গাল বেয়ে জলের ধারা নামে ক্রমাগত। কুলুঙ্গী থেকে গজ আড়াই শাটিং-এব কালো ফিতে আর বাদাম ভাজির ঠোঙাটা এগিয়ে দেয় বদনা। ঢোক গিলে বলে, তুর জন্যি এনেছি বিটি। লে, ছাড়িয়ে খা।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাত বাড়ায় গংগা। ঠোঙাটা ধরতেই বেকায়দায় ফিতেটা পড়ে যায় মেঝেতে। সর সর করে খুলে যায় শাটিং এব ফিতে। মেঝেতে সাপের মত দুলে ওঠে। বাদাম ছাড়িয়ে খেতে গেলেই ওয়াক-ওয়াক বমি ওঠে। গা পাকমোড়া মারে। কোন মতে ' হাতে মুখ চেপে সে ছুটে আসে কুয়োতলায়। এসেই হুড়হুড়িয়ে বমি ঢেলে দেয়। তারপর পশুর মত হাঁপায়।

— কি হল রে, বিটি? অমন ধারা উগলাচচিস্ কেনে?

— বাদামে পুকা।

— বাদামে পুকা! অমন বেছে বেছে কিনলাম তাও পোকা?

দেরি দেখে পেছন থেকে মেয়েকে খিঁচিয়ে ওঠে পদ্ম, লে লে। রেতকালে আর ঢং দেখাতে হবে নি। ঢের হয়েছে। চল, শুবি চল।

পদ্মর কথার হুলে খাড়া হয়ে দাঁড়ায় গংগা। ধীরে ধীরে দাওয়ার দিকে হাঁটতে শুরু করে। গা-হাত-পা আজ বড় ভারী ভারী। জল কাটে পুরো মুখে। কেমন তিতকুড়ো স্বাদ। কেঁচো চিবানোর মত ঘেন্না ঘেন্না মুখ।

— বাবুর বাসায় কি খেয়েছিলি, হ্যাঁরে মুখপুড়ি? আঁচলে নাক টিপে ধরে পদ্ম।

— কিচু খাইনি রে, মা?

— তাহলি উগলাচচিস যে বড়! উঠ, শুগে যা। রেত হল—

আঁচলে মুখের দু'পাশটা রগড়ে নিয়ে অসহায় চোখে তাকায় গংগা, মোর গা'টা বড্ড গুলাচ্চেরে মা, মোরে এট্টু ধরে ধরে নে চল।

ঘরের মধ্যে গংগাকে ঢুকিয়ে কি মনে করে খিল তুলে দিল পদ্ম। চোখে চোখ রেখে শুধোয়, তুর কোথায় কষ্ট, হ্যাঁরে গংগা? অমন ধারা দেঁইড়ে দেঁইড়ে কানচিস কেনে? চুপ যা!

চুপ থাকতে পারে না গংগা। ভয়ে পিছোতে পিছোতে চাঁচারির বেড়ায় পিঠ দিয়ে দাঁড়ায়। এক সময় ডুকরে ওঠে সে, মারে, মোর সব সর্বনেশ হয়ে গেল রে-এ-এ। দু'মাস থিকে মোর আর ওটা হয় না।

কথাটা তীরের মত কানে বিঁধতেই বনবিড়ালীর মত মেয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পদ্ম, ঢেমনি, কার কাছে চিৎ হয়েছিলিস বল, বল? না হলি, তুর মাথা ফেটিয়ে মুখে নুড়ো জ্বেলে দেবখন—।

কবাটের হুড়কো খুলে যায়। চুলের মুঠি ধরে গংগাকে দাওয়ায় আছড়ে ফেলে দেয় পদ্ম। তারপর বদনার দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় কেঁদে ওঠে, ও আমার কি হল গো-ও-ও-ও। আবাগীর বিটি পেট বাঁধিয়ে ঘরে এয়েচে গো-ও-ও-ও।

ঘুরঘুট্টি আঁধারে বাতাস ছুটছিল হিসহাস। বদনা চোর খরখর সাপের মতন এঁকে বেঁকে নেমে এল দাওয়া থেকে। গংগার গালে যে চড়টা কষিয়েছে তাতে তার নিজের হাতটাও জ্বলছিল। মেয়েটা চাপড় খেয়ে লুটিয়ে গিয়েছিল মাটিতে। ঘেন্নায় আর ফিরেও তাকায়নি সে। তার মতে, নষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ঢের ভাল। যে মেয়েকে কোল থেকে নামায়নি ধুলো লাগবে বলে সে আজ গু মেখে ঘরে ফিরেছে। ছিঃ!

ছুটতে ছুটতে রাগে রি-রি করছিল সর্বাঙ্গ। বাঁশ ঝাড়টা পেরিয়ে এসেই থমকে দাঁড়ায় সে। কঞ্চির আগোল সরিয়ে ডাক পাড়ে, কুড়ুনী, এ কুড়ুনী-ঈ-ঈ-ঈ।

দুবলা আলোর ছিমুতে শ্লেট নিয়ে ঢুলছিল কুড়ুনি। জ্যাঠার ডাকে তার তন্দ্রা ছুটে যায়। ডিবরি হাতে মায়ের সাথে আগোড় অব্দি চলে আসে সে। চোখ ডলতে ডলতে ভয় চোখে জ্যাঠাকে দেখে।

বদনার আর তর সইছিল না। কাঁপা আলোয় কুড়ুনীর মুখটা দেখে বদনা ঠোঁট কামড়ে

ধরে আক্রোশে। তারপর হিড়হিড়িয়ে টানতে টানতে কুড়ুনীকে দাঁড় করিয়ে দেয় কাঠটগর গাছটার নীচে। ভ্যাবাচেকা খেয়ে কুড়ুনী কাঁপছে, তখন চাপা গলায় বদনা শুধোয়, হ্যাঁরে বিটি, মালবাবু কেডারে?

—উ-যে হাসপাতালে খিচুড়ি দেয় গো জ্যাঠা। আঙুল তুলে অন্ধকারে হাসপাতালের দিকে তাকায় কুড়ুনি, বড় ভালো মানুষ গো জ্যাঠা। গংগাদির ডেকচি ধুয়া দিখে ঘরের কাজে লিয়েচে। হর মাহিনা পনের টাকা বেতুন—

—থাকে কুথায়?

—উঃ যে বড় পারা এট্টা ঘর, তাপ্পরে এট্টা কোঠা দালান—উখানটায় থাকে গো জ্যাঠা। দু' দন্ড চুপ মেরে যায় কুড়ুনী, তারপর ঢোঁক গিলে বলে, আমারে নুকিয়ে নুকিয়ে চানাচুর কিনি দেয়। দিদিরে এটা লালপারা শাড়ি আর ছোট জামা কিনে দিয়েচে।

—ঘরে যা। কুড়ুনীকে ঠেলা মেরে সরিয়ে দিয়ে আগোলটা ভেজিয়ে দেয় বদনা। মাথার ঘিলুতে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে কেউ। লম্বা লম্বা পা ফেলে সে এগিয়ে যাচ্ছিল সামনে। কোমরের হেঁসোতে হাত ছুঁইয়ে সে আরো হিংস্র হয়ে ওঠে। পেশীতে জোর লাগিয়ে ছোটে......জোরে......আরো জোরে.....।

মালবাবু যে খুন হয়েছে পরের দিন সকালে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। থানা থেকে খবর পাঠান হল জেলা শহরে। শহর থেকে নগরে।

বেলা বাড়তেই দুটো সবুজ জীপ খরার ঘাসগুলোকে পিষে ঢুকে গেল হাসপাতালের মাঠে। পোড়া পেট্রোলের গন্ধে আইঢাই করে উঠল বাতাস। মানুষজন ঘিরে ধরল সেই সব বাবুদের। কিছু দূরে কাঁঠাল গাছের ছায়ায় শোয়ানো ছিল মালবাবু। শরীর মোড়া সাদা কাপড়ে। কে যেন একটা ফুলের মালাও দিয়েছে।

বাঘের থেকেও তাগড়াই একটা কুকুর লতলতে জিভ বের করে মাটিতে শুঁকতে শুঁকতে এগিয়ে যাচ্ছিল পুব পাড়ার দিকে। তার পেছনে সরু-মোটা দু'জন পুলিশ। দু'জনের পায়েই ভারী বুট, কোমরে পিস্তল। বদনা চোরের ঘরের সামনে এসে কুকুরটা আর নড়ে না। মাটি শোঁকে, বাতাস শোঁকে। সামনের পা মুড়ে গড়াগড়ি দেয় ধুলোয় তারপর এক ছুটে পাকাটি গাদার দিকে। ফোঁস ফোঁস দম নিয়ে হাল্কা হয়ে ডাক ছাড়ে, ঘেঁউ ঘেঁউ।

পুলিশ দুটো খৈনী ঝেড়ে একে অন্যকে দেখে। মেঘের কোলে কোলে কালি জমে, উথাল-পাতাল হাওয়া শুরু হয় তখন। বাঁশ আর খিরিষ গাছের পাতা উড়ে যায় দূরে.....বাজ পড়ে কড়কড় কড়াৎ....।

পাকাটি গাদায় নাক গুঁজে কুকুরটা আবার ডাকে। রোগা পুলিশটা দু'হাতে টেনে সরায় পাকাটির আঁটি। দশ-বিশটা আঁটি সরাতেই যখের ধনের মত ঠিকরে পড়ে রক্তমাখা হেঁসোটা।

— শালা কুত্তা কামিনে। গাল দিয়ে হেঁসোটা তুলে নেয় মোটা পুলিশটা, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। চিকচিক করে ইস্পাতের ধার।

অন্য পুশিলটা রাগে পকেট থেকে বের করে আনে দেশলাই। জেদের মাথায় আগুন ছুঁড়ে দেয় পাকাটির গাদায়। দাউ দাউ জ্বলতে থাকে ফেসো, মচমচে জ্বালদেবার। যেন

আখের আলসেতে আগুন ধরিয়েছে কেউ।

—ওরে ও গু-খেগোর বেটারে-এ। দাওয়ার খুঁটি আঁকড়ে গাল দেয় পদ্ম, মোর শ্বশুরের ঢিপেয় কেন আগুন দিলিরে-এ-এ? মর মর, তোরা সব মুখে অক্ত উঠে মর।

আগুনের জিভ ছোট নয়।

হাওয়া থামতেই পঁচিশটা চালা ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেল। অঞ্চল প্রধান জলের বালতি ফেলে সাইকেলে ছুটল এম এল এ'র কাছে। এম এল এ তার পাঠাল জেলার মন্ত্রীকে। মন্ত্রী আবার ত্রাণ মন্ত্রীকে। লরী বোঝাই হয়ে ভেলিগুড়, চিড়ে আর ত্রিপল আসল সদর থেকে। সংগে আসল জেলা শাসক, পুলিশের বড় কর্তা। গাঁয়ের কাঁচা পথ জিপের দাগে বুক ঘা করে শুয়ে রইল, মাঝখান থেকে বিক্রি বেড়ে গেল চা- দোকানীর।

তখন সন্ধ্যা নামছে। আখের পাতায় দিনের তলানী। বাঁশের মাচায় বসে গল্প জমিয়েছে শহুরে চার সাংবাদিক। ওদের একজন ফাটা কাপে চুমুক লাগিয়ে মুখটা পেঁচার মত বেঁকিয়ে ফেলল, রাবিশ! চা না তো ঘোড়ার পেচ্ছাপ।

— তা যা বলেছ! ডাইরিয়া না হয়ে যায় কোথায়। সমর্থন করল আরেকজন।

মুহূর্তে উচ্চিংড়ের মত লাফ দিয়ে প্রসঙ্গ চলে যায় পেশায়।

—গমের মত দেখতে অথচ গম নয়—এগুলোর প্রপার নাম কি?

—বুলগার হুইট। মোচে তা দেয় চুরুক দাড়িওয়ালা আধা বয়েসী আরেক জন। তার মুখে লম্বা মাপের সিগ্রেট, ভলভল করে ধোঁয়া ছেড়ে হাঁটু নাচায়।

—নো, নো-ও-ও। দ্যাট ইজ বা-ল-গা-র হুইট। আই মিন ব্রোকেন হুইট। প্রতিবাদে নড়ে চড়ে বসে আরেক জন।

—ইজ ইট ইন্ডিয়ান হুইট?

—তুমি একটা ক্যালাস। চায়ের কাপ নামিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে প্রথম জন, ইটস্ ফ্রম অ্যামেরিকা।

—আর য়্যু সিওর?

—ধ্যুৎ! এটা রাশিয়ার।

চায়ের দোকানীটা সব শোনে। তার কাছিমের মত পিঠ, ফাটা গেঞ্জির আড়ালে হাড় জাগানো খাঁচা, থাকতে না পেরে শ্লেষ্মা উগলায়, অপরাধ লিবেননি গো বাবু- সকল, মুই এট্টা কতা বলি।......যা দিয়ে খেচুড়ি হয় তার নাম তো বগলাহুট।

—বগলাহুট কি রবীনহুডের ফাদার? হো হো করে হেসে ওঠে চারজনই। তাদের সাথে হন্তদন্ত হয়ে যোগ দেয় আরেক জন। তার ঘাড়ে ঝোলানো ক্যামেরা, চোখে গগলস্। পাছায় তুলো দেওয়া সিগ্রেটে টান দিয়ে সে বলে, রিয়েলি, ইটস টু মাচ্ স্যাড। মেয়েটির একটা ছবি নিলাম। পানা পুকুরের জল খেয়ে পেটটা একেবারে ঢোল। নো ড্রেস। যা কচি কচি বুক না....।

কুঠ

শীতের রাতে বুড়োদের ঘুম পাতলা হয়। কেশে হাত পা গুটিয়ে দাওয়ার দিকে তাকাল দশরথ। শুনশান বাইরে মরা জ্যোৎস্নার সজনে ফুল আলো। ঘেয়ো শীতের কয় পিটুলি গাছের পাতা থেকে খসে পড়ছে টুপটাপ। চালা ঘরের আশে-পাশে হাওয়ার হুল্লোড়, রাতের নৈঃশব্দ ছিঁড়ে যাচ্ছিল ন্যাড়ার ডাকে।

দড়ির খাটিয়ার উপর কোন মতে উঠে বসল সে। এই নিয়ে চার-চারবার। ভগীর কোন পাত্তা নেই। যাওয়ার সময় দাঁত বের করে বলেছিল,—তুমি ভেবো না খুড়া, আমি যাব আর আসব।

রোদ ফুটতেই ভগী গেল, এখনও তার আসার কোন লক্ষ্মণ নেই। রাত জমাট হয়ে ক্ষমছে চারদিকে। ভাঙ্গা মাঘের দাপটে পাকা সড়ক ফাঁকা। ভোজবাড়ি থেকে ফিরে যাওয়া মানুষজনের ছেঁড়া কথা মাঝে মাঝে কানে আসে। এদিকে লোকজন আসেনা বললেই চলে। দিনের বেলাতেই শ্মশানপুরী, রাত হ'লে বরফচাপা আঁধার।

সব অপেক্ষারই শেষ আছে, দশরথ জানে। ভগী কেন এল না, এই চিন্তায় ঘুম আসছেনা। ভোজবাড়ি থেকে মাংস ভাত নিয়ে ফিরবে ভগী। তাতে পেট ভরিয়ে নিদ্ যাবে এমন ইচ্ছে ছিল। দুপুর গেল, সন্ধ্যে হল, রাত্রি নামল ভগীর তবু দেখা নেই। এখন একা মানে বোকা। একার জন্য হাঁড়িশালে জ্বাল ঠেলতে মন চায়নি। রান্না বান্নায় ঝামেলার শেষ নেই। চোখ ফুলে ওঠে কাঁচা কাঠের ধোঁয়ায়। কুঁজো হয়ে বসে ফুঁ দিলে ঘাড় মাজা ব্যথা করে। তার উপরে শরীরের ঘা-পুঁজ গুলো আছে, তারাও ছেড়ে কথা বলে না। বাগ পেলেই কামড় বসায়। ক্ষুধা আর যন্ত্রণার যেন হাজার মুখ। কোন্ মুখ সামাল দেবে সে!

রোজ সকালে কানাই শিউলি এখান দিয়েই যায়। সড়ক থেকে নেমে গেলেই তার গুড় জ্বালদেবার 'বান'। চোখা-চুখি হতেই জোর করে এক ঘটি জিরেণ কাট রস দিয়ে গেল। সের মাপের পেতলের ঘটিটা ধরে অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে। চোখে তখন শ'শ' খেজুর গাছের ভিড়; শ' শ' ঠিলি, শ' শ' কাঁটা সমেত শুকনো খেজুর বেগো। পুকুর পাড়ে রস জ্বাল দিচ্ছে কানাই-এর বাপ জগাই। হাতে কাঁচা খেজুরের ছ্যাঁচা ডাল, উথলে ওঠা রসে ঝপাং বাড়ি মেরে ঠিকরে দিচ্ছে গাদ। তুষের চাদর গায়ে জড়িয়ে ফুট রসের ঘ্রাণ নিলে শরীরে নেশা ধরে যায়। এতো বেশী দিনের কথা নয়, তবু মনে হয় কতদিনের! জগাই শিউলি এখন বুড়ো, দশরথ এখন বুড়োর চেয়েও বুড়ো। চোখে ঝাপসা দেখে, বয়সের ভারে শিথিল চামড়া, হাঁটতে চলতে বেঁকে যায় মাজা। একটু হাঁটলেই হাঁপ ধরে। শ্বাসটান, শ্বাসকষ্ট।

লোকে বলে, কুষ্ঠ রোগ নাকি ভাল হয় না। এ রোগ অভিশাপের রোগ, বজ্রপাতের

রোগ। কার অভিশাপে তার এমন দশা হল? মনের মধ্যে চৌপুদিন কেবল এই একই চিন্তা। ভাবতে ভাবতে অবশ হয়ে যায় মাথাটা। ঘুমে জড়িয়ে আসে চোখ। টানা ঘুমের মধ্যে রোগের রক্তচক্ষু তাকে শাসায়, সতর্ক করে। তখন সে ফাঁসে লটকান বন-মোরগ। অসহায়। টুঁ চাঁ নেই, কাতরানি নেই, কেবল সয়ে যাওয়া। ধীরে ধীরে যমের দুয়ারে এগিয়ে যাওয়া। বুড়ো গন্ধ পোকার মত কেবল গন্ধ ছড়ান। গায়ের ঘাগুলো থেকে সব সময় যেন গন্ধ বেরয়। নাকে ঝাঁ ঝাঁ লাগে। ক্ষয়া নখগুলো পোড়ান শুকুই মাছের মত বাঁকা। পায়েরও সেই একই হাল। পুরু ছালা কেটে গদীর মত বেঁধে নিয়েছে পায়ে। এতে ঘষটানি কম লাগে। হোঁচট খেলেও সামলে নেওয়া যায়। সারা মুখে কালির ছোপ, বয়সের লতান শিরা-উপশিরা। নাকটা লালচে, কানের লতিও মোরগ ঝুঁটি লাল। দাড়ি ভর্তি মুখটা বীভৎস।

দু'দিন আগে ঘটা করে বিয়ে গেল রামচন্দ্রের অথচ তাকে একবার মুখের কথাও বলল না। গাঁয়ের লোক বুঝিয়ে-সুজিয়ে বলেছিল,—যা রে রাম, একবার তোর বাপের কাছ হয়ে ঘুরে আয়। কানা-খোঁড়া ভেংরো যাই হোক, সেতো তোর বাপ। শুভ কাজে তারে বাদ দেওয়া ঠিক নয়।

রামচন্দ্র কথা শোনেনি। ডাংমারা গুলির মত রাগে ছিটকে গিয়ে বলেছে, মরে গেলেও আমি যাবনি। সে আমার বাপ নয়, শত্তুর, ওর জন্যি তো আমার এত বদনাম। সবাই ছিঃ ছিঃ করে। দশটা সম্বন্ধ ভেঙ্গে গিয়ে ফের আমার বিয়ে লেগেচে, বাপের কাছে গিয়ে এ বিয়ে আমি ভাঙ্গতে পারব না। খাদে গড়িয়ে পড়া পশুর মত রামচন্দ্রের চোখ ধুঁকতে ধুঁকতে বলল,—যার বাপ নেই তার কি বিয়ে হয় না? মনে কর, আমার বাপ নেই, কেউ নেই।

এমন কলঙ্ক কথা দশরথের অজানা নয়। রাতে শুয়ে তবু সেই ছেলের জন্য তার পরাণ কাঁদে। কি করেনি এই ছেলের জন্য! নিজের হাতে গু-মুত কেড়ে মানুষ করেছে—তাঁতশালে বোনার ধৈর্য্য নিয়ে। বৃত্তি পাশ করে রাম যখন বড় ইস্কুলে গেল তখন শহর থেকে সাইকেল এনে দিল, ছেলে তার সাইকেল চড়ে ইস্কুলে যাবে। গাঁ-ঘরে তখন ক'টা লোকেরইবা সাইকেল ছিল, যা ছিল তা হাতে গোনা যায়। ছেলে বায়না ধরল—রেডিও নেবে। জলের দরে পাট বেচে রেডিও কিনে দিল। সেই ছেলে এখন মুখে কালি দেয়, বংশের মুখ ডোবায়। সারদা ঠিকই বলতো,—ছেলেরে এত লাই দিয়ো না গো, কোনদিন দেখবা লাগাম ছিঁড়ে পেলিয়েচে।

—তুই চুপ কর বৌ। কু' মুখে আর কু' গাসনে। ধমক দিয়ে সারদাকে থামিয়ে দিত সে। আজ হাড়ে হাড়ে টের পায় সারদার বেদ-বাক্য। রামচন্দ্র শুধু লাগাম ছিঁড়ে পালায়নি; পালাবার আগে চুনকালি লেপে দিয়েছে বাপের মুখে।

আজ রামের বৌ-ভাত। ভগী বলেছে, মাংস ভাত আনবে ভোজবাড়ি থেকে। সেই আশায় জেগে থাকা এতক্ষণ। রাত তো অনেক হ'ল। পথ চেয়ে চেয়ে ঘুম নেই চোখে। খাটিয়া থেকে ঝুঁকে পড়ে হ্যারিকেনটা তুলে নিল সে। কুসুম আলোয় পুরো ঘরটা ঝাপসা দেখা যায়। হুড় হুড় করে হিম ঢুকছে প্যাকাটি বেড়া ভেদ করে। জব্বর ঠাণ্ডা। রাত কত হ'ল বোঝা যায় না! বাইরে কোথাও পাখি ডাকে, ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দ শোনা যায়। সেই

আজব শব্দ শুনে দাওয়ার উপর থেকে তেড়ে যায় ন্যাড়া। পাকা সড়কে এখন কেবল ন্যাড়ার পায়ের শব্দ।

বুড়োটে হ্যারিকেনের দিকে তাকিয়ে নিজে যেন আরো বুড়ো হয়ে যায় দশরথ। আচমকা শ্বাস নিতে গেলে কন্ কন্ করে চোয়ালের চারপাশ। দাঁত তার একটাও নেই, দুই মাড়ি জেগে আছে আলু-ভুঁই-এর সরু জলা আলের মত। জোড়ে কথা বললে ছিটকে আসে থুতু। খিদে বাড়ে। মুখময় তিতকুড়ো জল। জিরেনকাট রস বুড়ো-পেটে সহ্য হয়নি। খাওয়ার ঘন্টাখানিক পরেই বমি বমি ভাব, অম্বল, চুঁয়া ঢেকুর। গলা-বুক পুড়ে যাচ্ছিল গ্যাসে। শেষে বার দুই বাহ্যি হতেই আরাম। এ সময় ভগীটা থাকলে কাজ হোত! ন্যাসা ডহর থেকে জল এনে দিত, বাড়াবাড়ি হলে ডাক্তার কবরেজ ডাকত।

সকালে সে ভগীকে শুধিয়েছিল ছলাকলায়,—হ্যাঁরে ভগী, আমারে কেউ যেতে বলেনি?

কথা শুনে ভগী চুপচাপ, কুলুপ আঁটা মুখ। বুড়ো আঙ্গুলের নখ দিয়ে দাওয়ার মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে অনামনস্ক।

—বড় খোকা নেশ্চয়ই একবার আসবে?

—দাদার এখন মিলা কাজ। তার সময় হবেনি। ভগী যেন এড়িয়ে যেতে চাইছে।

—তোর খুড়িমা?

—খুড়িমারও মিলা কাজ। ভাঁড়ার ঘরের চাবি হর সময় খুড়িমার আঁচলে থাকে। কার কখন দরকার পরে কে জানে!

—অঃ। ঠাণ্ডা গলায় বিড়বিড়িয়ে উঠেছিল দশরথ, আক্ষেপে ছল ছল করছিল ফোলা চোখ,—না আসে না আসুক। আমার কি? আমি তো আমার ধর্ম করেচি, তারা যদি অধর্ম করে করুক!

এরপরে ভগী আর দাঁড়ায়নি। পেট বাজিয়ে চলে গিয়েছিল পাড়ামুখো। নিরস, ব্যাজবেজে কথা শুনতে কার ভাল লাগে? বুড়ো বলদ লাঙ্গল চযতেও লাগে না। একলা দশরথ আর দাঁড়িয়ে থাকেনি। পিটুলি আর লালকচার পাশ দিয়ে সে সোজা চলে এসেছিল বাগানে। তার নিজের হাতে সাজান গোছান বাগান। গাঁদা গাছ থেকে শুরু করে টক পালং সব তার নিজের হাতে লাগান। নিজে যত্ন করে কঞ্চির বেড়া দিয়েছে। বেড়ার উপরে লতানো বরবটিগাছ, দাওয়া থেকে নামলেই তুলসী মঞ্চ। স্নানের পাট চুকিয়ে এইখানেই পেতলের ঘটিতে জল ঢালে রোজ।

জগাই বুড়োর তা বড় পুত্র ভাগ্য। কানাই হররোজ বুড়ো বাপকে গুড়শালে নিয়ে যায় আগুন পোয়াতে। জামবাটি ভর্তি আউসে মুড়িতে মালাইচাকি ভর্তি ফুট্রস দিয়ে সামনে বসিয়ে খাওয়ায়। দশরথের মনে হয়,—ওগুলো ফুটরস নয়, সমুদ্র মন্থনের অমৃত। ছেলে বড় হলে বাপের দুঃখ ঘোচে না কচু! এই আক্ষেপে ফুল ছিঁড়তে গিয়ে আস্ত গাঁদা গাছটা তুলে ফেলে সে। গ্রাম প্রধান ছেলে শুধু গ্রাম দেখে, তাকে নয়। বাপ খেল কি মরল এখোঁজ নেবার সময় কোথায়? নিজের ছেলে যখন খোঁজ খবর নেয় না, তখন ভগী তো পরের ছেলে। মা-বাপ মরা ছেলেটা তার কাছে থাকে। দুটো খেতে পায় বলেই তো থাকে? ভগীর উপর জোর খাটান যায় না। ছেলেমানুষি বুদ্ধি ওর, কতই বা বোঝে?

কানাই চলে যাবার পর জগাই বুড়ো এসেছিল লাঠি ঠুকতে ঠুকতে। উঁই লাগা ইলেকট্রিক থামের মত বয়েসি পা, মাজা পড়ে যাওয়ার দরুণ হাতে লাঠি তবু সময় পেলেই এদিক পানে চলে আসে। কানাই, জগাই আর ভগী ছাড়া তার কাছে এখন কেউ আসে না। গাঁয়ের লোকেরা এদিক পানে আসতেই ভয় পায়। ভুল করে কেউ আসলেও পাকা সড়কের নীচে নামে না। যেন নামলেই যমরাজ খ্যাঁক করে ধরে নেবে। কুষ্ঠ ছড়িয়ে যাবে সমস্ত গায়ে।

দশ গাঁয়ের লোক খাচ্ছে বৌভাতে অথচ দশরথের বেলায় লবডংকা। দুপুরে সে ভিজে ভাত, কাঁচা লংকা আর পেঁয়াজ চটকে খেয়েছে। টালি খোলার শেষের দিকে তখন খাসি কাটা হচ্ছে বৌভাতের, বাতাসে প্রানবায়ু বেরনো পশুগুলোর আর্তনাদ।

চালসে চোখে কৌতূক মিশিয়ে জগাই তখন বলেছিল,—আজ তো কত্তামশাই-এর দিন গো, ছেলের বিয়ে বলে কথা!

স্থির চোখে দশরথ শুধু তাকিয়েছিল, উত্তর দিতে পারেনি। ছেলের বিয়ে ঠিকই কিন্তু সে ছেলে তো তাকে বাবা বলে মানে না। বড় মেয়ে এসেছে শ্বশুর বাড়ি থেকে, তাকেও আসতে দেয়নি এখানে। এ সবই রামচন্দ্রের কারসাজি। কাকে বলবে দুঃখের কথা? উপর দিকে ছেপ ফেললে তো নিজের গায়েই পড়ে!

মোড়া টেনে নিয়ে জুৎ করে বসে জগাই বুড়ো বলল,—ক'দিন আসতে পারিনি কত্তা মশাই, শরীরটা ভাল ছিল না, হুপিং কাশি। তা কানাই গিয়েছিলো সেই বসন্তপুরের কবরেজের কাছে। অষুধ এনে দিয়েচে। তাই খেয়ে কাশিটা এট্টু নরম।

—বসন্তপুর, সে তো অনেকটা পথ গো! তা কানাই গেল?

যাবেনি কেনে? বাপ বলে কথা! ছেলেটা আমার মুখ্যু ঠিকই কিন্তু আমার উপর ওর নজর বড্ড কড়া। এই দেখনা কেনে, পাটালী বেচে এই চাদরটা এনে দিল। কড় কড়ে পুন্চাশ টাকা নিয়েচে। তা কত্তা মশাই, আপনারে নিতে গোরুর গাড়ি কখন আসবে?

—আমি সিখানে যাবনি।

—কেন গো, যাবনি বল্লে হয়! ছেলের বিয়েতে বাপ না থাকলে কোন কাজটা উৎরোয়?

গোরুর গাড়ি আসবে এমন একটা আশা নিয়ে বেশ কয়েকটা শীতের রাত ভোর হয়েছে। গোরুর গাড়ি আসেনি। রিজার্ভ করা বাস বরযাত্রী নিয়ে সামনের সড়ক দিয়ে গেল, বাসের ছাদে রমরমা ব্যান্ডপার্টি। খুঁটি ধরে নির্বাক দাঁড়িয়েছিল-দশরথ। বাসের ধুলোয় তার দু'চোখ লাল। ঠোঁটকাটা ভগী বলেছিল,তুমি কাঁন্ছ খুড়া?

—ধ্যায়্ পাগলা, আমি কাঁন্ব কেনে? দু'হাতের চেটোয় চোখের জল আড়াল করে ফোঁকলা দাঁতে হেসে উঠেছিল দশরথ। হাসিও যে কান্না হতে পারে, বারো তেরো বছরের ভগী সেদিন প্রথম বুঝেছিল। কাঁচা বয়সের ভগী জ্ঞানমান লোকের মত সান্ত্বনা দিয়েছিল তাকে। বলেছিল,—আমার তো কেউ নেই খুড়া, তুমিই আমার সব। বিয়ের ল্যাটা চুকতে দাও, তারপর তোমাকে নিয়ে আমি বড় হাসপাতালে যাব।

—আমি আর কোথাও যাবনি বাপ।

—তা বল্লি হয়। ভগীও যেন হাসপাতালের ছোকরা ডাক্তারটার মতন নাছোড়বান্দা। —রোগকে আবার ভয় কিসের দশরথবাবু? আপনি না স্বাধীনতা সংগ্রামী? স্বদেশী

আন্দোলন করেছেন, জেল খেটেছেন, সামান্য ব্যাপারে আপনার এমন ভেঙ্গে পড়া শোভা পায় না।

—রোগকে আমার ভয় না ডাক্তারবাবু, ভয় আমার মানুষকে। বড় যা তা কথা বলে। সহ্য করতে পারিনে।

—আপনার কষ্ট আমি বুঝি।

—জানেন ডাক্তারবাবু, এ গাঁয়ে একটা হাসপাতাল ছিল না, লোকে বিনে চিকিৎসায় মরত। এক ফোঁটা অষুধ পেতনি। কত্তো পিটিশান লিখে লিখে তবে এই হাসপাতাল হল। সে সময় বিধানচন্দ্র মুখ্যমন্ত্রী। তা সেবারই তিনি আমাদের জেলায় প্রথম এলেন। সেদিনের কথা কি বলব ডাক্তারবাবু, আমি এখনও ভুলিনি। অত্তোবড় মাপের মানুষটারে জোড় হাতে দন্ডবৎ করতেই তিনিও আমারে দন্ডবৎ করলেন। ভাবুন কথা, অত্তোবড় একটা পেকান্ড বটগাছের মত মানুষ! আর এখন দেখুন—নিজের ছেলেই আমারে সম্মান দেয় না, উল্টে ঘেন্না করে। ভয়ের খাদ্‌সে আলাদা করে দিলো।

ডাক্তারবাবুর কথায় বেঁচে থাকার ইচ্ছেটা প্রবল হয় দশরথের। তার অভিশপ্ত জীবনে ডাক্তারবাবুর কথাগুলো যেন বসন্তের হাওয়া। নিজের ছেলেটা তো লেখা পড়াই শিখল কিন্তু মানুষ হ'ল না। একজন মুখ্যমন্ত্রী তাকে যে সম্মান দিয়েছে—একজন গ্রাম প্রধান ছেলে তার সিকি ভাগ সম্মানও দেয়নি। এ কি কম আফশোষের! আগে ঘর থেকে খাবার আসত দু'বেলায়। বউটা এসে খোঁজ খবর নিয়ে যেত। এখন সারদা আসে না। আসলে ও ছেলের ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে চোরের মত, প্রাণ খুলে কথা বলে না।

প্রধান হবার দু'বছরের মধ্যেই একটা টালিখোলা, দু'বিঘে ধানি জমি। ভট্‌ভটি চেপে এ গাঁ থেকে সে গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায়। বিপক্ষ দলের সদানন্দ মোক্তার রয়ে-সয়ে কথা বলে না। হাট মিটিং-এ গলা ফাড়িয়ে বলল, —রামচন্দ্র রাজোয়ার, সে আবার মানুষ হ'ল কবে? দু'কলম লেখাপড়া শিখলেই কি মানুষ হওয়া যায়! যে তার নিজের বাবাকে দেখে না, ভিনো করে দেয়—সে আবার গ্রামের মানুষকে দেখবে কি করে?

এ কথা শুনে বিবেকের জ্বলনে দশরথকে গরুর গাড়িতে চাপিয়ে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল রামচন্দ্র। ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধের ব্যবস্থাও করেছিল। শেষটায়, সাঁঝ বেলায় বাবার চালাঘরে এসে হুমকির সুরে বলেছিল,—সদানন্দ মোক্তারকে যেন তোমার এখানে না দেখি, তাহলে কিন্তু খুনোখুনি হয়ে যাবে। ও আমার অ্যান্টিপার্টি। ভোটে ফায়দা লোটার জন্য তোমাকে ইস্যু করতে চাইছে।

বলব না বলব না করেও দশরথ সেদিন অনেক কথা বলেছিল। সব শুনে রামচন্দ্র বলল, মিথ্যে কথা। তোমাকে এসব কথা কে বলল? নিশ্চয়ই, ঐ হারামিটা বলেছে। আরে বাবা, আমি যদি পঞ্চায়েতের টাকা মারি লোকে তাহলে কেন আমাকে ভোট দেয়? তুমি কি মনে কর, সবাই চোখে ঠুলি পরেছে?

এসব ভাবতে ভাবতে রাত বেড়ে যায়, দড়ির খাটিয়ায় ঘুম আসে না দশরথের। কেবল ছটফটানি, বুকের কাছটায় শুরু হয় চিন চিনে ব্যথা। সে অনুভব করে তার শরীরের কুষ্ঠ এখন সারা গাঁয়ে। বাতাসে, ধুলোয় জলে, ফলে ফুলে সর্বত্র। পচা থোড়ের চেয়েও কালো

অন্ধকারে পুরো গাঁ খাল যেন কুঠ ব্যামোতে ধুঁকছে।

ভয়ে পাশ ফিরে শোয় দশরথ। শীতের চাদর পুরু হয়ে নেমে আসছে. মরাটে চাঁদের আলোয় এখন কেবল হাহাকার আর বিষাক্ত ডাঁশ মাছির ফনফনে শব্দ। কাত্ত বাড়ির এঁটো শালপাতা নিয়ে কুকুরদের কামড়া কামড়ির শব্দ আসে। হিম ঝরে। খিদেয় লতপত করে নাড়িভুড়ি। কত আর সহ্য করা যায়! বাঁধের ও পিঠে আখ ক্ষেতে তারস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে শেয়াল। পিটুলি গাছের ঝিঁ ঝিঁ কানা পেঁচাটা ইঁদুর ধরতে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুসুরি ক্ষেতে।

দশরথ ফের উঠে বসে। খাটের তলা থেকে বের করে আনে মুড়ির হাঁড়িটা। দু'হাতে খাবলা দিয়ে মুড়ি তুলে নিয়ে মুচমুচ করে চিবোতে থাকে। বড় খিদে তার। আশায় আশায় খিদেটা তার বেড়েছে। একমাত্র ছেলের বিয়েতে আশ মিটিয়ে খাবে, এটা খুব বড় চাওয়া নয়। অথচ, এই সামান্য চাওয়াটাই ভগবান তাকে দিল না। রামচন্দ্র হাজার কাজের মানুষ। ব্যস্ত। কিন্তু সারদা? সে কি একবার আসতে পারত না? ইচ্ছে থাকলে ঠিক উপায় হোত। সারদা কেন আসে না তা দশরথ জানে। কিন্তু ভগী যে কোন চুলোয় গেল? অথচ যাওয়ার সময় বড় মুখ করে বলল, —খুড়া আমি যাব আর আসব, তুমি ভেবো না! তুবড়ি আর বাজি পুড়ান দেখে ঠা করে ঘুরে আসব। ওখানে বেশি সময় থাকতে আমার মন চায়নি। ওখানে থাকলি আমারে কেবল এঁটো-পাতা ফেলতে বলে।

—তা তুই যাস কেনে, ওখানে কি মুনিষ বাগালের অভাব? পায়ের রক্ত কষ লাগা পটিটা খুলতে গিয়ে ভগীর পেটটা দেখে বলেছিল, আজ মনে হচ্ছে খুব খেয়েচিস। তা দুপুরে কি দিয়ে খেতে দিলরে ভগী? নেশ্চয়ই মান্‌স ভাত দিয়েচে? পেটপুরে খেয়েচিস তো, হ্যাঁরে ছোঁড়া!

—তা আবার খাবনি, দাদার বিয়ে বলে কথা!

—তোরা সবাই খেলি, খালি আমিই বাদ।

—তুমি কেনে বাদ যাবে খুড়া? তোমার জন্যিও আনব। সবুর কর না, এটুখানি সাঁঝ হতে দাও, তারপর।

ভগীর ইচ্ছে থাকলেও রামচন্দ্র তাকে মাংস ভাত আনতে দেবে না, এটা দশরথ জানে। তার কপালে শুধু নিরামিষ। প্রায় বছর দুয়েক হতে চলল মাংসের মুখ দেখেনি। রামচন্দ্র বলে পাঠিয়েছে. তার নাকি এখন মাছ মাংস খাওয়া বারণ। অথচ হাসপাতালের ডাক্তার বলে,—যা আপনার মন চায় তাই খাবেন দশরথবাবু, এ রোগে খাওয়া-দাওয়ার তেমন একটা বাছ-বিচার নেই।

ভগী লুকিয়ে চুরিয়ে মাঝেমধ্যে হাট থেকে চুনো চাঁদা মাছ কিনে আনে. আমিষ বলতে ঐ টুকুই। মাংস ভাত খাওয়া এখন তার কাছে স্বপ্ন। বেড়ের কাছে দুটো ডাহুক ঘোরে রোজ সকালে-বিকালে। কতদিন মারার চেষ্টা করেও পারেনি। বুড়ো হাতে এখন আর সেই আগের ভেল্‌কি নেই। ভগীও চেষ্টা করেছে, পারেনি। অথচ, সে খবর পেয়েছে, রামচন্দ্র ফি সপ্তাহে মাংস খায়। আঁশজল ছাড়া বাবুর মুখে নাকি ভাত রোচে না। বাজারের সেরা মাছটা প্রধান বাবুর, তা যে দামেরই হোক। দুটো পয়সার মুখ দেখে এখন ধরাকে সরা জ্ঞান!

ভগী বলল, বৌদি আমাদের খাসা হয়েছে গো, একেবারে শংকর পালের ছাঁচের প্রতিমা। এই টানা টানা চোখ, পান পাতা পারা মুখ। যখন হাসে একেবারে গাল ভরিয়ে। কি বাহারে মিঠে মিঠে কথা বলে গো! শুনলে পরে আর ছেড়ে আসতে মন চায়নি।

— আমারে একবার দেখাবি? দশরথের চোখ দুটোয় ছেলে মানুষের আকুতি, —ঘরের লক্ষ্মীরে দেখতে বড় মন চায়রে। কবে বিনে কবে মরে যাবো, তখন মনে একটা আক্ষেপ থেকে যাবে।

—কি করে দেখাই বলো দিনি, দাদা তো এখানে বৌদিরে পাঠাবেনি। একটা কাজ করলে হয়।

—কি কাজ? নড়ে চড়ে বসে দশরথ।

ভগী বলে, দুপুরবেলায় তালয়াড়ির পুকুরে নতুন বৌদি নাইতে যাবে বড়দির সাথে। ঠিক বারোটায় মিনিবাস যখন যায়, তখন তুমি বরং ঝোপের আড়াল থেকে দেখেই চলে আসবা। কেউ জানতে পারবেনি।

—ধ্যার!

—ধ্যার কি গো। দেখতি হলে অমন ধারাই দেখতি হবে। এ ছাড়া কুনো উপায় নেই।

—দায় পরেছে আমার লুকিয়ে চুরিয়ে বউ দেখতে! কেনে, আমি কি পচে গেচি? ঘরের লক্ষ্মীরে দেখব তো সামনা সামনি দেখব। আমারে কেউ কি কেটে ফেলবে নাকি?

চোখের কোনে জমে থাকা পিচুটিগুলো মুছে নিয়ে দশরথ বড় উদাস। মিয়ান মুড়িগুলো চিবাতে চিবাতে টাগরায় আটকে গিয়েছে তার। খক খক্ কেশে নিজেকে সামলে নেয়। ঢোক গিলে চোখ মুছে নেয়। নিজের প্রতি ধিক্কার জমে। রোগ-জ্বালা কি মানুষের হয় না, তার জন্য এত কষ্ট ভোগ! সে তো জ্ঞানতঃ কারোর ক্ষতি করেনি। তবে কেন ভগবান তাকে এতো কঠোর পরীক্ষায় ফেলেছে! কুঁকড়ে যাওয়া হাতের আঙুলগুলোর দিকে তাকিয়ে তার আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না। হাত দুটো ঠিকই আছে, কেবল নখের ডগাগুলো ক্ষয়ে ক্ষয়ে সাদা হাড় বেরিয়ে কেমন বিভীষিকা ময় রূপ । দেখে দেখে চোখ সয়ে গেলেও মাঝে মাঝে সে নিজেও ভয় পেয়ে যায়। এই আঙুলগুলো তবে কি একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে সময়ের সাথে? শরীরের সবকিছু তো হারায়, তবে তার আগে তো প্রাণ পাখি উড়ে যাবার কথা। প্রাণ-পাখি আছে, শুধু ভাঙ্গা খাচা আঁকড়ে ধরে কি লাভ? ক্ষয়-আঙুলগুলো টিপেটুপে দেখে দশরথ। তপতপ করে কাঁচা লাল মাংস। গুলোয়। পুঁজহীন এই শুলোনী শরীর আর সয়না। পায়ের আঙুলগুলোও ক্ষয়ে ক্ষয়ে কিম্ভুতাকার। প্রমাণ মাপের পা'টা এখন ছোট হতে হতে অনেক ছোট। জোরে হাঁটতে গেলে ব্যাথা লাগে। হোঁচট লাগলে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসে রক্ত। বিছানায় ঘযটানি লাগলে বদ্‌রক্তে ভিজে যায় কানি। তখন পটি জড়িয়েও সুরাহা হয় না। ফিনফিনে পটি বদলান মহা ঝামেলার কাজ। নরম মাংসের সাথে আটকে যায় সুতো। একটু টানা হিঁচড়া করলেই রক্ত বেরিয়ে আসে। গোড়ালির ঘায়ে মলম লাগলেও নরম পড়ে না। ধুলো বালি লাগলে কর কর করে ঘা। ঘায়ের চারপাশটা চুলকোয়।

এখন, এই একলা রাতে দশরথের কোন শারীরিক অস্থিরতা নেই। মাঝে মাঝে চোঙটা

ঘুরিয়ে দিলেই তার কানে সানাই-এর সুরের ছোঁয়া লাগে। মনে তখন নানাবিধ প্রশ্ন জাগে—সে কি রামচন্দ্রের বাপ না গ্রাম প্রধানের চাকর? বিয়ে বাড়ীর বাজনার শব্দ গ্রামের ঐ শেষ মুড়োতেও চলে আসে। চালা ঘরের ভিতর ডায়নামোর শব্দ শুনতে শুনতে তার চোখে হাজার বিজলি বাতি জ্বলে ওঠে, ফের দপ্ করে নিভে যায়।

—রামচন্দ্র কাজটা ঠিক করেনি বুঝলেন কর্তা, ও নিয়ে মন খারাপ করবেননি।

জগাই শিউলির বোঝ বাক্যে মন ভরেনি দশরথের। উল্টে দশরথ বলেছে, ও তো ছেলে নয়, সাক্ষাৎ কালসাপ। আঁতুড়ঘরে নুন দিয়ে মেরে ফেললে পাপ চুকত। না হ'লে বোঝ, আমারে বলে কিনা—কুঠ বড়ো ছোঁয়াচে রোগ। গাঁয়ের শেষ মুড়োয় ঘর বেঁধে দিচ্ছি, তুমি উখানে গিয়ে থাক।

—কত্তামা কিছু বলেনি?

—কি আর বলবে? মেয়ে মানুষ তো এগার হাত কাপড়ে নেংটো। সাত চড়ে যার মুখে রা ফুটে না সে আবার কি বলবে, কাঁদল, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। তারপর, চোখের জল মুছে আমারে পৌঁছে দিয়ে গেল এই ঘরে।.....বড় মেয়েটা আমার বড় নেওটা। মাঝে মাঝেই আসতো। এখন ছেলে জামাই এর ধমকে এদিক পানে পা মাড়ায় না।

দশরথ বিড়বিড় করে আপন মনে। ঘুম আজ ছেড়ে পালিয়েছে চোখ থেকে। চালা ঘরের ভেতর থেকে সে অপলক চেয়ে থাকে পাকা সড়কের দিকে। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। ভোজবাড়ি ফেরৎ লোকজনের কথা শোনা যায়। কেউ বলছে, —এমন দই বহুদিন খাইনি বাপু। একেবারে চিনি পাতা দই। হাঁড়ি সমেত উপড়ে দিলেও পড়বেনি। কেউ বলছে, —একেই বলে মানসো রাঁধা। আঃ, কি সুয়াদ! মুখে লেগে আচে গো। দেখতি হবে তো কোথাকার রাঁধুনি, একেবারে খাস বহরমপুরের। ভাল না হয়ে যাবে কোথায়?

তেইশটা খাসির মাংস কয়েকশ মানুষের পেটে ঢুকে জলপনা-কল্পনার শেষ নেই। যেন ভোজবাড়ি নয়, মহোৎসব বাড়ি! যে যত পার খাও, সব ঢালাও। কোথাও কার্পণ্যের চিহ্ন নেই। সামনে ভোট, এখন কার্পণ্য করলে চলে?

দশরথ তার কালি পড়া মাটির হাঁড়িটার দিকে তাকাল, ওখানে দু'দিনের বাসি ভাত মজুত। শীতে জল দেওয়া ভাত নষ্ট হয়না তাড়াতাড়ি। ইচ্ছে হলে ওখান থেকে দু'বেলা ভাত তুলে নিয়ে খেতে পারে সে। অন্য দিন হলে তাই করত। আজ আর তার ভিজে ভাতের দিকে লক্ষ্য নেই। তার দৃষ্টি পাকা সড়কের উপর যেখান দিয়ে শাল পাতায় মুড়িয়ে মাংস-ভাত আনবে ভগী। দশরথের ইচ্ছে করে একবার গলা ফাটিয়ে ডেকে উঠতে, —এ ভগী, ভগীরে। কিন্তু সে পারে না। এত দূর থেকে ডাকলে ন্যাসা ডহরটার ওপার পর্যন্তও পৌঁছাবে না তার স্বর।

ন্যাড়া কুকুরটা তার সর্বক্ষণের সঙ্গী। ভাতের ফেন খেয়ে তাগড়াই তার শরীর। ভোজ বাড়ির গন্ধ এড়িয়ে সে এখন দশরথের দাওয়ায়। খড়কুটো টেনে নিয়ে আরাম করে শুয়েছে।

দশরথ দেওয়ালে ঠেস দেওয়া লাঠিটা তুলে নিয়ে মাজা সোজা করে উঠে দাঁড়াল। পড় পড় করে ফুটে উঠল শিরদাঁড়ার হাড়। কনকনিয়ে উঠল শিথিল চামড়া, তবু মাজা বেঁকিয়ে কয়েক পা এগিয়ে এল সে। বয়সের বাড়ি খেয়ে ভাঙ্গা সাপের মাজার মত কোমর,

শরীরের ভার আর ধারে রাখতে পারে না, নুয়ে পড়েছে চিকন বাঁশের মত। দাড়ি ভর্তি মুখটাতে গাম্ভির্য যেন শ্রাবণের ভরাট দীঘি। চোখের নীচের কুচকান্ চামড়ায় বহু ঘাটের জল খাওয়ার চিহ্ন। কপালের ইঞ্চিচারেক কাটা দাগে ব্রিটিশ পুলিশের লাঠি, স্বদেশী আন্দোলনের ছাপ। থানা ঘেরাও করতে গিয়ে গোরা পুলিশের প্রথম আঘাতটা এই চওড়া কপাল সয়েছে। তখনকার রক্ত আর এখনকার রক্তে অনেক ফারাক। রক্তচিহ্ন কখনো মেলায়না মনে হয়। অবস্থা তাদের কোন কালেই খারাপ ছিল না। এক পয়সা সুদ নেয়নি, কারোর জমি ঠকিয়ে নেয়নি তবু তার গায়ে কুষ্ঠ, এ কোন পাপের ফল? ঐ জন্মের না গত জন্মের? লোকে বলে, এ সব চাউড় পাপের পরিণতি, লোকে কি তাহ'লে ঠিক বলে?

দাওয়া থেকে লাঠি ঠুকে ধীরে ধীরে নেমে আসে দশরথ। এখন তার কোন খিদে নেই, দুঃখ নেই। মানুষের সব সাধ পূরণ হয় না। এ তো দৈবের লিখন। তার একচুল এদিক ওদিক হবার জো নেই। টাকা পয়সার এখনও কমতি নেই তার। সরকার থেকে যা পেনসন পায় তাতেই তার চলে যায় ভাল ভাবে। কারোর কাছে হাত পাততে হয় না।

সব কিছু থেকেও কোথায় যেন দুঃখের চোরা কাঁটাটা খিচখিচ করে সর্বদা। খিদে ভুলে দশরথের এখন মনে পড়ে লাল বেনারসীতে মোড়ান ফুলে চন্দনে সাজান এক গৃহলক্ষ্মীর মুখ। মিঠে সানাই বাজছে, ভারি বাতাসে সেই সুর যেন তাকে নিকট আত্মীয়র মত কাছে ডাকছে। নেশায় পাওয়া মানুষের মত বিড়বিড়িয়ে ওঠে দশরথ, আমি যাব, কে আমারে রোখে দেখি? আজ তার একদিন কি আমার একদিন।

পাকা সড়ক নয়, পাকা সড়ক দিয়ে গেলে কেষ্ট তাকে দেখে ফেলে, শুধু এই ভয়ে মাটির পথে দশরথের ঘেয়ো এবড়া খেবড়ো পা এগোয়। মাঘ মাসের আকাশে ঢাউস চাঁদ নেই, কিন্তু জোনাকি আর তারার বিশাল সমাবেশ। ঝোঁপঝাড়ের পথ পুরো দেখা যায় না ঠিকই তবে হাঁটতে চলতে কষ্ট হয় না মোটে। শীতকাল বলে সাপ-খোপের ভয়ও নেই। কিছুটা এসে চেনা এক ফুলের গন্ধে থমকে দাঁড়ায় সে। নাক টেনে শ্বাস নেয়। পুরো বিয়ে বাড়ির আতর কেউ যেন চুরি করে ঢেলে দিয়েছে ঝোঁপে। ভুরভুর করে গন্ধ আসে, ম ম করে জোনাক জ্বলা রাত।

এমনি এক শীতের রাতে তারও বিয়ের ফুলশয্যা পেতে দিয়েছিল বৌদি, কৌতুহলী পড়শিরা। সারদা তখন কুমোর বাড়ির একমেটে প্রতিমা, দৃষ্টিতে গ্রাম্যতা। কিশোরীর সরল বিনুনীর চেয়েও সরল সেই মুখ। গা-ময় গহনা, চুলে ফুলের তোড়া, পায়ে আলতার সীমারেখা, লাল শাড়িতে সারদার সেই লাজুক চাহুনি সদ্য গাভীন হওয়া ডাহুকীর ভীতু চাহুনির চেয়েও মনোরম। আচমকা সুখ ঢেকুরে চাঙ্গা হয়ে ওঠে প্রায় পঙ্গু শীতে জুবুথুবু দশরথ। গায়ের চাদরটা ভাল মতন জড়িয়ে নিয়ে সে শোনে পাকা সড়ক দিয়ে চলে যাওয়া মানুষ জনের কথা।

—খাসা বউ হয়েছে রামের, একেবারে সীতার মত।

—প্রধান বাবুর ভার্যা ভাগ্য ভাল!

—তা যা বলেচ, বউ না তো সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।

বড়ের ভিতরে ঢেউ ওঠে কথা শুনে, দশরথের পা থরথর কাঁপে। এই দশজনের সামনে দাঁড়াবে কি করে যদি কেউ তাড়িয়ে দেয় ভিখারী ভেবে? মুহূর্তে শিউরে ওঠে সে। শরীরটা যে তার কাল হয়েছে এটা হাড়ে হাড়ে টের পায়। হারতে শেখেনি বলেই সামনের দিকে পা বাড়ায় আবার। যা হয় হোক সে যাবেই। দশরথ হাটে। সদর দিয়ে সে যাবে না, সে যাবে পিছন দিক দিয়ে, একদম ঘুরে ঘুরে। আলোর রোশনাই, হাজার মানুষের আনন্দ উচ্ছ্বাসে সে বাধা হবে না। সদর দোর যার জন্য বন্ধ খিড়কি দোর নিশ্চয়ই তার জন্য খোলা। এক দরজা বন্ধ হলে হাজার দরজা যে খোলা থাকে। দশরথ হাঁটে।

টালিখোলা থেকে শুকনো আমকাঠ নিয়ে গেল, রামচন্দ্রের বছরঠিকে মুনিষ। কে যেন হ্যাজাক নিয়ে দৌড়ে গেল শিবমন্দিরের দিকে। উঠতি বয়সের দুচারজন ছোকরা চাপা গলায় কথা বলতে বলতে সিগ্রেট ফুঁকছে পাকা সড়কে। টালিখোলা, শিবস্থান, আর বনসাই মুদির দোকান পাশ কাটিয়ে খুব সন্তর্পনে দশরথ রামচন্দ্রের কোঠা দালানের পিছনে এসে দাড়াল। ভোজবাড়ির উদ্বৃত্ত আলো এখানে কার্ণিক খেয়ে পড়েছে। এতদূর থেকেও সুস্বাদু খাবারের ঘ্রাণ ঝাঁ করে নাকে লাগল তার। কিছুক্ষণের জন্য আনমনা হয়ে গেল সে। ঢেলা ক্ষেতে দাঁড়িয়ে সে বুঝতে পারছিলনা কি করবে? এখানে বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়। যে কেউ দেখে ফেলতে পারে। আর দেখে ফেললেই তো বিপদ!

মানুষের কোলাহল, সানাই, হাসি-হৈ-হুল্লোড় সব একধারে সরিয়ে দেওয়াল ধরে ধরে এগোচ্ছিল দশরথ। একটা কাচের টুকরো পায়ে ঢুকতেই মাটিতে বসে পড়ল। যন্ত্রণায় বেঁকে চুরে গেল তার মুখ। কাচের টুকরোটা নখে করে তুলে নিয়ে নতুন কোঠা দালানটার দিকে তাকাল। জব্বর ঘর বানিয়েছে রামচন্দ্র। পাশাপাশি দুটো দালান, দালানের সামনে সিমেন্টের জমান পেখম তোলা দুই ময়ুর। কঞ্চির বেড়া সরে গিয়ে সীমানা বরাবর উঠেছে চাঁচারি বেড়া। লম্বা লম্বা বাঁশ পুঁতে খুঁটি। সেই চাঁচারি বেড়া ধরে কোনমতে কোঠা দালানটার দিকে এগোতে থাকে দশরথ। ভগীর মুখে শুনেছে, নতুন ঘরে নতুন বউ বসবে। তার আর কোন চিন্তা নেই। চুনকামের গন্ধ আসছিল। মাজাটাকে আরাম দিতে গিয়ে বেড়ার ফাঁক দিয়ে দশরথ দেখল, শান বাঁধান মেঝের মাঝখানে রামচন্দ্র, তার কপালে চর্চিত চন্দন, গলার মালা নেমে এসেছে নাভির কাছ বরাবর। ভাড়া করা চেয়ার টেবিলে সার সার লোক খাচ্ছে। লাল-সাদা ত্যাঙ্গা কাপড় দিয়ে ঘেরা হয়েছে খাবারের জায়গা। দু'জন লোক হাত নেড়ে নেড়ে তদারকির কাজে ব্যস্ত।

এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে রাত ভোর হয়ে যাবে। মনের ইচ্ছেফুলটা ঝরে যাবে। সারগাদার কাছে এসে দশরথ আর যেন হাঁটতে পারছিল না। বেড়ার ওধারে কম আলোয় কে যেন প্রাকৃতিক কম্মো সারছিল; ঝাঁঝাল গন্ধে নাক টিপে ধরল সে। তার পায়ের চেটোয় গড়িয়ে আসা জলের ছোঁয়া লাগে। ঘেন্নায় দু'পা পিছিয়ে আসে দশরথ। কাজের বাড়িতে আড়াল পাওয়াই মুশকিল। কোঠা দালানের কাছে যেতে হলে সারগাদাটা পেরতে হবে তাকে। এতবড় সারগাদা সে কি করে পেরবে? আগের কি সেই শক্তি আছে যে একলাফে এমুড়ো থেকে ওমুড়োয় চলে যাবে? ভোজবাড়ির যাবতীয় এঁটো শালপাতা, উচ্ছিষ্ট সব এখন সারগাদায়। কাঁচা গোবরের গন্ধের পাশাপাশি ঘি-তেলের গন্ধ। কুকুরগুলোও ঘুর-

ঘুর করছে চারপাশে।

দশরথ সাবধানে নেমে এল সার গাদায়। এঁটো শালপাতায় পা পিছলে যাবার ভয়। একটু বেকায়দায় পা ফেললে খস্ খস্ শব্দ হবে। পরনের খাটো ধুতিটা গুটিয়ে ধার ঘেঁষে এগোচ্ছিল সে। পৌঁছে যেত, কিন্তু কে যেন ঝুড়ি বোঝাই এঁটো শালপাতা হুড়মুড়িয়ে অন্ধকারে ঢেলে দিল তার উপর। কিছুটা হেলে গিয়ে আস্তাকুড়ের মধ্যে ঠিকরে গেল দশরথ। লোভী কুকুরগুলো এঁটো খাবার লোভে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেখানে।

নিমেষে পশু আর মানুষের লড়াই এ জমে উঠল আস্তাকুড়। মানুষের আর্তনাদ ক্রমশঃ টুঁটি টিপে ধরল সানাই-এর।

লাশ খালাস

নিধু ডোমের হাতে বাঁশের লগা, পরণের ভেজা গামছায় জল ঝরছিল হরদম। সেই সকাল থেকে পুরো পুকুরটায় খানা-তল্লাসী চালিয়ে হাত-পা এখন সাদা, আঙুলগুলো টিকটিকির তেলোর মত চুপসানো। বাঁশ বনের মত কাঁপছিল বেত ছিপছিপে মানুষটা।

ভাল মতন আলো না ফুটতেই পুরো পাড়া হুমড়ি খেয়ে পড়েছে বাঁশ বনে। খবরটা এখন সবার মুখেমুখে। কানাকানির তাই শেষ নেই। রণবাবুকে যে খুন করতে এসেছিল সেই ছোকরাটাই এই বাঁশ ডোবা পুকুরে ডুবে মরেছে। লাশ খুঁজে বের করতেই হবে। লাশ খোঁজার দায়িত্ব নিধু ডোমের। না পারলে ভিনগাঁ থেকে জেলের দল আসবে। কচুরিপানা সরিয়ে টানাজাল ফেলবে তারা। নিধুর এতে ইজ্জোৎ যাবার ভয়। থানার ডোম সে। বুকে লোম গজানোর আগে থেকেই লাশ তুলেছে। পচা গলা লাশ তুলে বহুবার সদর থেকে সে বকশিস পেয়েছে। এখন হেরে গেলে লোকে বলবে, মুরোদ নেই তো চাকরি ছেড়ে দাও হে! চামড়া ঢিলে হলে এসব কাজ আর হয় না।

সাপটে তেল মেখে নিয়ে হা করে পুকুরের দিকে চেয়ে আছে নিধু। হাবিলদার ধমক দেওয়ার আগেই শেষবারের মত জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তন্ন তন্ন করে খুঁজবে পুরো পুকুর। লাশ পেলে ভাল নইলে কুলকুচি করে উঠে আসবে ডাঙ্গায়।

হাওয়ার মুখো লম্ফোর শিসের মত নিধুর বুকে এখন ধুঁকপুকানি।

হাবিলদার সিগ্রেটে ফু দিয়ে বলল, যারে বুড়ো, খাড়িয়ে রইলে চলবে? যা যা ঝাঁপিয়ে পড়।

কুকুরকে যেন মাংসের টুকরো দেখিয়ে লোভ দেখানো হচ্ছে, নিধু হাবিলদারের দিকে তাকিয়ে ঘেন্নায় চোখ নামিয়ে নেয়। বুড়ো শরীরে রাগ গরগরিয়ে ওঠে। কারোর তাতানো কথা আজকাল ভালো লাগে না। চেষ্টার কোন কসুর করেনি, তবু হদিস মেলেনি লাশের। হদিস না মিললে তার কি করার আছে? লাশের জন্য তো জান দিয়ে দিতে পারে না? রোদ কামড় মারছে পিঠে। আর একটু রোদ বাড়লে খড়ি ফুটবে সর্বাঙ্গে। ঢিস ঢিস করে নিধুর বুক।

—এ বাপ, মুখ রাখিস বাপ। জিওল গাছটার কাছে এসে জলে ঝাঁপ দেয় নিধু। কচুরিপানার ফুল থেঁতো হয়ে যায় দেহের ভারে। জলের গন্ধে নেশা ধরে যায় শরীরে। তরতরিয়ে এগোতে থাকে নিধু।

গত রাতে বৃষ্টির কোন কামাই ছিল না। সেইসময় রণবাবুর দোতলায় পর পর দু'বার গুলির শব্দ শোনে গ্রামবাসী। বিজলি বাতি নিভে যায়। ঝমঝমিয়ে ছেরাতে শুরু করে মেঘ। মেঝেতে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ে রণবাবু। যে এসেছিল সে পাইপ বেয়ে নেমে

যায় বিপদ বুঝে। রণবাবুর বিলিতি কুকুরটা তাড়া করে তাকে। আর একবার গুলির শব্দ হয়। পচা বারুদের চেয়েও ভ্যাদভ্যাদে আলোয় কুকুরটা বুকে গুলি নিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে লোহার গেটটার কাছে। পাঁচিল টপকানোর শব্দ হয়। তারপর দুপদাপ ছুটতে থাকে। কাঁচা পথ, তার উপরে ইঞ্চি চারেক জল—তার মধ্যেই ছুটছিল। তার পিছনে গন্ডা চারেকমারমুখি মানুষ। বড় ইস্কুলটার কাছে বাজ করে কড় কড়—কড়াৎ। আলোর সাপটা আঁধার ছুঁবলে আবার নেতিয়ে যায়। এই মত্তকায় বাঁশ বনে ঢুকে পড়েছে ভীতু পা। চার গন্ডা লোক বাঁশঝাড়ের কাছে এসে বর্ষার মুড়ির মত মিইয়ে যায়। তেড়েফুঁড়ে বাঁশ ঝাড়ে ঢুকে যেতে সাহসে কুলায় না। জায়গাটা খারাপ। দিনমানেই গা ছমছম করে, আর রাত্রিতে কথা নেই। ভাবনা-চিন্তা করার ফাঁকেই পাড় ভেঙ্গে ঝপাৎ করে জলে পড়ে যায় কেউ। তারপর একটা প্রাণ ফাটানো আর্তনাদ। থমকে দাঁড়ানো পুতুল মানুষগুলো কাঁপে। বাঁশ ঝাড়ের মাথায় তারা ফোটে কয়েকটা, জোনাকি খেলা করে বেড়ায়। পোকামাকড়ের ডাকের মত কথা চালাচালি হয়।

— বাছাধন জলে পড়েছে।

—সাঁতরে পালাবে।

— উঃ, অতো সস্তা।

—মানুষটার হাতে ছোটপরা এট্টা বন্দুক ছেলো।

—হুঁ, তোরে বলেচে!

ল্যাঙ্গোটের মত গামছা পরে নিধু উড়ুল মাছের মত এগিয়ে যাচ্ছে মাঝ পুকুরে। এখন আর দম ধরে রাখার বয়স নেই, বিড়ি খেয়ে খেয়ে সব শেষ। নামার আগে পাঁচুয়া পেলে ভাল হোত। ধারে কাছে নেশার কিছু পায়নি। নেশা ছাড়া এ সব ছোটলোকি কাজ হয় না। অথচ বাবুরা বোঝে না। অর্জুন গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে পেট মোটা পুলিশটা চেঁচায়, হেই, জলদি কর নিধু। ধুপ চড়চে।

ধুপ চড়ছে তো তার কি। জলদি লাশ তোলার জন্য চট জলদি প্রাণটা দিয়ে দিতে পারবে না সে। বাবুদের সব তাতেই তাড়াতাড়ি। এ যেন ছেলের হাতে মোয়া, টুক করে গালে পুরলেই হল।

মাঝ পুকুরে পৌঁছে নিধু চারপাশ তাকায়। এই ফটায় (ছোট্ট) গাঁ'টায় এত মানুষ থাকে? জলে ছায়া পড়েছে কালো মাথার। ভুলভুলিয়ে আশে পাশে তাকায় সে। কচুরি পানার তেলা পাতায় বাঁশ ডোবার শরীর এখন চিকনাই। ফ্যাকাসে নীল ফুলে মৌমাছি বসছে উড়ে উড়ে। দাপনার কাছটায় কুট কুট করে কে যেন কাটছে। চিমটি কেটে জোঁকটা তুলে নিয়ে বাঁ হাতে ছুঁড়ে দেয় দূরে। জলে লগা ভাসিয়ে নিধু আবার চারপাশে তাকায়। কোথাও কিছু নেই, গাভীন গরুর পেটের মত পুকুরটা এখন ভরাট। এর মধ্যে কোথায় লুকিয়ে আছে লাশ? নিধু কি তাহলে হেরে যাবে? মুখে কালি লেপে দেবে বাপ-ঠাকুরদার? মরিয়া হয়ে ডুব দেয় সে। পাঁক ধরে এগোতে থাকে। অর্জুন গাছের ছায়াটা যেখানে শেষ, সেখানে এসে দম ছাড়ে নিধু। পাতলা চুলগুলো ভিজে ন্যাতা। ঘুল ঘুল করে তাকায়। গন্ধশোঁকে।

লগাটা হাতে নিয়ে চিৎ সাঁতারে এগোতে থাকে সে—। এগোতে এগোতে মাথা গিয়ে ঠেকে মাথায়। প্রথমে ভেবেছিল, কাঠ। পরে দেখে কাঠ নয়, মাথা। কোঁকড়া-ঝাঁকড়া চুলভর্তি একটা মাথা। বাপ্ রে—। বলে কিছুটা পিছিয়ে আসে নিধু। পরে ধাতস্থ হয়ে আনন্দে চিল্লিয়ে ওঠে।

শেষটায় লাশ তোলা হল ডাঙ্গায়। থানায় খবর দিতে সাইকেল নিয়ে সাত-তাড়াতাড়ি চলে গেল চৌকিদার। খবরটা এস.পি. অব্দি যাবে। রণতোষ ভুঁইএ্যা এম.এল.এ। তাকে খুন করতে যাওয়া কি চাট্টিখানি কথা!

ডাঙ্গায় উঠে নিধু যেন আর মানুষ নেই। একটা বুড়ো-হাবড়া বলদের মত ধুঁকতে থাকে। দাঁতে দাঁত চেপে কাঁপুনি থামাবার চেষ্টা করে। কখনো মুখ ছিটকে বেরিয়ে আসে হি-হি শব্দ। ড্যাবরা চোখে মরা ফুলো লাশটা দেখতে গিয়ে আঁতকে ওঠে। আরে, এ যে একেবারে তপাবাবুর মত দেখতে! বুকের কাছে হাতটা চলে আসে আপসেই, খুন চাগিয়ে জড়ো হয় ভয়। নিধু থরথর করে শীতে।

ঠিক সময় বিওলে কপালীর এমন একটা ছেলে হোত। বউটা বাঁজা। কত ডাক্তার কবিরাজ ঝাঁড়-ফুঁকমন্তর-তন্তর বিফলে গেল। শেষটায় মনোকষ্টে পচা লাউজালির মত শুকিয়ে মরল বউটা। সেই থেকে সংসারের উপর টান নেই নিধুর। যা পায় তা পচানী তাড়ি আর হাঁড়িয়া খেয়ে উড়িয়ে দেয় সাঙ্গাৎদের সাথে।

আসার সময় থানার বড়বাবু বারবার করে বলেছে, বুঝলিরে নিধু, যে করেই হোক লাশ তুলতেই হবে। নইলে বড় সাহেবের কাছে কি জবাব দেব?

নিধু পুরনো লোক। সিধে আর জটিল কেস দেখে দেখে হাড় পেকে গেল, বড়বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে সে কিছু বলেনি। বাবুদের সামান্য সামান্য কেসেই চাকরি যাবার ভয়। ফোন ফাটিয়ে সদর থেকে গাল দেয় এস.পি। লোকে বলে, রণবাবু দয়ার সাগর। তার মত মানুষকে কেন খুন করতে এল বেচারা। লোকের কথার ভেতরে ভেতরে তেতে ওঠে। রণবাবুকে সে শিকনি ঝরা বয়স থেকে দেখছে। ওর গুষ্টিশুদ্ধ খারাপ। রণবাবুর ঠাকুরদা জমিদার ছিল গাঁয়ের। বউ-ঝি'রা তার ভয়ে পুকুরে নাইতে যেতে পারত না। বাগদিপাড়ার লতার সর্বনাশ করে দিয়ে পাতকুয়োয় ফেলে দেয়। লতার বাবা মেয়ের শোকে কেঁদে পা জড়িয়ে ধরলে এক বিঘে জমি ধরিয়ে দেওয়া হয় হাতে। সেই বংশের ছেলে রণবাবু এখন গাঁয়ের হর্তাকর্তা। মেয়ের বিয়েতে লাখ টাকা খরচ করেছে।

শিরদাঁড়ায় হাত বোলাতে গিয়ে নিধু বড্ড ঘেমে যায়। তার নিজের কোন মানসম্মান নেই। থানায় তপাবাবুর হয়ে কথা বলতে গিয়ে বড়বাবু তাকে যাচ্ছেতাই ভাষায় গালাগালি করল, শালা, শুয়োরের বাচ্চা, স্পাইগিরি হচ্ছে? চাকরি নট্ করে একেবারে ভিখিরি করে ছেড়ে দেব।

এ গ্রামের অনেকেই তপাবাবুকে সহ্য করতে পারে না। অথচ তপাবাবু কত ভাল ছেলে, মাছহাটায় বিশ টাকার মাছ বারো টাকায় না দেওয়ায় হলধরের দাড়িপাল্লা ভেঙ্গে দিল রণবাবু। তখন তপাবাবুই সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল, দাড়িপাল্লার দাম উসুল করে ছাড়ল। মুখ নিচু করে চায়ের দোকানে ঢুকে গেল রণবাবু।

তপাবাবুর মত নিধুর প্রতিবাদ করার শক্তি নেই। তাই হয়ত তপাবাবুকে তার ভাল লাগে। নইলে দারোগা বাবু যখন মা-বাপ তুলে গাল দেয় তখন সে কেন হাসতে হাসতে সয়ে নেয়? আসলে এর জন্য দায়ী পেট। মরা পেটের জন্য শিরদাঁড়াটা জল হয়ে গেল। বাপটাও ধোয়া তুলসী পাতা নয়। কমবেশী বাপও দায়ী। অতবড় তাগড়াই শরীর নিয়ে কেন ফুঁস করে উঠত না বাপটা?

—শালোর বাপ, একবার নামুতে নেমে আসো হে! তুমার টেংরি খুলে বাইরে ঘরে শুইয়ে রেখে খাওয়াব। তুমি আমার শিরদাঁড়া বিকুবার কে হে?

মরা মুখটার দিকে তাকিয়ে নিধু ভেতরে ভেতরে শক্ত হয়ে ওঠে। ভেতরটায় চালের পোকার মত ব্যাজব্যাজ করে দুঃখ। কেন এমন হয় সে ঠিক বুঝতে পারে না। এমনটা তো তার কোনদিন হয়নি। বুকে লোম গজানোর আগেই বাপের সাথে লাশ টানতে যেত সদরে। বিষ খাওয়া মেয়েমানুষের পাশে কাঠ হয়ে বসে থাকত। ভয়ে কুরকুর করত সর্বাঙ্গ। সাঁই সাঁই করে রিক্সা ছুটিয়ে সাহস দিত বাপটা মুটে ভয় পাবিনে ব্যাটা, কাঁচা নোহা সাথে রাখবি। কেউ তুর ধারে কাছেও ঘেষতি সাহস পাবেনি।

ভয় ভ্যাদভেদে মুখটা হাঁটুর মধ্যে গুঁজে নিধু শুনত, মড়াকে আবার ভয় কিরে? ওর কি শ্বাস আচে না কথা বলে? মনে রাখবি, জ্যান্ত মানুষই বাগ পেলে গলায় হেঁসুয়া চালায়, মরা মানুষ মাটির মতুন ঠান্ডা। লড়ে না, চড়ে না। শুধু শুখা কথায় ভয় ভাঙ্গত না নিধুর। বাপটা ছিপিতে মদ নিয়ে ঢেলে দিত মুখে। বুকে থাবা মেরে বলত, ভয় না ভাঙ্গলে এসব কাজ হয় না। এতো ভদ্দলোরকের কাজ নয় যে আতর ঘষে মাহিনা লিবি। এ কাজ করতি গেলে বুকের ছাতি দরকার।

ও সব ছাইপাঁশ খেয়ে সার ছিটুনো পানিফলের মত জোর ধরেছিল নিধু। দেখে শুনে সেয়ানা বাপটা বলল, তুর এখুন লজর খারাপ ব্যাটা। আইবুড়ো মায়্যা-ঝি'র দিকে মুটে লজর দিবি নে। ওরা বড় সেয়ানা। শরীল লষ্টো করে দেয়।

পুরুষমানুষের দিকে তাকালে শরীর নষ্টের ভয় নেই তবু লাটাই-এর ঘুড়ির মত ছেইরে হয়ে যাচ্ছে তার মন। বাপটা বড় ধূর্ত। মিছে কথা বলেছে। বাবু ঘরের ছেলেটার দিকে তাকিয়ে সে আনমনা হয়ে যায়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে সে। চওড়া বুকের উপর সেঁটে থাকা জামাটার বোতাম ছিঁড়ে বেরিয়ে আছে লোম, পায়ের গুলিতে আটকে আছে নীল প্যান্টুলুন, কেটে না দিলে বের করানোই ঝক্কির! মারবেলগুলি চোখ দুটো আধ বোজা—ফুলে আছে যেন ছিটকে বেরিয়ে আসবে মনি। থেঁতলানো ঠোঁটের চেরা চেরা, দাঁত ফাঁক হওয়া বেঁকাচুরা মুখটা পুরনো মন্দিরের মত ভয়ঙ্কর।

রোদ বাড়ার সাথে সাথে জল টানছে মাটি, সোডায় কাচা গামছার মত ঝলমল চারদিক। ঢ্যাঙ্গা ঢ্যাঙ্গা বাঁশ গাছে খটখটাস শব্দ। তুরপুণের মত পাক খেতে খেতে মাটি ছোঁয় বাঁশ পাতা। নিধুর পেটের ভেতর ক্ষিদের কুকুরটা নখের আঁচড় কাটে। তখনই সাইকেলের বেল বাজাতে বাজাতে আরো দুটো পুলিশ এসে হাজির। তাদের মুখে জর্দা পান, ডাগর পেটে ঠাসভর্তি ভাত। ভরা পেটের দিকে তাকিয়ে দন্ডবৎ করে নিধু। পাকা গাছির জিরেণ কাট রস চেনার মত অভিজ্ঞ গলায় সে বলে, ছোকরাটা মনে হয় ভাল

ছেলেন গো সিপাই মুশায়। দেখুন, কেমুন ধারা লেস্‌পাপ চেয়ে আচে? নেশা করা মানুষের মত ঘোলাটে হয়ে ওঠে নিধুর চোখ।

পুলিশ দুটো বেদম হাসে ওর কথা শুনে। ওদের কুতকুতে চোখে সন্দেহ দেখে ভেতরে ভেতরে দমে যায় নিধু। জন্মে থেকে পুলিশ দেখছে তবু পুলিশ দেখলে এখনও তার বুকটা টিস টিস করে।

থানার বড়বাবু নিধুকে নিমগাছের কাছে ডেকে নিয়ে গিয়ে শুধিয়েছিল, হ্যাঁরে নিধু, তোর গ্রামের কার্তিক বাবুর মেজ ছেলেটা এখন কি করে?

বড় বাবুর শুধোনের অর্থ আলাদা, মোটে সাধাসিধে নয় জলের মত। ভেবে-চিন্তে, সামলে-সুমলে মাথা চুলকে নিধু বলেছিল, আজ্ঞে বাবু, কলকাতায় পড়ে। বড্ড ভাল ছেলে! সেই ছোটবেলা থিকে দেখছি কিনা।

—দিন কাল খারাপ। দেখা হলে মানা করে দিস ঝুট ঝামেলায় না যেতে। ওর নামে থানায় বহু রিপোর্ট।

সেদিন থানা থেকে ফিরে বুড়ো শিবতলায় তপাবাবুকে সাবধান করে দিয়ে ছিল নিধু। কার্তিকবাবুর মেজ ছেলে কথা শোনবার ছেলে নয়। গলার রগ ফুলিয়ে বলেছিল, আরে, ছাড়ো তো নিধু খুড়ো। থানা-পুলিশের ভয় ডর আমার নেই। নেয্য কথা বুক ফুলিয়ে বলব—তাতে যা হয় হবে।

কথা আর সাহস দেখে রা কাড়েনি নিধু। গায়ের লোকে তাকে সন্দেহের চোখে দেখে। সবাই ভাবে থানার ডোম মানে থানার স্পাই। তপাবাবু তাকে অমন চোখে কোনদিনও দেখেনি। বরং ডেকে নিয়ে গিয়ে সিগ্রেট খাওয়ায়। হেসে হেসে কথা বলে। ভাল মন্দ শুধোয়। এমন মানুষের খারাপ হোক কে চায়। সে জানে, বড় দারোগা লোক ভাল নয়। তা ছাড়া বাঘে ছুলে কমসে কম আঠার ঘা। যেখানে স্বার্থ সেখানেই দারোগা বাবুর কুতকুতে চোখ। নিজের ছেলেকেও এসব মামলায় ছাড়ে না। তাই নিধুর ভয় যত সব দারোগাবাবুকে নিয়ে।

তপাবাবুর মতিগতিও খারাপ। দিনরাত মোটা মোটা বই-এ মুখ ডুবিয়ে পড়ে থাকে। দাড়ি-মোচ কামায় না সময় মত। তরলা বাঁশের মত শরীরটা সর্বদা রুখু-সুখু। টান টান কথা তীরের চেয়েও সূচালো, একেবারে অন্তরে ঘা দেয়।

কার্তিকবাবু দুঃখ করে বলেছিল, ছেলেটাকে আমার দেখিস নিধু। ওর যে কি মতিগতি আমি ঠিক ধরতে পারি নে।

কলকাতার হোস্টেল থেকে সেই কবে এসেছে এখনো যাবার নাম নেই তপাবাবুর। ওখানে পুলিশের কু' নজরে পড়ে ছিল। রাজনীতি করতে গিয়ে পড়াশুনা এখন মাথায় উঠেছে। মা মরা ছেলে। কার্তিকবাবু তেমন ভাবে কিছু বলতে পারে না। অত গম্ভীর ছেলের সাথে কথা বলা তার ধাতে সয় না। তাই এড়িয়ে চলা, দূর থেকে মতিগতি লক্ষ্য রাখা।।

গাঁয়ের অঞ্চল প্রধানের কলার চেপে বটতলায় মেরে বসল তপাবাবু। সেই নিয়ে থানা কাছারি। কার্তিকবাবু কড়া শর্তে ছাড়িয়ে আনল ছেলেকে। এম,এল, এ রণবাবু পর্যন্ত হুঁশিয়ার করে দিয়েছে কার্তিকবাবুকে। গ্রামের শিক্ষক, সবাই মান্য গণ্য করে—তাই বাপের

দোহাই দিয়ে সে যাত্রায় রেহাই পেয়ে গেল তপাবাবু।

অথচ তপাবাবু এসব কিছু মানে না। কলকাতা থেকে বেড়াতে আসা তার চার বন্ধু ধরা পড়ে যায় কাঠের ব্রীজটার কাছে। ওদের কাছে বাইরের দেশের অস্ত্র ছিল। খরবটা এস.পি অব্দি পৌঁছায়। ওরা নাকি রণবাবুকে খুন করতে এসেছিল। মিটিং সেরে এই কাঠের পুল পেরিয়ে রণবাবু স্কুল পাড়ায় যেতেন। চার ছোকরার জুলপি ছিঁড়ে কানের পাশটা ঘেয়ো করে দেয় দারোগা। পায়ের তলায় দুমাদুম রুলের বাড়ি খেয়ে কিছুই স্বীকার করল না তারা। সে রাতে তপাবাবু ঘুমোয় নি। সারাক্ষণ জানলার ধারে চেয়েছিল।

নিধু থানায় তালাশ নেবার আগে তপাবাবু তাকে ডাকে। ঝড় ওঠার আগের মুহূর্তের মুখ। নিধু ভয় পায়। তপাবাবু নিধুর দিকে তাকিয়ে উষ্ণ গলায় প্রশ্ন করে, পশুর মত বেঁচে থাকতে তোমার ভাল লাগে নিধুখুড়ো?

নিধু কিভাবে বেঁচে আছে তা সে নিজেও জানে না। তার কাছে বেঁচে থাকা মানে পেটপুরে খাওয়া, দু'বেলা থানায় হাজিরি দেওয়া, নেশার সময় বান্ডিল দেড়েক বিড়ি, সের খানিক পাঁচুয়া আর লজ্জা ঢাকার আটহাতি ধুতি নয়ত খাকি প্যান্টুলুন। ব্যস, এতেই তার দিন গড়িয়ে সন্ধে, রাত গড়িয়ে ভোর। ল্যাটাং ল্যাটাং গতরটা কেবল টেনে নিয়ে যাওয়া আর আসা।

বাঁশঝাড়ে সময় গড়াচ্ছিল দ্রুত। পুলিশ দুটো মালের খোঁজে বড় রাস্তায় দাঁড়িয়েছে, ট্রাক থামিয়ে ঘুষ নিচ্ছে কখনো-সখনো। চৌকিদার মাটির ভাঁড়ে চা আনল বারোয়ারীতলা থেকে। তিন ঢোকে চা'টা গিলে নিয়ে নিধু বিড়ি ধরায়। চৌকিদারকে একটা দেয় । হাবিলদার চলে গিয়েছে বাজারের হোটেলটায়। থানার গাড়ি আর ভ্যান রিকসো আসলে লাশ তুলে নিয়ে তারা থানায় যাবে। দুপুরের এই সময়টায় বড় ক্ষিদে ক্ষিদে লাগে তার। সকালবেলায় তাড়াহুড়োতে বেরিয়ে এসেছে। হাঁড়ির ভিজে ভাত হাঁড়িতেই পচছে। নিধু ঢোক গিলে আশেপাশের দিকে তাকায়। দু'ধারে জমাট বাঁধা হাড়মটমটি আর লাল কচার ঝোপ। ঘুঘু ডাকছে কাঁঠাল-গাছের ডালে। তপাবাবুর জন্য তার কষ্ট হয়। আগুন নিয়ে যে খেলে তাকে নিয়ে নিধুর যত কষ্ট। তপাবাবুর শোবার ঘরে সিগ্রেট খুঁজতে গিয়ে বালিশের তলায় রুমালে মোড়ানো কালো পারা একটা অস্ত্র দেখেছিল নিধু। ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিল হাতটা। তবে কি তপাবাবুর সাথে কলকাতার বাবুগুলোর যোগসাজ আছে? সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে, ভাবতে গিয়ে ধড়ফড় করছিল ছ্যাঁকা খাওয়া বুকটা। বড়বাবুর কোমরে সে প্রায়ই এই রকম একটা অস্ত্র দেখে। এই অস্ত্র দিয়ে বড়বাবু মাসখানিক আগে দুটো তাজা দেহ উপড়ে দিয়েছে। রাতে রাতে লাশ হাপিস করতে গিয়ে নিধু শুনেছিল, এই ছেলে দুটো নিকুঞ্জ ডাক্তারের কাটা মাথা নিয়ে লোফালুফি খেলেছে চৌ-রাস্তায়। শেষে সদরে গিয়ে ধরা পড়ে। তারপরের দিন থানার পাশের গাঁ থেকে সামন্তবাবুর রাইফেল, নারাণ মুক্তারের পঁচিশ হাজার টাকা বন্দুক দেখিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে যায় কারা। সে রাত থেকে তপাবাবু ডোমপাড়া দিয়ে ঘুরে যায়। কাশবন চিরে ঘুরপথে আসতে গা-হাত-পা চিরে গিয়েছিল। নিধুকে ঘুম থেকে তুলে অস্ত্রটা গুঁজে দিয়েছিল তার হাতে। ফিসফিসিয়ে বলেছিল, এটা তোমার কাছে রাখ নিধু খুড়ো। হাত ছাড়া হলে দলের বিপদ হতে পারে।

মুখের উপর না করতে পারেনি। অস্ত্রটা নিয়ে ফ্যাকাসে চোখে চারপাশ দেখছিল নিধু। শেষটায় খড়ের গাদায় লুকিয়ে রাখে ওটা। তার আগেই তপাবাবু চলে গিয়েছে মাঠ ডিঙ্গিয়ে। সারারাত ঘুমোতে পারেনি নিধু, ভয়ে চমকে চমকে উঠেছে। সেই থেকে অস্ত্রটা এখন, নিধুর কাছে। কতদিন ভেবেছে, পুকুরের জলে ফেলে দেবে। দিতে পারে নি। তপাবাবু যেন সামনে দাঁড়িয়ে বলেছে, ওটা আমার জীবন। ওটা তোমার কাছে বাঁধা দিলাম নিধুখুড়ো। রগরগ করছে চোখের ভেতর। খড়ের গাদা থেকে অস্ত্রটা এখন চালের হাঁড়িতে। বুড়ি নেই, চাল নিতে গিয়ে যেন দু'বেলায় দেখা হয় মেজবাবুর সাথে। বুকে কেমন বল ফিরে পায়। শরীরটা শুলোয়।

পুলিশের গাড়ি গাঁয়ে ঢুকতেই মাঠের গরু গোয়ালে বাঁধা পড়ে। দুপুরে ভাত এসেছিল চৌকিদারের ঘর থেকে। সংগে বেগুনমলা, শুকুইমাছের কড়া টক। গামছার উপরে এনামেলের থালা বিছিয়ে গোগ্রাসে গিলেছে ওরা দু'জনে। খাওয়ার পরে একটু ঘুম ঘুম ভাব এসেছিল। কিন্তু বড় দারোগার ভয়ে ঘুমায় নি সে।

গাড়ি থেকে গটমট পায়ে নেমে এসে সামানের দিকে এগিয়ে যায় বড়বাবু। সংগে রণতোষ ভুঁইয়া। এ গাঁয়ের চোখের মনি, চোখের বালি। প্রায় রোজই খবরের কাগজে উনার নাম ছাপা হয়। কলকাতা নাকি ফাটিয়ে দেন ভাষণ, যুক্তি জেরায়। মিটিং ছেড়ে মানুষ পালিয়ে গেলে কথার টানে চিটে গুড়ে পিঁপড়ের মত আটকে রাখেন রণবাবু। এ সব ভগবান প্রদত্ত ক্ষমতা। বৌয়ের গলার সীতাহার বন্ধক দিয়ে ভোটে দাঁড়িয়ে ছিলেন সব মিটিং-এ এটা বলা চাই-ই চাই।

নিধু ছুটে গিয়ে হাতজোড় করে দন্ডবৎ করে। সিগ্রেটের ছাই ঝেড়ে কোচা হাতে লাশের দিকে এগিয়ে যায় রণবাবু। সংগে সংগে চা-দোকানী তারিণী এসে টিপছাপ দেওয়া দরখাস্তটা বাড়িয়ে দেয়, তারপর পা চেপে ধরে রণবাবুর, ও বাবু, মোর পানে এট্টু সদয় হোন গো। সেই কবে থিকে বউটার বুকের ব্যামো। আপনি বললেন, কোলকাতার হাসপাতালে সীট পাইয়ে দেবেন—বহুদিন হলো গো বাবু, ইবার এট্টু গরীবের পানে মুখ তুলে তাকান।

তারিণীকে ঠেলা মেরে সরিয়ে দেয় পুলিশ। নিধু তার চোয়াল বসা গাল, কোঠরে ঢোকা চোখ নিয়ে তারিণীর সাথে সরে দাঁড়ায়।

দারোগাবাবু ডাইরীতে নোট নিতে নিতে বলেন, লাশ কোথায়?

পুলিশ দুটো স্যালুট দিয়ে নিধুকে দেখিয়ে দিল। গাবগাছের গা বেয়ে তখন সার সার উঠে যাচ্ছে লাল পিঁপড়ে, নিধুর চোখ সেই দিকে।

—বড়ি সার্চ হয়েছে? বড়বাবুর কড়া ধমকে পুলিশ দুটো ঘাড় কাৎ করে।

—মালপত্তর সব কোথায়?

—এম্‌টি স্যার। বড় চালাক স্যার! পুলিশ দুটো হাত কচলায়।

—চালাকির দ্বারা মহৎ কাজ হয় না। রণবাবু ফুট কাটেন, আগুন খেলে মুখ তো পুড়বেই।

ক্যামেরা ঘাড়ে ঝোলান লোকটা ছবি তোলো। একবার দু'বার তিনবার। সিগ্রেট ধরিয়ে বড়বাবু বলে, আজই লাশ যাবে সদরে। উপর মহলের অর্ডার।

ভ্যান রিক্সোয় দশাসই দেহটা তুলে নিয়ে ছনের দড়িতে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধে নিধু। বাই বাই করে রিক্সা ছোটায় শালবনের ভিতর দিয়ে। লাঠি হাতে চৌকিদার ছোটে পিছু পিছু। বাঁক পেরুতেই কার্তিকবাবুর সাথে দেখা। মানুষটার এখন মাথার ঠিক নেই। তপাবাবু চলে যাবার পর থেকে কেমন এলোমেলো কথা বলে লোককে শুনিয়ে শুনিয়ে।

ব্রেক মারতেই ভ্যান রিক্সো থেমে গেল শালবনের শেষ মুড়োয়। তখনো কৃপণ রোদের কুসুম আলো সর্বত্র। পোড়া বিড়িটা দূরে ছুঁড়ে কার্তিকবাবু বলে, নিধুরে, এট্টু সরাতো বাপ— দেখি মুখটা?

পরণে লুঙ্গি, গায়ে চিটে ময়লা জামা, হাওয়াই চপ্পলের ফিতেয় সেফটিপিন— কার্তিকবাবুর দিকে তাকিয়ে নিধুর বড় কষ্ট হয়। বাঁ হাতে সাদা কাপড়টা সরিয়ে দেয় তক্ষণাৎ।

পাগলের মত চেয়ে থাকে কার্তিকবাবু, ঠকঠক করে কাঁপে, আর একটা খুঁটি চলে গেলরে নিধু! এমনি করে সব খুঁটিগুলো যদি চলে যায় তাহলে পুরো বাড়িটার কি দশা হবে বলদিনি?

নিধু তাকাতে পারে না। গলার মধ্যে আটকে যায় কথা। আর একটা বিড়ি ধরায় কার্তিকবাবু, দু'টান দিয়ে বিড়বিড়িয়ে ওঠে, তপাটা মনে হয় আর বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে একবার কি ওর মায়ের অসুখে আসত না? কত যে টেলিগ্রাম করলাম হোস্টেলে।

ভ্যান রিক্সোটা বড় সড়কের উপর তুলে এনে গামছায় ঘাম মুছল নিধু। তপাবাবুর বাবা আপন মনে বকতে বকতে বারোয়ারীতলার দিকে চলে গেল। ঝাঁক ঝাঁক হাওয়া ক্ষিদের গন্ধ বয়ে আনে। থানা থেকে কাগজপত্তর নিয়ে তাকে যেতে হবে সদরে। তার মানে, সারাটা রাত রিক্সোতেই পগার পার। কাল দশটার বাসে পুলিশ যাবে। তার আগে সদরে লাশ না পৌঁছালে মুশকিল। কাটা-ছেঁড়া হবেই বা কি করে? ভাবনা মতই কাজ হয়। থানার পাশের হোটেলটায় এক পেট সাটিয়ে এসে হেঁউ করে ঢেকুর তুলে বিড়ি ধরায় নিধু। কাছিমের পিঠের মত উঁচু পেটটায় হাত বোলাতে বোলাতে ফিরে আসে থানার রোয়াকে। তিন তাসের জুয়া চলছে পুলিশ-ব্যারাকে। বসে থাকতে থাকতে ঘুম পায় নিধুর। কাগজপত্তর রেডি হতে অনেক দেরী। ডিউটি অফিসারের হাত খালি নেই, হাত খালি হলে ডাক পড়বে তার। নিমগাছ তলায় গামছা বিছিয়ে গড়িয়ে নিতে গিয়েই ফ্যাসাদ হল। বড় মজার একটা স্বপ্ন দেখল সে।

মেজবাবু ফিরে এসেছে। চারদিক জুড়ে কোন কষ্ট নেই, অভাব অনটন নেই। মাঠে মাঠে ধান, গাছে গাছে ফল, বাতাসে কি মিষ্টি একটা সুয়াদ!

নিধুকে দেখতে পেয়ে তপাবাবু স্বস্তির একটা শ্বাস ফেলল, আজ একটা সিগ্রেট ধরাও খুড়ো। আজ বড় সুখের দিন। সারারাত ধরে গান বাজনা হবে।

সিগ্রেট নিতে গিয়ে নিতে পারছিল না সে। হাত-পা থেকে মাংস ঝরে বীভৎস এক গন্ধ। চাঁদ থেকে ফিন্‌কি দিয়ে বেরিয়ে আসছিল রক্ত।

—মেজবাবু-উ-উ-উ! ভয়ে হাত-পা ছুঁড়ে চিল্লিয়ে উঠেছিল নিধু।

পাহারাদার সিপাইটা ঠেলা মেরে ভাঙ্গিয়ে দিয়েছে ঘুম। চোখে মুখে জল দিয়ে এসে

সে আর বেশীক্ষণ দাঁড়ায়নি। কাগজপত্তর সব ঝোলায় ঢুকিয়ে পেরিয়ে গিয়েছে সুড়কি ঢালা পথ, শালবন আর তে-মাথা। বড় সড়কের উপর উঠে এসে নিধু যেন অন্য মানুষ। পায়ের পেশীতে খিঁচ লাগিয়ে স্যাট্‌স্যাট্‌ ছোটায় রিক্‌সা।

ক্রমশ রাত গাঢ় হয়। চাঁদ ফুটে ওঠে আকাশে। কাশফুলের মত মেঘ জলের আয়নায় মুখ দেখে সারাক্ষণ। ওভার ব্রীজের শেষ মুড়োয় এসে কপালের ঘাম মুছে দাঁড়িয়ে পড়ে নিধু। জলের শব্দে বুকটাতে গুড়গুড় শব্দ হয়। কপালের ঘাম মুছে নিধু পথের কথা ভাবে।

সদর হাসপাতাল এখান থেকে মোটে মাইল চারেক পথ। এই পথ ধরে কতবার যাতায়াত করেছে সে। কিন্তু আজকের মত এত নিখুঁত ভাবে গংগাটা তার চোখে পড়েনি।

তপাবাবু বলত, গংগা সবার জন্য।

ভ্যান রিক্‌সোর তিন চাকায় তিনটে খোয়া আটকে নিধু পেট বাজিয়ে গান ধরে। সেই গানের সুরে চাঁদের আলোয় বড় ঝলমল দেখায় চারদিক। তখন বাবলাগাছের মাথায় তারায় ভর্তি আকাশ, আখক্ষেতে হাওয়ার ছেলেমানুষী দৌড়-ঝাঁপ, ধবল মেঘের উপর হালকা নীলের ওড়না। গান গাইতে গাইতে নিধু বড় আনমনা হয়ে পড়ে। তপাবাবুর কথা মনে পড়ে। অস্ত্রটা এখনও ফেরৎ দেওয়া হয়নি। কোথায় যে হারিয়ে গেল মানুষটা? তপাবাবুর সাথে এ বাবুটার বহু মিল। কাপড়ে মোড়ানো টান-টান লাশটার দিকে তাকিয়ে হু-হু করে ওঠে তার বুক। অমন সুন্দর শরীর কাটাকুটি আর সেলাই-এ এফোঁড় ওফোঁড় করবে ডাক্তার। কালসিটে মেরে যাবে গতর। মাথা ফাটিয়ে পেট কেটে চলবে মরা মানুষের উপর দস্যিপনা। তারপর জড়িয়ে মড়িয়ে তুলে দেবে ভ্যান রিক্‌সোয়। জল কাটবে, পচা রক্তে ভিজে যাবে কাতার দড়ি, চাদর আর রিক্‌সোর কাঠ।

— কেন মরতে এয়েছিলেন গো বাবু? অসহ্য যন্ত্রণায় নিধু কপাল টিপে ধরে। মেজবাবু যেন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

—নিধু খুড়ো। দেখে নিও একদিন তোমরা পেট পুরে খেতে পাবে। তোমাদের সকলের জন্যিই তো আমাদের এই লড়াই।

কাঁপতে কাঁপতে ভ্যান রিক্‌সোর দিকে এগিয়ে যায় নিধু। সারা জীবন বহু পাপ করেছে সে। ভাল মানুষের ছোঁয়ায় তার একটু ভাল হতে দোষ কোথায়? কাতার দড়ি খুলে নিধু লাশটা কোল পাঁজা করে তুলে নেয় দু'হাতে। তারপর ধীরে ধীরে নেমে যায় ব্রীজের নীচে। ভেজা পলিতে পা ছুঁইয়ে চাকরির কথা ভুলে যায় সে।

গোলামী করতে গিয়ে শিরদাঁড়া হারিয়েছিল তার বাপ। সেই দুঃখ সে এখনো ভোলেনি। তাহলে কেঁচোর মত বেঁচে থেকে কি লাভ? মস্ত ছাতির গাং'এ নেমে নিধুর বুকের ছাতি বেড়ে যায়। ঢেউ'এর মাথায় বাবুকে ভাসিয়ে দিয়ে টান টান হয়ে দাঁড়ায় বেত নুয়ানো ছিপছিপে মানুষটা।

চাতক

চারদিন লাগল বেগ থামতে। পাঁচ দিনের মাথায় বুড়ি এসে বুকটা ডলে দিতে গিয়ে হাড় কটা গুণে ফেলল চটপট। লাখুরিয়া-কালীগঞ্জের আশেপাশে তখন ভোটের আগুন, দেওয়ালে আলকাতরা, গাছের গুঁড়িতে চুন লাগিয়ে সর্বহারাদের সব ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি। জগতখালির নরম ধুলোয় শ' শ' মানুষের সাইকেল মিছিল, হাজার খানিক শিরা ফোলা মুঠি পাকান হাত, মালাই চাকি উদোম ভুখা চোখ, মেছো বাজারের আঁশটে পথ সভায় রক্ত গরম করা বকুনি সব ছাপিয়ে লাখুরে গাঁয়ের পুরনো ভোটারটা পাতলা পায়খানা ধুতিতে মুছে বৌকে বলে, আমায় এট্টা ডাব খাওয়াবি বেচার মা? শরীলটা বড্ড কযে গিয়েচে বড়ি আর ইন্‌জিসীনে। হলুদ হলুদ পেসাব হতিচে।

পরণে ময়লা কাপড়, ডানে-বাঁয়ে শুঁকুই-বকু, বুড়ি নিকি খোঁটে আর মাথা চুলকায়। গাঁ-ঘরে ডাব আক্কারা। বড় খোকা ভিনো হয়ে ঘর তুলেছে। কুয়োর পাশে তার নারকেল গাছটার ফলন ভাল। শিরডগায় চার-পাঁচটার কম হবে না। বড় মুখ করে দুটো চেয়েছিল। পায়নি। বেচা বলেছে, বুড়ো শিবের মানত আছে, মা। গাজনের আগে মরে গেলেও গাছে হাত দিবনি।

বুড়ি চোখ মুছে ফিরে এসেছে।

বিড়িটা অরুচিতে মেঝেয় ঠুসে ধরে বুড়ো তাকায়। বাহ্যি-বমিতে শরীরে তেমন জোর নেই তবু তাকায়। বুকটা ধ্বক ধ্বক করে ওঠে নামে। বেচার মুখটা মনে পড়ে। ছেলেটা একবার চোখের দেখাও দেখতে এল না। সব শুনে কাটোয়ায় ফুলোট বাজাতে চলে গেল। এই দেখে পাড়ার লোকে টিটকিরি মারল। ছেলের নিন্দে শুনতে কার ভাল লাগে? ছ্যাঁকা তো নিজের গায়েই লাগে। এ যেন উপর দিকে থুতু ছুঁড়ে দেওয়া। বাপ-ছেলের সম্পর্কটা এখন পোড়া বিড়ির চেয়েও খারাপ। ভাবতে ভাবতে বুকে হাত বোলায় বুড়ো। ক্ষরিসের ডেকা ছুবলে দিলে এত কষ্ট হোত না। কেন এত কষ্ট হয় পুরো শরীর জুড়ে? রক্তগুলো জল হয়ে গেলে আর দুঃখ পাওয়া থাকত না। চড়কের মেলা দেখতে গিয়ে বেচাটা হারিয়ে গিয়েছিল। বুড়ো তখন জোয়ান। পাগলের মত এ-দোকান সে-দোকান, চড়কতলা, বুড়ো শিবের মন্দির দাপিয়ে খুঁজেছে। শেষটায় খুঁজে পেতে তার সে কি কান্না। সেই কান্নার রেশ যেন এখনও বুকে লেগে। ঘামে ভিজে যাচ্ছে বিছানার চাদর। হাঁপিয়ে উঠছে সে। অবশ্য বিড়ি খেলে আজকাল হাঁপু ধরে, আঁইঢাই করে গতর। তবু এ যেন অন্যধরণের যন্ত্রণা। মুখ লুকিয়ে রাখলেও একষ্ট থামবে না।

বুড়ি তখনো একমনে উকুন মারতেই ব্যস্ত। ঘর থেকে সাবু ফুটিয়ে এনেছে, বুড়োর তাতে অরুচি। শুধু সাবু আঠার মত গলায় চ্যাটপ্যাট করে। বুড়ো কাল বলেছিল, দুধ

মেশাতে। দুধ কোথায়? তাছাড়া দুধ খেলে এখনো পেটটা ভুটভুট করে গ্যাসে। অম্বল হয়। সারারাত ঘুম আসে না। বিস্কুটের যা দাম একেবারে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। চা দোকানীকে বলে, এক প্যাকেট উধারে এনেছে বুড়ি। তাই দেখে বুড়োর রাগ। বিস্কুট সাবুতে তার কোন লোভ নেই। একটা ডাব পেলে তার লতানে লোভটাকে ছেঁটে নিতে পারে। তা যখন হয়নি তখন পুরো রাগটাই সে বুড়ির উপরে উগলে দেয়, এ সব পিণ্ডি মরলে চিতেয় দিসখন। এমনি তো নিজের জ্বালায় জ্বলে মরচি তার উপরে বাহাদুরি দেখিয়ে বাবু-খাদ্য।

রা কাড়ে না বেচার মা।

—কেনে, বাবুর দোরে চাইলেই পারতিস?

নিকিটা খুঁটে নিয়ে বুড়ি তাকিয়ে থাকে। বাবুর দোরে সে গিয়েছিল। কোন কথা কানে তোলেনি বাবু। মাত্র দশ টাকা উধার চেয়েছিল। বাবু খিঁচিয়ে উঠেছে, চাষ বাস নেই বেচার মা। এখন জ্বালাসনে দিনি। সোমত্ত ছেলে থাকতে তোদের আবার অভাব কিসের?

এই বাবুর কাছে ঢাকটা বাধা আছে তিন মাস হল। ফি বছর এই বাবুর বাগানে ডাব-নারকেল পেড়ে বুড়ো কত বাহবা কামিয়েছে। বাবু খুশি হয়ে নারকেল দিয়েছে বড় পুজোয় খেতে। এখন অসুখে একটা ডাবও দিল না। কি করে উগলাবে সে বাবুর কথা?

বুড়ো আবার শুধোয়, কিরে বাবুর দোরে গেলিনে কেনে? গেলিই তো পেতিস।

ধানের নাড়ার চেয়েও শুকনো বুড়ির মুখ, চালসে ধরা চোখে চারদিক কুয়াশার মত অস্পষ্ট। ফাতারফাই শাড়ি শরীরে মুড়িয়ে সাবুর বাটিটা এগিয়ে দেয়।

সংগে সংগে বুড়ো হাত দিয়ে ঠেলে দেয় সেই বাটি। হা-হা করে ওঠে বুড়ি, তার আগেই চলকে যায় সাবু। শানের উপর ঠিকরে পড়ে থলথলে আঠা।

বিরক্তিতে চেয়ে থাকে দু'জনে। শেষটায় দাঁতে দাঁত চেপে হাঁপাতে থাকে বুড়ো, যা, লে যা। তু খা গে যা।

বুড়ি তবু নড়ে না। আলো ফুরোয় চারিদিকে। খেজুরবনে পাঁকের মত আঁধার। বড় বাঁধটা দেখা যায় না দূর থেকে। দু চারটে ছাগল খেদিয়ে ঘর নিয়ে যাচ্ছে বাগাল। কুঁজো হয়ে সাবুগুলো চেঁচে নেয় বুড়ি; মলিন তাকায়, পয়সার জিনিস।

উত্তরে কাশির শব্দ, ভ্যালভেলানো দৃষ্টি। বুড়ো হাঁপায়। বুক পুড়ে যাচ্ছে তার। হাসপাতালের কলেরা ঘরটায় অন্ধকার জমে ওঠে ধীরে ধীরে। উশখুশ করে বুড়ি। ঘর ফিরতে হবে। পথ অনেকটা। সেই মান্ধাতার পাকুড়তলা ছাড়িয়ে দাসপাড়া। একা একাই তো যেতে হবে।

দিন তিনেক আগে শ' শ' ডাব নামাল কাহার পাড়ার পটলা, বাবু দাঁড়িয়ে ছিল সামনে। এক গণ্ডা দু'গণ্ডা শেষটায়, পন পন গুনে নিল দেবগ্রামের মহাজন। বুড়ি সুযোগ খুঁজছিল। পায়নি। পেলেই হাড়মটমটির ঝোপে লুকিয়ে রাখত একটা। চেয়ে না পেলে চুরি করতে দোষ কোথায়? শাস্ত্রে বলে, পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য।

একটা কচি ডাবের কতই বা দাম? খুব বেশী হলে পাঁচসিকে, দেড়টাকা। এর জন্যই—

সাঁঝ নেমে আসে দস্তুর মতো, কদমতলার পাশ দিয়ে বড়গাঁমুখো গোরুর গাড়ি চলে

যায়। বাতাসে ভাসে ক্যাঁচকোঁচ শব্দ।

—খেয়ে নাও। সাবুর বাটিটা আর একবার এগিয়ে দেয় বুড়ি।

নিরুত্তর মানুষটার চোখে রাগ না ঘেন্না বোঝা দায়। শুধু কোৎ কোৎ গিলতে থাকে সাবু। ঘ্যারঘেরিয়ে ওঠে গলা। বিষম লাগে। নাক মুখ দিয়ে ছিটকে আসে সাবুজল। রোগ থেকে উঠলেই বুঝি খাওয়ার ঝোঁকটা বেড়ে যায় মানুষের।

বুড়ি খালি বাটিটা নিয়ে উঠে পড়ে। এটা খাবো, সেটা খাবো—অমুক চাই, তমুক চাই স্বভাব বুড়োর চিরদিনের। মেথি না থাকলে এসব আসেই বা কোথ থেকে। চাঁদির জুতো ভিন্ন পেটের ছায়েরাও পুছে দেখে না।

বহু আশা নিয়ে বেচার কাছে হাত পেতেছিল বুড়ি।

চোখের পর্দা উল্টে বেচা বলেছে, মরুক বাপ, মোর কি। যা ভাল বুঝো করোগে যাও। মোর কাছে এয়ো না। মোর বলে সনসারই চলে না।

ছোট খোকা গাঁয়ে ছিল না। সে বদ্ধ ছিটেল। পালিয়ে বেড়ান স্বভাব। গেরুয়া পরে। বিঘোৎ খানেক চুরুক দাড়ি, সর্বদা চোখ-মুখ লাল তাড়ির ঘোরে। গাঁজা ভাং পাঁচুয়া সব তার কাছে নস্যি। কপালে তিলক এঁকে রামপ্রসাদী গায় হাটখোলায়। দুদিনের মাথায়, সে কুলবেড়ে থেকে ফিরে এসে তুলসীতলায় বুক চাপড়ে কাঁদল। বুড়ি বোঝ দিয়েছে, কাঁদিস নে হেলা, চোখ মুছ। যা বাপের কাছ হনে ঘুরে আয়।

হেলা কিছুতেই যাবে না।

বুড়ি বলে, যা বাপ। তোরা গেলে জান হাতে পায় মানুষটা। এই সরু সরু নল নাকে মুখে ঢুকিয়ে দিয়েছে নার্সরা। ইনজিসীনে ইনজীসীনে গা-গতর চালুনির মত ঝাঁঝরা। মুটে লড়তে চড়তে পারে না।

চোখের জল মুছে হেলারামের কত কেরামতি। ধুলোয় বসে চিল্লে চিল্লে বলে, বাপ গুরু পরম গুরু, বাপ সগ্‌গো, বাপ ধম্ম।

এই হেলাই নাকি অমাব্যসা রাতে আমগাছে উলঙ্গ মা কালীকে নাচতে দেখে। মা কালীর পায়ের শব্দে তার নাকি ঘুম ভেঙ্গে যায় রোজ। সে নাকি স্পষ্ট শোনে মা কালী তাকে নিশিরাতে ডাকে, আয়, হেলা আয়। শ্মশানে যাবিনে? বুড়ির বুক ফুঁড়ে কান্না আসে। দাঁতে দাঁত চেপে সে কান্নাকে হজম করে নেয় কোনমতে। উলুবনে মুক্ত ছড়িয়ে কি লাভ? নাড়ি ছেঁড়ার যাতনা যদি ছেলেরা বুঝত! চেনা-জানা পুরো সংসারটাই এখন তার কাছে পচা কুমড়োর মত ভ্যাদভেদে।

—বেচার মারে, মনিহয় হাসপাতালে থিকে ঘুরবনি। কাশতে গেলেই বুকে লাগে। বাহ্যি বেরিই যায়। কাটাকুটি, হিজিবিজি মুখটার দিকে তাকিয়ে বুড়ি কোন ভাষা খুঁজে পায় না। খুব একটা অসুখে বিসুখে ভোগে না বুড়ো। এবার যে কি হল। একেবারে কাবু করে দিয়েছে মানুষটাকে! শুরুতে ডাব-লেবুর কোন কথা পাড়ত না। তখন কেবল বেদনা হজম করার মালাম (কুস্তি)। পেটের চারপাশ ঘিরে বেদনা। কোঁত পাড়লে নাড়িভুঁড়ি যেন বেরিয়ে আসবে ভেতর থেকে। কপালের শিরা ফুলে থাকত। চাকচাক রক্ত বেরত শুধু।

তিনদিনের মাথায় ওষুধে কাজ দিতেই ডাক্তার বলল, ডাব খান। শরীর চাঙ্গা হবে।

লেংটো বেলাকার বন্ধু লক্ষ্মণ এসেছিল দেখতে। সেও বলল, ডাব খা দিনি। দু চারটে ডাব খেলি পরে শরীল ঝরঝরে হয়ি যাবে। মনে খুশ আসবে তুর।

বুড়ি চলে যাবার পর লাল কম্বলটা বুকে টেনে নিয়ে বুড়ো খালি ভাবে, ঘরের কোণে মাকড়সা জাল বোনে। ময়লা জমানো টিপিটা থেকে গন্ধ আসে। একটা কটরা ব্যাঙ খালি লাফায়। বুড়োর চিন্তাটাও এক জায়গা থেকে আরেক জায়গার লাফ দিয়ে চলে যায়। ছেলে দুটো কেউ একবার চোখের দেখাও দেখতে এল না। যেন ঘাস-কাঁটার সম্পর্ক। বাতাসে গন্ধটা হঠাৎ তীব্র হয়ে নাকে বেঁধে। এ কিসের গন্ধ? বুড়োর হাত-পা ইসপিস করে নাকটা কুচকে যায়—ঘাড় উঁচিয়ে খাবি খায় সে, অন্ধকার নামে। ভেতরটাও তার আঁধার হয়ে উঠেছে ক্রমশ। চোখের কোণাটা ভিজে স্যাঁতসেঁতে। একসময় বড় একটা ফোঁটা চোখের কাছ থেকে ঠিকরে ঠোঁটের কাছাকাছি এসে যায়। জিভটাও চলে যায় সেই জলবিন্দুর কাছাকাছি। মাকড়সার জালে মাছি আটকে গিয়েছে কখন। বুড়োর জিভে নোনতা ম্যাড়মেড়ে ঘোলাটে এক স্বাদ। আঃ! হাই তোলে সে। এ সময়টা পাথরের চেয়েও মজবুত, ধরিত্রীর মত বুকে চেপে বসে, ঘুম ঘুম আসে। একা থাকলে ঘুমের গুঁড়োগুলো সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। কেমন ঝিমঝিমানী, হাত-পা সব অবশ অবশ, চোখের পাতা যেন লোহার চাদরের মত ভারী। পুরো মুখটায় তিতকুরো, ঢোক গিলতেও ইচ্ছে হয় না। চোখের কোণা দুটো কেবল ভিজে যায়...। কুকুর ডাকে। গুলমোহর গাছের পাতার আড়ালে এখন আর পাখির কিচকিচানী শোনা যায় না।

ধীরে ধীরে হাতে ভর দিয়ে উবু হয়ে বসে বুড়ো। গর্তে ঢোকা পেটটার ছায়া পড়ে মেঝেতে। চারপায়ে জন্তুর মত হাঁপায় সে। জানলার ও পিঠে বিজলীর আলো পড়েছে। মাঠটা আরো সবুজ হয়ে উঠেছে সেই আলোয়। দু একটা ঘাসফুল নাকছাবির মত ফুটে আছে। ফলে সাজগোজ করা মেয়ের মত বাহারে হয়ে উঠেছে চারপাশ। কিছু দূরে ইলেকট্রিক পোলে মরা বাদুড় ঝুলে আছে। বুড়ো তাই দেখে আঁতকে ওঠে। খেজুর গাছগুলোর পাশেই শান বাঁধানো টিউকল, জল স্যাঁতসেঁতে ঘাসের উপর পড়ে আছে দু চারটে কাটা ডাব। কেউ খেয়ে ছুঁড়ে ফেলে গিয়েছে ওখানটায়। কলের বাড়তি জলের স্পর্শে এখন সবুজ। দেখে শুনে হু হু করে ওঠে বুড়োর সাদা মন। জানলার শিক ছেড়ে চুল চেপে ধরে। রাস্তার ওপাশে কদমগাছে পেঁচা ডাকে। মড়ার ঘরটার পেছন থেকে ঘেয়ো কুকুরটা রক্তমাখা ন্যাকড়াটা বের করে এনে ঘাসে পা মুড়ে চাঁদের দিকে চেয়ে আছে।

কাল বুড়োকে ভাত দেওয়া হবে। বুড়ির সতর্ক কথা, একটু সামলে-সুমলে খেয়ো। অসুখ থেকে উঠলে সকলের নোলা বাড়ে।

জন্ম থেকেই মানুষটা লোভা। খাবার দেখলে লুলিয়ে ওঠে অন্তরাত্মা, জিভে জল আসে, বাঁচা মরার জ্ঞান থাকে না মাথায়। খাওয়া পাগল। পেট হালকা মানুষ নিয়ে বুড়ির যত জ্বালা। বয়স বাড়ছে। এখন লোহা খেয়ে হজম করার শক্তি কোথায়?

নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয়। লোভে না পড়লে সে আজ ড্যাং ড্যাং করে ঘুরে

বেড়াত, হাসপাতালের সীমানা মাড়াতে হ'ত না। মিছিলে যেত, চা-পান-বিড়ি খেত, দু'চারটে ভাল মন্দ কথা বলে জান জুড়োত। আসলে বিষ্ণুপদবাবুই সব মাটি করে দিল। বাবুর বাড়ির ছাগলটা রাতে মারা যায় গলা ফুলো ব্যামোয়। পেটও ফুলেছিল সামান্য। ধুমসা ছাগলটা কোথায় ফেলে? ভাগাড় বলতে সেই গাঁয়ের দক্ষিণ দিকের টিপি ডাঙ্গ টা। তা প্রায় মাইল খানেক পথ। এতটা পথ ছাগলটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়রানির। দুটো লোক কমসে কম দরকার। দুটো লোক মানে পাঁচ দুকানী দশ টাকা। তার উপরে চা-বিড়ি ভাগাড় খরচ আছে। বাবুর বউ বলল, গোয়াল ধারে রেখে দাও, কাল দাসের পো আসলে দিয়ে দিও।

ভোর হতেই খবর যায় দাসপাড়ায়। বুড়ো দাঁত মাজতে মাজতে এসে হাজির। ফাটা কাপে চা খেয়ে সে সময় নষ্ট করেনি। ঠ্যাং উল্টানো ছেরানে ধাড়ীটা তুলে নিয়েছে কাঁধে। চামড়ার লোভ ছিল। একটা পুরো মাপের চামড়া ষাট-পঁয়ষট্টির কম নয়। এদিয়ে শহুরে বাবুদের সৌখিন জিনিস হয়। ব্যাপারী নগদানগদি কিনে নিয়ে যায় খুশী মনে। তাছাড়া—

বুড়োর জিভে জল চলে এসেছিল। আজ বহুদিন ঘরে মাছ-মাংসের দেখা নেই। চুনো চাঁদা মাছ সব এখন নাগালের বাইরে। দু'টো খাসীর ঠ্যাং চেয়েছিল বাজারের কসাইকে। চোখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। বলেছে, একটা ঠ্যাং এখন এক টাকায় বিকোয়। তুমি চেনা-জানা মানুষ, বারো আনার কমে হবে নি। মান্সের চেয়ে ঠ্যাং-এর উপকার বেশী, এতে রোগ ভাল হয়। ডুমুরের মত হলুদ চোখ নিয়ে বুড়ো ফিরে এসেছে।

মরা ধাড়ীটাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে ন্যাসা ডহর পেরিয়ে, ঘুর পথে দাসপাড়ায় এসেছে। সোজা পথে আসতে পারত, তাতে ঝামেলা বেশী—হাজার গণ্ডা কৈফিয়ত দিতে দিতে জান বেরিয়ে যাবার যোগাড়। তাতে সময় ক্ষয়, ধৈর্য নষ্ট।

তেঁতুলতলায় ধাড়ীটাকে শুইয়ে রেখে কাঁধটা ডলে নিয়েছে গামছায়, তারপর চিল্লিয়ে বুড়িকে ডেকে পুরো একঘটি জল খেয়েছে। গামছায় পেটের জল মুছে দু'দণ্ড জিরিয়ে চারা তেঁতুলের ডালে ঝুলিয়ে দিয়েছে ধাড়ীটা। তারপর ছাল ছাড়িয়ে মাংস কুচিয়ে দু'টাকা সেরে বেচেছে জ্ঞাতিভাইদের। নিজের জন্য বেছে বেছে রেখেছে সের দুই মাংস, আর থলেথলে চর্বি, মেটে। দেখেশুনে বিরক্তিতে মুখ ঝামটেছে বুড়ি, তুমার কি মাথার ছিট আচে, হ্যাঁগা? অত মান্সো একা খেলে বাঁচবা তো তুমি?

বিড়ি ধরিয়ে ফুঁক ফুঁক টেনেছে বুড়ো। পাকা গোঁফের ফাঁকে ফাঁকে হাসি, মানসো খেয়ে পটল তুলেচে এমন কতা শুনিনি বাপু! তবে বয়সকালে তাড়ির সাথে তিন সের অব্দি টেনে দিয়েচি—দুলাল কাহার সাক্ষী আচে।

—তখুনকার কথা বাদ দাওদিনি।

—কেনে, বাদ দিব কেনে?

তখুন জল-বাসাৎ ভাল ছেলো। পাথর খেলেও হজম হয়ে যেত এক ঢেকুরে। জিনিস-পত্রে তখুন এত পায়িল ছেলো না।

বুড়ো কোণঠাসা। শুকনো মুখটা কাঁচুমাচু করে বলেছে, তা যা বলেচিস। তখুন আর

এখুন বহু ফারাক। মনে হয় ভূমি থিকে পাতালে ঢুকে যাচ্ছি—সগ্‌গো থিকে নরকে চলে যাচ্চি।

তবু হাতছাড়া করেনি মাংস। বাজারে এক সের মাংস এখন দেড়কুড়ির কাছাকাছি। সামর্থ কোথায় কিনে খাবার? মাংসের ডেকচিটা এগিয়ে দিয়ে বলেছে, যা লে যা। নুন-হলুদ দিয়ে বেশ করে সাঁতলিয়ে রেখে দে দিনি। দু'দিন ধরে ভোজবাড়ির মত রসিয়ে খাবোখন।

সেই-মাংস খেয়েই ঘন ঘন নামু চাপ। পেট ব্যথা, শুলোনী। ছ'বারের মাথায় দুপুরবেলায় বাঁশঝাড়ে রক্ত দেখে ঝাঁ করে মাথা ঘুরে গেল। জল কাজ সেরে বাড়ি আসার সময় টলেটলে পড়ে যাচ্ছিল আশশেওড়া আর বনকচার ঝোপে। কোনমতে তুলসীতলায় এসে হড়হড়িয়ে বমি ঢেলে দিল উঠোনে।

বুড়ি তখন সুচে তাগা পরাচ্ছিল। বমির শব্দে বাইরে এসে দেখে থোড় ছাড়ান কলাগাছের মত করুণ দশা বুড়োর। পয়সা জমানো বাঁশের খুঁটিটা ধরে কোঁত পাড়ছে ঘনঘন। মুখের দু'পাশে অজীর্ণ ভাত, ঘোলা জল। টক গন্ধ আসছিল।

দেখে শুনে কপাল চাপড়ে কেঁদে ওঠার কথা কিন্তু বুড়ি কাঁদেনি। শুধু সামনে এসে ঝুঁকে পড়ে শুধিয়েছে, কি হল গো, অমন করচো কেনে?

বুড়ো ধুতি সরিয়ে তলপেট দেখিয়ে বলেছে, ইখানটায় বড় ব্যথা, শুলোচ্চে। মনে হতিচে কুকুর হাঁচড়াচ্চে চার পায়ে।

তালাই বিছিয়ে বুড়োকে শুইয়ে দেওয়া হয় দাওয়ায়। বুড়ি তেল-জল লেপে দেয় তলপেটে। তাতেও কমে না। শেষটায় লেবুপাতা চটকে সরবৎ বানিয়ে খাওয়ান হয় বুড়োকে। তাতেও নরম পড়ে না। পেট চেপে গলগল করে বমি করে বুড়ো। চোখ উল্টে এখন যাই তখন যাই দশা। আসলে মরা নাড়িতে কড়া পাকের মাংস পড়ে হুলুসস্থুলুস কাণ্ড। আর হবেই বা না কেন? খাওয়া কি সেই ভদ্রলোকের মতন। পুরো হাঁড়িটা থালার সামনে চেটেপুটে খেয়েছে। দাঁত নেই। চিবাতে পারে না। বেগতিক দেখে কোঁৎ কোঁৎ গিলেছে।

ঘাটের কড়ি সাত তাড়াতাড়ি কিনলে বুড়িকে দেখার কেউ নেই। বড় খোকা পেটের শত্রু, জানোয়ার। মা-বাপ তার কাছে বিচুটির ঝোপ। আর বৌমা? সে তো লক্ষ্মী টেরা। দুধ ক্ষরিসের জাত। আর ছোট খোকা? সে তো ন্যালা ক্ষেপা, বাউণ্ডুলে। মদ গাঁজা ভাং-এর সাগরেদ। এর মধ্যে কোথায় দাঁড়াবে বুড়ি?

হাসপাতালে যাওয়ার পথে সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে আবার বে-কাজ করে ফেলে বুড়ো। কাপড়ে-চোপড়ে বিষ্ঠা লেগে দুর্গন্ধ ছড়ায়। রক্তের ধারাটা দাপনা ভিজিয়ে পায়ের গোড়ালীতে ঠেকে।

—কলমে আমগাছটা নিজের হাতের লেগিয়েছিলাম রে! এবার বোল আসবে বেচার মা? কিসের মায়ায় হু হু করে কেঁদে ওঠে বুড়ো, বাবুর কাছ হনে ঢাকটা ছেড়িয়ে আনিস, বাপ-চৌদ্দপুরুষের জিনিস হাতছাড়া হলে মরে গিয়েও শান্তি পাব না।

বুড়ির ছলছলে চোখ, ভয়ে দুরদুর করে বুক। ফাটাফুটো কালসিটে শাঁখাটা বড় মলিন দেখায় রোদে।

বড় ডাক্তার তখন টিকিট লিখতেই ব্যস্ত। তার সামনে হেঁট মাথায় তরলা বাঁশের চেয়েও ছিপছিপে একটা মেয়ে যার ডিমালো মুখ, পটলচেরা চোখ। মহাজনের তুখোড় ছেলেটা পাটের ভুঁই-এ কানের দুল, সীতাহার, পায়ের তোড়া, সিঁথির বালপাশা হেনতেন সর্বশেষ বিয়ের লোভ দেখিয়ে পেটে গোঁটা বাঁধিয়ে দিয়েছে পাঁচ মাসের। বিনা পয়সার হাসপাতালে তাই পেট খালাসের আর্জি।

বুড়ি মুখ ঘুরিয়ে নেয়। যৌবন কালের কথা মনে পড়ে।

সামনের পাকা রাস্তায় 'ইনক্লাব জিন্দবাদ'। ভোটের মিছিল চলে যায়। ভোটের আর মাত্র সাতদিন বাকি। মাত্র সাতবার হেগে ঝিমধরে বেঞ্চিতে বসে থাকে বুড়ো। ঘোলাটে হয় ওঠে চারদিক। পেটের ভেতর ব্লেড দিয়ে চাঁড়া কাটছে কেউ, কানের ভেতর ঝাঁ ঝাঁ করে, ঝিঁ ঝিঁ ডাকার মত শব্দ হয় অনবরত। মাত্র ক'দিন আগেই মন্ত্রী এসেছিল। তার গাড়ির মাথায় লাল আলোর দপদপানী। বুড়োর চোখে সেই লাল অলো খেলা করে এখন। সুস্থ থাকলে সেও মিছিলে যেত। মিছিলে গেলে বাজার খরচটা উঠে যায়। হরেকষ্টে বাবু বলে, ভোটটা এবার আমার দলকেই দিও।

লাল্টুবাবু বলে, আমার পার্টিকেই ভোটটা দিও গো দাসের পো। জিতলে পরে শিল্পী লোনের টাকাটা তোমাকেই পাইয়ে দেব।

এতদিন ধরে ভোট দিয়ে কিছু পায়নি। যা পেয়েছে তা তো শরীর ভাঙ্গান মজুরী। যেখানে ক্লাবের ছেলেরা যাত্রা করে ছ' হাজার টাকা লস খেল—সেই বাসস্ট্যাণ্ড ময়দানের শুয়োরের শুকনো গু-গুলো আইড়ি-ঝাঁটায় সাফসুফ করে দিতে দু'খানা ফুলুরি আর আড়াই টাকা রোজ দিয়েছিল কানে আতরের তুলো গুঁজে রাখা বাবুটা।

হাসপাতালে তাকে বড়ি আর সুঁই দেওয়া হয়। জমজমাট ভিড় ছেড়ে তারপর তাকে চলে আসতে হয় কলেরা ঘরে।

আজ নিয়ে পাঁচদিন হল—এখানেই সে বেঁচে আছে। শুধু মাঝে মাঝে একটা ডাবের জন্য বড় ন্যাওটা হয়ে পড়ে মনটা। একটা ডাব তো আর একতাল সোনা নয়? তবু কেউ দেয় না। তখন বেঁচে থাকতে তার ঘেন্না হয়। পেট খামচে দাঁতে দাঁত চেপে শুয়ে থাকতে সাধ যায়। ঘাড় সোজা করে মেরুদণ্ড টনটনিয়ে উঠে দাঁড়ায় সে। ভেতরে ভেতরে ঘেমে উঠছে। কম্বলটা পা দিয়ে সরিয়ে জানলার শিক ধরে চাঁদটার পানে তাকিয়ে থাকে। ধীরে ধীরে চাঁদটাকে খেয়ে নিচ্ছে মেঘে। কি আগ্রাসী সে ক্ষুধা...। চোখ নামিয়ে বাইরের দিকে তাকালেই ছড়ানো ছিটানো কাটা ডাবগুলোর দিকে নজর যায়। ডাবের গায়ে শিশির পড়েছে। তরতাজা হয়ে উঠেছে ডাব। দেখতে দেখতে হু হু করে বুক। মনে হয়, ডাব না তো বজ্রশূল।

বুড়ো আর দাঁড়ায় না। সোজা চলে যায় ডিউটি-রুমে।

দিদিমণির সামনে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকে সে, মা জননী গো, মোরে ছুটি করে দাও মা। লাতিটার জন্য পরাণ ধড়ফড়ায়। মুটে রইতে পারিনে মা...। ফোন নামিয়ে দিদিমণির চোখে বিস্ময়।

ঘাড় নেড়ে, হাত-পা ঝাঁকিয়ে সাতকাহন পাঁচালী শোনায় বুড়ো, টেরের ঘরে একলা

থ্যাকতি পারিনে, মা। রেতকালে দড়াম দড়াম পায়ে কে হাঁটে, লোহার বল গড়িয়ে দেয় এমুড়ো থেকে ও-মুড়োয়। ঘ্যার ঘ্যার ঘটাস ঘটাস আওয়াজ। ঘুম ভাগলেই কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। জলের কলসী আপসেই ঠকঠক নড়ে। এসব নিয়ে একা থাকতি পারিনে, মা। তরাসে গায়ের লোম চেগে ওঠে।

ভয়ের কথা উল্টো সিধে লাগিয়ে কলেরা-ঘর থেকে একেবারে হাসপাতালে চলে আসে বুড়ো। কাঁথা-কানি মেঝেতে বিছিয়ে নিজের মনেই হাসে। যাত্রাটা দিদিমণির সামনে ভালই করল। তাজ্জব বনে গিয়েছে মেয়েমানুষটা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেটে হাত বোলায় সে। তলপেটের কাছে এখন কোন চাওড় বাধা বেদনা নেই। পেটটাও স্থির জলের মত ঢেউহীন, মুখের তিতকুড়ে ভাবটাও উধাও। আরামে ঢেকুর তোলে বুড়ো, আঃ, কি শান্তি!

কাল হাসপাতাল থেকে ভাত দেওয়া হবে বুড়োকে। শিঙ্গি মাছের ঝোল সংগে কাঁচকলা। দই আর পাতিলেবু। দিদিমণি বলেছে, তিন দিনের মধ্যে তার ছুটি হয়ে যাবে। এমন খাওয়া-দাওয়া পেলে জন্ম-জন্মান্তরে সে আর ছুটির কথা মুখে তুলবে না। ঘর গেলেই তো সেই ঘ্যাট-ঘন্ট, ভিজে ভাত আর যবের রুটি। কচলে মচলে এই খেয়েই জীবনধারণ। পা টানটান করতে গেলে খিঁচ লাগে শিরাতে। পাশের রোগীটা বেদম কাশছে, হাঁপানীর ধাত। সেই কাশির শব্দে গমগম করে বদ্ধ বাতাস। দুটো চামচিকি ডিউটি-রুমের দিকে উড়ে যায়। বুড়ো ভয়ে পাশ ফিরে শোয়।

রাত গড়ায়। লম্বা বারান্দায় ঝোলান বাতিটা হাওয়ায় নড়ে। ভৌতিক ছায়া পড়ে মেঝেতে।

ঘুম আসে না বুড়োর। তার এখন জিরিয়ে নেওয়ার পালা। কম্বলের গা ঘেঁষে সার সার লাল পিঁপড়ে। পেচ্ছাবের গন্ধ আসে। পাঁচমিশেলি বকাটে গন্ধে সুড়সুড় করে নাক। হাসপাতালের সব ভাল কেবল এই গন্ধটাই তার সহ্য হয় না, এ যেন পিত্তি গলা পচা মাছের চেয়েও জঘন্য! জোরে জোরে নাক টানে বুড়ো। উঃ, গন্ধ! চারদিক জুড়ে গন্ধ! এর হাত থেকে রেহাই পেতে বিড়ির কৌটোটা বালিশের তলা থেকে বের করে আনে সে। কৌটো ফাঁকা। বাধ্য হয়ে পাশের রোগীকে খোঁচায়, লায় গো দাঠাকুর, এট্টা বিড়ি হবে?

—কে বটেক? ছানিপড়া চোখে পাল্টা শুধোয় বামুন পাড়ার মুরুব্বি, ঘোলাটে চোখে চিনতে পেরে উবু হয়ে বসে বিছানায়, ওঃ, তুই খেলার বেটা বটে! তা বেশ, তা বেশ! ক'মুহূর্ত চুপ থেকে পৈতে খুঁটতে খুঁটতে বলে, তোর বাপ বড় ভাল শোলা কাটাতোরে। টুপি বানাত মালীপাড়ায়। তখুন থানার কাছে ইসটিমার বাঁধা থাকত। হাতের কাজ দেখে সাহেবরা তুর বাপরে এট্টা মেডেল দিয়েলো। সেই মেডেলটা গলায় দিয়ে তুর বাপের সেকি নাচানাচি।

বুড়ো চুপ করে থাকে। এসব গল্প বাপ বেঁচে থাকতে বহুবার শুনেছে সে। চটকানো লেবুর মত ঘটনাগুলো এখন তেঁতো।

দাদাঠাকুর চোখের পিচুটি মুছে গদগদ তাকায়, অমন জিনিস হারাসনে বাপ। ও হলোন গিয়ে সেরেতি, অমূল্যধন।

বুড়ো কপালে হাত বুলায়। সেই অমূল্যধন এখন হাতছাড়া। বেচার অসুখের সময় টানাটানি চলছিলো। কিছু উপায় ছিল না। মেডেলটা স্যাকরার দোকানে বেচে দিয়েছে। দাদাঠাকুরের দিকে ঘাড় তুলতেই দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। মুখের ওপর লতলত করে কষ্ট। চোখের ভেতর বালি পড়ে বুঝি। ঘনঘন বিড়ির ধুঁয়ো ছাড়ে দুই বুড়ো।

লম্বা বারান্দায় ভারী জুতোর শব্দ হয়। ভীতু খরগোশের মতো ভ্যাবাচেকা খেয়ে দু'জনেই লুকিয়ে ফেলে বিড়ি। পাশের রোগীটা বলে, নিবিয়ে ফেলুন গো বিড়ি। ডাকতারবাবু। দেখলি পরে হাসপাতাল হণে নাম কেটে দেবে। তাড়াহুড়োতে আধপোড়া বিড়িটা কম্বলে চেপে ধরে বুড়ো। লোম পোড়ার কুঁচুটে গন্ধে নাক কুঁচকায় ডাক্তার।

—এখন কেমন আছেন?

—আজ্ঞে ভালো নেই গো বাবু। হাঁটতে চলতে পা'টা টলে টলে পড়ে। শরীলটারে মনে হয় একেবারে হালকা মুলো। চোখ বুজলেই হলুদ হলুদ সর্ষে ফুল। কোথ থিকে যে আসে কিছু বুঝিনে। বুড়োর কথায় সন্দেহ নিয়ে তাকায় ডাক্তার। চশমার কাচ মোছে। টর্চ জ্বেলে জিভ আর চোখ দেখে। টর্চের আলো নিভিয়ে বলে, এখন পেট খালি রাখা ঠিক নয়। শরীর দুর্বল। জ্যান্ত মাছের ঝোল খেতে পারলে ভাল হয়। ঘাড় নাড়ে বুড়ো,—তা তো বুঝলাম বাবু, কিন্তু পাব কুথায়? শিঙ্গি মাছ দু'কুড়ি দুই। চ্যাং-ছিঙ্গুড়ি আট-দশ টাকার কম নয়। এক সের চালের দামে দু'বছর আগে এট্টা গামছা হতো।

ডাক্তার ও প্রসঙ্গে যায় না। কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখে।

—পেচ্ছাব হয়?

—আজ্ঞে না বাবু। হালকা হতি গেলে জ্বালা করে শরীল। হলুদ হলুদ এক ফোঁটা দু' ফোঁটা। তাও আবার বহুকষ্টে কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে।

—ডাব খান। পেট ঠাণ্ডা রাখুন।

হন হন করে ডাক্তার চলে যায় অন্যদিকে। বুড়ো মাথা চুলকোয় আর ভাবে। এতক্ষণ সে ডাবের চিন্তা ভুলে ছিলো। ডাক্তার যেন বারুদের গাদায় আগুন ধরিয়ে চলে গেল। সবাই তো ডাব ডাব করে। কিন্তু কোথায় পাবে সে? ঢোক গিলতে গেলে শুকনো লাগে গলাটা। মনে হয়, গলা চিরে পাতলা রক্তগুলো ডাবের জলের মতো নেমে যাবে পাকস্থলীতে। পৃথিবীর কোন জিনিস তার দখলে নেই। নইলে গাঁয়েঘরে এত ডাব অথচ তার ভাগ্যে কি একটাও জোটে না? পয়সার জন্যেই কি সব আত্মীয়তা? একসাথে গায়ে গা লাগিয়ে বেঁচে থাকা এর কি কোন মূল্য নেই? সব সম্পর্কই কি খরানীর মাটির মতো ফেটে চৌচির হয়ে যাবে? ভাবতে কষ্ট হয়। এই গাঁয়েই তার এক থেকে একষট্টি বছর কাটলো। দু'খানা ডাব তো দু'তাল সোনা নয়। মনটাতে আবার সেই ফোস্‌কা গলে যাবার কষ্ট। ভয়ানক রকমের অস্বস্তি শরীরে নিয়ে বুড়ো শুধোয়, তা দাদাঠাকুর, এবার কি গাঁয়েঘরে মুটে ডাব হয়নি?

মড়ার মত পড়েছিল আশি খুবলান বুড়ো। দম নিয়ে বলে, তা আবার হবেনি কেনে বাপ্? গাঁয়ে ঘরে ডাব হবেনি তো কি সগ্‌গে হবে বাছা! আসলে, বুঝলে কিনা—পোদ থেকে ফুল না ঝরতেই সব চালান হয়ে যায় শহরে। কুলকাতায়—

—কেনে, কেনে? বুড়ো উৎসাহী গলাটা বাড়িয়ে দেয় সামনে, চোখে-মুখে উদ্বেগ ফুটিয়ে বলে, কুলকাত্তার মানুষগুলো কি মোর মতুন ওলাউঠোয় ভুগচে, লায়গো দাঠাকুর?

ফোকলা দাঁতে হেসে ওঠে দাদাঠাকুর, তা লয় বাছা, ওরা হলেন গিয়ে সুখী মানুষের ছা, যাকে বলে ভদ্রলোক! হাজার হোক নেকা-পড়া শিখেচে তো। সারাদিন কেবল বেরেনের কাজ করে। শরীল তো শেতল রাখতি হবে? ওদেশে বেজায় গরম কিনা!

—ওঃ! গম্ভীর আর থমথমে গলায় বুড়ো শুধোয়, শরীল শেতল রাখতি গেলে কি করি বলদিনি?

—মিচরি খা। এক গিলাস জলে দু' ঢেলা মিচরি। পারলে ফোঁটা কতক পাতিলেবুর রস। চোখ-কান বুজে গিলে নিয়ে মাঠে বসে থাকো ফুরফুরে বাতাসে শরীল হিম হয়ে যাবে। আপসেই হড়হড়িয়ে—

কথায় কথায় রাত গম্ভীর হয়। টালি নিয়ে ঘর ফেরে রাঢ় দেশের গাড়োয়ান। পাকা সড়কে ক্যাচকোঁচ শব্দ হয় চাকায়। মড়ার ঘরের পাশ থেকে কুকুর ডেকে ওঠে রূপলী চাঁদ দেখে। বুড়োর কিছুতেই ঘুম আসে না। এ শরীরের উপর তার অধিকার যেন ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। পিঠ ফুটে বেরিয়ে পড়ছে ঘাম। পিচবোর্ডের চেয়েও শক্ত পেটটা বড় অবাধ্য তার। বেহিসেবী। খালি যখন তখন ক্ষিদে পাইয়ে দেয়। এখন ক্ষিদের থেকে তেষ্টাটা বেশী। অথচ ভগবান তার তেষ্টা মেটানোর কোন পথ রাখেনি। ভগবানকে সামনে পেলে সে যেন ছিঁড়ে খুঁড়ে খেত এমনি উগ্র চোখে চারপাশে তাকায়। ডুমুর পাতার চেয়েও খসখসে গলাটা আরো শুকিয়ে ওঠে। রুক্ষ, কর্কশ আর নির্জলা গলা কাঁপিয়ে কান্নার মত বেরিয়ে আসে, ও দাঠাকুর, দাঠাকুর গো—।

উত্তরে নাক ডাকার শব্দ আসে, মাথার কাছ বরাবর ইঁদুর ছুটে যায় ফেলে রাখা আঁধারে। ঘাপটি মারা বিড়ালটা ঝাঁপিয়ে পড়ে তক্ষণাৎ। দেখেশুনে চকচক করে বুড়োর চোখ। কলেরা ঘরের ডাবটার কথা মনে পড়ে। দু' হাতে পেট চেপে উঠে পড়ে সে। সন্তর্পণে দেওয়াল ধরে হাঁটতে থাকে। শ্বাস নিতে গিয়ে পরনের কানিটা খুলে যাবার যোগাড়। আসলে পেটে কিছু নেই। ময়রা দোকানের ফুটন্ত তেলের ঝুরিভাজার মত ওলোট পালোট খায় নাড়ি-ভুঁড়ি। কানিটা কোমরে গিঁট দিয়ে আবার দেয়াল ধরে চলতে থাকে সে। শিকারী চোখ দুটো অনবরত ঘুরে যায় এদিক সেদিক। দিদিমণির সহজ মুখটা মনে পড়ে। বড্ড বোকা বানিয়ে দিয়েছে মেয়েটাকে। কিছুটা এগোতেই সে ঢুকে পড়ে একটা ঘরে। চারটে লোহার খাট, কাঠের টুল, গামলা বিছানা পাশ কাটিয়ে একেবারে ঘরের মাঝামাঝি এসে দাঁড়ায়। আলো নিভানো; শুধু চাঁদের আলো। কাঠটগরের পাপড়ির মত ফিকে একটা জ্যোৎস্না। মেঝেতে নিজের ছায়া দেখে হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়ে বুড়ো। বাইরের ফাঁকা মাঠে তখন থৈ থৈ করে জ্যোৎস্না, হাওয়াতে খেজুরগাছের পাতা নড়ে। দেওয়ালের টাটকা চুনের গন্ধ বুকে নিয়ে বুড়োটা সরীসৃপের মত এগোয়। ঘুমে কাদা মানুষগুলোর কোন হুঁশ নেই। কেবল মশারী উড়ছে ফ্যানের হাওয়ায়। কিছুটা এগোতেই বুড়োর শরীরে টিপ টিপ ভয়ের ঢেঁকি।

কানের পাশটা গরম হয়ে ওঠে। বড় বড় চোখ করে দেখে খাটের নীচে কাঁদি সমেত গোটা কতক ডাব। সবুজ ফুলকচি আর টাটকা। দেখে মনে হয় গলা অব্দি জল। উপরন্তু স্বাস্থ্যবান, গোলগাল। শিশিরে ফেলে রাখা পালং-এর চেয়েও তরতাজা। বুকটাতে খুশির খৈ ফুটে ওঠে। পায়ের রগগুলো টানটান। গিঁট ফুটে ওঠে উত্তেজনায়। বেঁচে থাকতে গেলে মানুষকে সাপ ব্যাঙ কত কি হতে হয়? পেট জব্বর শত্রু। তাকে পোষ মানানোই দায়। লোভটা কলমীলতার মতো বাড়ে। শরীরের পুকুরে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে, দরদরিয়ে ঘেমে ওঠে। কোথায় যেন খিঁচ লাগে, মড়মড় করে বুকটা। দু'হাতে বুক চেপে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে সে। চোখ দুটো লেপটে থাকে ডাবে।

তার বাপ বলত, খেতে না পাস্ শুকিয়ে আমসী হয়ে মর বেটা। তবু বাছারে, পরের জিনিসে মুটে লুভ দিবিনে। লুভে পাপ। পাপে মরণ। শ্মশানের অঙ্গার।

বাপের কথাগুলো আবছা অন্ধকারে সুঁচ হয়ে খোঁচা মারে মাংস কোষে। মাথাটা বড় ভারী ভারী ঠেকে। তবে কি পাপের শুরুতেই মাথাটা ঝুঁকে পড়বে?

পালপুকুরে রাতে জাল টেনেছিলো নিতাই। ধরা পড়ল। মারও খেল। হাতে-পায়ে ধরে ছাড়া পেল। বুড়ো তখন পাকা মুরুব্বির মত বোঝ দিয়েছে, ছি-ছি লেতাই, তুই জাতের মুখে চুন-কালি লেপে দিলিরে! সামান্য মাছের লুভে বাবুদের পুকুরে তুই রেতে কেনে জাল টানলি? হ্যাঁরে খেতি মন চায়, চাইলেই তো পারিস। অতবড় জোয়ান মরদ তুই। তোর বৌটা লজ্জায় দেওয়ালে কপাল ঠুকে ঠুকে কান্‌চে।

নিজের কথা নিজেকেই শূলে চাপিয়ে দেয়। কান্নার ঢঙে বিড়বিড়িয়ে ওঠে বুড়ো, ই বাপ্, ই লেতাই,—তুরা মোরে ক্ষমা দে। মুই আর পারিনে। মোর তলপেটটা টাটায়। কড়া কড়া বড়ি আর ইন্‌জিসীনে মুই মরে যাবো রে—এ—এ।

খাটের তলা থেকে কাঁদিটা বের করে দখল নেয় বুড়ো।

খোঁয়াড়

ফাঁকা মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে অহল্যা ডেকে ওঠে, দাদা, এ দাদা...আ...আ...আ।

সামনে বন বিভাগের জঙ্গল। অহল্যার ডাকটা পিছলে গিয়ে প্রতিধ্বনি ফিরে আসে। এদিকটায় আলো কমলে লোকজন খুব একটা আসে না। ফাঁকা জায়গাটা সুবিধের নয়। চোর-ছ্যাঁচোড়রা রাতের আঁধারে তাড়া খেয়ে এদিকটায় পালিয়ে আসে।

সব কিছু জানার পরেও শক্ত পায়ে দাঁড়ায় অহল্যা। খাটো শাড়িটা কোমরে গুঁজে এদিক-সেদিক তাকায়। দাদা এদিকেই এসেছে। বড্ড রগচটা। খাওয়ার সময় মেজাজ যেন ঠিক থাকে না। মায়ের সাথে ঝগড়া করে ভাতের থালা উল্টো পালিয়ে এসেছে দুপুরের দিকে। ভেবেছিল, প্রতিদিনের মত ফিরে যাবে। যায় নি।

মহান্তি বাবুর গুড়কল থেকে লোক এসেছে তাকে নিতে। গোবরা ছাড়া একপ্রকম গুড়কল অচল। রস জ্বালদেবার কাজ যার তার দ্বারা হয় না। রসে ফুট্ ধরলেই কত রকম যে ঝক্কি-ঝামেলা! তখন গাদ তোলার দায়িত্ব থাকে না ঠিকই তবু গুড়ের দিকে নজর রাখতে হয় পুরোমাত্রায়। চুল্লীর সামনে খাঁকি পোশাক পরে দাদার চেহারাটা তখন শ্মশানডোমের চেয়েও একরোখা। খাঁকি পোশাকের এখানে ওখানে রসের গাদের চিটে ময়লা। চুলগুলোয় আটকে থাকে কালি-ঝুল। জট ধরে থাকে সব জায়গায়।

গুড়কলে যাওয়ার আগে গোবরা মা'কে বলেছিল, চালতা দিয়ে মাছের টক রাঁধতে। সকালে কুঁড়া-জালিতে চিংড়ি মাছ পড়েনি। ফলে টক রাঁধা হয়নি। শুধু ডাল-ভাত আর কুমড়োর ঘন্টো এগিয়ে দিয়েছিল মা। মাছ ছাড়া ভাত রোচে না বাবুর। অথচ প্রতিদিন মাছ কোথা থেকে আসে? বাজারে মাছের দাম রূপোর ভরির সমান!

এক কথায় দু'কথায় রাগ চড়ে গিয়েছিল ব্রহ্মতালুতে। মা বলেছিল, খেতে মন চায় খা। মিলা বকবক করিসনে দিনি। ঘরে কিছু নেই। গায়ের মান্‌সো কেটে কি রেঁধে দেব?

সাত গাড়ি আখের রস চৌবাচ্ছায় গাঁজলা তুলছে। এখনও গুড়কলের সামনে পঁচিশ গাড়ি আখ লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে। কোম্পানির চিনিকল বন্ধ। কোম্পানির দামে কেউ আখ বেচতে রাজি নয়। ওতে সমবছরের চাষের খরচই ওঠে না। চাষীদের তাই গুড়কলের দিকে ঝোঁক বেশী। মহান্তিবাবুরা রেট ভালো দেয়। আখ মাড়িয়ে গুড় করে নিলেও ক্ষতি নেই।

ধীরে ধীরে শালবনের ভেতর ঢুকে যায় অহল্যা। বাতাসে শুকনো পাতা উড়ে বেড়ায়। পাখি ডাকে পাতার আড়ালে। মরা আলোয় কালচে হয়ে আসে সবুজ পাতা। সেই নিভু আলোয় মাহাতো বউ-ঝিরা পুরুষগুলোর সাথে গাঁয়ে ফিরে যাচ্ছে। তাদের পায়ের চাপে মচ-মচিয়ে ওঠে পাতা। এর মধ্যে থম মেরে আছে চারদিক। আর একটু পরে পাতা নিংড়ে

রোদ চলে যাবে মাটির কাছাকাছি। অহল্যা গুটিগুটি পায়ে বুড়ো সেগুনগাছটার কাছে এগিয়ে যায়। উবু হয়ে খুঁজে বেড়ায় পোড়া বিড়ির টুকরো। পায় না। গোবরা আসলে নির্ঘাৎ পোড়া বিড়ির টুকরো থাকত। থাকত শালপাতা জড়ো করে আগুন ধরানোর চিহ্ন।

কোন চিহ্ন-ই নেই। শুকনো পাতায় শুধু মচরমচর শেয়াল পালানোর শব্দ। ঝুরঝুরো বালির পাড়ের মতো ভেঙে যায় অহল্যার ভেতরটা। কোথায় যেতে পারে দাদা? ঘাড় তুলে তাকাতেই স্টেশন যাওয়ার সুড়কি বিছানা পথটা নজরে পড়ে। পথের শেষে স্টেশনের দালান। ঝমঝমিয়ে ইঞ্জিন চলে যায়। আঁতকে ওঠে অহল্যা। বুকের কাছে অজান্তেই হাত চলে যায়। ঘাম জ্যাবজ্যাবে বুকে তিরতিরে স্রোত। ভয়ে সিঁটিয়ে যায় সে।

মঞ্জু, তার সই—ট্রেনে গলা দিয়েছিল মায়ের সাথে কাজিয়া করে। দু'খান হয়ে গেছিলো মঞ্জুর দেহটা। রেল লাইনের খোয়ায় একটুও রক্ত ছিল না। গোবরা বলেছিল, দারুণ সুখের মরণ বুন! হুস করে ইঞ্জিনটা বেরিয়ে গেলেই হল!

স্টেশনের দিকে তাকাতেই ভয় এসে ঘিরে ধরছে অহল্যাকে। স্টেশনটাকে তার মনে হয় যমপুরী, প্রেতপুরী। পড়ি মরি করে গাঁ-মুখো ছুটতে থাকে অহল্যা। তখনই লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে সন্ধে নামে। শালবনে গুমরে যায় আটকা পড়া হাওয়া।...অহল্যা ছোটে। আলের ঠ্যাঙাড়ে ঘাসে তার পা আটকে যায়। জমির ফাটলে গোড়ালি ঢুকে মাঝ মাঠে থমকে দাঁড়ায় সে...।

দেখে, দূরের খাল পাড়ের ওখানে আকাশ শেষ; বড় ইস্কুলের ওখানে আকাশ শেষ, ইস্টিশানের ওধারটায় আকাশ শেষ। বড় ইস্কুলের টিকলিতে হুমড়ি খেয়ে থেঁৎলে গেছে আকাশ। দেখতে দেখতে বড় অবাক হয় অহল্যা। মন খারাপ করে। মনে হয়, কেউ তাকে জোর করে খোঁয়াড়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। আকাশ দিয়ে বেড়া দেওয়া হয়েছে সেই খোঁয়াড়। যেখান থেকে বেরিয়ে আসার কোন উপায় নেই।

আখ মাড়াই কলের বাবুটা ফিরে গিয়েছে সেই কখন। অহল্যার গায়ের গন্ধ পেয়ে গা ঝাড়ে গরুটা। এই সময়টায় মশার বড় উৎপাত। গোয়ালে ধুঁয়ো দেওয়া হয়নি। মাটির সরায় ঘষির আগুন নিয়ে একমুঠো ধুনো ছিটিয়ে বাতাস দেয় সে। ধবলি বড় আদর খেতে ভালোবাসে। আখ কলের কাজে লেগে গোবরা গো-হাট থেকে কিনে এনেছিল গরুটা। টাকাটা বিয়ের জন্য জমিয়েছিল। কিন্তু রাধা রাজি হয় নি। ছোটবেলার কোন সম্পর্ক রাধা মনে রাখতে চায় না। অথচ গোবরার কাছে চিৎ-সাঁতার, ডুব-সাঁতার শিখেছিল রাধা। লুকোচুরি খেলত বড় ইস্কুলের ওধারটায়। ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে চলে যেত খালে। মাহাতোদের মেলায় যেত, শিব-থানে এক সাথে পূজো দিত তারা।

ধবলির পিঠ থেকে হাত সরিয়ে পাতনায় আউর কুচি দিয়ে ফিরে আসে অহল্যা। হঠাৎ তার চোখে নেচে ওঠে আগুন। গুড়কল থেকে ভল্-ভলিয়ে উঠে যাচ্ছে আগুনের শিস। ধেই-ধেই করে গাজন পাগলার মত নেচে যাচ্ছে আগুন। তার কোপে ঝল্সে যাচ্ছে আকাশ।

—ও মা মারে। দেখে যা। অহল্যার গলায় সোনা কুড়িয়ে পাওয়ার স্ফূর্তি। বুড়ি নেমে এসেছে দাওয়ায়। দু'জনের কথা-বার্তায় ঝুড়ি চাপা দেওয়া হাঁস মুরগীগুলো কক্ কক্

করে ডানা ঝাড়ে। এই অবেলায় ভাঁটায় আগুন দিল কে? দাদা ছাড়া আর কে হতে পারে। হয়ত রাগ করে গুড়কলে ফিরে গিয়েছে দাদা। রাতে হয়ত ফিরবে না। রাগ পড়লে ভোরে ভোরে ঠিক এসে হাজির হবে। দাদার মুখটা যেন আগুনের শিখার মত নড়ে উঠছে। আগুন নিয়ে দাদার সারা দিনের কারবার। ঠিকমত গুড় জ্বাল দিতে পারলে দশ-বারো টাকার কমে রোজগার হয় না। আগুনের কাজ ধকলের কাজ। তবু পয়সা আছে। তা ছাড়া ঘরে ফেরার সময় এক-আধ পোয়া গুড় মালিক খুশি হয়ে দিয়ে দেয়।

অহল্যা একবার জল-খাবার দিতে গুড়কলে গিয়েছিল। গুড় জ্বাল দেবার কষ্টটা চোখে দেখা যায় না। পাঁচ হাত লম্বা, তিন হাত চওড়া মাপের লোহার কড়াই। তাতে টগবগিয়ে ফোটে সবুজ রস। ফিটকারির ঠেলায় ফেনা ওঠে কড়া ভর্তি। গায়ে খাঁকি জামা, পরণে ঢোলা খাঁকি প্যান্ট, আগুনের সামনে ঘাম মুখে দাঁড়িয়ে থাকে গোবরা। মচমচে আখ ছিবড়ে গনগনে আগুনে পড়েই পট্-পটর শব্দে জ্বলে ওঠে। আধলা মালাই হাতে তখন গাদ তোলে গোবরা। কপালের দু'পাশ দিয়ে চুঁইয়ে নামে ঘাম। ফোলা ফোলা শিরাগুলো আরও ফুলে যায়। তামাটে মুখটা মাটির মতো নিরস হয় ক্রমশ।

মনের মধ্যে ভয় পুরে সেদিন ঘরে ফিরে এসেছিল অহল্যা। রাতে স্বপ্ন দেখেছে গুড়কলের। রসভর্তি কড়াই উল্টে গেছে খোঁচানী লাগার ধাক্কায়। ফোঁটা রস গড়িয়ে যাচ্ছে ঘাসে। ঝল্‌সে যাচ্ছে দশ দিক। ফুট রসের ভাপে চারা গাছগুলো সাদাটে মেরে গেল দু'দণ্ডে। ষণ্ডা-মার্কা একটা লোক এসে আখ ছিবড়ের ঢিবিতে আগুন ধরিয়ে দিল। হাওয়া উঠলো শন্‌শন্। ছড়িয়ে গেল আগুন। পুড়ে শ্মশান হয়ে গেল গ্রাম। আগুনের তাতে গলে গলে পড়লো আকাশ। ভয়ে ঘেমে নেয়ে ছটফট করছে অহল্যা। ঢোক গিলতেই গলা শুকিয়ে আমচুর। ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়েই কুয়াশা রং-এর মশারীর ভেতর ঘুমন্ত দাদাকে দেখে এসেছে। তারপর স্বস্তিতে বুক ভরে শ্বাস নিয়েছে অহল্যা। যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল তার।

রাত যত বাড়ে, তত বেশী দাদার কথা মনে পড়ে যায় তার। আখ নিয়ে যাওয়া ক্যাঁচকোঁচ গরুর গাড়িগুলো দাদার কথা আরও বেশী করে মনে করিয়ে দেয়। অহল্যাকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে ওর মা বলে, তুই খেয়ে নে অহিল্যে, বেটা আমার আসবেনি মনে হতিচে। ঠিক একেবারে বাপের জেদ পেয়েছে।

রুটি আর মেটে আলুর তরকারি নিয়ে চুপচাপ বসে থাকে অহল্যা। রাত বাড়ে। টিপ্‌টিপিয়ে বৃষ্টি পড়ে। সাঁইসাঁই হাওয়া ছোটে। চিংড়ি ধরার জালটায় কুঁড়ো আর গোবর মেখে অহল্যা চলে যায় পুকুরঘাটে। একটু শীত শীত থাকলে চিংড়িমাছ পড়ে বেশী। বৃষ্টি হয়ে ভালই হল। নতুন জলের টানে মাছগুলো কুঁড়ো-গোবরের ঘ্রাণে আটকে যাবে জালে। সারা রাত ছট্‌ফটিয়ে ভোরের দিকে ঝিমিয়ে থাকবে ওগুলো। কাল চালতা দিয়ে চিংড়ির টক রেঁধে খাওয়াবে গোবরাকে।

ভোর হওয়ার আগেই অহল্যাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে ওরা। পরিমল মশারীর দড়িটা খুলে নীচু গলায় বলে, খুড়িমা কোথায় রে?

এদিক-সেদিক তাকিয়ে মা কে দেখতে পায় না অহল্যা। মা'র ঘুম খুব পাতলা। রাতে

ভাল মত খায়নি। একটু শব্দ হলেই বার বার শুধিয়েছে, তুর দাদার পায়ের আওয়াজ মনে হতিচে। এ অহিল্যে, দেখ না এট্টু আলোটা বাড়িয়ে...।

সাদা ভেড়ার লোমের মত ছড়িয়ে ছিল কুয়াশা। পুকুরের বিঘোৎ খানিক উপরে হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছিল কুয়াশা, চালতাগাছের পাতা থেকে টুপ-টুপিয়ে শিশির পড়ে। পরিমলকে দেখে অবাক হয় অহল্যা। সাত দিনও হয়নি গোবরার সাথে কাজ নিয়ে কাজিয়া করেছে ও। ক্রাসারে হাত পিষে গিয়েছিল পল্টুর। মহান্তিবাবু চিকিৎসার খরচ দেবে না। গোবরা গিয়ে রুখে দাঁড়াতেই পরিমল বলেছিল, তোর কি মাতব্বর হওয়ার সখ?

কাক হয়ে কাকেরে ঢোকরাস? গোবরার ফোঁসানীতে এলোপাথাড়ি ঘুঁষি চালিয়ে ছিল পরিমল। আচমকা ঘুঁষিতে সামনের দাঁতটা পড়ে যায়। ঝোঁক সামলে নিয়ে গোবরা ছুঁড়ে মেরেছিল বাটখারা। পরিমলের মাথা ফেটে রক্ত ঝরছিল। সড়কি গেঁথা বাঘের মত কোঁতাতে কোঁতাতে সে বলেছিল, আমার এক বাপের জন্ম। এ রক্তের উসুল আমি নেবই।

—দাদা কোথায়? অহল্যার আর্ত প্রশ্নে পচা মাছের চোখে তাকায় দু'টো মানুষ। তাদের গলায় জোর করে কেউ যেন বরফ ঢুকিয়ে দিয়েছে। মহান্তিবাবু ঢোক গিলে বলে, তোদের এট্টু গুড়কলে যেতে হবেক্ষণ। পুলিশ এয়েচে...।

কথা শুনে কাটা কলাগাছের মত অসাড় দাঁড়িয়ে থাকে অহল্যা। কুঁড়াজালি হাতে, কোঁচড়ে পোয়টেক চিংড়ি মাছ নিয়ে ঘরে ফেরে তার মা। নোলা-ঝোলা ভাঙ্গা-চুরো মুখে চিন্তার হিজিবিজি। দু'জন মানুষের দিকে ভুলভুলিয়ে তাকায়।

শিশির ধোওয়া পথের উপর শুকনো পাতার বিছানা। গরুর গাড়িটা লাফিয়ে লাফিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছিল পথ। মুখোমুখি বসে আছে অহল্যা আর তার মা। কারোর মুখেই কথা নেই। শুধু কান্নার বেগ আসলেই আঁচলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে যাচ্ছিল মেয়েটা। তার মা কিছু বুঝতেই পারে না। শুধু চেয়ে থাকে ফাঁকা মাঠটার দিকে। পরিমল দাঁতের খড় চিবাতে চিবাতে বলল, কাঁদিস্ নে বুন,...বিপদ নিয়েই জগৎ সন্সার।

—দৈবের মার দুনিয়ার বার। অহল্যার দিকে তাকিয়ে মিথ্যে কাশে মহান্তিবাবু, তোর আমার কি করার আছে বল? গুড় জ্বাল দিতে গিয়েই গোবরাটা ঘুমের ঘোরে গুড়ের কড়াই-এ হুমড়ে পড়েছে। যখন টের পেলাম...।

অহল্যার কানের মধ্যে তীরের মতন গিঁথে যাচ্ছিল কথাগুলো। কাটা ঘুড়ির মত এলোমেলো হচ্ছিল তার ভাবনা। ধীরে ধীরে মাথাটা তার ঢলে পড়ে মার কোলে।

বুড়ি কিছু বোঝে না। বুঝতে পারেও না। শুধু সাপে ধরা ব্যাঙের মত কেঁপে যায় তার ন্যাসকানো বুক। মেয়ের মাথা ছুঁয়ে বলে, এ অহিল্যে, রা কাড় মা। গুড়কল যে এসে গেল...।

দ্বন্দ্বযুদ্ধ

ফাঁকা বাঁধের উপর উঠে এসে নরহরি দেখল নিমতলায় হ্যাজাক জ্বলছে। হলদেটে আলোয় সে দেখল জনাচাবেক মানুষ ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে আসছে লাখুরিয়ার দিকে। হাওয়া এসময় প্রায় দিনই ভারী থাকে। গাং পালানো হাওয়ায় সামান্য শীতের ছোঁয়া থেকেই যায়। নরহরি ঘাড় তুলে তাকায়। রাত খুব একটা হয়নি। জায়গাটা খারাপ বলেই তার ভয় ভয় লাগে। গাঁয়ে চুরি ডাকাতি বেড়েছে। চোর ছ্যাঁচোড়দের উৎপাতে কারোরই যেন শান্তি নেই। কমলাবেড়িয়ার গো-বেপারির হাজার টাকা এখানেই পাক মোড়া দিয়ে কেড়ে নেয় কারা। পরের দিন সকালে মানুষটার কাঠ হয়ে যাওয়া শরীরটা দেখে ছিল সবাই। এসব কথা মনে পড়তেই নরহরি একটু কুঁকড়ে যায়। তখনই কাটা বাঁধের ওখান থেকে হ্যাজাকটা এগিয়ে আসে পিটুলিগাছ অব্দি।

শক্ত হাতে চাম-পুঁটুলি আঁকড়ে নরহরি এক পাশে সরে দাঁড়ায়। বাঁধ এখানে বেশ মোটা। গোরুর গাড়ি গিয়ে জন্মক্ষতের মতো চাকার দাগ। তাড়াহুড়োয় পা হড়কে যায় তার। শরীরের লোম চেগে ওঠে। দ এর জলে তখন কুমড়োর ফালির মতো চাঁদ। ঢেউয়ে ঢেউয়ে সেই চাঁদ নড়ে। বড় বানের সময় ধস নেমে তৈরি হয়েছিল দ। এখন বাঁশডোবা খাদ। ওরই কিছুদূরে সরু প্যাটকা-ক্যানেল, পোদ্দারদের আখের ভুঁই আর মিল কোম্পানির অনাবাদী জমি।

নরহরি আরো কয়েক পা এগোয়। খ্যাংড়াকাঠি বুকটা ঢিগঢিগ করে ভয়ে, ঘন ঘন ঢোক তুলে নিজেকেই দোষী করে সে। একটা ছাগলের ছাল ছাড়াতে এত রাত হয় না কখনো। নিভু বিকেলে আকাশের কোলে কোলে শকুন দেখে ঘর ছেড়েছিল সে। পুঁটুলিতে ছিল চাকু-ক্ষুর আর ঝুলি-ঝাপ্পি। বাঁধে উঠেই 'জয় মা ভাগাড় চণ্ডী' আউড়ে পথ ধরেছিল কমলাবেড়িয়ার। ছাল ছাড়াতে আধঘন্টাও লাগেনি। ফেরার সময় জ্ঞাতি-ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। ওরা না খাইয়ে ছাড়লো না। খাওয়াটাও জমেছিল ভালো কিন্তু আঁধার দেখেই ভয় পেয়েছিল নরহরি। চোখে ছানি পড়েছে বছর পাঁচেক আগেই। বয়েসের ভারে হাঁটতে চলতেও কষ্ট। জোরে কথা বললে বুকটা নড়ে, ঘ্যাসঘ্যাস শব্দ হয়। এ বয়সে খাটা গতরও নেসকে যায়। আরাম খোঁজে। ভগবান তার কপালে আরাম লেখেনি। নইলে সেই সকাল থেকে সন্ধে অব্দি ফুরসত নেবার সময় মেলে না কেন? লোকে তাকে বলে ছিনে জোঁক। কেউ বলে, ওস্তাদ নরহরি। তখন শুনতে ভালো লাগে। পেটে ভাত না থাকলেও খিদে লাগে না। ঝাড়-ফুঁক বাপ-ঠাকুর্দার ব্যবসা। রক্তের মধ্যে দোয়া গুলো ঢুকে গেছে। ঘাড় ঝুঁকিয়ে হাঁটতে থাকে সে। সামনেই লাখুরিয়াব বড় ইস্কুল। আর একটু এগিয়ে যেতে পারলেই ইলেকট্রিক আলো পেয়ে যাবে। এইসব সাতপাঁচ ভেবে জোরে জোরে পা চালায়। মরা

ছাগলের চামড়ার গন্ধ আসে। জল কেটে ভিজে যায় তার বামুনি গামছা, ঘাড় এবং শিরদাঁড়ার বেশ কিছুটা। গুয়েবাবলার ডাল থেকে পেঁচা উড়ে যায় অশোথ গাছে। ভয়ে আবার পেছন ফিরে তাকায় বুড়ো। হ্যাজাকের আলোটা এবার আরো কাছাকাছি। গলার আওয়াজগুলো এবার স্পষ্ট। পেছন থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে সে আরো জোরে জোরে পা ফেলে। ধুলো উড়ে আসে খাটো ধুতির পাড় অব্দি। শ্যাকুল গাছের ঝোড়ে ঝিঁ ঝিঁ ডাকে। জোনাকিগুলো পথ হারিয়ে উড়ে যায়। নরহরি ভয়ে চিৎকার করে ওঠে, 'রক্ষা করো গো মা ভাগাড় চণ্ডী...ঈ.ঈ.ঈ...।'

ভেজা মাটিতে পড়ে গিয়ে ছ্যাঁক করে ওঠে গা। মাথার উপর থেকে ঠিকরে যায় চামড়ার বোঝা। তালগাছের মাথা থেকে বাবুইগুলো ডেকে ওঠে। বাদুড় ডানা ঝাড়ে। ধুলোয় হাত বিছিয়ে চামপুঁটুলি আঁকড়ে ধরে সে। সামনেই জগৎখালির মহাশ্মশান। নলিনীর কলেরায় মরা মেয়েটাকে তিন হাত বালির নিচে পুঁতে দিয়ে গিয়েছিল সে। পরের দিন এসে দেখেছিল শিয়াল-কুকুরে খামচে তুলেছে মেয়েটাকে। বুকে হাত রেখে জলো কলমিলতার মতো কেঁপে যায় নরহরি। ভয়ের জায়গায় ভয়ের কথাই বেশি মনে পড়ে। চামপুঁটুলিটা টেনে আনতে গিয়ে সে দেখে সামনে একটা ছাইবর্ণের কুকুর। চোখ জ্বলছে পশুটার। বুড়ো বুক দিয়ে আঁকড়ে ধরে চাম। পরিশ্রমের ধন সে কাউকেই দেবে না। তিন মাস ধরে ভাগাড় ফাঁকা। পশুদের রোগ কমে মানুষের রোগ বেড়েছে। তাই সময় মতন এখন হাঁড়ি চড়ে না ঘরে। বুড়িকে প্রায়ই উপোস দিতে হয়। বড় খোকা ভাত দেয় না। ভিনো হয়ে টালির ঘর তুলেছে। ফুলোট বাঁশি বাজায় যাত্রাদলে। ওর বউটা মহাহারামি। বাপের নেই পরনে ন্যাকড়া, তার বিটির আবার হাজার ফাঁকড়া দশা। বছর বিইয়ে হাড় জিরজিরে গতর। বড় খোকা যেন কামুক রাজা! চার আনায় তিনটে রবাট ফাটিয়ে বৌ ঠ্যাঙায় গুণধর ছেলে।

তাই কপাল মন্দা বুড়োর। জমিজমা নেই যে চাষ করে খাবে। গুণিন ব্যবসায়ে এখন ভাঁটা। লোকের তেমন বিশ্বেস নেই ঝাঁড় ফুঁকে। এর মধ্যে বুড়ির আবার বুকের দোষ। পঞ্চায়েতে সাহায্য চেয়েছিল। দেয় নি। কেবল শাদা পারা কাগজে কী সব লিখে শীলমোহর মেরে দিয়েছিল প্রধানবাবু। বলেছিল, যা নরো, ভালো কথাই লিখে দিয়েচি। এবার গাঁ ঘুরে ঘুরে এই কাগজ দেখিয়ে ভিখ মাঙ। কেউ তোরে ফিরিয়ে দেবে না—এমন কথাই লিখে দিয়েচি। বলবি, বুকের দোষ, খেতি পারি না...।

তা সেবার মন্দ হয়নি। দু'কুড়ির উপরে। তাই দিয়ে বুড়ির জন্য জীয়োন চ্যাং-ছিঙ্গুড়ি, কাঁচকলা আর একথালা লাল আউশ। সেই কদিন ভাগাড়ের মুখে ছাই দিয়ে আরামে দিন কেটেছে তার। সাঁঝবেলায় কড়িকাঠের উপর থেকে ঝোলানো ঢাকটা পেড়ে এনে বাজিয়ে গেছে, 'তা গুড় গুড় ড়.ড়.ড়...। ধিনাকে ধিনাকে তা গুড় ড়.ড়.ড়। টেঁ টেঁ টেঁ এঁ.এঁ.এঁ. টিনাকে টিনাকে তা গুড়...গুড়। বুড়ি ডাঁটি ভাঙা কাপে এগিয়ে দিয়েছে চা।

এলানো বাঁধের উপর বসে পড়তেই আর যেন উঠে দাঁড়াতে পারে না সে। পায়ে পা জড়িয়ে যায়। মেরুদণ্ড যেন ভেঙে গেছে। এসময় দু'ঢোক লবা দাসের তাড়ি পেটে পড়লেই সে চোঁ-চাঁ জান-বাঁচানো ছুট লাগাতে পারত। লবা দাস এখন তাকে ধারে মাল

দেয় না। চোখের পাতা উল্টে যা তা কথা বলে। আর একবার পেছন দিকে দৃষ্টি ফেরায় সে। দেখে, হ্যাজাক নামিয়ে পাম্প দিচ্ছে ঢ্যাঙা মানুষ। আর একটু পরেই লোকগুলো তাকে ধরে ফেলবে। যদি কু মানুষ হয় তাহলে এক কোপে ধড় এদিক ওদিক। এ সময় বুড়ির কথা মনে পড়ে যায় তার। বুকটা কাতলামাছের মতন খাবি খায়। মদ না খেলে প্রথম দিকে বুকে যন্ত্রণা হোত। রাতটা ধারাল চাকুর মতো কাটত মনটাকে। বুকের কষ্টে ছটফট করত সে। সে সময় মিঠে তেলে রসুন ছেঁচে বুকটা ডলে দিত বুড়ি। সর্বাঙ্গ যেন জুড়িয়ে যেত আরামে! হাড়জিরজিরে বুড়ি তবু নামের বাহার আছে। বাপ-মা তার সাধ করে নাম রেখেছিল সারদা। দশভূজার আটহাত খসে এখন দু'হাতে বাসন মাজার হাজা, ঘা। গোড়ালিতে এই শীতের শেষেও টান, চড়চড়ানি ফাটা। ফাটলে কী হবে? একা একাই যন্ত্রণায় কোঁতাবে বুড়ি। খুব বেশি হলে কুপির তাতে সরষের তেল ফুটিয়ে খড়ের ডগায় এক ফোঁটা দু'ফোঁটা।

নরহরি চামড়ার পুঁটুলিটা বুকের কাছে চেপে ধুলো ছুঁড়ে দেয় কুকুরটার দিকে। ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে আসে কুকুর। বাতাস ফাঁড়িয়ে সে আর্তনাদ করে ওঠে, খেয়ে নিল গো, বাঁচাও-ও-ও-ও।

হ্যাজাক ফেলে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে দুটো মানুষ। নরহরিকে খাড়া করিয়ে বলে, কে, কে তুমি?

নরহরি খনখন করে কাঁদে, আজ্ঞে, আমি দাসের পো নরহরি...। দূরে কোথাও গোরুর গাড়ির ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ হয়। এরই ফাঁকে বুকে বল পেয়ে নিজেকে দাঁড় করিয়ে ফেলে নরহরি। খাটিয়াটার কাছে এগিয়ে গিয়ে শুধোয়, এ যে দেখচি প্রধানবাবু...! তা শুয়ে কেনে? কী হয়েচে...?

—লতায় কেটেচে। জটিলেশ্বরের নিস্তেজ গলা। কথা শুনে চকচকিয়ে ওঠে নরহরির চোখ। এ অঞ্চলে সে-ই একমাত্র নামকরা ওঝা। ভিন গাঁ থেকেও লোক আসে তাকে নিতে। ফলে এক জন্মগত অধিকারে দু'হাত দিয়ে সরিয়ে দেয় বাবুর গায়ের চাদর। বাবুর মিয়ানো মুখটার দিকে তাকিয়ে সতেজ গলায় বলে, লতায় কেটেচে, তা কখুন? গায়ের বর্ণ নজরে পড়েচে কি?

কথা শুনে বিরক্তিতে গজগজ করে জটিলেশ্বর, এ তোমার কেমন ধারা কথা খুড়ো? আঁধারে দুনিয়া কালি। এর মধ্যে কি বর্ণ দেখা যায় সাপের?

জটিলেশ্বরের কথায় কোনো গুরুত্ব দেয় না নরহরি। বামুনি গামছায় বাঁধা চাম-পুঁটুলিটা টেনে আনে কাছে। চামড়ার রস কেটে ভিজে ন্যাতা হয়ে গেছে গামছা। দুর্গন্ধ আসে। ছাগলটা দশাসই ছিল। দেরিতে যাওয়ার জন্য চামটা ক্ষামি করে দিয়েছে শকুনে। তবু এক কুড়ির উপরে বিকোবে। নুন দিয়ে সাফ সুফ করে দেবগ্রামের হাটে নিয়ে যেতে পারলেই হল।

গামছার এককোণে গিঁট দিয়ে বাঁধা আছে চাকু-ক্ষুর, ধার-পাথর, শেকড়-বাকড়, দু'চারটে খালি মাদুলি-তাবিজ। এগুলো সঙ্গে না নিয়ে কোথাও বেরোয় না সে। মানুষের আপদ বিপদের কি শেষ আছে? তাছাড়া নিজেরও তো আলাদা দু'পয়সা আসে। আক্কারার বাজারে

তাই বা মন্দ কিসে।

নরহরি ধীরে ধীরে পুঁটুলি খোলে। তারপর বাবুর মুখের দিকে তাকায়। ভয়ে মানুষ এত কালো হয়ে যায়? এত মুচড়ে পড়ে? কোথা থেকে হাওয়া আসে? শনশন শব্দ হয়। ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ে বাবলা পাতা। মাছ ঘাই দেয় খাদের জলে। শীত-শীত লাগে নরহরির। গায়ের গেঞ্জিটা টেনে নামায়। 'পড়পড়' শব্দ হতেই ভয়ে ছেড়ে দেয় গেঞ্জি। বাবু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। হাড়জ্বলুনি শীতে থাকতে না পেরে বাবুর কাছে গিয়েছিল সে। একটা কম্বল চেয়েছিল। বাবু দেয় নি। অথচ দীন দুঃখীদের বিলোবার জন্য কম্বল এসেছিল সদর থেকে। সেসব কম্বল যারা পেয়েছে তারা অনেকেই শাল গায়ে ঘুরে বেড়ায়। নরহরির এর জন্য কোনো দুঃখ নেই। জলা জায়গায় জল দাঁড়ায়, তেলা মাথায় তেল সবাই দেয়। একথা ওর ঠাকুরদার। নইলে বড় ছেলে এখন ভাত দেয় না তাকে। বিয়ের পরে বাপ-মা পর, শ্বশুর-শাশুড়ি আপন। বৌমা না তো যেন বিচুটির ঝোপ। কথাব তেজে যেন বিছে কামড়ায়। তাই সাত হাত দূরে সরে থাকে ছেলে-বৌয়ের।

বাবু গাঁয়ের মাথা। সব খবর তার কানে ঢোকে। নরহরির তিন মাস ধরে ভাগাড় ফাঁকা। কষ্টেনষ্টে দিন ক্ষয় হচ্ছিল তার। দেশজুড়ে আক্কারা। কোনো কিছুতেই দখল নেবার জো নেই। খুক খুক কাশতে কাশতে সে বলে, এট্টা বিড়ি হবে গো বাবু? বহুক্ষণ লেশা করিনি...।

জটিলেশ্বর হ্যাজাকে পাম্প দেয়। এখন শীতের শেষ। বাবুদের বাসায় এখন ইলেকট্রিক পাখা ঘোরে। একটা গেঞ্জিতেই এ শীত হার মানে। শেষরাতে গায়ে লেপ রাখাই দায়। তবু নরহরি কাঁপতে কাঁপতে বলে, তাহলে এট্টা সিকারেট দিন। মেজাজে গলাটা খোলতাই করি।

জটিলেশ্বর ধুলো হাত ঝেড়ে প্যান্টের পকেট থেকে সিগ্রেট বের করে। নরহরি যেন জীবনে কোনোদিন সিগ্রেট খায়নি, এমনি ভাবে ছোঁ-মেরে কেড়ে নেয় সিগ্রেটটা। হ্যাজাকের মাথায় ঠুসে ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ে। কাশতে কাশতে বলে, তা বাবু, গেছিলাম বহুদূর। শ্মশান পেরিয়ে একেবারে কমলাবেড়িয়ার উত্তুর।

জটিলেশ্বর ঠোঁটটা দাঁতে টিপে ধরে, বকবকানি থামাও দিনি। নইলে—। ধমক খেয়ে চুপসে যায় নরহরি। পরক্ষণে হি হি হেসে ওঠে, রাগ করলেন, ও বাবু রাগ করলেন? জটিলেশ্বর উত্তর দেয় না। তর্জনী উঁচিয়ে শুধু বাবুকে দেখিয়ে দেয়। বিশে মাস্টাব বলে, বাবুরে ভালো করে দাও খুড়ো। তোমার পাড়ায় টিউকল বসিয়ে দেব।

টিউকলের লোভে ধপাস করে মাটি ছোঁয় নরহরি। গায়ের গামছাটা টেনেটুনে হাড় ঢাকে। সুচালো ধূর্ত মুখ চকচকিয়ে ওঠে, সত্যি বলচেন মাস্টুর? বড় কষ্টে আছি গো। পুকুরের জল খেলি পরে বাহ্যি হয়।

দাসপাড়ার কলটার পাইপ তুলে নিয়ে যায় চোরে। ছমাস থেকে কলতলার কাদা শুকিয়ে খটখটে। অঞ্চল অফিস থেকে বলেছে, কল বসবে। এখন সাপ্লাই বন্ধ। তাই দেরি হবে আরো ছমাস। পুরো দাসপাড়া এখন পালপুকুরের জল খায়। নলিনীর মেয়েটা কলেরায়

মারা গেল। মরার আগে দুটো পটল-বিস্কুট চেয়েছিল মেয়েটা। পায় নি। সেদিন বাংলা বন্ধ।

গত ভোটের সময় বাবুরা বড় মুখ করে বলেছিল, এবার তোমাদের ভিটেগুলোর মেরামতির ব্যবস্থা হবে গো দাসের পো। মোটে ভেবো না, ভোটটা যেতে দাও, আউড় দিয়ে ঘরগুলো ছাইয়ে দেব তোমাদের।

পচাটে আউড় আরো পচল। ভোটও খতম। বাবুরা খেল জিতে যে যার শহর পানে চলে গেল। গাঁয়ে অনেক অসুবিধে। এখানে চিকচিকি কাগজে মোড়া সিগ্রেট পাওয়া যায় না, মোটর সাইকেলের পেট্রোল পাওয়া যায় না...আরো কত কী অসুবিধে। রসিয়ে রসিয়ে এসব ব্রহ্মাণীতলায় শুনেছে নরহরি। ছোট খোকা তার বলে ভালো। বড় ঠোঁটকাটা নারাণ। তোড়ের মুখে উগলে যায় সব—যা আসে মুখে, জানো বাপ, বাঁধে নতুন মাটি পড়ার কথা ছিল। সন ঘুরে ফির এট্টা সন এল। মাটি আর পড়লনি। পলাশী-কালীগঞ্জের রাস্তাটা সেই কবে থেকে হোঁক লেগে পড়ে আছে অথচ দেখদিনি গ্রান ফেরাবার কেউ নেই। নারাণের কথা শুনে হো হো হেসে উঠেছিল চা-দোকানী। তার দেখাদেখি বাঁশের মাচায় বসে থাকে জনাছয়েক মুনিষ।

দেখেশুনে নরহরির বুক গর্বে মচমচ করে। ছোট খোকা তার মানুষ হল টাউনে গিয়ে। আট ক্লাস অব্দি পড়েছিল। তারপর কুসঙ্গে পড়ে বিড়ি খাওয়া ধরে। ঘরের চাল-ময়দা নিয়ে গিয়ে বেচে দিত দোকানে। খরাবেলায় কানচল পেড়ে একটা থাপ্পড় কসিয়ে ছিল নারাণকে। ছেলেটার চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে নরহরি বলেছিল, বাপের পরনে গামছা নেই ছেলের আবার বাবুগিরি! যা না বুকে তো লোম গজিয়েচে। চরে খা। খেতি আসলে টেংরি খুলে দেব।

নারাণ আর দাঁড়ায়নি। সে রাতেই একটা দশাসই কাঁসার থালা সের চারেক চাল আর জামা-কাপড় নিয়ে পালিয়ে এসেছিল কলকাতায়। সঙ্গে কুমোরদের পটলা।

—জয় ওস্তাদ কানুখুড়ো। মুখ রেখো বাপ। খাটিয়াতে কপাল ছুঁইয়ে নরহরি খামচে তুলে নেয় মাটি। মরা গাঙের দিকে তাকিয়ে আউড়ে যায়, জয় জয় জগৎ জননী, যম ভয় হর-তারা মা মনসা জননী।

তার হাবভাব দেখে ঘাবড়ে গিয়ে জটিলেশ্বর বলে, বাবুরে ভালো করে দাও খুড়ো, তোমাকে একটা ভেড়ার লোমের কম্বল কিনে দেব।

কথা শুনে দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে হেসে ওঠে বুড়ো, সবই তো বুঝলুম বাবু, কিন্তু লেট হয়ে গেল যে! অতটা সময় কী করলেন আপনারা?

ভজহরির কাছে গেছিলাম।

কী বলল ব্যাটা ভজা?

—বলল, আমি নয়গো। আমি তো 'সি' কেলাস ওঝা। এই জটিল কেসে নরহরি খুড়োর কাছে চলে যাওগে। ওর শেকড়বাকড়ের গুণ ধন্বন্তরি। হাসপাতালও ফেল মারবে ওর ঝাঁড়-ফুঁকে। কথা শুনে বুকের ছাতি বাড়ে তার। সামনে পিছনে ধুলোর গন্ডি কেটে বলে, ঝাড়-ফুঁক মানে কলজে খাঁক করে চেঁচানো। দিনমানে চা মেলে নি। এখুন এট্টু চা

পেলে গলাটা ছাড়ে।

দাঁত মানিক। জটিলেশ্বর রাগে গরগরিয়ে ওঠে, ছাল ছাড়িয়ে হাতে দেব। সনমুখে রোগী দেখে ধ্যাসটুনু। আদেখলা।

—আরে, রাগ করো না দিনি। চা বললেই চা! অমায়িক হাসে সে, আরে ছ্যা, এমনি বলেছি গো। কেনে বলতে নেই?

—আমাকে একটু জল দে মঙ্গল। গলাটা বড্ড শুকায়। প্রধানবাবুর কথায় ভয়ের ছোঁয়া। মঙ্গল মাটির কলসী থেকে জল গড়িয়ে বাবুর সামনে দাঁড়ায়। তর্ক থামিয়ে হায় হায় করে ওঠে বুড়ো, এই বাপ, জল দিবেন নি গো, দিবেন নি। অসময়ে জল দেওয়াটা কি ঠিক?

তাহলে দেবটা কী? মঙ্গলের গলায় রগ ফুলে উঠেছে, আর ভণিতা করে লাভ নেই। এবার ছেড়ে দাও, আমরা হাসপাতালে যাই। হুঁ, আবার ফুটানি করে বলা গাঙে ভাসানো মড়া এনে বাঁচিয়ে দিয়েচি বাবু। মঙ্গলের কথাতে আঘাতের আঁচ ছিল। সেই আঁচকে গায়ে মেখে হাত কচলায় নরহরি, ঘাবড়াবেন নি গো বাবুসকল। যা বলেচি তা চাঁদসূর্যির মতুন সত্যি। না ডাকতেই মায়ের দয়ায় আমায যখন পেয়েছেন তখুন বিষ না নামিয়ে এ বান্দা ফিরবেনি। আপনাদের মা-বাপের ছিচরণের দয়ায় এই নাথুরে অঞ্চলের সব সাপের মুখই আমার চেনা। ব্যাটাদের সাতগুষ্টির খোঁজ এই আমার গ্যাটে। পেছনের মালাইচাকিতে চাটি মেরে এদিক সেদিক তাকায় সে। তার নোলা ঝোলা শরীরের ভেঁটুল চক্ষু ঘুরতে থাকে তখন। মুখটা সুচালো হয়ে যায় ধূর্ত শেয়ালের মতো। একানে-দুকানে চুলগুলোয় আঙালের বিদে দিয়ে বিড়বিড়িয়ে ওঠে সে, সাক্ষী থাকো গো সর্পদেব স্থিতু করি মন,/ সভার শহীদ বন্ধন/ নরপতি বন্ধন বন্ধন গুণিনের পা..। কাতলা মাছের মতো খাবি খেয়ে খটাস মাজা ফোটায় নরহরি। চরুক দাড়িতে ঘনঘন হাত বুলিয়ে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে বাবুর দিকে। ছেঁড়া গেঞ্জিটায় ঢাকা পড়ে উথালি পাথালি খায কলজে। তবু হেঁসুয়ার মতো মাজা বেঁকিয়ে ধুঁকো বকের মতো চেয়ে থাকে বাবুকে। পেটের মধ্যে পাকমোড়া মারে দামি সিগ্রেটের ধোঁয়া। জ্ঞাতিভাইয়ের ঘরে পেট সাঁটিয়ে ফিরছে তবু যেন ক্ষিদে লাগে। ক্ষিদে তার কাছে জানোয়ারের বাচ্চা। পেটের মধ্যে কেবল কুঁই কুঁই বেহায়াপনা। পেট হালকা থাকলে তাই কিছু ভালো লাগে না এ বয়সে। পিত্তি পড়ে গুলিয়ে ওঠে গা। সবাই বলে আক্কারা চলছে গাঁয়ে। কথাটার ওজন আছে। এত আক্কারা বাপের জন্মে দেখেনি। রেশনবাবুর চাল-গম-চিনি সবই ব্ল্যাকে ঝেড়ে দেয়। প্রধানবাবুর সাথে ওনার বিরাট সাট। যাওবা গম-চিনি মেলে তারও আবার ওজন কম। ভেজা চিনি, গুমসা গম।

প্রতিবাদ যে হয় না তা নয়। গর্ব করেই উনারা বলেন, কী করব বলদিনি ভাই। সাপ্লাই তো এমন তরো। সন্দ থাকলে দরখাস্ত লিখো। টিপ ছাপ দাও। সদরে পেঠিয়ে দেব। ইনক্যুয়ারি হবে।

দরখাস্ত সদর অবধি পৌঁছায় না। দেবগ্রামের বিডিও অফিসেই হারিয়ে যায়। নরহরির এখন বয়সের ভারে রক্ত পাতলা। বেশি কথা বললে হাঁফ লাগে, চৈত্রমাসের পশুর মতো দম আটকে আসে।

...মোর গুরু বিষ খায়, বিষ যায়...বিঁযেরে করি পোনাম। বাবুর ক্ষতস্থানে হাত বুলিয়ে কোলাব্যাঙের মতো দু'পাশের গাল ফোলায় সে, স্বর্গের গুরু, মর্ত্যের গুরু কোটি কোটি পোনাম...। ঘাড় ঝুঁকিয়ে আবার ফুঁ দিয়ে খাটিয়া ছোঁয় নরহরি। তার ড্যামা-ড্যামা চোখে, জ্যালজেলে চামড়ায় ঢেকে রাখা কণ্ঠনালিটা বাইরে বেরিয়ে আসে অনেকটা। ঘ্যারঘ্যার গলা খেঁকারি দিয়ে শ্লেষ্মা ফেলে ধূলোয়। একফালি ধূতিতে পেছনের পুরোটা ঢাকে না, জাঙের কাছটায় শির দেখা যায়। ঢোঁড়াসাপ দেখা মুরগি ছায়ের মতো কাঁপতে কাঁপতে সে বলে, চক্ষু খুলুন গো, চেয়ে দেখুন আপনার ছিমুতে কে!

ভয়ে চোখ খুলতে পারে না প্রধানবাবু। তার হাত পা টানটান। কথা বলার শক্তি যেন উবে গিয়েছে। পাথরের মূর্তির মতো চেয়ে থাকে অপলক। নরহরি ঝটকা টান দিয়ে বাবুর পা-টা নিজের বুকের কাছে টেনে নেয়। তার কলেজের হাড়ে বাবুর ধবধবে পা। ক্ষতস্থানের রক্তগুলো মুছে তাতে ছেপ লাগিয়ে থুতু বোলায়। শেষটায় লম্বা ফুঁ দিয়ে আবার টেনে দেয় চামড়া।

যন্ত্রণায় উঃ হুঁ করে ওঠে বাবু। খাটিয়া নড়ে ওঠে। গাঙের দিকে উড়ে যায় রাতপাখি। শ্মশান থেকে ভেসে আসে শেয়ালের ডাক। নরহরির বুকটা কিছুতেই বাগ মানে না। কেবলই ঢেউ ওঠে। আবার ভেঙে তছনছ হয়ে যায় সেই ঢেউ।

দুদিন আগে বাবুর কাছে পাঁচ টাকা কর্জ চেয়েছিল। বাবু দেয় নি। উল্টে সাত কাহন কথা শুনিয়েছে তাকে, শাক-লতা পাতা সেদ্ধ করে খা। আমি কি তোদের চোদ্দগুষ্টির ঠিকে নিয়েছি, অ্যাঁ!

বাবুর মুখে এমন কথা মানায় না। ভোটের আগে এই বাবুর মুখে কত মধু মধু কথা। হেনা দেব, তেনা দেব, সব দেব। শেষ পর্যন্ত ধোঁকা দিল বাবু। এসব ভাবতে ভাবতে নরহরির ঝিমানো শরীর লড়াই-মোরগের মতো ফুঁসে ওঠে। ঝুলি-ঝাপ্পি থেকে বের করে আনে ত্রিকোণার ফল। লালচোখে বাবুর দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে সে। তারপর খনখনে গলায় দরদ মিশিয়ে বলে, কেমড়ে খেয়ে ফেলুন গো। সাপের বিষের মোক্ষম অযুধ। বলতি পারেন অমৃত। দেখবেন, শরীলে কেমুন খুশ আসচে। মনে হবে, বাঁধের উপর ছুটে ছুটে বেড়াই।

চার মানুষ হেলে পড়েছে নরহরির দিকে। ফলটা দেখার জন্য তাদের এত হুড়োহুড়ি। নরহরি দু-হাত বাড়িয়ে শকুনের মতো ঘাড় নাড়ায়, সরে যান দিনি। বাবুরে বাসাৎ ছাড়ুন...। তার হাতের ধাক্কায় পিছিয়ে আসে চারজন। ফলটায় কামড় মারে বাবু, যেন ওই ফল খেলে তিনি সত্যি সত্যিই চাঙ্গা হয়ে উঠবেন। বাবুর মেজাজ বুঝে মুখ খোলে বুড়ো, এ বছরের শুরু থিকে জি. আর-টা কেটে দেলেন বাবু। বড় কষ্টে আছি দিন চলে না।

চারজন মানুষ আবার এগিয়ে আসে চার পা। হাওয়া লেগে দপদপ করে হ্যাজাক। বাবু যেন পিন ফোটানো বেলুন। নরহরির এ সবে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। ছাড়া জলের মতো খলবল করে তার রক্ত। ছোট খোকার কথা মনে পড়ে। বছর খানিক পরেই কলকাতা থেকে গাঁয়ে ফিরে এসেছিল নারাণ। এক বছরে রূপো যেন সোনা হয়ে ফিরল। বুড়ো ধন্দ লাগা চোখে গিলছিল নারাণকে। লম্বা ডিং ডিঙে ছেলে অথচ চোখ দুটোয় আগুনের

ছটা। মিশমিশে কালো চাপ দাড়িতে মুখটা অমাবস্যার বাঁশঝাড়ের মতো ভয়ঙ্কর। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারেনি সে। সেবারই প্রথম হেরে যায় নারানের কাছে। পায়ের ধুলো নিয়ে ছোট খোকা হাসতে হাসতে বলেছিল, কলকাতায় আর যাব নার বাপ। গাঁয়ের কাজেই গাঁয়ে ফিরে এলাম।

ছেলের যে কী কাজ গ্রামে নরহরি সেদিন বুঝতে পারেনি। মাস দেড়েকের মধ্যে সব কিছু স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল তার। আগে সাত চড় মারলে রা কাড়ত না। এখন একটু গরমিল দেখলেই রুখে দাঁড়ায়। অঞ্চল অফিসে দলবল নিয়ে হাজির হয়েছিল নারাণ। ক্ষরিস সাপের ডেঁকার মতো ফুঁসে উঠেছিল নারাণ, শিল্পী লোনের টাকা কোথায়, ওবাবু, জবাব দাও? নইলে চেয়ার উল্টে ফেলে দেব। টাকার বদলে রক্ত নেব।

নারাণটা শহরে গিয়ে রাজনীতিতে ভিড়ে ছিল। পোস্টার মারত, স্টেজ বাঁধত, মাইক বইত আসরের। ভদ্রলোকদের সঙ্গে মিশে রক্ত গরম করা বুলি শিখেছিল মাথা ভর্তি। গ্রামের ফিরেও তার মাথা থেকে সেই ভূত নামেনি। কথা কম বলত। সব সময় যেন ওর ভিতরে ভূমিকম্প। রুটি নিয়ে রাত্রের আঁধারে চলে যেত আখ ক্ষেতে। ফিরে আসত ঘন্টা তিনেক পরে। নরহরি সন্দেহ করে পিছু নিয়েছিল। আখক্ষেতের ভিতরে ঢুকে যা দেখেছিল তা তার সারা জীবনের আপশোষ। বিচুলির উপর চাদর বিছিয়ে শুয়ে আছে ধবধবে ফর্সা দুটো বাবু। নারাণ তাদের রুটি ভাগ করে দিচ্ছে আর হেসে হেসে কথা বলছে। ফেরার পথে সে সরাসরি শুধিয়েছিল নারাণকে 'বল, এ নারাণ বল এ বাবু দুটোর ঘর কুথায়?

এদের কোনো ঘর নেই বাপ। সারা দুনিয়া হচ্ছে এদের ঘর।

তাহলি এখানে কেনে?

গাঁয়ে পাপ ঢুকেছে। পাপ খেদাতেই এনারা এয়েচেন।

ছেলের হেঁয়ালির কথা বুঝতে পারেনি নরহরি। সে জানে, আগুন খেলে অঙ্গার উগলায় মানুষ। বড় খোকা বিয়ে করে হাতছাড়া। ছোটখোকাও যদি হারিয়ে যায় তাহলে সে দাঁড়াবে কোথায়? নরহরির দুবলা হাতটা নারাণকে আঁকড়ে ধরে, মানিক আমার, তুই ছাড়া আমার আর কেউ নেই। ভুল পথে যাসনে বাপ।

কিসের ভুল? মানুষ হয়েচি। দেশের জন্যি, দশের জন্যি কিছু করা দরকার আমার। নইলে মিচিমিচি গতরে মানসো জমিয়ে কী লাভ?

ছেলের কথা শুনে নরহরির হেঁক লেগে যাবার যোগাড় কোনোক্রমে দম নিয়ে বললে, এসব ছাড়। পেটে ভাত না থাকলি কেউ ভুলেও দেখবে নি।

না দেখুক। ভাতের জন্যি কুকুরের মতো বেঁচে থেকে কী লাভ? বাবুরা বলেচে, পথিবীর মাটিতে সবার সমান অধিকার। এবার থেকে অধিকার ছিনিয়ে নিতে হবেক্ষণ। নুনে জোঁকের মতো ধড়পড়িয়ে মরলে কেউ তারে পুছেও দেখবে নি।

সে'রাতে বাড়ি ফিরে ভালো মতন ঘুমোতে পারেনি নরহরি। পরদিন সকালে গাঁ ঘুরতে গিয়ে সে দেখেছিল বড় ইস্কুলের গায়ে আলকাতরার পোঁচ, কাটামাথার ছাপ, ধোমা লেখা আরও কত কী! থানার বড়বাবু জিপ থামিয়ে কথা বলছিল হেডমাস্টারের

সঙ্গে। তাদের পাশে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে ছিল প্রধানবাবু।

সেদিন আর গাঁ ঘুরতে যেতে পারেনি নরহরি। বুকটা ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছিল ভয়ে। ঘরে ফিরে এসে নারাণকে সতর্ক করে দিয়েছিল সে। নারাণ কথা শোনেনি। হাসতে হাসতে বলেছে, কত ফুল ফোটে বাগানে। সব ফুল কি দেবতার সেবায় লাগে বাপ? আমার জন্যি ভেবো না দিনি।

শহরের তোতাবুলি গাঁয়ে-ঘরে ধোপে টেকেনি। আখক্ষেতের লুকানো বাবুরা পুলিশের ভয়ে পালিয়ে যায় সদরে। নারাণ যেন একাই একশ। ছেলেছোকরা জুটিয়ে হাতের মুঠি ফুলিয়ে ইনকিনাব জিন্দাবাদ করছে।

গাঁয়ের বাবু-ভদ্রলোকেরা এই শুনে হাসতে হাসতে বলেছে, মুচির পো'র মন্ত্রী হবার বাসনা গো। সেই যে বলে না, দুদিনের বৈরাগী ভাতেরে কয় অন্ন। হা-হা হা.....।

পঞ্চায়েতের ইজ্জত বাঁচাতে নারাণকে বেধড়ক পেটানো হয় গাবতলায়। নারাণ তাদের হাঁড়ির খবর জানত, ধীরে ধীরে ফাঁস করে দিল সব। বেশি দূর আর এগুতে পারল না বেচারা। মারতে মারতে জটিলেশ্বর বলেছিল, পুঁটিমাছের তড়বড়ানি কমল রে, নারাণ। নিন্দে ছড়াস—বলি তোর বাপের রাজত্ব? বলেই আবার জোড়া পায়ে লাথি।

সাতদিন পরে অফিসের ঘড়ি-চুরি কেসে নারাণকে লটকে থানায় নিয়ে গেল পুলিশ। গাদাগুচ্ছের ছবি বের করে বলেছে, বল এরা কোথায় থাকে? নইলে চুল ছিঁড়ে হাতে দেব।

ভারী বুটের লাথি খেয়েও মুখ খোলেনি নারাণ। ছোট ঘরে আটকে চাপা ঘাই দিয়েছে ভোঁদকা ওসিটা। দাঁত ছিটকে গিয়েছিল শানে, মাথা চুঁইয়ে রক্ত ঝরছিল। তাতেও শান্তি হয়নি ওদের। কংসবধ না হলে কি ঘুম হয় বাবুদের! পানাপুকুরে চুবিয়ে আবার মার। তারপ পাখায় বেঁধে....পানাপুকুর। শেষের দিকে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল নারাণ। জ্ঞান ফিরতেই মুখের রক্ত মুছে বলেছিল, কুত্তার বাচ্চা, তোদের এত লুভ। লে লে খুন লে...। বলেই ছিটিয়ে দিয়েছিল চাপ চাপ রক্ত।

সেই থেকে নারাণের কষ্ট ভোগ আর বুকের দোষ। মোটেই খেতে পারে না ভালো-মন্দ। কাশলে ক্যানেস্তরা পেটানোর শব্দ। দম নিতেই যেন পরাণটা বেরিয়ে যায় কড়াইয়ের ভাজা কইয়ের মতো। বুড়ি আর থাকতে না পেরে হেঁসেলঘরে পরনের কানিতে চোখের জল মোছে, লারাণ, বাপ আমার! কি কুক্ষণে টেউনে গিয়েচিলি বাপ। যা বাবুদের পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে লে...।

বুড়ো বলে, জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে লড়াই ভালো লয়, লারাণ। তুই তোর মায়ের কথায় হ্যাঁ কর বাপ।

না-আ-আ আ...। নারাণের গলার স্বরে বাজ পড়ে। হুঙ্কারে কেঁপে যায় চারদিক। গলা চিরে রক্ত ঝরে।

এসব দেখে নরহরি ঠিক থাকতে পারে না। চোখের সম্মুখে নুনে জোঁকের মতো ছটফট করবে ছেলেটা এ কোন বাপ সয়? তাই সে হাজির হয়েছিল প্রধান বাবুর বাসায়, বাবুগো, এট্টু দয়া করো বাবু। ছেলে আমার রক্তের তেজে ধরা কে সরাজ্ঞান করে—তা বলি,

বাবু, আমি তো ঠিক আচি। এই আপনার ছিচরণের দাসানুদাস।

বাবু বলেছিল, ঠিক আচে, শুধু তোর মুখ চেয়ে আমি এম. এল. এ-র কাছে চিঠি লিখে দিচ্ছি। কিন্তু সাবধান, আর যেন সাপের গায়ে পা না দেয় তোর ব্যাটা।

সুপারিশের চিঠিটা হাতে নিয়ে এম. এল. বলেছিল, এখন হাসপাতালে ভিড়। মেলা বসেছে। ঘরে ঘরেই তো বুকের রোগ, তার উপরে তোমার আবার এই দুর্ভোগ।

ভাবতে ভাবতে ঘাড় ঝুঁকিয়ে বাবুর পায়ের বাঁধন খুলে দেয় নরহরি। তারপর ঢ্যাঙা চারজন মানুষের দিকে বালক চোখে তাকিয়ে হেসে ওঠে। তখনই পেঁচাটা ইঁদুর ধরতে না পেরে ফিরে আসে গুয়োবাবলার ডালে। তারপর কর্কশ ডেকে ওঠে। জমাট রাত পুরোনো গেঞ্জির মতো ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়। নরহরির গলা নিস্তেজ হয়ে আসে ঠান্ডা হাওয়ায়। কোনোক্রমে ধুঁকতে ধুঁকতে বলে, ভয় পাবেন নি গো বাবুসকল! এ আমার হাতের খেল, ওস্তাদ কানুখুড়োর ছিচরণের দয়া। বয়স আমার কম হযনি। তা তিন কুড়ি তিন। সেই ন্যাংটো কাল থিকে বিষ ঝাড়ছি সাপের, তখুন আপনারা জন্মান নি। বিশ্বেস না হয় শুধোবেন বাপ-মাকে।

তিরতিরে বাতাসে হ্যাজাক কাঁপে। কালো রাতের কপাল ফুঁড়ে দু-চারটে তারা। মাঠবাবলার ডাল থেকে রাতচরা পাখিদের ডানা ঝাড়ার শব্দ আসে। হাওয়া বয় শনশন। সাহেবমাঠের পেয়াদার গলা শোনা যায় আবার। মাছ ঘাই দেয় পাশের ডোবায়। হ্যাজাকে পাম্প দেয় জটিলেশ্বর। বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে ফ্যাকাশে হাসে নরহরি। আমসি মুখে ভয় পেয়ে নরহরির হাতটা বুকের কাছে চেপে ধরে বাবু, তোদের জি. আর দেব, চাল দেব। ও নরো, আমারে তুই ভালো করে দে....।

বাবুর গলায় আকুতি শুনে খ্যা-খ্যা করে হেসে ওঠে বুড়ো। তার ঘেয়ো মাড়ি থেকে দুর্গন্ধ ছোটে। থুতু ছিটিয়ে যায় এদিক সেদিক। হাতের তালুতে মুখ মুছে গোল গোল চোখে বাবুকে দেখে। দেখতে দেখতে থেমে যায় সে। কন্ঠনালীটা ওঠা- নামা করে। হাতের পেশিগুলো শক্ত হয়। পায়ের চেটোয় ধুলো সরিয়ে ঘাড় দাবিয়ে দাঁড়ায়।

শীত না ফুরোতেই নারাণটা মারা গেলে কাশতে কাশতে। মুখের রক্ত ভিটেয় উগলে সে বলেছিল, বাপরে, দুঃখ লিবি নে। আমার খুনের শেকড় ছড়াবে বহুৎ দূর। তারপর, সিখান থেকে এট্টা গাছ হবে। গাছটায় ফুল হবে, ফল হবে।...সড়কিটায় ধার দিয়ে রাখিস। বাবুরা বলেচেন, অস্ত্রে যেন মরচে না পড়ে।

নারাণের মৃত্যু নিয়ে বোলান বাঁধল দাসপাড়ায়। হ্যাজাকের নিভু নিভু আলোয় শ'পাঁচেক লোকের সামনে তারা গাইল, 'হায় হায় নারাণ./রক্ত ঝরে হল কাঁড়ান(প্রথম চাষ)!/কুথায় রইলি ফোটা জবা ফুল?/চাঁদ ওঠে, ফুল ফোটে—বুঝতে পারি ভুল।'

ছোট খোকার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সদর থেকে দুটো বাবু আসে রাতের বাসে। বাস থেকে নেমে তারা সোজা চলে যায় দাসপাড়ায়। নারাণের জন্মটিপির উপর দাঁড়িয়ে তারা দু দন্ড কথা বলে না। যাবার সময় একটা শ-টাকার নোট তারা নরহরির হাতে ধরিয়ে দিয়ে গর্জে ওঠে আপনারা শক্ত হোন। নারায়ণ দেশের জন্য প্রাণ দিল। যারা ওর জীবন নিল তাদের কাছে নারায়ণের প্রতিটি রক্তবিন্দুর হিসাব বুঝে নেব আমরা।

কথা শেষ করে ওরা আর বেশিক্ষণ দাঁড়ায়নি। সেই রাতেই সোজা চলে আসে ব্রহ্মাণীতলায়। তারপর পাকা সড়ক ধরে হাঁটতে হাঁটতে সটান দেবগ্রাম। পরদিন সকালে কেউ আর তাদের দেখেনি। কিন্তু খবরটা থানা অব্দি পৌঁছে যায়। পুলিশ এসে তল্লাশি চালায় নরহরির কুঁড়ে ঘরে। বুড়ি তখন ঘরে ছিল না। বুড়ো গিয়েছিল গাঁ-ঘুরনে। এসে দেখে, চালের হাঁড়ি ভাঙা, ঢাকের তালা ফাঁসানো, হ্যারিকেন উল্টে পড়েছে মেঝেয়। ছড়ানো খেসারির ডালগুলো খুঁটে খাচ্ছে শালিক-চড়ুই।

বেনেমাঠের পেয়াদাটা হাঁক দিয়ে যায় আবার । বাতাসে তার কঠিন গলা। নরহরির চোখটা প্রধানবাবুর চোখের দিকে তাকিয়ে থরথর করে জলে। চোখের নিচের আলগা মাংসগুলো কাটা পাঁঠার মেটের মত নড়ে। হাতের উল্টো পিঠে জল মুছে ভাঙা গলায় সে বলে, ভয় পাবেন নি গো বাবুসকল, এমুন ধারা বেপদ তো হয়েই থাকে। মানুষ কামড়ালেই বিষ হয় আর ও তো বিষধর সাপ। কথা ফুরিয়ে নরহরি ঘনঘন দম নেয়, আপনার খোকাটার বয়েসী গো আমার ছোট খোকাটা। কচি হাড়ে বাবুদের লাথি সহ্যি হলনি। নারাণ আমার চলে গেল, আর এল নি।

চারজন মানুষের চোয়াল শক্ত হয়। তারা একে অন্যের মুখ চায়। আসলে ভয়। ওদের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করেই দু'হাতের মুঠোয় ধুলো তুলে নেয় নরহরি। তার ঠোঁটের কোনে কষ্টের ভাঙচুর। হাত দুটো শুন্যে তুলে আকাশমুখো ছুঁড়ে দেয় সেই ধুলো। তারপর শ্মশানের দিকে মুখ করে চেঁচায়, উঁচু কপাল বেহুলা তুর চিকন চিকন দাঁত—/অকালে খাওয়ালি পতি না পোহাল রাত।/ বেহুলা তুর বুকের ভেতর সর্প করে বাস,/ সেই সর্প ধরে আন বিটি না হলে সর্বনাশ।

ধীরে ধীরে ঘাড় শক্ত হয়ে যায় বাবুর। চোখের মণি দুটোও স্থির। নরহরির মুখ থেকে অনর্গল বেরিয়ে যায় মন্ত্রধ্বনি। জগতখালির বাতাস ভারি হয়ে ওঠে মুহুর্তে। শ্বেতকচার ডাল থেকে শিশির পড়ে টুপটুপিয়ে।

ও বাবু, কথা বুলন। বলি, আপনার কি ঘুম ঘুম লাগে? শরীলে কি বিদনা হয়, ম্যাজম্যাজ করে গা গতর? বাবুর ঘোর লাগা চোখের দিকে তাকিয়ে ভড়কে যায় নরহরি। হাতের তালুতে তালু ঘষে গরম করে গা। বাবু তবু নিরুত্তর। অগত্যা গামছায় গিঁট দিয়ে সেই গিঁট ছুড়ে মারে বাবুর মাথায়। মুখভর্তি মন্ত্র আউড়ে ফুঁ দেয় ঘনঘন, চিয়েন ফেরা, চিয়েন ফেরা। মারে মা, পদ ধরি দে ক্ষেমা।

নরহরির খালি মনে হয়, কোনো শত্রুতে বাবুর মাথায় চিঁইয়ে দিয়েছে দুধ, ক্ষরিস, আল-ক্ষরিস আর শঙ্খ-ক্ষরিসের বিষ। তারই কোপে যেন নীল হয়ে যাচ্ছে বাবুর গা-গতর। বাবুর বড় বাঁচার ইচ্ছে। বাবুকে বাঁচাতেই হবে। তাই ক্ষণে ক্ষণে মন্ত্র বমি করে নরহরি। বাবু নড়ে না, চড়ে না। শুধু ছোট খোকা এসে তোলপাড় করে দেয় নরহরির মন। ওলোট-পালট হয়ে যায় তার জানা মন্ত্র। রামযাত্রায় ফিমেল পাঠ করত ছেলেটা। কখনো সখনো আলখাল্লা পরে বিবেক। .... শোন বাঙালি চোখ মেলে চা, সামনে ভীষণ খাদ।

চারজন মানুষ নিচু গলায় কথা বলে। মনের ভেতর সন্দেহ কিংবা ষড়যন্ত্র! নরহরি

আর থাকতে পারে না। কোথায় যেন কষ্ট হয়। ডিগডিগ করে শরীর, মন। একটা পচাড়ে শ্যাকুলকাঁটা যেন মনের বাদাড়ে ঢুকে গিয়ে আর বেরোয় না। চোখ মুদলেই ছোটখোকার মরা মুখ ভেসে ওঠে। মোটা হোঁদকা ওসি দাঁড়িয়ে থাকে রুল হাতে। থানার মেঝেয় ছটফট করে নারাণ। জোড়া বুকের লাথি না সইতে পেরে মচমচ করছে তার বুক।

এ নারাণ ,তুই আমারে ক্ষমা দে। চুল চেপে ধরে সব ভুলে থাকতে চায় নরহরি। পারে না। তার গলা শুকিয়ে চড়চড় করে। কপালটা সিঁটকে যায় রেখায় রেখায়। চোখের নিচে থলথলে মাংসে যেন পিঁপড়ে হেঁটে বেড়ায়। বাবুর রক্তনীল মুখটাকে আলতো তুলে নিয়ে বিড়বিড়িয়ে ওঠে নরহরি, অষ্টনাগ, নয় বোড়া। ষোল চিতে, বার বিছে।/ কোন চিতে? / আলাই চিতে, শাঁখ চিতে। বেড়া চিতে, নোনা চিতে/....কি সাপে কামড়াইল বাছারে আমার, মা বলিয়া ডাকিতে দিল না!

কুকুরটা হাড়মুখে গড়াগড়ি খায় ধুলোয়। চারজন মানুষ ভয় পাওয়া গলায় বলে, হেই, হেট হেট.....।

ওদিক থেকে মহাদেব হাসে, বিষ ভেসে ভেসে কান্না আসে।/কার আজ্ঞায়?/ ঈশ্বর মহাদেবের আজ্ঞায়।' নরহরির দু'হাত বাবুর কণ্ঠনালী ছুঁয়েছে। দশ আঙুলের বজ্রগেরোয় বাবুর নীলচে শরীর ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে সে নারাণ হয়ে যায় মুহূর্তে।

খরা

ঘর ছাড়িয়ে পাকুড়তলায় আসতেই হাঁপু ধরে পেলার।

বয়সের কামড়ে গা-গতর শুকনো লাউ জালির মত ন্যাসকানো, গালের চামড়া ঝুলে তোবড়ানো মুখটা এবড়ো খেবড়ো চষা জমিন। তার মধ্যে ফাঁকা ভুরু। হাসলে কপালের চামড়াগুলো কুঁচকে গিয়ে লতলতে কেঁচো।

পাক্কা ছ'ফুট ঢ্যাঙ্গা গতর। তিনকুড়িতে মাজা ভেঙ্গে ত্রিভঙ্গ দশা। ডান হাতের দুবলা আঙ্গুল সব সময় আঁকড়ে থাকে তেল কুচকুচে পাকা বাঁশের লাঠি। বাঁ হাতের বার্মণি গামছায় বাঁধা আছে চাকু-ক্ষুর-পাথর-চকমকি-পোড়াশোলা-শেকড়-বাকড়, মাদুলি-তাবিজ লাল-সুতো-মোম-মা কালির স্বপ্নে পাওয়া ফুল-বিড়ি-শুয়োরের হাড়....আবো কত কি।

পরনের ধুতিটায় মালাইচাকি উদোম, গা লেপ্টে নেতিয়ে আছে ফাটাফুটো গেঞ্জি। কানা বকের মত চেহারা নিয়ে শ্বাস নেয় পেলা। খটখটে ধরীত্রির ভ্যাপ্‌সা আর গুমোট গন্ধ ছাড়া চারদিকে আর কিছু নেই। পরাণটা কাটা শিম লতার মত ঝিমিয়ে যায়। আহারে, কতদিন বরষা ঝরেনি! একমাস,...দু'মাস... তারো বেশি। গাছের পাতা মরাটে, রোদে ঝলসান দশা। হাওয়া উঠলেই কুচুটে চামড়া পোড়া ঘ্রাণ। আর মানুষগুলোর ছিরি কি? পচা পাঁকের চেয়েও বিচ্ছিরি, কালো কালো। তামাটে রং চটা হাড় জাগানো শরীল, দরকচা নয়ত পোড়া পোড়া...।

পাকুড়তলা থেকে দাসপাড়ার কালীমন্দিরটা দেখা যায়। ঘর থেকে বেরিয়ে ওখানে সাটপাট হয়ে দন্ডবৎ করেছে পেলা। এটা তার নিত্যকার অভ্যাস। মন্দিরের ঠিক পাশেই ঘেনুমাতব্বরের ঘর। পেলার সাথে দা-কুমড়ো সম্বন্ধ। ঘেনু এবার পঞ্চায়েতী ভোটে দাঁড়িয়েছিল। জ্ঞাতিভাই বলে ভোট দিয়েছে পেলা। ঘেনু জিতেছে। জেতার পর লেজ ভারী হয়ে গিয়েছে ওর। ছুঁতোনাতায় পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করে। অথচ ঘেনুটা তার বড় খোকার বয়েসী। ওর বিয়েতে মৌগাঁ গিয়ে শুয়োর মেরে তাড়ি খেয়ে এসেছে। এখন পেলাকে দেখলে অন্য রাস্তা ধরে ঘেনু। সক্কলের কাছে বলেছে, পেলার মত হারামী নাকি দাসপাড়ায় কেউ নেই। ভাগাড়ে গোরু পড়লে পেলার চোখ আর ঘ্রাণশক্তি নাকি শকুনের চেয়েও উগ্র।

তা ঘেনুর কথাই সত্যি। পেলার ভরসা বলতে ঐ সবেধন নীলমণি ভাগাড়। বাপ-ঠাকুরদার আগলে রাখা ভাগাড়। অথচ ঘেনু বলে, ভাগাড় কারোর একার নয়। ভাগাড় সবার। যে আগে যাবে তার চাম। পেলা অনেক যুক্তি দেখিয়েছে। ঘেনু ওর কথা শোনে নি, তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে। পেলার মতে, ভাগাড় তো একটা নয়। ভাগাড় অনেক। চাম-কাটার মানুষ তো মাত্র ক'জন, হাতে গোনা যায়। এর মধ্যে ঝগড়া-কাজিয়া কি

ভাল দেখায়? ভদ্রলোকেরা হাসে। বলে, ছোটলোকের মরণ!

ঘেনু এসব শোনার ছেলে নয়। সে বলে, বুঝলে খুড়ো, জোর যার মুলুক তার। মোরে বাধা দিতে এসোনি। জানে মারা পড়বা।

মনে অশান্তি তাই মা কালীর কাছে ধর্ণা।

—মারে, এসব ঝুট-ঝামেলা ভাল করে দে মা। ওর জন্যি কোন্ দিন মোর জানটাই তপড়িয়ে বেরিয়ে যাবে। অশ্বত্থতলায় বসে ভাবতে ভাবতে বিড়ি ধরায় পেলা। বুকটায় হুঁক হুঁক করে কাশি। টেঁপামাছের মত দম নেয়। যৌবনে হাঁপানীর ব্যামো ছিল। এখনো আছে। এ হাঁপানী সারবার নয়, একেবারে চিতেয় উঠবে।

দু'আঙ্গুলের ফাঁকে বিড়িটা পুরে সুখে টান দেয় সে। দমকে দমকে কাশি ওঠে আবার। ঘ্যার ঘ্যার শব্দ হয় গলার ভেতর। গাওয়া ঘি শ্লেষ্মাগুলো হড়হড়িয়ে নেমে আসে মুখে। মুখ থেকে থু করে কচার ঝোপে।

বয়স তো কম হলো না। মেঘে মেঘে বেলা সটকে গেছে বহু দূর। তবু এখনো তাকে গাঁ -ঘুরতে যেতে হয়। না গেলে পেট মরবে। বিনা অন্নে কিভাবে বাঁচবে সে? আগে তার সব ছিল। এখন কিছু নেই। ভাসিয়ে দেওয়া প্রতিমার খড়কুটোর মত কেবল কথা আর ঘটনা পড়ে আছে। তা ভাঙ্গিয়ে পেট চলে না। তাই হর-রোজই গাঁ ঘুরতে যেতে হয় তাকে। ছেলে দুটো মানুষ হয়েও ভাত দিল না। চওড়া ছাতি ফুলিয়ে ভিনো হয়ে গেল তারা। বুকের পাঁজরা খসে গিয়েছে দুটো। ছেলে না তো জাত সাপ। অমন ছেলেকে আঁতুড় ঘরে নুন খাইয়ে মেরে ফেললেও পাপ হোত না তার।

রোদ ফোটে বাঁশবাগান আর আমবাগানের ফাঁক-ফোকরে। গোরু-মোষগুলো দল বেঁধে চরতে বেরল মাঠে। পেলার আর বসে থাকতে মন সায় দেয় না। হাত ভর্তি কাজ। দুপুরের আগে সব সেরে ফেলতে হবে তাকে। নইলে ঝামেলা বাড়বে বই কমবে না। পেলা উঠে দাঁড়ায়। হাওয়া ছুটছে, ধুলো উড়ছে। যেন হাওয়ার সাথে ধুলো হাডুডু খেলছে সাত সকালে। পাশের আইশ্যাওড়া ঝোঁপে লাফিয়ে লাফিয়ে পোকা খুঁটছে ক্যাচকেঁচি আর হাঁড়িচাচা পাখি। পেলা উপর দিকে মুখ তোলে। একটা লেংটো আকাশ। শূন্য, ধূ-ধূ। তার মধ্যে রোদের ইলবিল কিলবিল আঁচ। যেন কোটি কোটি ক্ষরিস সাপের ছা উগলে দিচ্ছে নির্দয় দেবতা...।

পেলার গলাটাও এই সাত সকালে শুকিয়ে ওঠে। আসার সময় বুড়ি লাল চা করে দিয়েছিল। চা না খেলে এখন আর প্রাকৃতিক কম্মোগুলো ঠিক-ঠাক হয় না। শরীরটা চিমড়ে থাকে। চায়ের সাথে টা-নেই। দুটো বাসি রুটি ছিল। খেলেও খেতে পারত সে। কিন্তু খায়নি। বুড়িকে দিয়ে দিয়েছে। বাসি রুটি খেলে চুয়া-ঢেকুর ওঠে, অম্বল হয় তার।

চাপড়ার দিকে তাকিয়ে মুখটা বারবার নড়ায় পেলা। চাপড়া তার কাছে নেশার গাঁ। ট্যাকে পয়সা থাকলেই ঘাড়ে গামছা ফেলে তাড়ির খোঁজে সে চলে যায় পাশের গাঁটাতে। পেট পুরে সাটিয়ে আসে সের খানেক রস। দুনিয়াতে সস্তা বলতে এখন ঐ একটা জিনিসই। পেলা বড় বড় চোখ করে তাকায়। বাঁশবাগানের ছায়া চুবানো পথ ধরে কে যেন আসছে হাত নাড়িয়ে। কাঁধে বাঁক। বাঁকের দু'দিকে রসের ঠিলি। পেলা আরও খাড়া হয়, যেন

বুড়ো আঙ্গুলে দাঁড়াতে পারলেই শান্তি। নজরে ভাল আসেনা, ঝাপসা লাগে। পুরো বাঁক কাঁধে তারিণী পাকুড় তলার কাছে আসতেই পেলা লাঠিতে ভর দিয়ে সম্মুখে দাঁড়ায়। কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে বলে, কেমন আচিস, হ্যা লা তারিণী?

—ভাল নেই গো, কত্তা। আড় চোখে তাকিয়ে জবাব দেয় তারিণী। তার মনের ভেতর সন্দেহের পোকা নড়ে-চড়ে।

— কেনরে, তুর আবার হলোটা কি বলদিনি?

তারিণী কথা বলে না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। চাম-এঁটুলির মত পেলার গায়ে পড়া স্বভাব তার ভাল লাগে না।

—পথ ছাড় গো, কত্তা। রস গেঁজে উঠছে। লেট হলি পরে মুটে খদ্দের পাবনি...।

তারিণীর অবহেলায় পেলা খানিকটা মনমরা। আজকাল সবাই তাকে এড়িয়ে চলতে চায়। আসলে পয়সা-কড়ি না থাকলে জগত আঁধার। নিজের ছেলেও পর হয়ে যায়। রস ঠিলি দুটোর দিকে তাকিয়ে পেলা আর ধানাই পানাই করে না. মনের কথা ফাটা শিমূল তুলোর মত ছড়িয়ে দেয়, আধা সের রস দে না বাপ। গলাটা এট্টু ভেজাই। বহুৎ দিন নিশা করি নি রে!

তারিণী খেঁকিয়ে ওঠে না, নরম গলায় বিরক্তিটা শুইয়ে রাখে শুধু, মাফ করো গো, খুড়ো। পারবুনি। সকালবেলায় ধারে তাড়ি বেচতে বৌ মানা করেচে। ধারে বেচলে সাট খারাপ। মুটে খদ্দের জুটে না।

মহাফ্যাসাদে পড়ে পেলা। বুড়ো জিভের নোলাটা খুঁচিয়ে তুলেছে তাকে। অগত্যা ট্যাকের কাছটায় হাত চলে যায়। খুঁজে খুঁজে সিকিটা বের করে এনে তারিণীর সামনে ধরে, কিরে, ইবার দিবিনে?

তারিণী নিরুত্তর। পেলা আরো ঘন হয়ে দাঁড়ায়।

—চাঁদির জুতো বুঝিস, বাপ? চাঁদির জুতোয় সব মুখ অমন ধারা কেলসিয়ে যায়! দে দে, আর মিলা দেরী করিস নে! গাঁ ঘুরতি যেতে হবে যে!

বশীকরণের ছুকরির মত কালভার্টায় উঠে আসে তারিণী। ঠিলির মুখে গামছা বেঁধে রস ঢালে।

একগ্লাস—দু'গ্লাস—তিনগ্লাস।

রসের কথা ভেবে নয়, পেলার শরীরের কথা ভেবে তারিণী বড় ভয় পায়।

—আর খেয়ো নাগো কত্তা। শেষটায় গাঁ ঘুরতি যেতি পারবা না।

—তোরে বলেচে! হেঁউ করে ঢেকুর তুলে আবার খালি গ্লাসটা সামনে বাড়িয়ে দেয় পেলা। রস ছাড়া কি আর খাবো, বাপ? চাল চার টাকা। গুম আড়াই টাকা। শ'গেরাম সরষের তেল দু'টাকা। তারিণী সায় দেয়. হুঁ। ঠিক বলেচো। খরাতে ধরা শুকিয়ে সুপ্‌রি। ধানচারা গুলান সব কেল্‌সে গেল। শ্যালো মেসিনে জল তুলতে পারচে না। লেয়ার কমে এয়েচে। কামারী গাঁয়ে পাটের ভুঁই সব এখন একাণে দুকাণে। কথাটা বলতে গিয়ে তারিণীর গলাটা ভেজা ভেজা লাগে, জানো কত্তা, মানুষে নাকি কচু শাক খেতি ধরেচে। সজনেগাছে আর মুটে পাতা নেই। মানুষই শুয়োপোকা। আর খাবেনি কেনে, গাঁয়ে কি

কাজ আচে? সব কেস্‌নগর রাণাঘাট পেলিয়ে যাচ্চে কাজের খোঁজে।

—তা, কেস্‌নগর কতদূর? তারিণীর দিকে জুলুজুলু তাকিয়ে পেলা যেন নেহাৎই ছেলে-মানুষ, দে-এ-এ। আর এক গিলাস দে বাপ। মনের আশ মিটিয়ে খেয়ে লিই। বেশী দিন তো আর বাঁচবো নি-ই-ই।

—বয়স কত হলো গো কত্তা?

—তা বড় বানে জম্মেচি। তাপ্পর দুটো বান, চারটে খরা, এট্টা আকাল পেরিয়ে গেল। এখুনো দুটো দাঁত পড়েনি। মান্‌সো চিবিয়ে খেতি পারি।

সকালের মিনিবাস গোঁ-গোঁ শব্দে ছুটে যায়। দু'পাশের টালিখোলার ধুলো-বালি তার পিছু পিছু। চলতে গিয়ে পেলা টের পায় তার পা টলছে। মাথার উপর রাক্ষুসী আকাশটা যেন ভেঙ্গে পড়েছে।। সকালবেলায় মাথা ধরা লক্ষণটা তার ভাল ঠেকে না। ডাক্তারের কথায় হাসি পায় পেলার। সে জানে, পাশ করা ডাক্তাররা বড় বড় কথা, সুঁচ ফুটিয়ে রোগ ভাল করার ধান্দায় থাকে। সে নিজেও তো ডাক্তার হ্যাঁ, ডাক্তারই তো! গুণিন কি ডাক্তার নয়? দু'আঙ্গুলে কপাল টিপে ঝিম ধরে দাঁড়িয়ে থাকে সে। নিজেকে ভরাট কাঁঠালগাছের পাকা পোক্ত গুঁড়ি মনে হয়।

সকালে ব্রহ্মাণীতলার চেহারাটা ঘেয়ো রোগীর মত ঘিনঘিনে। কাঁচা রাস্তার গা ঘেঁষে অঞ্চল অফিস। সেখানে সাপের লেজের মত সরু লাইন। গাঁ ভেঙ্গে শ-শ' মানুষ এসেছে রিলিফ নিতে। কাল রেড়িওতে বলেছে, নদীয়া মুর্শিদাবাদ খরায় জ্বলছে। রিলিফ দেওয়া হবে। দেখে শুনে পেলার আর পা সরে না। কি হবে গাঁ ঘুরে? তার চেয়ে রিলিফের লাইন দেওয়াই ঢের ভাল। চা-দোকানের পাশে এসে পেলা কি করবে ঠিক করে উঠতে পারে না। একবার ভাবে ঘরে ফিরে যাবে। বুড়িকে সংবাদটা দিয়ে আসতে পারলেই যেন নিশ্চিন্ত। মেরে কেটে সের দুই আতপ চাল, চাইকি সের খানিক ঘরে আসতে পারে। লোভটা তাকে বড় বিমনা করে দেয়। ঠিক তখনই কাঁচা রাস্তার ওপিঠ থেকে অঞ্চলপ্রধান সরে এসে তার সামনে দাঁড়ায়। গলায় ব্যস্ততা ফুটিয়ে বলে, 'এট্টু আমার দোরে যেতি হবে রে, পেলা। ঘরে তেন মাসের খোকাটা ভয় পেয়েচে। রাতে শুয়ে কেবলই লেফিয়ে লেফিয়ে উঠচে আর দুধ উগ্‌লাচে। এট্টু ফুঁ দিয়ে আসলি পরে ভাল হয়। নিঃশ্বাসে কথা ফুরিয়ে জনুবাবু সিগ্রেট ধরায়, লম্বা টান দিয়ে বলে, ঘোর অকাল দেখিদিনি, সকাল সকাল কত মানুষ এগাঁ সেগাঁ থেকে ছুটে আসছে দুটো গমের আশায়। তা এত গম কমনে পাব? বিডিও অফিস থেকে বলচে, গম সাপ্‌লাই আর হবেনি। যা হবার সব হয়ে গিয়েচে।

জনুবাবুর কথা ভাল লাগছে না। লোকটা সুবিধের নয়। কাজের বেলায় তোষামদি, কাজ ফুরোলেই লাল চোখ। তবু পেলা বিনীত গলায় বলে, আজ্ঞে বাবু, ও দিনের বেলায় ফুঁ দিলে চলবেনি?

প্রধানবাবু মুখ ফুটিয়ে কিছু বলে না; শুধু কপালের শিরাগুলো কুঁচকে যায় বিরক্তিতে। পেলা দাঁড়িয়ে আছে।খরার বাজারে বিনি পয়সায় কোন কাজ হয় না। সেবার প্রধানবাবুর হালের বলদটা পাতলা ছের-এ মরমর। পেলার ঝাড়-ফুঁক জল পোড়া আর শিকড়-বাকড়ে বাহ্যি একেবারে টাইট। বলদ এখন হাল বয়। গাড়ী টানে। পেলা কেবল দক্ষিণেটাই

পেল না। অন্য কেউ হলে তক্কাতর্কি করত। পাঁচ টাকার কমে গুণিন বিদায় নিত না।

পেলাকে চুপচাপ দেখে জনুবাবু বলে, রিলিফের জন্যি ভাবিস নে। গম আসলে দু' সের তোর ঘরেও চৌকিদার দে আসবে। হ্যাঁ রে, চা খাবি?

—না।

—বিড়ি?

—আজ্ঞে, আপনার ছিমুতে নেশা করতি বিবেকে বাধে....।

—তাহলে?

—তাহলে গুমটা পেঠিয়ে দেবেন। ওবেলায় গিয়ে ফুঁ-দিয়ে আসব। গুণিনের দক্ষিণে না দেলে শিকড়বাকড়ে কাজ হয় না।

জোঁকের মুখে নুন ছুঁড়ে দিয়েছে পেলা, জনুবাবু মুখ ফাঁক করে খরাণীর কাৎলার মত দম নেয়। যুগটার হলো কি? ছোট লোকগুলোর বাড়বাড়ন্ত দেখ। কথার কি ছিরি? ঘ্যানঘ্যানিয়ে ওঠে জনুবাবুর শরীর। পেলা আর দাঁড়ায় না। তার অনেক কাজ। বুনোপাড়ায় যাওয়ার আগে ভাগাড়টা দেখে যেতে হবে। শেষবেলায় কাল শকুন উড়ছিল। আজও উড়ছে। মনে হয়, ভাগাড় চন্ডী মুখ তুলে চেয়েছেন।

ব্যস্ত হাতে লাঠি আঁকড়ে সে ডান পা বাড়িয়ে দেয় সামনে। গোড়ালী ফাটা পায়ের মধ্যে ধুলো বোঝাই। আজকাল মোটে সে সময় পায় না নইলে ফাটা চামড়াগুলো কুঁচো ছিটের মত কেটে বাদ দিতে পারত। তা যখন হবার নয় তখন আফশোষ করে কি লাভ?

পেলা হাঁটছে। বড় সড়কের উপর তার হাতের লাঠির খটাসখটাস শব্দ। নোয়ানো ছায়া পড়ছে পথে। মাথার ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছে তালরস। বড় কড়া জিনিস। বুকের কাছটায় মুচড়ে মুচড়ে নেমেছে। টলানো পা, পেলা তবু হাঁটছে.....।

গাঁ-ঘুরোন তার বংশগত অধিকার। যতদিন শ্বাস আছে ততদিন এ অধিকার সে কাউকেই দেবে না। নিলামে আটকে রাখবে ভাগাড়। ভাগাড় হাতছাড়া হলে খাবে কি? ঝাঁড়-ফুঁক, তুক-তাক, তাবিজ-মাদুলি, শেকড়-বাকড় জল-পোড়া, ভুত-খেদানো, ভয় ছাড়ানো—এসব বিদ্যের ক্ষয় নেই। কাঁচা পয়সা আসে। বাপ রাত জেগে জেগে এসব বিদ্যে শিখিয়ে গেছে। মরা বাপের অমর্যদা হতে দেবে না সে! জাত ব্যবসায় বেঁচে থাকা কি কম গর্বের? পেলার গায়ের লোম চাগিয়ে ওঠে। হাতের লাঠিটা পিছলে যায়। চোখ মুদলেই যেন বাপের মুখটা স্পষ্ট দেখতে পায়।

বড় ভাল ছিল বাপটা। এক ডাকে দশটা গাঁয়ের লোক চিনত। ভালবাসত। এখনো গাঁয়ের মুরুব্বিরা নাম করে। বলে, ঢের ঢের তাবড় তাবড় ওস্তাদ দেকেছি কিন্তুক তোর বাপের মতুন অমনধারা দাপানে গুণিন আর দেকিনি!

হাঁটতে হাঁটতে ছাতি ফুলে ওঠে তার। বাপ নেই কিন্তু কথা আছে। বাপ মরার পর থেকে কি এই এক নেশায় পেয়ে বসেছে তাকে! তাকেও বাপের মত হতে হবে? বাপের কাছাকাছি যেতে হবে।

তাই নেশায় নেশায় গাঁ ঘোরে পেলা।

হরিনাথপুর। চাপড়া। লাখুড়ে।

একটু টেরে গেলে অনন্তপুর-বাণীনাথপুর-সাহাপুর-দোয়েম।

সবখানেই জীবের জরা-মৃত্যু আছে। অসুখ-বিসুখ তো আক্‌ছার। যেমন রোগ আছে, তেমনি আছে প্রতিকারের দাওয়াই।

তাই উড়োনচণ্ডী গাঁ ঘুরতে ঘুরতে এই খরার সময় তার হাত পা বেদনায় টনটন করে। ক্ষতি নেই। চকচকে পয়সা দেখলেই সব বেদনায় ভাঁটা আসে। তাছাড়া, লোকের ভালো দেখলে এ বয়সে পরাণটায় খুশ আসে। একটু ধর্ম-কর্মের দিকে মন ঝুঁকেছে। সাঁঝ-সকালে হরির নাম, মা বিপদতারিণী মা, জয় মা কালী, জয় মা ভাগাড় চণ্ডী, এসব আক্‌ছারই মুখ দিয়ে পিছলে যায়। অথচ মাত্র দশ বছর আগেও এদের ধারে কাছে যেত না সে। তখন রক্তের তেজ ছিল। দিন-রাত, আসমান-জমিন সব এক ছিল। এখন পায়ের তলায় মাটি পাতলা হচ্ছে, ধীরে ধীরে লতলতে হয়ে সরে যাচ্ছে সব। তাই এত কিছু করেও মনে শান্তি নেই। মনে তো কাঠ কয়লার আগুন। তাতে অভাবের বাতাস তুষ ছিটিয়ে দেয়। বুড়ো হাড় ছ'ঋতুর সাথে মালাম লড়ে পারে না। তবু লড়তে হয়। পেট যে জব্বরশত্রু! ওকে ধোঁকা দেবে কোন মন্ত্রে? এসব নানা চিন্তায় তার মাথার চুল সাদাটে আর একানে-দুকানে। শরীরটাও হেজে গিয়েছে। ভিতরে ভিতরে না পেরে হেরে যাওয়ায় দাদ-চুলকুনি। হলদেটে আমপাতার মতন মনটা গতরের সাথে দারুণ খাতির জমিয়ে নিয়েছে। যে কোন মুহূর্তে বেইমানীর চাকু চালিয়ে দেবে আয়ুতে। গা সিরসিরিয়ে ওঠে। হাত পা ইসপিস করে। খাটা গতর বসে থাকতে সায় দেয় না। তাই গাঁ ঘুরোন।

রাখাল ঘোষের গোরুকে বাণ মারল অনন্তপুরের বেপারী; গরুটার গতর শুকিয়ে কাঠ, চোখের ন্যাসায় গাদাগুচ্ছের পিঁচুটি। চামড়া গিয়ে হাড়ে ঠেকেছে। শুধু কি তাই? দুধের বদলে রক্ত পড়ছে। হাঁটতে চলতে গেলে ভিমরি খেয়ে উল্টে পড়ে। এক শেকড়েই কেল্লাফতে। গলায় বেঁধে ঝুলিয়ে দিল মন্ত্রপূতঃ শামুক। দু' দিনেই চাঙ্গা হয়ে উঠল গাইটা। এখন দশ সের দুধ দেয়। এ বেলা, ওবেলায়।

খালি নিজের মেয়েকে বাঁচাতে পারেনি। ফুলমনি তার বড় আদরের ছিল। বাণীনাথপুরের এক গেরস্থের ঘরে তাকে সম্প্রদান করা হল। জামাই পাক্কা ডাকাত। চরিত্রহীন। মেয়েছেলে কেসে ধরা পড়ল। থানার ওসি তুলে আনল জামাইকে। তারপর পিটিয়ে আমাশা করে দিল। সেই থেকে অর্শ হল। বছর বছর ছেলে কাঁখে নিয়ে ফুলমনির সুখ ছিল না। পেলাকে বার বার বলেছে বাপরে, ঘরেতে আঁখার আগুন। পেটেতে ছ' মাসের শত্রু লড়ে-চড়ে। আমারে ছিঁড়ে খায় বাপ। ওরে তুই ধসিয়ে দে। কত আইবুড়ো, বিধবা মেয়ের পেট খসিয়েছে মাত্র দশ বিশ টাকায়। নিজের মেয়ের বেলায় হেরে গেল সে। মাদুলি, তাবিজ, জলপোড়া কত কেরামতি সব বিফলে গেল। আঁখার আগুন দাউ-দাউ জ্বলে উঠল ফুলমনির মনে। ঘরে শান্তি হল না। পেটেরটা জাগান দিল পুরোদমে। গুণিনের বিদ্যে নিজের মেয়ের বেলায় একেবারে বিফলে গেল। মাদুলি দেওয়ার সাত দিনের মধ্যে পাটের বিষ খেয়ে মরল ফুলমনি। জামাই আবার বিয়ে করেছে। সেই থেকে পেলার মন তোবড়ানো হাঁড়ি। বিশ্বাস কাঁচা সরার মত ভেঙ্গে গেছে। মন্ত্র ফন্ত্র তাই এখন শুধু ছোলা ভেজানো কথা, পেট চালানোর ফিকির। কথার পিঠে কথা, চোখের ভেতর চোখ, ঝানু হাত পা নেড়ে

পেলা দুই প্রাণীর সংসার চালায়। গাঁয়ে পাশ করা ডাক্তার এসেছে। সে ও তার শত্রু। গাঁয়ে পশু চিকিৎসক এসেছে। সেও তার শত্রু। একটু অসুখে বিসুখে মানুষজন বিনি পয়সার হাসপাতালে ছোটে। হাসপাতালও তার শত্রু। গুণিন ব্যবসায় চড়া পড়েছে তাই এলোপাথাড়ী গাঁ ঘোরে পেলা।

বুড়োমাতলা ছাড়িয়ে এসে নিজেকে বঁড়শির মত বেঁকিয়ে আকাশ দেখে পেলা। সকালের এই রোদের কোন দয়া মায়া নেই। ঘাড়ের কাছটা ঘামে চুপ চুপ করছে। পোঁটলাটা পাকুড়তলায় নামিয়ে হাঁশপাঁশ দম নেয় সে। একটু বেশী হাঁটাহাঁটি করলেই কলজেটা কামারশালার হাঁপরের মত ওঠা-নামা করে। নিজের উপর বড় ঘেন্না হয় তখন। তিন কুড়িতেই বুড়িয়ে গেল সে অথচ তার বাপ? দু ক্রোশ ছুটে এসেও আধমনী বস্তা তুলে নিতে পারত মাথায়। সাঁতরে এপার ওপার হোত পালপুকুর। খেতেও পারত জব্বর! তিন পোয়া চাল এট্টা গোটা কুমড়োর ঘ্যাট্ একাই সাপটে মেরে দিত। বাবুরা বলত, বড় খানেওয়ালা ছিলরে তোর বাপটা। গোনাগুণতি দেড়শ' রসোগোল্লা রস সমেত তোর বাপ বসে বসে খেয়ে নিত।

এসব পেলার কাছে স্বপ্ন। এক পোয়া লাল আউশ খেলেই হাই পাই করে পুরো শরীর। তল পেটটা কেমন ফুলে থাকে। মোটে নিদ্ আসে না। বিছানায় কেবল ছট্ফটানি.....।

সকালবেলায় পোড়া মাঠের দিকে তাকাতে তার মন চায় না। সেই কবে থেকে মাঠ পুড়ছে,....কেবল পুড়ছে। হাওয়ায় খালি আগুনের হলকা। মেঠো মেয়ের সবুজ শাড়ি দাউ দাউ করে জ্বলছে। হাওয়ায় যেন তার গোঙ্গানী।

বসে থাকতে আর ভাল লাগে না। শেষটায় পেলা উঠে পড়ে। পাতা পচে পচে পাশের পুকুরটার জল এখন সবুজ। বুনোপাড়ায় যেবার বাঁধ ভাঙল, সেবার এখানে কি স্রোত। মাছের লোভে কোঁচ নিয়ে এসেছিল সে। শেষটায় পা হড়কে পড়ে গিয়েছিল স্রোতের মুখে। ভাসতে ভাসতে একেবারে চাপড়ার বিল। এখন সেই জায়গার মাটি ফেটে হা। একটা গুয়েশালিক পোকা খুঁটে খাচ্ছে। নিমগাছের মগডাল থেকে হাসতে হাসতে উড়ে যায় ঝাঁক ঝাঁক বনটিয়া।

পেলার আর ধুঁকো বকের মত ধুঁকতে ভাল লাগে না। চটজলদি ঘরে ফিরলে আঁখা জ্বালবে বুড়ি।

টালীখোলাটা পেরিয়ে আসতেই ন্যাসা খাদটায় চোখ যায়। বর্ষাকালে এখানে জল টলটল করে। ল্যাঠা মাছ ছা নিয়ে ঘুরতে এসে ভীতু চোখে তাকায়। এখন চটা উঠছে মাটির। তার উপর বুনো জামপাতার বিছানা। ঢ্যাঙ্গা ঘাসগুলো ঝাঁটার কাঠির মত কদর্য। মাটির ঢেলা আর ভাঙ্গা ইঁটের টুকরোয় শরীরের আবের মত শ্রী হারিয়েছে জায়গাটা। ওর পাশেই ভাগাড়। ফলে ভাগাড়ের এখন বাড়বাড়ন্ত সময়।

পেলা আর দেরী করে না। পাকা সড়ক থেকে নেমে আসে ভাগাড়ে। পা দুটো যেন নেশার ঘোরে শূন্যে সাঁতার কাটছে। উঁচু হয়ে মাটি ছুঁয়ে বিড়বিড়িয়ে ওঠে পেলা, আমি অনাথের ধর্মের কাছে যাই......। দেহ বন্ধন, গাং বন্ধন, আত্মা বন্ধন, চতুর্দিক বন্ধন.....আমি অনাথের ধর্মের কাছে যাই.....। সে কার আজ্ঞায়? আদম সাত'শ পীরের আজ্ঞায়।

ভাগাড়ের মাটিতে পা ছুঁইয়ে নিজেকে ধুলোপোড়ায় বেঁধে নেয় সে। বাপ বলত, ভাগাড়ে নামলে ভাগাড় চণ্ডীরে তুষ্টো রাখবি। দেব-দেবী ডাকিনী-যোগীনীরে তুষ্টো না রাখলি পরে এসব বাহাদুরি কাজ হয় না।

বাপের কথা হাড়ে হাড়ে সত্যি। একবার অমান্য করে বিপদে পড়েছিল সে। কোন মতে সে যাত্রায় বেঁচে যায়।

নিমছায়ায় বসে বসে বিড়ি ধরায় পেলা। তখনই লাল কচার বন চিরে কাছিমের মত মুখ বের করে আনে হিমাংশু। ওর পরণে বাংলাদেশের প্যান্ট। গায়ে কুঁচকানো জামা। পেলার পাশে দুপ্ করে বসে পড়ে সিগ্রেট বের করে।

—এই নাও পেলা খুড়ো, সিগ্রেট ধরাও।

বিড়িটা কানের ফাঁকে গুঁজে আদেখ্লার মত সিগ্রেটটা টেনে নেয় পেলা। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে গিলতে থাকে হিমাংশুকে।

— তা, কবে আসলে গো বাপধন, খবর সব ভাল তো?

শুকনো পাতার মত হিমাংশুর মুখ। বড্ড উশখুশ করে সে।

— কি করে ভাল থাকি বলতো? বাসের হেল্পারী করি। দিন ফুরালে মোটে সাত টাকা। নিজেরই চলে না।

— তা যা বলেচো! দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে গো। দেখ না, ক'দিন পরে লাঠালাঠি শুরু হবেখন। সবুর করো, আকাল এলো বলে। হিমাংশু কি জবাব দেবে? টুকে মুকে ম্যাট্রিক পাশ করেছে সে। তারপর তিন বছর হন্যে হয়ে চাকরির জন্য এদোর-সেদোর। শেষটায় কলকাতায় গিয়ে বাসের হেল্পারী।

পেলার ঘোলাটে চোখের দিকে তাকিয়ে সে কোন কথা খুঁজে পায় না।

সিগ্রেটটা মাটিতে গুঁজে পেলা বলে, এবার উঠি, মেলা কাজ পড়ে আচে—হিমাংশু নেশাগ্রস্থের মত পেলার হাত দুটোকে বুকের কাছে আনে, ভূতে পাওয়া মানুষের মত বলে, আর এট্টু বসো খুড়ো। তোমার সাথে দুটো দরকারী কথা আছে।

—কথা? আমার সাথে? হি-হি-ই-ই। পেলা মাড়ি বের করে হাসে, কি বলছো গো, বাছা? বিশ্বেস হচ্চে না যে। বুড়ো নাংলায় কি চায হয়?

— কি যে বল, খুড়ো! হিমাংশুর কাঁচুমাচু মুখ, পুরণো চালই ভাতে বাড়ে। আমরা সব মূর্খ তাই পুরণো চালের কদর বুঝিনে। সোনা আর রোল্ড-গোল্ডকে এক বলে চালিয়ে নিচ্ছি—।

পেলা থমকে দাঁড়ায়। হিমাংশুকে দেখে। এ যেন ভূতের মুখে রামনাম। বড় ইস্কুলে যাবার পর থেকেই বিড়ি ফুঁকে ফুঁকে ঠোঁট কালো করে ফেলেছে ছেলেটা। মাস্টারদের সাথে ঝগড়া ঝামেলায় ওর জুড়ি কেউ ছিল না। বাবার পকেট থেকে একশ টাকা সটকে নিয়ে কলকাতায় পালিয়ে যায়। তার মুখে এমন দামী কথা? তাহলে কলকাতায় গেলেই কি এমনি সবাই পালটে যায়? পেলা কিছু বলার আগেই হিমাংশু বলে, বড় বিপদে পড়েছি গো খুড়ো। তুমি ছাড়া কেউ আর আমাকে বাঁচাতে পারবে না।

— তা, তুমার আবার কিসের বিপদ গো এ বয়সে? তারিয়ে তারিয়ে হিমাংশুকে

পড়ে নিচ্ছিল পেলা।

—নয়নতারাকে তুমি চেনো? ঢোক গেলে হিমাংশু।

কাশতে কাশতে পেলা বলে, তা আবার চিনবোনি কেনে? বাড়ুজ্জেবাবুর বড় মেয়ে তো?

—হু। ঠিক ধরেছো।

—হঠাৎ নয়নতারার কথা উঠালে যে বড়।

— না উঠিয়ে পথ নেই খুড়ো। মেয়েটার বড় ফাট্। আমাকে দেখলেই পেছন ঘুরিয়ে চলে যায়।

— তা তো যাবেই কলেজে পড়চে। অমন মেয়ে পুরো গাঁ ঘুবে আসলেও আর এট্টা পাবে না।

—নয়নতারাকে আমি ভালবাসি।

কথার দাপটে চমকে ওঠে পেলা। চোখের মণি দুটো হঠাৎ চিক্‌চিকিয়ে ওঠে। বুঝতে পারে, শিকার জালে পড়েছে—।

— ও বামুন, তুমি কইবোত। এ পীরিত জমবেনি, বাছা।

—কেন? হিমাংশুর গলার রগ ফুলে ওঠে, আমিও মানুষ, নয়নতাবাও মানুষ। এ ভালবাসায় পাপ কোথায়?

পাপ-পুণ্যের হিসাব জানে না পেলা। তার কেবল বেঁচে থাকা নিয়ে কথা। অথচ হিমাংশুকে সে সরাসরি না করে দিতে পারছে না। কোথায় যেন বাঁধো বাঁধো ঠেকে। বহুদূর থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে এনে সে বলে, পথ ছাড়ো গো, আমার বলে এখন অনেক কাজ। রোদ চড়ছে—। কতটা পথ যেতে হবে—।

—আমাকে বাঁচাও খুড়ো। পেলার ভাঙ্গাচুরো গতরটা কুলগাছের মত ঝাঁকিয়ে দেয় হিমাংশু, তোমাকে আমি টাকা দেব। শুধু নয়নতারাকে তুমি বশ করে দাও।

টাকার গন্ধে কপালের ঘাম মুছে আবার ন্যাসা খাদে বসে পড়ে পেলা। কাশতে কাশতে বলে, ও সব বশীকরণ-ফশীকরণ ছেড়ে দিয়েছি, বাপ। কেউ আর লেয্য মতুন পয়সা দেয় না। কাজ হাসিল হলে ভেগে পড়ে। তখুন চিনতেই পারে না।

— মা বুড়োমার দিব্যি, আমি তেমন ছেলে নই। কত লাগবে। বল, আমি আগাম দেব।

—পুরো বিশ।

—বাপরে, এত!

—কেস্‌নগরের পুতুলের মতুন বউ লেবা, এ তো কমই বলেচি।

—একটু কমে হয় না?

—পারবনি বাপ। পথ ছাড়ো।

পথ ছাড়ে না হিমাংশু। শুকনো ঢোক গিলে বলে, আমার দিকটা একটু দেখ খুড়ো। কলকাতায় আড়াইশ' টাকায় কি হয়? ঘরভাড়া, খায়-খরচ বাদ দিয়ে হাতে যে কিছুই থাকে না।

—তাহলে মরো গে যাও। অত সস্তায় অমন পাপ আমার দ্বারা হবেনি? পেলার চোখ মুখ কঠিন হয়ে ওঠে মুহুর্তে দু' হাত দিয়ে ঠেলে ফুঁসে ওঠে, মাস্টুরকে বলো গে যাও বে দে দিতে। বুড়ো বয়সে এসব পাপ ভাল্ লাগে না। ধরা পড়লে পিঠের ছাল খুলে মলম লাগিয়ে দেবে। তখুন জান নিয়ে ফেরা সমিস্যে।

শেষে সতের টাকায় রাজি হয় পেলা। চারমিনারের ধুঁয়ো ছেড়ে আকাশপানে তাকায়। বিড়বিড়িয়ে বলে, এ ভারী কঠিন কাজ গো। পারবা তো সামাল দিতে? তুমার গাঁয়ের বাঁজা গোরুর চনা লিয়ো, দখিণ বিলের মাটি, এক ডুবে ঘরা ভর্তি জল, কদমগাছের বাকল, ঢ্যামনা সাপের হাড়, মাকালফলের ছাল, পারলে বামুন বাড়ির এঁটো আর প্রথম ঘানির রাইতেল। ব্যাস, এতেই কেল্লা ফতে! তারপর ঝাড়-ফুঁক তুক-তাক ডাকিনী, যোগিনীর আশীর্বাদ।

সব শুনে হিমাংশুর বুক ফুঁড়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। হাল-ফিল বোকা বোনে যায় সে।

পেলা বলে, কিচু আগাম দাও।

হিমাংশু পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে আনে। তৎক্ষনাৎ ছোঁ মেরে কেড়ে নেয় পেলা, অত কম? হবেনি। বে জোড়ে শুভ কাজ ফস্‌কে যায় বাপ।

—বিশ্বেস কর, আমার কাছে আর একটাও পয়সা নেই। ফুল প্যান্টের পকেট উল্টে বোকার মত তাকিয়ে থাকে হিমাংশু। পাথর পোরা রুপোলী লাইটটা ছিটকে পড়ে ধুলোয়।

পেলা হাত বাড়িয়ে তুলে নেয় ওটা। আঙ্গুলে চাপ দিয়ে মজাসে আগুন জ্বালে। এমন ধারা পাথর পোরা লাইটে তার বড় সখ। দেবগ্রামের গো-হাটায় দাম করেছিল একবার। দশ টাকা। এখন তার হাতের মুঠোয়। হিমাংশু কাচুমাচু মুখে বলে, বড় সখের গো! ধার করে কেনা। জামগাছের মাথা থেকে তখুনি উড়ে যায় চারটে-পাঁচটা শকুন। লাইট'টা ট্যাকে গুজে পেলা আর দাঁড়ায় না। ভাগাড়ের ওপাশ থেকে কুকুর ডেকে ওঠে, কাক চিল্লোয়। পেলার বুক ধড়ফড় করে আনন্দে। আখক্ষেত চিরে ভাগাড়ের ছিমুতে দাঁড়াতেই দেখে মোনাপারা গাই উল্টিয়ে পড়ে আছে শুকনো ঘাসে। চক্ষু স্থির। পায়ের ক্ষুর ফাঁক। পেট উঁচু হওয়ায় শরীরের চামড়া টানটান। চামড়া দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ছে যেন। আনন্দে খাবি খায় পেলার ভেতরটা। ওঃ মা একি হল গো! একসাথে অত সুখ সইবে তো কপালে?

কোমরে পাঁচ টাকা খসখস করে। বেচারী নয়নতারা আহা, কি সোন্দর গড়ন! যেন একেবারে ফুলপরী।

আকাশে পাক দিতে দিতে আরো কয়েকটি শকুন নেমে আসে ভাগাড়ে। আরো কয়েকটা কাক নিমডাল থেকে নেমে এসে ডানা ঝাড়ে। কুকুরগুলো দূরে দাঁড়িয়ে হাড় খুঁটছে। ঝিরঝির হাওয়াতে আখের পাতা নড়ে। ঝরা নিমপাতা চুনোমাছের মত রোদে সাঁতার কাটে। বড় ভাল লাগে পেলার। ভাগাড়কে বাপুতি সম্পত্তি মনে হয়। অথচ এই ভাগাড় নিয়ে কত টানা হিঁচড়া রেষারেষি। জ্ঞাতিভাইদের খর নজর এর উপর। প্রায় রোজই ঘেনুটা লুকিয়ে-চুরিয়ে চাম কেটে নিয়ে দেবগ্রামে বেচে আসে। গাঁয়ে বিচার চাইলে কেউ তার বিচার নেয় না। ঘেনু যে পাঞ্চায়েত সদস্য।

আক্রোশে কোমরের গামছা খুলে মাথায় ফেট্টি দিয়ে নেয় পেলা। তারপর ভাবে, গাইটা কাদের? এক পা দু' পা করে গাইটার সামনে এগিয়ে যায়। মুহূর্তে তার মাথার মধ্যে হাজার হাজার ধবলা গাই, কালো গাই, পাকড়া গাই, বুড়ো গাই, চিতে গাই, ম্যানা গাই এর ক্ষুরের শব্দ। চোখ মুখ লাল হয়ে ওঠে চিন্তায়। ধবলা গাই শুয়ে আছে ভাগাড়ে। আকাশ পানে মুখ। লাঠি হাতে গন্ডি কাটে পেলা। ধবলা গাই'এর চাপে পাক খেতে খেতে ছোঁ মেরে এক মুঠো ঘাস ছিঁড়ে নেয় ভাগাড় থেকে। ঘাসের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড়িয়ে ওঠে সে, ধবলা গাই'য়ের পাকড়া ভাতার মুখে রোচে না ছানি, ধবলা গাই-এর চৌদিকে চৌযট্টিভূত ডাকিনী-যোগিনী। .....রাগিলে ব্রহ্মতালু জল স্থল কাঁপে। সে কার আজ্ঞায়? কামরূপ কামাখ্যা মায়ের আজ্ঞায়। সে কার আজ্ঞায়? হাড়ির ঝি চন্ডীর আজ্ঞায়।

শূন্যে ছুঁড়ে দেয় মন্ত্রপোড়া ঘাস। তখনি সাঁই সাঁই করে হাওয়া ছুটে আসে। শীতল বাতাসে ভারি আনন্দ পায় বুড়োটা। আনন্দে লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে। গন্ডী পেরিয়ে গাইটার পিঠে হাত বুলোয়। কাক দুটো মন্দ বুঝে উড়ে যায়। আহা, কি সফেদ বর্ণ! চোখ দুটো কাজলটানা। মাথার চামে লাল তিলক। এর মানে বড় জেদী ছিলি তুই, মা? কি করে মরলিরে মা ভগবতী? খরা, ছের, গলা ফুলো ব্যামো?

লেজটা উঁচু করে ধরতেই পেছনটায় পাতলা গোবর। বিশ্রী ঘ্রাণ! আঃ, ছেরে মরলি? কেনে, আমারে খবর দিতে পারেনি তুর মনিব? একঘটি জল পোড়াতেই তোর ছের থামিয়ে দেতাম গো মা। ভাবতে ভাবতে চুল ছেঁড়ে পেলা, পেটে হাত রাখতেই চমকে ওঠে, অ্যাঁরে, একি সর্বনেশ! পেটটা উঁচু উঁচু লাগে কেন? গাভীন ছিলি নাকি, মা ভগবতী?

দূরে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে পেলা। হাতের তালি দেয়। নিমডালের বেয়াদপ কাক দুটো আবার উড়ে এসে গাইটার শিং-এ বসে। তাদের দৃষ্টিগুলো বড় হিংস্র দেখায় এখন।

পেলা ভয় পায়। ভেতরটায় বিড়ির ছ্যাঁকা লাগার মত আৎকে ওঠে। নিরুপায় হয়ে হাতের তালি মারে সে।

— যা। উড়ে যা। গুখা। মুত খা। ভাগাড়ে তুর কি?

কাক দুটো তাকায়। ডানা মেলে দেয়। ভ্রূক্ষেপহীন ওদের চোখ। পেলা দাপনায় বাড়ি মারে। তোবড়ান গালটা ফুলে ওঠে, আবার চুপসে যায়।

—'চরণ রাখিরে ভাগাড়ের ঘাসে, গড় করি মা ভাগাড় চন্ডী। শোঁ-শোঁ কু বাতাস ডাকিনী-যোগিনীর লিঃশ্বাস তাই ঘাসের দন্ডী। দু-হাতের মুঠোতে ঘাস ছিঁড়ে নেয় পেলা, তাতে ফুঁ দিয়ে ছুঁড়ে দেয় শূন্যে। কাক দুটো তবু নিশ্চুপ। ওদের নখ চেপে ধরেছে গাইটার শিং। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম উপরে আসমান নীচে বসুধা। মোর মুখে মন্‌তোর হাতে ঘাসের অসতোর। পেলা ঘাম শরীর নিয়ে উত্তেজিত হয়ে ওঠে, চন্ডীর কিরা কাটি, গাং বন্দী, সুমুদ্র বন্দী। দূরে যা। উড়ে যা। সরে যা। মরে যা। পেলিয়ে যা। না হলি—। ঘনঘন দম নিয়ে তর্জনী তুলে কাক দুটোকে শাসায়, শিকারে এয়েচিস তুই কার আজ্ঞায় এ ভাগাড়ে? মর্‌ মর্‌।

কাক দুটো নড়ে না। গোরুটার চোখের কাছাকাছি চলে আসে। পেলা ঘন ঘন শ্বাস নিয়ে ভড়কে যায়। এত সাহস কাক দুটোর হয় কি করে? কোন অপদেবতা নয়তো?

নিজের গায়ে চিমটি কাটে। হুঁশ আছে তার। শুধু মাথাটা তার তাড়ির নেশায় ঘুরছে। কাক দুটোর চোখের দিকে তাকাতেই সে চমকে উঠে। পা থেকে মাথা অব্দি মুচড়ে ওঠে ভয়ে। হঠাৎ-ই তার মনে হয়, কাকের শরীর ফুড়ে বেরিয়ে আসছে ˚দয়ারাম দাস এবং তার মা ˚কানন দাসী। বুকে গুড় গুড় শব্দ হয়। এ কেমন করে সম্ভব? গত রাতে সে মরা বাপ-মার স্বপ্ন দেখেছে। তবে কি তারাই শেষ পর্যন্ত ভাগাড়ে এসে হাজির হল? ঘামে সারা মুখটা তেলতেলে হয়ে যায় তার। কানের পাশ থেকে ঘামগুলো ধীরে ধীরে গলা বেয়ে নেমে আসে। পা'টা সরাতে গিয়ে বুঝতে পারে শরীর কাঁপছে, পা টলছে, গলাটা শুকিয়ে কাঠ। কোনক্রমে থুতু গিলে সে লাল চোখে তাকায়, ধমকের গলায় বলে, মোর ভাগাড়ে এয়েছিস তুই কার আজ্ঞায় ঠুকরে খাবি চোখ? তুদের গায়ে ম্যাজ্‌রা মারুক। শ্যালে খাক। ছিঁড়ে খাক...।

পেলার চোখ ছলছল করে। ছুটে গিয়ে পাশের আখভুঁই থেকে খাবলা দিয়ে মাটি তুলে নেয় আবার। তারপর রাগে গলার রগ ফুলিয়ে ফুঁসে ওঠে, তুদের গায়ে বাণ ছুঁড়ছি, ওমা, ওবাপ, পালা....পালাদিনি।

ক্ষেপামু দেখে ঝাঁক ঝাঁক শকুন ডানা ঝাড়ে। কুকুর ডেকে ওঠে। কাকা দুটো জড়োসড়ো হয়ে বসে? বাতাসময় বাসি হাড়ের গন্ধ। পেলা সহ্য করতে পারে না। চোখের সামনে তবে কি শ' টাকার চাম ক্ষামি হবে? না, এ কখনই হতে দেবে না সে। মা, কামরূপ কামাখ্যা মা আমার। তুই মুখ তুলে চা মা। হে মা, মন্ত্রের শক্তি দে মা। বুকে বল দে মা।

হঠাৎ কপাল থেকে গামছা খসে পড়ে। সেই গামছায় দুটো গিঁট দিয়ে দাপনায় চাঁটি মারে পেলা। চ্যাটাং চ্যাটাং শব্দ হয়। কাক দুটো পরস্পরের দিকে তাকায়। মাথার ভেতর ঘুরপাক খায় তাড়ি। টক রসগুলো ঢল ঢল করে পেটের মধ্যে নড়ে। টন টন করে গা-গতর। কথা আটকিয়ে যায় গলার ভেতর।

—গামছাতে বাঁধিলাম গিঁট—এই গিঁট বাঁধুক কাকের গলায়। খুঁট থেকে চাকু বের করে হাতের তেলোয় ধার দেয় পেলা। চকচক করে চিতল পেটীর মত ইস্পাতের ধারাল মুখ।

—চাকুতে দেলাম ধার, এই চাকু বিঁধুক কাকের শরীল.....। তিনবার চাকুটা কপালে ছুঁইয়ে রাগের মাথায় ছুঁড়ে দেয় কাকের শরীরে। আখের পাতা হিলহিল করে ওঠে তখন। চর্বি বোঝাই ঢোঁড়াসাপটা ঘাস নাড়িয়ে ডোবায় নেমে যায়। কাক দুটো উড়ে যায় নিমের ডাল। পাশাপাশি বসে শব্দময় রাগ উগলে দেয়। জনহীন সকালে হাঁটুমুড়ে পেলা বসে পড়ে ভাগাড়ে। ভাগাড়ের ধুলোয় শরীর ছুঁয়াতেই তার মনে হয়, ভাগাড় তার মা, ভাগাড় তার বাপ। একে সে কোন মতেই হাতছাড়া হতে দেবে না। নখ দিয়ে মাটি খুঁটে ঝোঁকের মাথায় কপালে তিলক কাটে সে। বুকের ঘামে লেপটে দেয় মাটির চিহ্ন। দু'হাত তুলে আকাশের দিকে তাকায়। কেবলই বাপের মুখটা মনে পড়ে।

—বাপ?

— কি?

— তু কুথায় বাপ? মুই তো ভুঁই নিড়ুতে গেচিলাম। এসে দেখি তুলসীতলায় তুই কাঠ হয়ে মরে পড়ে আচিস। মোর সাথে এট্টাও কত্তা বল্‌লিনে কেনে?

নেশায় পাওয়া মানুষের মত মাথায় লাল গামছাটা ভাল করে বেঁধে নেয় পেলা। চোখের মধ্যে হাজার আলোর বুদবুদ। দাঁড়াতে গেলেই ঝিমঝিম করে মাথা। তবু নিজেকে কোন মতে দাঁড় করিযে ঘোলাটে চোখ নিয়ে গাইটাকে দেখে। কোমরে গোঁজা ক্ষুরটা বের করে ছুটে যায় গাইটার কাছে। দাপনায় হাতের থাবা মেরে গোরুটার শিং-এর উপর লাফিয়ে পড়ে। শিং দুটো দু' হাতে ধরে নাড়ায়। গাইটা নড়ে না। পা চারটে আগের মত শক্ত, টানটান হযে থাকে। তবু লেজটা খাঁকড়ে টানতে থাকে পেলা। এক সময হাঁপিয়ে ওঠে, গাইটার পেটে কান লাগিয়ে সে ডাক পাড়ে, ই বাপ, ই মা। তুরা কোথায়?

জবাব আসে না।

শেষটায় রাগে রক্ত চলকে উঠলে গাইটার থুতনিতে ক্ষুর বসিয়ে দেয় পেলা, সেইক্ষুর হড়হড়িয়ে টেনে আনে দাপনা অব্দি। টাল সামলাতে না পেরে ছিটকে পড়ে মা ভগবতীর গায়ে।

—ই বাপ, তু কুথা গেলিরে! আর্তনাদ করে থেমে যায় পেলা।

তখন রোদ চড়ে যায় নিমগাছের মগডালে। কুকুর ডাকে। ডানা ঝাড়ে শকুন। কাক দুটো উড়ে আসে তৎক্ষনাৎ। শুধু ভাগাড়ে মুখ থুবড়ে শুয়ে থাকে পেলা। তার চক্ষু স্থির। হাত-পা এলানো। মুখের দু'পাশে ফেনা।

কুকুর শকুন কাক কিছুই বুঝতে পারে না, কে তাদের খাবার। মানুষ না গোরু।

ন্যাসা বাগ্‌দি শেয়াল ধরতে যায়

বাবু চলেছেন শিয়াল শিকারে।

পিছু পিছু ন্যাসা বাগদি, পুকুরপাড়ের একমাত্র আগোলদার। তার হাতে পাকা বাঁশের লাঠি, মাথায় ফেট্টি দিয়ে জড়ানো লাল গামছা, পরনে খাটো মাপের লুঙ্গি, ফাটা এবড়ো খেবড়ো পায়ে টায়ারের চটি তাতে সুতলি দিয়ে গোড়ালী বাঁধা, বাঁ হাতের বাহুতে বাধা আছে লাল কারে বাঁধা পেল্লাই মাদুলি, কপালে তার তিনটে ভাঁজ, চোখের নীচে কালি, মুখের চামে কাটাকুটি দাগ, থুতনির মাংস ঝুলে গিয়ে সুচালো মুখ, কালোর কুস্টি ঠোটের এখানে সেখানে রোয়া রোয়া ধুলোবালি, কাঁচা পাকা রং চটা গোঁফ দাড়ি। ঘাড় গুঁজে দ'-এর ঢং এ হেঁটে চলেছে সে। পাশেই পুকুর। পুকুরের জলে ছায়া পড়েছে তার।

আকাশে তখন গনগনে আঁচ, চারিদিক জুড়ে ঝিলমিলে রোদ, মরাটে বাঁশের পাতা হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে মাটি ছোঁয়, বাঁশের শির ডগায় অনবরত ডেকে যায় মাঠ ঘুঘু। কুকুরটা খরায় নাড়ি-ভুঁড়ি বেরুনো ডোবার জলে গা ডুবিয়ে হাঁপায়, ছাগলগুলো নারকেল গাছের ছায়ায় অলস জাবরকাটে, মাঝ পুকুরের কলমী ফুলগুলো মনমরা, শ্যালো-মেসিনে জল উঠছে এক চিলতে দু-চিলতে। আইরেট ধানের গোড়ায় দু' আঙ্গুল জল নেই। চাতকটা হাট্টিট্রি গলা ফাটাচ্ছিল আকাশে। বাঁশ ঝাড় নুইয়ে গেছে গত সনে, সেই থেকে গোড়ায় মাটি নেই। কোঁড়া বেরিয়েছিল, শেয়াল ভেঙ্গেছে। বীজতলায় ধানচারা শেয়ালে তছনছ করেছে। ছাগল হাঁস মুরগী ছা-গুলোকে সটকে নিয়ে পালিয়ে গেছে ঐ শেয়াল।

ট্যাংরা পুকুরপাড়ের কাঁচা বিধবা, বাবুর বাসায় ঠিকে ঝিয়ের কাজ করত।

তার ভরন্ত গড়ন, টাইট বুক, ভারী পাছা আর চিকনাই গতর। বিকেলে গা ধুতে গিয়েছিল ঘাটে। শিয়ালটা খ্যাক করে পেছন থেকে পায়ে কামড়ে দেয়। খাবলা দিয়ে মাংস তুলে নিয়ে দে দৌড়। সবাই দেখেছে শেলায়টার সুচাল মুখ, ধারাল দাঁত। লেজটা পায়ের ফাঁকে গোটান। চোখ-মুখ লাল, হাঁটাচলায় মাতলামী। হাড়-মটমটীর ঝোপে ঢুকে গিয়ে শেয়ালটা বার দুই ডেকে উঠে ছিল। কিন্তু একবারও পিছন ফিরে তাকায়নি। সেই ডাকে সবাই চমকে উঠেছে। জান ধ্বক ধ্বক করেছে ভয়ে। কেউ আর সাহস করে এগোয়নি যদি ঘুরে এসে কামড়ে দেয়। গত পরশু ট্যাংরা মারা গেল।

সেই থেকে পুকুরপাড়ে এখন আতঙ্কের ছায়া। সবার মনেই একটা ক্ষেপা শোয়াল নড়ে চড়ে। বাবুর কাছে কত আর্জি-নালিশ তাই নিয়ে। বাবু মন দিয়ে শুনে শিকারে এসেছেন। শিকারে না আসলে উপায় নেই। আত্মসম্মানে ঘা লাগে। উনার বাবা বড় শিকারী ছিলেন। একদা বাঘ মেরে ছিলেন একটা। বন্দুক হাতে বাঘের পেটে পা দিয়ে দাঁড়ান ছবিটা বাবুকে জেদী হতে যথেষ্ট সাহস জুগিয়েছে। পুকুরপাড়ে পঁচিশ ঘর বাসিন্দা ভাড়া দেয় মাস মাস।

এটা বাবুর উপরি ইনকাম। সারা মাসের মদের পয়সা হয়ে যায় এতে। এটা হাত ছাড়া হলে মুশকিল।

তাছাড়া আরও দু'জনকে কামড়েছে এই একই শিয়াল, তারা এখন বড় হাসপাতালে নাভির কোলে কোলে সুঁই নেয়, কোঁকায়। আপ-ডাউন দু'পিটের রিক্সা ভাড়া দিয়ে পুকুরপাড়ে ফেরে দুপুরবেলায়। তাদের খাটা গতর, বেদনায় কাজে মন আসে না। মরণ ভয় সর্বদা তাড়া করে। তাদের বৌগুলো কোলেরটাকে নিয়ে বিধবা হওয়ার ভয়ে কালীতলায় মানত করে, ঢাক বাজিয়ে জোড়া পাঁঠা দেব মা, ঘরের মানুষটারে ভাল করে দাও। ও ভিন্ন মোর আর কেউ নেই।

ন্যাসা হল বাবুর আগোলদার। পুকুরপাড় আগলায়। সে-ই বাবুর কানে কথাটা ঘন ঘন তোলে। বঙ্কিমবাবু তখন গদিতে বসে হিসেব নিকেস করছিলেন। সিগ্রেটে ফুঁ দিয়ে ভুরু কুঁচকে তিনি বলেছিলেন, তা শেয়ালটারে ধরতে পারলি না? কেমন আগোলদার হে, খালি বসে বসে মাইনে, আর ভুঁড়ি বাগানো! বাবা দেখছি আমার কপালে একটা বুড়ো গাধা জুটিয়ে দিয়ে গেছে।

ন্যাসা বাবুর বাবার আমলের আগোলদার। কথাটা বড় গায়ে লেগেছিল তার। গরীব বলেই বাবু তাকে ছোট বড় অনেক কথাই শোনায়, যেন তার গায়ের চামড়া মানুষের নয় পশুর। মুখের কাছে উত্তর এসে গিয়েছিল মেজাজ মত। তবু উত্তর করেনি ন্যাসা। এটা তার স্বভাবের বাইরে। বাবুর দয়ায় তার তিন মানুষের সংসার চলে। বাবু তাকে মাস গেলে মাইনে দেয়, কখনো-সখনো জল খাবারের পয়সা, খেলায়-খেলায় দু' এক টাকা হাত খরচ। এর বাইরেও তার কিছু এদিক সেদিক আয় আছে সেগুলো সামান্য হলেও সংসারের ফুটো সারতে এক আঁটি বিচুলির চেয়েও দরকারী। ন্যাসা জানে, আলগা জল ছাড়া পুকুরের গতর ভরে না, সার ছাড়া ধান বাড়ে না আর বালি ছাড়া খৈ ফোটে না। তেমনি সেও আলগা ধান্দায় ঘুরে বেড়ায়। কলাটা, মুলোটা, বাঁশটা-গাছটা মাঝে মাঝেই বেচে দেয় বাবুকে না জানিয়ে। একেবারে সলিড আয়। বাবুর এত দেখার সময় কোথায়? তেনার তো পাটের ব্যবসা, কেরোসিন সিমেন্টের বেলাক। এ গাঁয়ে বাবুরই তিনতলা বাড়ি। গমকল, ধানকল আর দশখানা রিক্সা। হাঁটতে-চলতে ন্যাসার ভারি গর্ব হয়, যেন এসব তার নিজের সম্পত্তি। হাত দুটো অনবরত দোলে, লম্বা লম্বা পা পড়ে। এ সবই খুশীর লক্ষণ। পুকুরের জলে ছায়া পড়েছে বাবুর। চমৎকার দেখাচ্ছে চারদিক। ঘুঘু ডাকছে, বাঁশ ঝাড়ে শব্দ হচ্ছে ভৌতিক। ন্যাসার অনেক কথা মনে পড়ে যায়। পেটের জন্য সে এই ঝঞ্ঝাটে পুকুর পাড়ের আগোলদার। ভাড়া নিয়ে প্রায় তার সাথে ঝগড়া হয়। বাবু পুরো ভাড়া না পেলে সাতটা কথা শোনায়। বলে, চাকরি ছাড়িয়ে দেব। রস গুটিয়ে ছেড়ে দেব। আরও কত কি!

বড়কর্তা মরার সময় ব্যাঙ্গাবাবু (বঙ্কিম)-কে বলেছিল, তোর হেফাজতে ন্যাসা রইল বঙ্কে। হারামজাদাটারে ভাগিয়ে দিসনে। পুরনো চাল আর পুরনো মানুষ পুরনো ঘিয়ের চেয়েও দামী।

ভাবছে তা যাতে বাবুর কাছে প্রকাশ না হয়ে পড়ে সেজন্য শান্ত চোখে বাবুকে দেখে।

ধীর গলায় দু'বার কেশে মুখ নীচু করে হেঁটে চলে। ছোট বেলায় তার বাবা শিখিয়েছিল, বোবার শত্রু নেই। বাবার কথাটা এখন ফলছে। হায় বাপ, তুই যদি বেঁচে থাকতিস?—ন্যাসার চোখ কুটকুট করে।

—'অত ভয় পেলে চলে? তুই না আগোলদার?' বাবুর জিজ্ঞাসায় ন্যাসা আরো ভেঙ্গে যায়। এতক্ষণ মনের ভেতর সে যে সাহস সঞ্চয় করেছিল তা যেন বাতাস লাগা কলা বেগোর মত মড়াৎ শব্দে ভেঙ্গে পড়ে। তবু নিজেকে শক্ত করে, সাহসে স্নায়ু বেঁধে সে উত্তর দেয়, জানের ভয় সবার বাবু। অকালে কে আর প্রাণ দিতে চায়?

এ কথায় বাবু রাগ না খুশী হল বোঝা মুশকিল, কেবল চোখের পাশের চামড়াগুলো বার দুই কুঁচকে গেল। কপালের রগগুলো দপদপ করল অনবরত। একটা ঘরের চাকরের কাছে বীরত্ব না দেখাতে পারলে সারাজীবন কি কৈফিয়ৎ দেবে সে?

—তোর প্রাণের ভয়? জীবনতো পদ্ম পাতার জল, সব সময় টলমল করছে—কখন যে ঠিকরে পড়বে—

বাবুর কথায় উত্তর দেয় না ন্যাসা। যে কথার ওজন নেই সেই কথা নিয়ে লোফালুফি খেলা মানায় না। বাবুর ছায়া পুকুরের জলে কাঁপে, হেলেঞ্চে শাকের ঝোপ দিয়ে একটা ডাহুক তখন পোকা খুঁটতে চলে যায়। ন্যাসাও ধীরে ধীরে বাঁশঝাড়ে ঢোকে। এতদূর থেকে বাবুর মোটর সাইকেলটা দেখা যায় না। তবু ন্যাসা যেন দেখতে পায় গাবগাছের নীচে কালো রং-এর মোটর সাইকেলটা জিরুচ্ছে, তার মেয়ে আশালতা সেই মোটর সাইকেলে ঠেস দিয়ে জর্দা পান চিবুচ্ছে। আর নকড়ির বড় ছেলেটা যেন হাসতে হাসতে বলছে, আলতারে তুর গাটা যেন মোটর বাইকের সীটের মতুন নরম, তুলতুলে—।

বাঁশের গোড়াতে হোঁচট খেয়ে ন্যাসা খপ করে বসে পড়ে। বুড়ো আঙ্গুলটা থেঁৎলান কলার মত হয়ে গিয়েছে। নখের পাশে রক্তের সরু ধারা।

—ওঠ, বসে পড়লি যে। বাবু কটমট করে ন্যাসার দিকে তাকায়। ন্যাসার যে সত্যি সত্যি নখটা থেঁতলে গিয়েছে এটা সে মেনে নিতে পারছে না। কাজে ফাঁকি দেবার বাহনায় অনেকে এমন করে! ন্যাসা যেন একটা ঘাঘু মানুষ, ফাঁকি বাজের চূড়ান্ত ছবি এমনটা মনে করে বাবু আবার শুধোয়, কি হল, উঠ? চল, বেলা পড়লে শেয়ালের আর দেখা পাবিনে। উঠ।

বাবুর কথা ন্যাসার সহ্য হচ্ছিল না, কাঁটা গেলার চেয়েও মর্মান্তিক তার মুখের দশা। অস্বস্তি আর অপমানে সে চোখে আঁধার দেখছিল। শেয়াল শিকারে আসার সময় বঙ্কিমবাবু মাল খেয়েছে। ন্যাসা দূরে দাঁড়িয়ে পিটির পিটির দেখছিল। বাবু তাকে নিরাশ করেনি। বোতলের তলানী আর দুমুঠো চানাচুর দিয়েছে খুশী হয়ে। বাবুকে তখন দেবতার মত দেখাচ্ছিল।

পুরোটা সাটিয়ে নিয়ে ঘোর লাগা চোখে ন্যাসা দেখছিল তার বউ চিরুণি কলমীশাক ভাজছে রান্না ঘরে। মেয়েটা বাঁশের খুঁশিতে ঠেস দিয়ে হা পিত্তেশ চোখে বাপকে গিলছে যেন তার বাপ একটা দাগী আসামী—এই মাত্র জেল থেকে ছাড়া পেল।

শাড়ির আঁচলে ঘামটা রগড়ে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে আলতা চুলার কাছে দুপ করে

বসে পড়েছিল, নীচু গলায় বলেছিল, মাগো, ওমা। বাবা না ব্যাঙ্গাবাবুর সাথে মাল খায়। নেশা হলে বাবা আর বাঁচবেনি!

খুস্তির নড়ন-চড়ন থামিয়ে আলতো হেসে উঠেছিল চিরুণি, হাসির সাথে ফিকে অহং, ড্যামা ড্যামা চোখ নাচিয়ে মেয়েকে ধমকে চুপ করিয়ে দিয়েছিল, চুপ যা। মাল খেয়েচে তো কি হয়েচে! পুরুষমানুষ মাল না খেলে মানায়!

ঘাবড়ে গিয়েছিল আলতা। এতদিন সে জেনে এসেছে যারা মদ খায় তারা খারাপ, সবাই তাদের সামনা সামনি কিছু না বললেও পিছনে দু' চার কথা শোনায়। আচার কারখানার বাবুটা মদ খায়। মদ খেলে তাকে দৈত্যের মত দেখায়। তখন পাশে দাঁড়াতে ঘেন্না হয় আলতার। যতই ভাল মুখে ছোলা ভেজান কথা বলুক না কেন চোখ তুলেও দেখতে ইচ্ছে করে না। মদ-মেদো চোখগুলো পলাশের চেয়েও লাল, কাঠকয়লার আগুনের মত ভাব—যা তার পক্ষে সহ্য করা মুশকিল।

কপালের ঘাম মুছে একরাশ বিস্ময়ে চুবান মুখে মাকে গিলছিল আলতা। মায়ের কি ভয়ডর নেই? নাকি বয়স হলে মানুষের ভয়ডর কমে যায়।

ভিজে ভাত শাকভাজি দিয়ে সাটিয়ে ন্যাসা বাবুর পেছনে পেছনে চলে এসেছে এতদূর। মনে ভয় থাকলেও তাকে আসতে হয়েছে পেটের দায়ে। নইলে বাবু তাকে ছেড়ে কথা বলবে না। তাছাড়া আগোলদার বলে কথা, তার তো ভয় থাকলে চলে না বাবু এই কথাটাই বারবার খোঁচা দিয়ে শুনিয়েছে। যা চামড়া ভেদ করে একবারে আঁতে ঘা দিয়েছে। ক্ষেপা শেয়ালের কামড়ের চেয়েও বাবুর কামড়টাই বেশী। এর থেকে তার নিস্তার নেই। ঘন এক বিপদভরা জঙ্গলের মধ্যে সে একা, ক্ষেপা শেয়াল তাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে...ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছে সে। মুখের দু'পাশে ফেনা, চোখ বেরিয়ে আসছে, ছালছাড়ান মুরগীর মত ধুঁকপুক চোখে সে চারপাশে তাকায়।

আগে আগে বাবু, পায়ে গামবুট, মাথায় ন্যাকড়ার টুপি, হাতে দোনলা বন্দুক, প্যান্টুলুনের পকেটে টোটা বোঝাই। বাঁশপাতার উপর মচর মচর শব্দ তুলে দাম্ভিক এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

পুকুরপাড়ের চাংড়ারা টিন বাজান'র ঠিকে নিয়েছে। চারদিক থেকে টিনের শব্দে বাতাস গমগম করে উঠলে ন্যাসা শেয়ালের খোঁজে বাঁশঝাড়ে ঢুকে যাবে বীরের মত। এ গর্ত সে গর্ত, এ ঝোপ সে ঝোপ খুঁজে তাকে বের করে আনতে হবে শিয়ালকে। বাবু দেখামাত্রই গুলি করবে। গুলিটা পায়ে লাগলে ভাল হয়। বুকে লাগলে অসুবিধে কেননা বাবুর দরকার জ্যান্ত শেয়াল! বাবুর আদুরী বউ শহুরে মানুষ। এখনো শেয়াল দেখেনি!

টিন বাজছে। হৈ-হৈ করে ছুটে যাচ্ছে মানুষ। ন্যাসা গাছের মত দাঁড়িয়ে থাকে, পা থেকে তার শিকড় নামছে। আজ টিন বাজান'র দায়িত্বটা থাকলে ভাল হোত। একাজে ঝামেলা নেই অথচ ভাল টাকা। এখন তার প্রাণ নিয়ে টানাটানি শেয়ালে কামড়ালে নাভির কোলে কোলে চৌদ্দটা ইনজেকশন। উঃ, সেকি যন্ত্রণা! ন্যাসার মুখ বেঁকে ওঠে, চোখ-মুখ বেজায় ফোলা ফোলা দেখায়। চুলের গোড়ায় গোড়ায় কষ্ট শুরু হয়েছে, এর থেকে সে কি করে নিস্তার পাবে?

বন্দুকটা মাটিতে ঠুসে বাবু বলল, বাজাও, জোরে বাজাও। টিন ফাটিয়ে দাও। শালোর শেয়াল পালাবে কোথায়?

ন্যাসার হাতে টিন নেই, সে হাত-পা ছোঁড়ে।

চিরুণি তার কথা শোনে না। শহরে যায় কয়লা ধরতে। মাখন টোস্ট খায় কয়লাবাবুর সাথে। টোস্ট খেয়ে খেয়ে চিরুণির পেট ফুলছে, ভরাট হয়ে উঠছে ঢিলে ঢালা গতরটা। চোখের কোলে মাংস জমেছে, গালের দু'পাশটায় লালচে আভা। ন্যাসা দু'হাতে মুঠি পাকায়। মুখের থুতুটা ঘেন্নায় বাঁশপাতায় ছুঁড়ে দেয়। চিরুণির দাঁত উঁচু মুখটা শেয়ালের মুখের সাথে মিলিয়ে ফেলে। রাতকালে তাই চিরুণির সাথে শুতে ভয়। চিরুণির গা থেকে আজকাল অচেনা একটা গন্ধ বেরয় যা তার নিজের না অন্যের বোঝা যায় না শুধু তালকানার মত অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ায় ন্যাসা। চেনা শরীরটা বড় অচেনা হয়ে যায়। সেই ক্ষেপা শেয়ালটা প্রহর কাঁপিয়ে ডেকে ওঠে।

বাঁশঝাড়ের চারদিক জুড়ে এখন শুধু টিন পেটানোর শব্দ। বন্দুক তাক করে ধরেছে বাবু। হামাগুড়ি দিয়ে কাছিমের মত এগিয়ে যাচ্ছে ন্যাসা। তার হাতে বাঁশের লাঠি, কোমরে একটা হেঁসো। ভয়ে দুরদুর করছে পুরো শরীর, বুকের ঘামে লেপটে যাচ্ছে শুকনো বাঁশপাতা। হাঁটুতে ধুলো, হাতে ধুলো যেন সরসরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে একটা বিলকুমীর, জয় মা বিপদতারিণী মা, রক্ষা করো গো মা। ন্যাসার ঠোঁট কাঁপছে। রাতে স্বপ্ন দেখে চিরুণিরও এমন ঠোঁট কাঁপে। মরার সময় ট্যাংরা এমন কাঁপতে কাঁপতে মরেছে।

—হারে-রে-রে-এ-এ।

—দড়াম দড়াম দুম—দড়াম...।

কিছুটা গিয়ে ন্যাসা আবার পেছন ফেরে। ট্যাংরাকে পোড়াতেই চিতে থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ছিল মেয়েটা। তারপর ঝুপ করে ঠিকরে গিয়েছিল বালিতে। বড্ড ভয় পেয়েছিল ন্যাসা। সে রাতে চিরুণিকে একটুও কাছছাড়া হতে দেয়নি। চিরুণি মুখ ঝামটেছে, উরি, মারে—বুড়োর ভীমরতি দেখিনি।

ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ফেলেছে ন্যাসা। চিরুণিকে বোঝাতে পারেনি কোথায় তার যন্ত্রণা।

ন্যাসা চলে যেতেই বিষ্টুপদ এসে হাজির। তার থাবড়ান নাক, কুতকুতে চোখ—সবখানেই উপর চালাকির কাদা লেপা। হাতজোড় করে সে বাবুকে বলল, এ দেখছি মশা মারতে কামান দাগা! আপনি ঘর যান বাবু, ঘণ্টাখানিকের মধ্যে জ্যান্ত শেয়াল আপনার দোরে পেঠিয়ে দেব। সে হিম্মৎ আমার আছে।

বাবুর চোখে আশার ফুলকি। ঘেমে গিয়ে মুখটা চ্যাপ চ্যাপ করছে—এর মধ্যে বিষ্টুপদর তোষামোদীর কথাগুলো গায়ে মলম লাগানোর বদলে জলঠোসা ফেলে দেয়। কড়া চোখে তাকাতে গিয়েও মালাই চোখে তাকায়। গোঁফ বেঁকিয়ে না খুশী না দুঃখী গলায় আউড়ায়, তা কোথায় ছিলি রে? অনেকদিন যে দেখিনি! বিষ্টুপদ আমতা আমতা করে। বাবু যেন তার সব কিছু ক্ষত দেখে ফেলেছে ঐ জ্বলজ্বলে চোখ দিয়ে। আর ঢাকা যায় না, বাঁচা যায় না এমন একটা অসহায় ভাব তার চেহারায় ধরা পড়ে। নুন দেওয়া কেঁচোর মত দুর্দশায় সে একটা কথারও জবাব দেয় না। তার থাকার জায়গা বলতে ভাঁটিখানা। সেখানে

সে দু' বেলায় যায়। না গেলে ভাত হজম হয় না। মাসখানিক আগেও রিক্সা চালাত ভাড়ায়। আঁধার রাতে লাইটপোস্টে গুঁতিয়ে এখন বেকার।

চারদিক দেখে শুনে বিষ্টুপদ বলল, বাবু ও বুড়োটারে ভাগিয়ে আগোলদারের কাজটা আমায় দেন। পুকুর পাড়ে কপি লাগাব। চোখে তাক লাগিয়ে দেব আপনার।

বাবু কোন ভ্রূক্ষেপই করে না। পা টিপেটিপে ন্যাসার দিকে এগিয়ে যায়, কিরে ন্যাসা, শ্যালের দেখা পেলি?

—শ্যাল মনে হয় পেলিয়ে গেচে! অত মানুষ দেখলে বাঘই ভয় পায় আর ওতো শেয়াল! ন্যাসার কথায় হো-হো করে বিষ্টুপদ হাসে। যেন হাডুডু খেলায় জিতে মেডেল নিয়ে ঘরে ফিরল। আসলে মনে মনে বিষ্টুপদ এটাই চাইছিল। ন্যাসা হেরে গেলে সে এক হাত শেয়ালকে দেখবে। আজ শেয়াল ধরতে পারলে বাবুর দয়া সে পাবেই। আর তখন কায়দা করে ন্যাসার পাতা ফুটো করে দিতে তার আর বেশী সময় লাগবে না। যতক্ষণ বিষ্টুপদ বাবুর সাথে সাথে থাকল ততক্ষণ ন্যাসার দুর্নাম ক'রল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, কায়দা করে এটা সেটায় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করল বার দুই। কিন্তু কিছুতে কিছু হল না দেখে দাঁতে নখ কাটতে কাটতে সে সরাসরি বিদ্রূপ করল ন্যাসাকে, বুড়ো হাবড়ায় কি বাহাদুরির কাজ হয় বাবু? আগোলদারের কাজটা আমায় দিন। দেখবেন সব টাইট করে ছেড়ে দেবে।

কথা শুনে ভেতরে ভেতরে জ্বলে যায় ন্যাসা। মুখের উপর কেউ অমন কথা তাকে নিয়ে বলতে পারে এ তার বিশ্বাসের বাইরে। বিষ্টুপদ'র সে তো কোন ক্ষতি করেনি! তবে বিষ্টুপদ কেন তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে চায়? একবার ভাবে বিষ্টুপদকে যাচ্ছেতাই বলে দেবে। কিন্তু ঐ ভাবা পর্যন্তই। বিষ্টুপদ'র শরীর-স্বাস্থ্য ঈর্ষা করার মত। সে যদি তাকে জাপটে ধরে তাহলে দম আটকে যাবে ন্যাসার। আবার সেই ভয়টা ধীরে ধীরে সমস্ত সত্বা জাগিয়ে তাকে অসহায় করে তুলছে। ছানিপড়া চোখ দিয়ে সে লুকিয়ে লুকিয়ে বিষ্টুপদকে দেখে, মনের ভেতর সেই একই ভয় সাপের মত নড়ে। বুঝতে পারে, বিষ্টুপদ'র কথার মধ্যে যাদু আছে যা তার নেই। বিষ্টুপদ'র হাসি, চোখের চাহনি সব তার চেয়েও উজ্জ্বল। তার মনে হয় বিষ্টুপদই আগোলদারের পদে যোগ্য।

দো-নলার বাঁটটা মাটিতে ছুঁইয়ে উষ্ণ গলায় বাবু বলে, যে করেই হোক আমার শেয়াল চাই। নইলে মানে মানে কেটে পড় বাপু। আমি অন্য লোক দেখি।

—খুড়োর তো নড়তে চড়তেই আঠার মাসে এক বছর। ও ধরবে শেয়াল! যে মানুষটার পুকুরে জাল ফেলতেই হোঁক লাগে, বাঁশ কাটতে জিরোয়—সে ধরবে শেয়াল? ন্যাসা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। পায়ের গুলিগুলো টানটান করে মনে মনে বিষ্টুপদকে খিস্তি দেয়, ওর মৃত্যু কামনা করে; শেষে হাঁপিয়ে উঠে ক্ষেপা শেয়ালের মত ছুটে যায় পশ্চিম কোণে।

শেষ পর্যন্ত শেয়াল ধরা হয় কিন্তু তার কামড় খেয়ে যন্ত্রণায় বেঁকে যাচ্ছিল ন্যাসা। কিছুক্ষণ আগে শেয়ালের সাথে তার যে কুস্তিটা হয়েছে তা দেখে বাবু এবং বিষ্টুপদ দু'জনেই খুশী।

বাঁশঝাড়টা ঘুরে গেলেই একটা আল পড়ে। আল ধরে সোজা চলে গেলে গুয়েবাব্লার ঝোপ। সেখান থেকে ন্যাসা দেখে—পশুটা গড়াগড়ি খাচ্ছে ধুলোয়। কি যেন খেয়েছে! পেটটা তাই একেবারে 'ঢোল। পেছন থেকে গিয়ে মাথায় লাঠি মারতে পারত ন্যাসা। কিন্তু করেনি। সেও বিষ্টুপদকে দেখিয়ে দেবে—বুড়ো হাড়ে এখনও ভেলকি আছে। শুধু এ ভেলকি সে চিরুণিকে দেখাতে পারেনি। বউটার ধামা উল্টানো পেটে হাত বুলিয়ে ন্যাসা প্রায় রাতেই বলেছে, এ আলতার মা, বল না কেনে এ খোকা কার?

চিরুণি কোন জবাব দিতে পারেনি পাশ ফিরে শুয়েছে। হাই তুলে মিথ্যে ঘুমের ভাণ করেছে।

—বেবুশ্যে, বারোভাতারী। বলে চেঁচিয়ে উঠতে চেয়েছে ন্যাসা। কিন্তু পারেনি। কিছু দূরে আলতা ঘুমোচ্ছে, ফোঁসফোঁসানী নাক ডাকার আওয়াজ। এক লাথ মেরে বউকে পাশ থেকে সরিয়ে দেয় সে।

খনখন করে চিরুণি কাঁদে। গুয়েবাবলার ঝোড়ের কাছে দাঁড়িয়ে ন্যাসা যেন বৌয়ের কান্না শুনতে পায়। একটা শেয়াল ছা তার চালাঘর ফাটিয়ে কেঁদে উঠছে, বাতাসে কেবল তার গুমরানী।

—ওগো, তোমার পায়ে পড়ি। আমারে ধুতরো বিচি এনে দাও।' চিরুণির এ আব্দার তার গায়ে কাঁটা দেয়। বোঝে, শেয়ালটা আর বেশী দূরে নেই, আশে পাশেই আছে।

বিষ্টুপদ ফিরে এল হাঁপাতে হাঁপাতে। আমুনী-ভুঁইটার কাছে ন্যাসাকে টেনে নিয়ে গিয়ে বলল, যাও, হেম্মত থাকে তো ধরো গে যাও। উঃ দেখ, উঃ যে শুয়ে আছে।

বিষ্টুপদর কথায় বোলতার হুল ছিল। রাগে গরগরিয়ে ন্যাসা ছুটে গিয়েছিল খেতে। পুকুরপাড় আগলানোর কাজটা গেলে এই বুড়ো বয়সে খাবে কি? শুকিয়ে মরার চেয়েও শেয়ালের কামড় ঢের ভাল। প্রায় রাতেই সে একটা ক্ষেপা শেয়ালের স্বপ্ন দেখে, শেয়ালটা তার বিছানার কাছে মুখ লাগিয়ে বিকট শব্দে কেঁদে ওঠে। এর পরে ন্যাসা আর ঘুমোতে পারে না। তখন বউটার শরীরে হাত রাখতেও ভয়। ঠিক ক্ষেপা শেয়ালের মতন দম ছাড়ে বউটা, কিড়মিতে দাঁতে দাঁত ঘষে। বাইরে বেরিয়ে এসে ন্যাসা দেখে চাঁদের মধ্যেও ঘাপটি মেরে পড়ে আছে ধূসর বরণ শেয়ালটা, যার পায়ের নখগুলো টান টান, চোখগুলো লাল কাচ টিপ্পি, দাঁতগুলো সাদা পাথরের চাকু, মুখটা সূচের চেয়েও সুচালো।

ঘুমের ঘোরে কখনো পুকুরের পাড়ে এক সাথে পাল পাল শেয়ালের ডাক শুনে ভয়ে চিল্লিয়ে ওঠে ন্যাসা। আলতা হ্যারিকেন হাতে বাইরে এসে বাপকে আবার ঘরে নিয়ে যায়। নেশায় পাওয়া মানুষের মতন ন্যাসা তখন ভুলভুলিয়ে আলতাকে দেখে। নাক টেনে শ্বাস নেয়। আলতার শরীরে ক্ষেপা পশুর বকাটে ঘ্রাণ নেই, ফলে মেয়ের হাতটা জড়িয়ে ধরে হাউ-হাউ কেঁদে ওঠে, 'এ বিটি, সর্বত্র ক্ষেপা শেয়াল, আমি কুথায় পালাই বলদিনি?'

শেয়ালে কামড়েছে এতে ন্যাসার কোন দুঃখ নেই, গরীব গুবরোর শরীর তো শ্যাল-শকুনের খুবলানোর জন্যই! তবু বাবুর উপর তার অভিমান, যা ভাবতে গেলেই তার চোখের নিচের আলগা মাংসগুলো থিরথির কেঁপে উঠে, চোখের ফ্যাকাসে কোনা ভিজে যায়, লম্বা টিনটিংয়ে শরীরটাও ঝুঁকে যায় ঘৃণায়।

বাবু ইচ্ছে করলেই অনেক কিছু করতে পারতেন।

শেয়াল ধরতে গিয়ে ন্যাসা যখন হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় বাবু তখন ছুটে গিয়ে তাকে টেনে তুলতে পারত। বাবু তখন মাত্র বিশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে। হাতে টোটা ভর্তি বন্দুক।

গর্তের ভেতর থেকে শেয়ালটা ক্ষিপ্র গতিতে তেড়ে আসে তার দিকে। কোনক্রমে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে ন্যাসা ছুটতে শুরু করে। টায়ারের চটি ছিঁড়ে হুড়মুড়িয়ে সে ঢেলার মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে। বাবু এই সুযোগে শেয়ালটাকে গুলি করতে পারত। কিন্তু করেনি, শিয়াল জখম হলে বাবুর বৌয়ের আনন্দ মাটি হবে এই ভেবে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। মানুষ আর শেয়ালের লড়াইটা ফাঁকা ভুঁই-এ জমেছিল ভাল। প্রথমে সপাটে ন্যাসা শেয়ালটার মজায় একটা লাঠির বাড়ি মারে। সেটা হজম করে নিয়ে শেয়ালটা ন্যাসার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে খুব সহজে। ন্যাসা এলেপাথাড়ী ঘুঁষি চালায়। চোখের ভেতর আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়ে কাবু করে পশুটাকে। তার আগে তিন-চার জায়গায় খাবলে দিয়েছে ক্ষেপা শেয়াল। রক্তে সারা শরীর একাকার।

শেয়ালের কামড় খেয়ে ন্যাসা যখন যন্ত্রণায় অস্থির, বাবু বলেছিলেন, ঘাবড়াস্‌নে ন্যাসা। লোহা পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দিস সব বিষ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তোর সাহসের তারিফ করি, বুড়ো হাড়ে ভেলকি দেখালি তুই...।

ন্যাসার এখন খালি ট্যাংরার মরা মুখটা মনে পড়ে। আর ভেতরে ভেতরে ঘেমে ওঠে।

বিষ্টুপদ শেয়ালটার গলায় দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে গাঁ-মুখো। তার পিছনে শ' পঞ্চাশ লোক। বাবুর বউ শহরের মেয়ে। এখনও শেয়াল দেখেনি।

যাওয়ার সময় নীচু গলায় বাবু বলে, তোর মেয়েটাকে আজ রাতে পাঠিয়ে দিস। একটা ধুতি আর দু'সের চাল দেব।

ন্যাসা কেঁপে ওঠে। তার ছানি পড়া চোখে জল আসে না। কেবলই মনে হয়, বিষ্টুপদ যেন তাকেই দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছে গাঁ-মুখো।

সমুদ্র কাঁকড়া

মাছখটির দক্ষিণ ধারে দাঁড়িয়ে ছিল তিলা। গুয়া ডাকল, আয়। যাবিনে? পূবধারে মেঘ জমেছে। মেঘ-দৈত্যের ছায়া এখন সমুদ্রে। কালচে দেখাচ্ছে চারপাশ। ঝাউবনের ওধার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে তিলা এগিয়ে এল। আলসেমি চলন। ফর ফর করে আঁচলের কানি উড়ছিল বাতাসে। বাগ মানান দায়। লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে খড়কুটোর মত এগিয়ে এল কোনমতে। এগিয়ে এসে আঁচলটা আষ্টেপিষ্টে লেপটে নিয়ে ঠোঁট কামড়ে গুয়ার দিকে তাকাল।

গুয়ার হাতে কাঁকড়া ধরার শিককাঠি। বেতবোনা খালুই। কোমরে পেচান গামছা। গায়ের গেঞ্জিটা ঘামে জবজবে। চোখ তুলে শুধোল, হলো কি তোর? রা কাড়চিস নে কেনে?

রা কাড়ার ক্ষমতা ছিল না তিলার। এই চড়া রোদে মুখটা শুকিয়ে আমসী, কাঁকড়ার বজবজানী জল কাটার চেয়েও করুণ ঠোঁট দুটো নড়ছিল। কোনমতে ধুঁকানী গলায় বলল, বেলা চড়চে? যেতে হলে চলো। আকাশের মতিগতি ভাল নয়। ঝড় উঠবে।

ঝড় ওঠার কোন লক্ষণ দেখল না গুয়া। কেবল পূবধারের প্রায় আঁধার ঝাউবনে হাওয়ার সিরসিরানী। সামান্য মাতাল ভাব। মানুষজন এদিকটায় বড় একটা আসেনা। মাইল খানেক দুরে পড়ে আছে ঝলমলে সোনাবালির চড়া। ওখানেই যত বাবু ভদ্দোরলোকের হৈ হল্লোড়। এদিকটা শ্মশান নয়, মরুভূমি নয়, দুয়ের মাঝামাঝি কিছু একটা। স্নান ঘাট নেই। কেবল উত্তাল ঢেউ, কামুক বাতাস। ভাঙ্গা নৌকো, ডিঙ্গি, খালুই, পচা জাল, ভাঙ্গা বাঁশ, সমুদ্র আর গাঁজরার ছড়াছড়ি। মরা বাউল মাছের চেয়েও স্তব্ধ নীরবতায় যেটুকু হৈচৈ আছে তা ঐ হরলালের মাছখটির চারপাশে। ওখানে এই ভর দুপুরেও চোলাই বিক্রি হয়। বিক্রি নিয়ে বচসা হয়' পুলিশ আসে। ঘুষ নিয়ে ফের চলে যায়। অনেকক্ষণ পরে তিলা বলল, বাবুরে সব বলেচ? কি বলল?

—কি আর বলবে, ঘোড়ার মাথা। বলল, রেট বাড়বেনি। কাঁকড়া ধরতে হলে ধর, নাহলে ভাগো। তোর আমার মত মিলা লোক নাকি মাল দেবার জন্য ফ্যা ফ্যা করে ঘুরচে।

—মিচে কতা। অস্থির একটা ঢেউ তিলার চোখে, আমাদের মত হতভাগা আর কে আচে? দুপুর গড়াল অথচ একমুঠো দানার দেখা নেই।

ব্যবসা নিয়ে বেশ কয়েকদিন থেকে হরলালের সাথে মন কষাকষি। ব্যবসা বলতে কাঁকড়ার ব্যবসা। চালান মালের রেট কমেছে। কাঁকড়া নাকি এই গরমে বাবুভাইরা খায় না। রপ্তানি করা মাল পচেগলে একসার। বাবুর তাতে বিরাট টাকার লস। লরি গিয়েছিল কলকাতা, খড়গপুর। সেখানেও বাজার মন্দা। দালালটাও সাপোর্ট করল বাবুকে। ফলে,

গুয়া একেবারে কোণঠাসা। —লস না হাতি। গুড়গুড়িয়ে ওঠে ওয়ার ভেতর। হাতের আঙ্গুল কামড়ে বলে, যে যায় লঙ্কায় সে হয় রাবণ। অথচ দেখ, পাঁচ বছর আগেও এই হরলাল আমার সাথে সমুদ্রে যেত মজুর খাটতে।

—সবই ভাগ্য। নিঃশ্বাস টেনে মুখের তিতকুটো জলটা ঢোক গিলে নেয় তিলা। বলে, এভাবে উজগারা দু-পাঁচদিন চললে আমি মারা যাব। আমার শরীলে আর সয় না। বড় হাঁপিয়ে উঠি গো!

—এ সময়টায় তোর আরাম দরকার।

—আর আরাম, মরলে গিয়ে আরাম হবে।

—কাল থিকে আর আসিসনে।

—না আসলে হয়? খাবা কি?

—যা পাই তাতেই হবে।

বেশ জোরের সাথে কথাটা বলে বেশ কিছুক্ষণ ঝিমধরে দাঁড়িয়ে থাকে গুয়ারাম। শুশুকের চেয়েও কুচকুচে চামড়ায় ফুটে ওঠে ঘাম। মুখের এখানে ওখানে চিক্ চিক্ করে বালি। পুরুষ মানুষের আফশোষ প্রথমেই ফুটে ওঠে মুখে। এখন চাষবাস নেই। যা ছিল নোনা জলের কামড়ে ধরাশায়ী। চৈত পেরিয়ে বোশেখের এখন মাঝামাঝি, তবু যদি একটু আকাশ ঢালত। বোশেখ মাসটা শুখা মাস। রোয়া বোনা নেই। মাঠ একেবারে বিধবার সিঁথি। দয়ামায়াহীন রাজা। কেঁদেকেটেও কোন লাভ নেই। অতবড় একটা সমুদ্রও কাজে লাগার নয়। নোনা জলে পেট ভরে না। বরং পেটে পলি পড়ে। অভাবে ঘুম আসে না। গুমোট গরম। দু'চোখের পাতা এক হয় না। তখন ক্ষিদে ভুলে শরীর নিয়ে কেবল নাড়া-ঘাটা। তিলা এখন পাঁচ মাসের পোয়াতি। ভাল-মন্দ খাওয়ার জন্য চুকচুকায় তার জিভ। পশ্চিম থেকে মা আসবে সাধ খাওয়াতে। সাত রকমের মাছ, ফল, তরকারী আর মিষ্টি। নতুন শাড়ি পরে দই চিড়ে ভেলিগুড় খাবে অনেকদিনের ইচ্ছে। কবে যে সাত মাস হবে! পেটে হাত বোলায় তিলা। পাতলা কানির ঢেউটা ছড়িয়ে পড়ে গতরে। গতর থেকে রক্তে। রক্ত থেকে কলজেয়। কলজে থেকে শিরা, উপশিরা এবং লোমকূপে।

খাঁ খাঁ করছে উপর আকাশ। একটা শঙ্খচিল চক্কর মারছে নীচ আকাশে। ঝাউবনের ওদিকে অবাধ্য হাওয়ার ফুসলানি। গুয়া বলল, চল। ভাগ্যে কি আছে দেখি। মেঘলাতে শিকার ভাল জমে।

শিকারের কথায় মুখ বেঁকিয়ে তাচ্ছিল্য মিশাল তিলা।

যাবা তো কাঁকড়া ধরতে তারে আবার শিকারে যাওয়া বলছো! এই দেখ, আমার হাত-গোড়ে কেমন হাজা নোনা জলে ক্ষয়ে গিয়েছে। খুব বেদনা হয়। শুলোয়। মোটে হাঁটতে পারিনে। বালি ঢুকে গিয়ে জ্বালা করে ঘা-গুলো।

গুয়ারাম তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। বউটার আঙ্গুলের ফাঁক-ফোকরে ঘা, সাদা হয়ে আছে নরম চাম এবং তার আশেপাশের অঞ্চল। তারও তো সেই একই দশা। নোনা জলের ছোবলে সেও তো ছ্যারাব্যারা। রাতকালে কুপি থেকে কেরসীন তেল বের করে এনে ঘষে। তখন একটু বেদনাটা কমে। হাসপাতালের লাল ওষুধে নরম পড়ে ভাল। আজকাল

আর সময় করে হাসপাতালও যাওয়া হয়ে ওঠে না। ধারে কাছে হলে কথা ছিল, হাসপাতাল যেতে হলে মাইল দুয়েক পথ ঠেঙাতে হয় তাকে। তাছাড়া টাইমে না গেলে ওষুধ মেলে না। সকালের দিকটায় কাঁকড়া পড়ে ভাল। সমুদ্র তখন উথলে ওঠা দুধ নয়, একেবারে সরপড়া শান্ত কোন এক জলাশয়। ভোর ভোর তাই বেরিয়ে যেতে হয় তাকে। তখন অবশ্য সঙ্গে তিলা থাকেনা। সংসারে তার কাজ আছে। বুড়ি মা তার। দেখাশুনার সব দায়িত্ব তিলার। যত্নের সাথে সবকিছু দায়িত্ব পালন করে মেয়েটা। গুয়ার মা যেন তার নিজের মা। আর বুড়িও জান দিয়ে ভালবাসে মেয়েটাকে। একটু কপাল কামড়ালে, কত যত্নে দাবিয়ে দেয় মাথা। চুলের ভেতর আঙ্গুল চালিয়ে কতরকমের কায়দা-কানুন। চোখে ভাল দেখেনা তবু রোজ বিকেলে বউটার মাথা তার দেখা চাই। যেন এক নেশা। কিছু বললে বলে, তু আমার ঘরের বৌ, লক্ষ্মী। তোরে ছুঁয়ে থাকলেও আমার পুণ্যি।

মাথা দেখতে দেখতে কত কথা, গল্প, হাসি। হা করে সবকিছু শোনে তিলা। শুনতে ভাল লাগে। কখনো বা শিউরে ওঠে গা। ৪৯ সালের ঝড়ের কথা বলতে বলতে ছলছলিয়ে ওঠে বুড়ির চোখ। সুড়ুৎ করে নাক টেনে চোখ মুছে নেয় ঘন ঘন। কুঁচকান কাটাকুটি মুখের চামে থিরথির কাঁপুনী। ভাঙ্গা গলায় বুড়ি বলে, সে তোরা দেখিসনি মা, দুপুরের ভাত খেয়ে মাদুর বিছিয়ে গা এলিয়েচি এমন সময় হুঙ্কার। চারপাশ যেন ঝনঝন করে কাঁপছে। দুড়দাড় হাওয়া বাসাৎ। বুমবুম করে এদিক সেদিক চক্কর খেল হাওয়া, আবার ঠোক্কর খেয়ে আছড়ে পড়ল। কড়্কড়্ করে নড়ে-চড়ে উঠল ঘরের কড়ি-বর্গা। ঘর থেকে শ্বাশুড়ির হাত ধরে বেরিয়ে এলাম তক্ষুণি। বাইরে এসে দেখি চারদিক কালো হয়ে আছে, আশপাশ সব আঁধার। আর হাওয়ার কি শিস! যেন এফোঁড় ওফোঁড় করে দেবে চারপাশ। বলেই কানা বুড়ি বুকের কাছে হাত বুলায়। তার দুচোখে তখন জলের ধারা। সেই ঝাপসা চোখে বহু বছর পিছিয়ে যাওয়ার চিহ্ন। ডাঁই উকুনটা নখের ডগায় চেপটে বড় করে শ্বাস টেনে বলে, বুঝলি মা, এই সব্বনেশী ঝড় আমার সব নেলো। মানুষটা যে সমুদ্রে গেল আর ফিরে এলনি।

সমুদ্রকে তাই বুড়ির ভয়। বুকের ভেতর যেন কালসাপ শুয়ে আছে তার। বাগ পেলেই ছোবল মারবে। নোনা জলের বিষকে বিশ্বাস নেই।

গুয়া তখন পেটে। মানুষটা জেলে ডিঙ্গায় গেল আর ফিরল না। হাত-পা ছড়িয়ে দুয়ারে বসে খুব কেঁদেছিল তখন। তার চার মাস পরে গুয়া তার নাড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে এল আলোতে। একদম ঘরের মানুষটার মত দেখতে। হলে কি হবে? ছেলেটা মোট্টে আদর-যত্ন পেল না। জ্ঞান পড়ার পর থেকে নিজেরটা নিজেকে জুটিয়ে নিতে হয় তাকে।

জোয়ান হতেই তিলাকে সে ভাগিয়ে আনল ঝুপড়িগুলোর আশপাশ থেকে। মেয়েটা ভাল। কথা শোনে। সাত কথায় এট্টা কথাও রা কাড়ে না। তাছাড়া, সংসারের দুঃখ বোঝে। টান আছে।

গুয়া বেরলে সেও বেরিয়ে পড়ে কাঁকড়ার খোঁজে। তার হাতেও শিককাঠি, খালুই, আর নাইলন সুতোর ছোট জাল। মানা করলে নিষেধ শোনে না। বলে, ঘরে বসতে মন চায়নি মা। খেটে খেলে কত আনন্দ। লাল্ চাল তখন বড় মিঠে মনে হয় আমার।

বুড়ির খনখনে গলায় প্রতিবাদ, এ ঘরের বউরা কোনদিন বাইরে যায়নি। তুই গেলে লোক হাসবে। কু'কথা রটাবে।

কিছুটা দমে যায় তিলা। কিন্তু পরক্ষণে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে, খেটে খেলে লাজ লাগেনি আমার। তাছাড়া আমি তো ঘরের বাইরে যাচ্ছিনে। সমুদ্র তো আমার ঘর। নিঃশ্বাস, প্রশ্বাস। ওখানেতো আমার শ্বশুর আছে। আমার খারাপ কিছু হলে সে আমারে দেখবে। কিগো মা, বল দেখবেনি?

উকুন মারা থামিয়ে চুলে বাসনা তেল ঘষে বুড়ি। একেবারে কোমর অব্দি লতান চুল পেয়েছে বউটা। মুখটা ভারি মিষ্টি, সমুদ্র ফেনার চেয়েও নরম—যেন টোকা মারলেই অভিমানে ফুলে উঠবে সরু চাকলির মত নরম নরম আর পুরু চেপ্টা দুই ঠোঁট। এমন বউ বাইরে বেরুক কোনো শ্বাশুড়িও চায় না। তবু, ছেলেটা একা যায়। বউটা সঙ্গে গেলে ভরসা। প্রফুল্ল মাঝি এসেছিল, গুয়াকে জেলে নৌকোয় নিয়ে যাওয়ার জন্য। বলেছিল, গুয়ারে আমার হাতে ছেড়ে দাও খুড়ি, ওরে আমি নোনা জলের কায়দা কানুন শিখিয়ে পাক্কা করে দেব। তখন পয়সা ধরতে অসুবিধা হবে না, তোমার অভাবটাও ঘুচবে।

বুড়ি কিছুতেই রাজি হয়নি। 'ঘরের মানুষটাতো পয়সা পয়সা করে মরল। সেদিন হারে হারে না করেছিলাম, বলি যেও না গো—তোমার দুটি গড়তল ধরি। আজ আমার হাত থিকে সরবৎ গেলাসটা পড়ে ভেঙ্গে গেল।' কথা শোনেনি, তীরের মত ছিটকে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে মানুষটা। যাওয়ার সময় বলল—খাটা শরীর আরাম চায় না মোক্ষদা। তু ভাবিসনে, যাব আর আসব।

কত বড় মিথ্যুক। বলে কিনা, যাব আর আসব। কই এল? আজ ২৫ বছর ছেলেটাকে নিয়ে কেবল এদোর-সেদোর। গতরখাকি কুকুরের কেবল হামলা হুজ্জোত। ছুঁকছুঁকানি। ঘরের বউটা যায়। তাইতো ভয়। সমুদ্র হাওয়ায় কেউটে সাপের বিষ। মানুষগুলোও এক একটা বিষধর। কেবল ছোবল মারার ধান্দা। একবার সুযোগ পেলে বিষ ঢেলে দেবে শরীরে।

হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর এসে গিয়েছিল ওরা। উল্টোপাল্টা হাওয়ায় দশদিকে কেমন খাই খাই রব।

তিলা বলল, গতিক ভাল নয়। খপ খপ চল। সাঁঝ হবার আগে ঘর ফিরব। মা একা আছে।

মায়ের কথা এতক্ষণ ভুলেছিল গুয়া। মনে পড়তেই ময়রা দোকানের কথা মনে পড়ল। বালি বাঁধের ওধারের হাবলু ময়রার দোকানে কড়া পাকের জিলিপি আজ চাট্টি নিয়ে যেতে হবে। বারবার করে বলছিল, বহুদিন খাইনি, বাপো। সেদিন গোবর কুড়াতে গিয়ে দেখলাম থালিতে থাক থাক সাজান। রং দেখে লোভ হয়।

তিলাটা পোয়াতি। মুখ ফুটিয়ে ও কোনদিন খাবার কথা বলে না। সংসারের হাল-চাল সব বোঝে বলেই কোন আব্দার নেই ওর। সেদিন রাতে মুখ ফসকে বেরিয়ে এসেছিল একটা সামান্য আব্দার। বলেছিল, চর্বিজমা সমুদ্র কাঁকড়া খাবে গো। এসময় কাঁকড়ার গায়ে চর্বি জমে। খেতেও সুয়াদ।

—এ আর এমন কি কথা? হেসে উঠেছিল গুয়া। বৌয়ের ঈষৎ চাগিয়ে ওঠা পেটে হাত রেখে কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিল মুহূর্তে। বাপটাকে সমুদ্র খেল! যার বাপ নেই তার কোন ছায়া নেই। বাপ থাকলে কি এমন হোত? এমন করে দিনদুপুরে ঠকাতে পারত হরলাল? মাল নিয়ে ঝুটঝামেলা হোত না শুধু মুধু। লোকটা মহাহারামী, চোখের চামড়া নেই। নির্লজ্জ। সেদিন মসকরা করে বলল, তোর বৌ তো খাসা রে। কেমন তাকায়, ভিমরী লাগে জানে! এত সুন্দর বউ থাকতে তবু তোর অভাব?

তিলার গড়ন ভাল। এই আঁটোসাটো গড়নই কাল হয়েছে গুয়ার। সমুদ্র চত্বরে খারাপ মানুষ বালির চেয়েও সহজ লভ্য। তাই নজরে নজরে রাখতে হয় বৌটাকে, নাহলে এই ঝাউবাগানে কোনদিন ওর সর্বনাশ হয়ে যেত।

সমুদ্র কাঁকড়া খেতে চেয়েছে তিলা। গুয়ার কত আনন্দ এতে। একটু মেহনত দিলেই, দুদিন সমুদ্র ধারে ঘুরলেই, প্রমাণ সাইজের কাঁকড়া ধরে ফেলবে সে। এ আর এমন কি কঠিন কাজ? ছোট, মাঝারি কাঁকড়া তো আকছারই মেলে। দু কিলো তিন কিলোর উপরে কাঁকড়া ধরাটাই বাহাদুরীর কাজ। শুধু বাহাদুরীতে কাজ হয় না, চকচকে ভাগ্যও দরকার। ক'দিন থেকে হাতে লোহার শিককাঠি নিয়ে ঘুরঘুর করছে গুয়া। মনের মত মাল এখনও নজরে পড়েনি। যা পেয়েছে সব কচি। বড় জোর পাঁচশ' এক কেজি। খোল ছাড়ালে, দাঁড়া বাদ দিলে এর আর কি থাকে? আর চর্বি বলতে কিছু নেই। পেট ভর্তি কেবল নোংরা মল। ঘর নিয়ে যায়নি এসব। ইচ্ছে আছে এমন জিনিস নিয়ে যাবে সে যা দেখে চমকে উঠবে গর্ভের শিশু। তিলা আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলবে, কুথায় পেলে গো! বাঃ, বেশ দেখতে-তো!

বুড়ি মা-টা বলবে, বাপোরে, আর যাবুনি। এ যে দেকচি যমরাজ। বাগ পাই কি কামড়ি দিলে আর বাঁচবুনি।

তখন হা হা করে হেসে উঠবে গুয়া। হোঁচট খেয়ে ভাবনা ছিঁড়ে যায় গুয়ার। তিলা তার পাশে নেই। খালুই আর শিককাঠি নিয়ে নোনা জলে পা ছুঁইয়ে এগিয়ে গেছে অনেকটা। কিছুটা গিয়ে বসে পড়ল তিলা। ঘাড় ঝুঁকিয়ে শিককাঠিটা ঢুকিয়ে দিল কাদা-কাদা বালিতে। কাঁকড়ার ঘরবাড়ি সব অন্য রকম। অভিজ্ঞ চোখে বুঝে নিতে দেরী হয় না তিলার। একদম পাড়ের কাছাকাছি, সামান্য জল কাদা বালিতে গা লুকিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকে দশদাঁড়ার মানিক। খুব ভাল ভাবে দেখলে নজরে পড়বে বুড়বুড়ির শব্দ। তার মানে নিঃশ্বাস নিচ্ছে মক্কেল। থিতিয়ে থাকা জলে বুদবুদ গুলো উপরে উঠেই ফেঁসে যায়। তখন একদম নিশ্চিত শিক চালিয়ে দেওয়া যতদূর যায় ততদূর। একসময় খোঁচায় খোঁচায় তিতি বিরক্তি ক্রুদ্ধ দাঁড়া চেপে ধরে শিক। দু'হাতে তখন বালি সরিয়ে দাঁড়া চেপে ধরে সরাসরি খালুই-র অন্ধকার গহ্বরে। তখন বাপুর ছটফটানী দেখে কে! যেন কেটে ফেলবে খালুই, ছিটকে হানা দিয়ে এগিয়ে যাবে নীল জলে। তখন তার দাঁড়ার শক্তি যেন ইন্দ্রের ব্রজ্রের শক্তি। কার সাধ্য তাকে হারায়?

খোঁজাখুঁজি চলছিল এই ভাবেই। সন্দেহজনক জায়গা দেখলেই ঝুপ করে বসে পড়েছে গুয়া। তারপর শিখকাঠি বালিতে চালান করে অভিজ্ঞ চোখের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কোনবার

হারে, কোনবার জেতে। এই হার জিৎ-এর খেলায় একটা মজা আছে, তখন আর হরলালের দরদামের কথা মনে পড়ে না। একটা নেশা, একটা জেদ কাঁকড়ার দশ দাঁড়ার মত চেপে ধরে থাকে। তার দু'হাত, কাঁকড়ার দশ হাত। দু'হাত দিয়ে দশ হাতের সাথে মোকাবিলা। এরকম যুদ্ধটায় কখনো কখনো হারতে হারতে জিতে যায় গুয়া। কপালময় দরদরিয়ে নেমে আসে ঘাম। পিঠের কাছটা, হাতের কনুই সব ব্যথা করে। যতক্ষণ না টেনে তুলছে বালির ভেতর থেকে ততক্ষণ কোন অধিকার নেই তার। জলের জীবের জলেই শক্তি। একবার খালুই-এ পুরতে পারলে সব বাছাই টাইট। তখন মুখ থুবড়ে ক্রুদ্ধ চোখ ঠিকরে দেয় অভিসম্পাত।

কখনো কখনো এই জীবটার চোখে জল দেখেছে গুয়া। তবে তা সমুদ্রের জল না চোখের জল বুঝতে পারেনি সে। মাদীগুলো ধরলে ছড়ছড় করে বাচ্চা ছেড়ে দেয় বালিয়াড়িতে। লাল পিঁপড়ের চেয়েও একটু বড় বড় ছা। সবে হয়ত ডিম ফুটে বেরিয়েছে। কি সুন্দর সুড় সুড় তাদের যাতায়াত! পায়ের চাপে থেঁতো হয়ে যায় দশ বারটা কিংবা আরো বেশী। তবু কোন তোয়াক্কা নেই গুয়ার। শাসন করার জেদে তার ভেতরটা তখন ফুটছে। বালি থেকে টেনে তুলতেই তার জিৎ। জেতার নেশা ধারাল নেশা, পাগল নেশা। হারলে মুচড়ে যায় ভেতরটা। সেবার কিলোখানিক ওজনের মালটা হাত ফসকে ছুঁড়ে দেওয়া হাতের ঢিলের মত চলে গেল জলে। যেন জল ডাকছিল তাকে। আটকাতে পারেনি। হাঁটু জল অব্দি নেমে গিয়ে পা দিয়ে চেপে ধরেছিল মক্কেলকে। আর যায় কোথায়! ফিরে এসে রাগে বসিয়ে দিয়েছে দাঁড়া। ছাড়ে না কিছুতে। নীল জলে তখন রক্তের ছোপ। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছে গুয়া। শেষে বুদ্ধি করে পাল্টা ছুঁড়ে মারল গুয়া। ভারী শরীর নিয়ে ছিটকে পড়ল কাঁকড়া। তারপর আর ফিরে তাকায়নি, একেবারে গভীর জলে।

কাঁকড়া ধরার আট ঘাট গুয়ার সব জানা। তৈরী চোখ এখন এক পলকেই বুঝে ফেলে কোথায় আছে প্রমাণ সাইজ মাল। মাঝে মাঝে তার মনে হয় শিককাঠিটা না থাকলে তাকেও জব্দ করে ফেলত জীবগুলো। বহু গভীরে শিকড় চালান গাছগুলোর চেয়েও আঁটোসাঁটো বন্ধন কাদাজলের। উপড়ে তোলা কি চাট্টিখানি কথা! একটু অন্য-মনস্ক হলেই কচি পুঁই শাকের মত আঙ্গুল কেটে দু টুকরো করে দেবে ধারাল দাঁতে। এমন অনেকের হয়েছে।

বর্ষাকালে খালে পাড় ধরে সে কাঁকড়া ধরতে যেত দল বেঁধে, তখন ঘাস ফড়িং, উচিংড়ে আর পাকা তেলাকুচা নিয়ে খেলার সময়। ছিপকাটিতে টোপ গেঁথে ধান খেতে ফেলে ফ্যাতনার দিকে হা করে তাকিয়ে থাকতে কার না ভাল লাগে? মা বলত, ধানের পচা গোড়া খেতে ভেটকি মাছেরা নাকি সাঁতরে সাঁতরে চলে আসে। আর দু' খাবলা পচানে গোবর ফেললে তো কথা নেই। তুঁড় মাছ থেকে শুরু করে একদম বেলে মাছ অব্দি হুমড়ে পড়বে। সেই বয়সে আমন ভুঁইয়ের গর্তে হাত ঢুকিয়ে কালিয়া কাঁকড়া টেনে তুলেছে গুয়া। বিপজ্জনক কাজ। বিল কেউটে, শামুকে কেউটে, আল কেউটে, চায় কি ঢোড়া পর্যন্ত লুকিয়ে থাকা অস্বাভাবিক নয়। ভেজা আলের চারপাশ থেকে ঝুলে থাকত জলো ঘাস, কলমী পাতা আর সুষনির ভার শরীর। চাঁইবাঁধা হিষ্ট-পুষ্ট দূর্বা ঘাস তখন যেখানে সেখানে। কালিয়া কাঁকড়ারও তেজ কম নয়। কুচকুচে কালো তার শরীর, অনেকটা ভাদ্র মাসের পাকা তাল।

কামড়ে ধরলে এরও জ্বলন অনেক। চিতি কাঁকড়া আর ফুসী কাঁকড়ারা বড় বেশী নিরীহ। ফকির চাচার ছোট ছেলেটার মত, সাত চড়েও রা কাড়ে না। যারা রা কাড়ে না তাদেরই তো বিপদ বেশী। ফকির চাচার ছোট ছেলেটাকে একদিন তাঁতী বাড়ির কুকুরটা কামড়ে দিল। উঃ, কি রক্ত। শেষে হাসপাতালে তুলোয় করে কি সব লাগিয়ে দিতেই চামড়া পুড়ে পচে একাকার। ফুসী কাঁকড়ার চচ্চড়ি খেতে খারাপ লাগে না। তার মায়ের হাতের রান্নাটা ভারী চমৎকার। খেতে বসলেই তার মা প্রায় বলত, ফুসী কাঁকড়া ধরবি নে বাপ, এরা হলো গিয়ে চাষীর সখা। জলা ভুঁই-এর পোকা-মাকড় খেয়ে সাফ সুফ রাখে জমি। বড় উপকারী জীব।

রেগে তেতে উঠত গুয়া, বলত উপকারী না ছাই। সব বদমাসের ধাড়ি। মানিক বলছিল, আশ্বিন মাসে ধানের ফুল বেরলে ওরা হাপড়ে সাপড়ে খেয়ে নেয় ওগুলো। ধারাল দাঁড়ে কেটে দেয় কাঁচ ধান-শিস। ওদের আমি ধরতে পারলে পুড়িয়ে খেতাম।

—ও কথা বলিস নে, পাপ হয়।

—পাপের আমি নিকুচি করি। দশভুজরা বড় বজ্জাৎ। ধরতে পারলে দাঁড়া ভেঙ্গে নুলো করে দিতাম ওদের। আমার রাগ তো চেনে না! আমার নাম গয়ারাম।

ছেলের মাথা যে গোবর পোরা তা ভাল মতন বুঝতে পারত মোক্ষদা। বুঝে-শুনে হাসত। তার হাসি দেখে রাগে ফুসত গুয়া। তার মা তাকে বোঝাত।

—একথা বলিসনে। ধানের ফুল না খেলে যে ফুসী কাঁকড়া বাঁচে না। ফুল খায় বলেই তো চর্বি হয় গায়ে। ওরা তখন ডিম ছাড়ে—ডিম না ছাড়লে যে বংশ বাঁচে না।

গত ছ'মাস থেকে কাঁকড়া ধরা গুয়ার পেশা। মিঠে জলের চাষ নেই। মাঠ এখন খালপোশ করা মুরগীর চেয়েও কুৎসিৎ। তাকালে জ্বালা জ্বালা করে চোখ। চারদিকে রোদের হিলহিলানী। তার মধ্যে বুম বুম করে মাথা। অসহ্য ভার ঠেকে দুনিয়া জগত। কোথায় হারাল সেই সবুজ পাড় ঢেউ, শস্য পূর্ণ মাঠের সলজ্জ হাসি আর কল আসা ধানের চেনা সেই ভুবনমোহন ঘ্রাণ? চোখ বুঁজলে এখন কেবল হলুদ গোলা বুদবুদ, কষ্টের জিল-জিলে চোরা স্রোত। সমুদ্র কাঁকড়ার ডিমের মত গোল গোল দুঃখ বলয়। মাঠ বালির সাথে কাজও বেপাত্তা। সমুদ্র কিনারের ঝুপড়ির লোকগুলো প্রাণ হাতে নিয়ে ঢেউ-র মাথায় পেতে আসে ইলিশমারীর জাল, সমুদ্রে রাঁধে বাড়ে, সমুদ্রে ওদের ঘর।

গুয়াও চলে যেত। মাঝ দরিয়ার স্থির নোনা জলে টাকা আছে। মা তাকে যেতে দেয়নি। পথ আগলে মরা বাপের দিব্যি দিয়েছে।

—তোর বাপের দিব্যি। যাবি নে বলচি। নোনা জল সবার কপালে সয়না। যার সয় তার হয়। যার সয় না তার ক্ষয়।

দুয়ার ডিঙাতে পারেনি গুয়া। মা যেন আঁকসি লতা হয়ে জড়িয়ে গেছে শরীরময়। তিলার বোবা চোখের ভাবা বাবলা আঠার চেয়েও আঠা। এ আঠা যার গায়ে লাগে সে যে স্বর্গে গিয়েও সুখ পায় না।

সেই থেকে শিককাঠি হাতে গুয়ার নিত্য ঘোরা ফেরা সমুদ্র পাড়ে। ঢেউ-র মাথায় ফেনা দেখে হলফ করে বলে দেবে তা কত দূরের ঢেউ—তাতে কি কি মাছের উৎপন্ন।

বলে দেবে, সাপ আছে কিনা—থাকলে তা বিষধর কিনা। সমুদ্রের সাপ মাত্রই বিষধর। ছুঁবলালে নিস্তার পাওয়া দায়।

সব জেনে শুনেও আসতে হয় গুয়াকে। পেটের জন্য, নিজের জন্য। শ্বশুরঘর থেকে বড় শালা আর শ্বাশুড়ি আসবে সাধ ভাত খাওয়াতে বৌকে। তখন একটা বিরাট খরচের ধাক্কা। অন্তত তিলাকে একটা নতুন শাড়ি দিতে হয় প্রথামত। সেই সংগে দই চিড়ে নলেনগুড় পাকা রম্ভা। সাত রকমের মাছ তরকারী মিষ্টি আর ফল। কোথায় পাবে এতসব!

টাকার দরকার। টাকার জন্য আঁতিপাতি চলে কিনারের আনাচে কানাচে, কাঁকড়ার অনুসন্ধান। ক'দিন ধরে পড়তাটা তার মন্দ। জোয়ারের আগে ওরা যে সব কোথায় লুকোয় বলা মুশকিল। হয়ত নিশ্চিত আশ্রয়ের খোঁজে চলে যায় স্থায়ী নির্ভরযোগ্য কোন ঠিকানায়। সে ঠিকানা গুয়ার জানা নেই। জানা থাকলে যেত। যত বিপদ হোক সে যেত।

দু'দিনের অভুক্ত শরীর, জেদ টং টং করে, উত্তেজনায় কেঁপে ওঠে হঠাৎ হঠাৎ। তিলাকে সে ঐ দূরের ঝাউবনে নিয়ে গিয়ে দাপড়ে-সাপড়ে খেয়েছে। তিলাও খেয়েছে তাকে। খাবার বলতে ঐ টুকুই। চারদিকে এখন ধস, বালিয়াড়ি ধসছে সমুদ্রের কামুক ঠোঁটে। এখন ক্লান্ত বালিয়াড়িতে মরা কাছিমের খোল, খোলের হাওয়া।

তিলা কতদূর চলে গেছে দেখতে পায় না গুয়া। এরকমটা সে প্রায়ই চলে যায় নেশায় নেশায়। আবার ফিরে আসে, সাঁঝ নামার আগে।

আকাশের যা মতিগতি তাতে আজ অসময়ে সাঁঝ নামবে। সূর্য হেলছে পশ্চিমে। সেই লাল পিণ্ডের উপর কেউ যেন ছিটিয়ে দিয়েছে পাঁক-মাটি। ফলে পশ্চিম দিকটা অন্ধকার। গুমোট একটা আবহাওয়ার মধ্যে ঝড় ওঠার পূর্বাভাষ। মা বলেছিল, আজ পূর্ণিমা। বউরে নিয়ে তুই যাস নে। তুই একা যা। অবেলায় বদ-বাতাস লাগলে চমকে যাবে তোর ব্যাটা—প্রসব হতে কষ্ট পাবে বউটা।

গুয়ার ভেতরটা দুমড়ে-মুচড়ে একাকার হয়ে যায়। ঠাসঠাস করে নিজের দাড়ি ভর্তি গালে চড় বসিয়ে দিতে মন চায়। সে কি পুরুষ মানুষ না বৃহন্নলা। এই অবস্থায় কেউ কি বউকে একা ছাড়ে। যদি বদ-বাতাস লেগে বউটার কিছু হয়ে যায়—এই ভয়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে তার গা।

—তিলা—আ-আ-আ। চিৎকার করে ওঠে গুয়া। তার চিৎকার গড়িয়ে যায় নীল জলে। শ্যাওলা কিংবা রঙিন মাছ হয়ে ঢেউ-র মাথায় ভাসতে থাকে শব্দ।

সে আবার ডাকে, তিলা—আ-আ-আ। ফিরি আয়—অ-অ। আকাশ ভাল নয়, ঝড় উঠবে।

ঢেউ যেখানে থেমে যায় সেই শেষ জলরেখা ধরে তাল সারির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে গুয়া। হাওয়ায় রোধ হচ্ছে গতি, ধূতির ভেতর হাওয়া ঢুকে পাল তোলা নৌকার মত পত পত করছে হামেশা। এক একটা ঢেউ দশ হাত উঁচু হয়ে আছড়ে পড়ছে কিনারায়, পাথরে পড়েই ছিটকে যাচ্ছে জল, ফেনা। পুরো সমুদ্রশরীরের গন্ধ উঠে আসছে ডাঙ্গায়। নোনতা জলের ঘ্রাণে ভরে যাচ্ছে আশপাশ। দূরে জেগে উঠল জেলে নৌকা। পাড় থেকে কে যেন বাজিয়ে দিচ্ছে সাইরেন। হোটেল গুলোর মাথার উপর চক্কর খায় কেরী পাখি, মেছো

কাক আর শামখোল। ক' পা যেতেই গর্তে পায়ের চেটো দেবে যায় গুয়ার। তাকিয়ে দেখে শিকার। ঘোলা কাদামাটি বালিজলে বড় বড় ফুসকুড়ি, বুদবুদ। ফিরফির করে কাঁপছে ভেজা বালির সরু সরু দানা। যেন নীচে শুরু হয়েছে ভূমিকম্প, প্লাবন। হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাতের নখে আঁচড়ে ফেলে বালি। তারপর শিককাঠিটা খুব সহজে ঢুকিয়ে দেয় বালিতে। ভেজা বালিতে শিককাঠিটা ঢুকে যায় অনায়াসে। খুঁচিয়ে বার করে আনতে গেলেই বিপদ। বালির নীচ থেকে কামড়ে ধরেছে মক্কেল। দু'হাতে গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে শিককাঠিটা নাড়তে থাকে গুয়া। কড় কড় শব্দ হয়—যেন বেঁকিয়ে দেবে শিক। শেষে মরিয়া হয়ে খোঁচাতে থাকে গুয়া। বুঝতে পারে—এতদিন পরে ভগবান তার কথা শুনেছে। নির্ঘাৎ দু'চার কিলোর কম হবে না! নাহলে এত শক্তি পায় কোথা থেকে? এটা আর মাছ খটির হরলালকে বেচে দেবেনা সে? ঘর নিয়ে যাবে। তিলার বহুদিনের শখ চর্বি বোঝাই সমুদ্র-কাঁকড়া খাওয়ার। ভাল-মন্দ কিছুই তো তেমনভাবে খাওয়াতে পারেনি সে। কাঁকড়াটা দেখে নিশ্চয়ই খুব খুশী হবে তিলা। কিন্তু মক্কেলটা যে উঠছে না কিছুতে! নিরুপায় হয়ে দু'হাত দিয়ে সরাতে থাকে বালি, যেন বালির নীচে গচ্ছিত আছে তার যাবতীয় গুপ্তধন। যে করেই হোক টেনে তুলতে হবে।

বালি সরিয়ে ডান হাতটা বালির নীচে সিঁধিয়ে দিতেই খপ করে কে যেন কামড়ে ধরে হাত। এত দ্রুত ঘটনাটা ঘটল কোন কিছু বোঝার সুযোগ পেল না গুয়া। বালির প্রায় ফুট খানিক নীচে গুয়ার হাত, আর যন্ত্রণায় কষ্টে দুমড়ে যাচ্ছে সে। বের করে আনবে, তেমন কোন উপায় নেই, শক্তি নেই। বারবার চেষ্টায় সে যখন ক্লান্ত তখন উথাল-পাথাল ঝড় শুরু হল প্রকৃতিতে। ঝাউবন কাঁপছে, দুলে যাচ্ছে তাল সুপারির কোমর। এলোমেলো বালু হাওয়ায় বিপর্যস্ত বালিয়াড়ি। চোখে হাত চাপা দেবে তেমন শক্তি পর্যন্ত তার নেই। এক একটা ঢেউ এগিয়ে আসছে সামনে, আর নুইয়ে দিচ্ছে মাথা। এক একটা ঢেউ-এর আঘাতে নির্দিষ্ট এক গন্তব্যে এগিয়ে যাচ্ছিল গুয়া।

জ্ঞানবৃক্ষের ফল

শংকর যখন রাধার বাড়িতে গিয়ে পৌছাল রাধা তখন পুকুরঘাটের পচা বাবলার গুঁড়িতে বসে আমপাতায় পা ঘষছে। পিঠের উপর ঘন ছড়ানো চুল, ঝুঁকানো ঘাড় জলের দিকে। চালতাগাছের ফাঁক দিয়ে যেটুকু রোদ আসে তাতেই ফর্সা মুখের ছায়া পড়েছে জলে। হাওয়ায় ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে সেই মুখ এখন মাঝ জলে। পা'টা নামানো ছিল। মাঝেমাঝেই তেচোকো আর মুরালা মাছে ঠুকরে দিচ্ছিল পা।

এই সময়টা রাধার বড় ভাল লাগে। আকাশের কোল ছুঁয়ে বাহারীবরণ মেঘ যা ঝলমলে ওড়নার চেয়েও দামী, হুটহাট কোথা থেকে যে উড়ে আসে হদিশ মেলে না। বিকেলের ছায়া যত দীর্ঘ হয় ততই ঘরে ফেরার তাড়া জাগে ভেতরে। একটা অলসতা তাকে ছুঁয়ে থাকে সর্বদা। রাতজাগা শরীর বরফের মত হিম হয়ে জুড়োতে চায়। এর জন্য সময়ও চাই। সে সময় তার নেই। বাড়িতে মা একা। বিকেল বেলাটায় ঝামেলার অন্ত নেই। মাঠ থেকে গরু ফিরে আসে গোয়ালে। গোরু বাঁধার কাজ আছে। গোয়াল ঘরে মশা-মাছির উৎপাত। ধুঁয়ো না দিলে সারারাত লেজ নাড়ে, কান ঝাপটায় গোরু গুলো। খলা-বাহির ঝাঁট না দিলে সন্ধ্যাপ্রদীপ দেওয়া যায় না।

ভুস্ করে ডুব মেরে তাড়াতাড়ি ঘর ফিরতে চায় সে। সাঁঝ হতে আর বেশী দেরী নেই। ডাঙ্গাপড়িয়ার মাঠের দিকে সূর্য ঢলছে। আর একটু পরেই কচার ঝোপে আঁধার ঘনাবে। পথে-ঘাটে শুয়ে থাকবে ভুসো কালির আঁধার।

একটু পা চালিয়ে না গেলে বাঁশঝাড়টা পেরোতে তার ভয়ভয় লাগে। সোমত্ত মেয়ে অবেলায় নেয়ে অতটা পথ যাওয়া চাট্টিখানি কথা! সাউদের কাঁটা বাঁশঝাড়টা পেরলেই তাদের চালাঘর। তেকাঠি গাছের বেড়া তাদের ঘরের চারপাশে।

উঠে দাঁড়িয়ে কোমর জলে যেতেই তার চোখে পড়ল একটা গাভীন ডাহুক। হেলেঞ্চা ঝোপের উপর দিয়ে কক্-ককক্ করতে করতে ছুটে যাচ্ছে একেবারে জলের কাছাকাছি। ডাহুকটার গলার সাদা দাগটা যেন মতির মালা, ঝকঝকে পালকে তেল চুয়ায়। কেমন ভয়লেশহীন ডাহুকটা।

কোমর জলে দাঁড়িয়েই হাতে তালি দেয় রাধা। জলপোকারা গোল্লা কাটছে জলে। ব্যস্ত ডানায় উড়ে যায় ভীত ডাহুক।

জলের আয়নায় রাধার এখন মুখ দেখার পালা। প্রতিদিনই দেখে। মুখ ভেঙায়, আহা কি রূপের ছিরি!

কথাটা তার বাইরের, ভেতরের নয়। রাধা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজেকে দেখে। যত দেখে তত অবাক। তার মা বলে, 'গরীবের এত রূপ ভাল নয়। তোর জন্যি আমার ভয় হয়

রে রাধা।' জবাবে মুচকি হাসে সে।

রূপ কি জিনিস তা অনেক আগেই জেনে গিয়েছে সে। বাড়ির ভাঙ্গা আয়নাটাই তাকে রূপের পাঠ দিয়েছে। গালের দু'পাশে মস্ত টোল দুটোর নাম রূপ। আর যৌবন? যৌবন সম্বন্ধে তার ধারণা ঘষা-কাচে চোখ লাগিয়ে সমুদ্র দেখার মত। সেবার 'সতী বেহুলা' পালায় তার বুকের কাপড়টা সরে গিয়েছিল সামান্য। সে নিজেও এতটা খেয়াল করেনি। অথচ, হারমোনিয়াম বাজায় সেই ছেলেটা তাকে পানের খিলি এগিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'তোমার ঢেউ-দেওয়া যৌবন বানের জল নয় গো—আগুনের ফুলকি! যে ঝাঁপাবে সে-ই মরবে।' কথাটা বলেই প্রচণ্ড হাসছিল ছেলেটা আর কেমন বিশ্রীভাবে তাকিয়েছিল তার বুকদুটোর দিকে। তাহলে যৌবন মানে কি বুক, ঢেউখেলান বুক?

আপন মনেই খিলখিলিয়ে হেসে উঠল রাধা। জলে ভিজে তার শরীর এখন মাখা ময়দা। আর বেশীক্ষণ জলে থাকা যায় না। হৃদী (শ্যাওলা) সরিয়ে যেই ডুব দিতে যাবে অমনি তার খোলা বুকের দিকে তাকিয়ে ডুব দেয় একলা মাছরাঙা। রাধা হাসে। কলমিলতার ফুল হাসে। চালতার হলুদ পাতা জলের ঢেউ-এ সাঁতার কাটে। খলবল করে বাতাস।

একসময় কানে আঙুল দিয়ে জলের গভীরে নিজেকে লুকিয়ে ফেলে রাধা। কালো গোছা গোছা চুল ছড়িয়ে যায় জলের শরীরে, যেন শেকড় মেলে দিয়েছে কোন জলো গাছ।

২.

রাধা যখন ভেজা শাড়িতে পুকুর পাড়ে উঠে এল তখন শুনশান হাওয়া বইছে চারধারে, বাঁশপাতা ঘুরপাক খেতে খেতে নেমে আসছে ধুলোয়। আকাশের মতিগতি ভাল নয়, ঝড় উঠতে পারে এই ভেবে লম্বা-লম্বা পা ফেলে রাধা যখন তেকাঠি বেড়ার কাছাকাছি, তার ছোট বোন সুধা এগিয়ে এসে বলল, 'খপ খপ চ দিদি, মা তোরে ডাকে।'

'কেনরে?'

'আমি তার কি জানি?'

সুধা সব জানে তবু, দিদির কাছে মুখ ফুটিয়ে সে কিছু বলে না। যাত্রাদলে যেতে দিদির যে একদম মন নেই। যদি রেগে যায়—এই ভয়ে সেও চুপ।

রাধা বলল, 'ঘরে বুঝি কেউ এয়েচে? বায়নদার বুঝি...?'

সুধা মুখ নীচু করে হাঁটছে। রা নেই তার মুখে। নির্জন পথে এখন কারোর মুখে কোন কথা নেই। কেবল রাধার ভেজা পায়ে খড়কুটো। মাঝেমাঝে ভেজা শাড়িতে আটকে যাচ্ছে পা। এ সময়টায় বাতাস বড় গোমরা। পথ যেন জারজ অসহায় শিশু। কিছুটা গিয়ে সুধা বলে, 'সেবারও তুই আমার ছাপা ফ্রকটা এনে দিলি না। এই দেখ দিদি, ঘাড়ের কাছটা কেমন ছিঁড়ে গেছে। বিশ্রী।'

ফ্রক আনার কথা ছিল, আনতে পারেনি রাধা। দলওয়ালারা পালা শেষে টাকা দেয়নি। মহা ছ্যাচোড় পার্টি। কাজ করিয়ে পুরো পয়সা দিল না। রাধা কাচুমাচু মুখে ঘর ফিরেছে। দু'মাসের খাটুনিই মাটি। মানুষগুলোর চোখের চামড়া যেন উল্টান, নাহলে খাটিয়ে কেউ পয়সা দেয় না। গ্রীণরুমে অঝোর ধারায় কেঁদেছে সে, কেউ তার কান্নার দাম দেয়নি।

নানা কারণে সে আর যাত্রাদলে নাম লেখাতে চায় না। গাঁ-ঘরে 'ফিমেল'-এর অভাব। সখের যাত্রায় আজকাল মেয়ে না হলে জমে না। পালার ধরণ বদল মানে যাত্রার মেজাজ বদল। তালে তাল মিলিয়ে চলেছে গাঁয়ের যাত্রাসমাজ। সেখানে বেটাছেলেকে মেয়েছেলে সাজালে চলে? লোক হাসে। টি টি টিটকারি পড়ে চারদিকে। অথচ গাঁ-ঘরে ফিমেল পাওয়া দায়। ড্রেস কোম্পানীর যে ক'জন ভাড়া-করা মেয়ে আছে তাদের প্রায় সবই কদর্য রং চটা টিনের স্যুটকেস, খালপোশ-করা মুরগী। পাঠ বলতেই চিঁ-চিঁ করে রাতজাগা স্বর। পেশাদারী চাল-চলনে ঝানু নারকেল মুখের আদল। রাধা সেখানে ভরা বিলের বালিহাঁস। গায়ে নেই পাঁক, মনে নেই পাপ। একেবারে তালশাঁস। হেসে-কেঁদে, নেচেকুঁদে মন্দ হয় না। বরাত ভাল হলে একরাতেই এক সপ্তাহের খোরাক। কে দেয় এই আক্রার দিনে? বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই তার এই আয়ের দিকে হা করে তাকিয়ে থাকে চারটে মুখ। সে এখন সংসারের বড়। জোয়াল তাকে টানতেই হবে।

আগোল সরাতে রাধা দেখল দুয়ারে ঝাঁকড়া মাথার কে যেন বসে। ছেলেটার ছিমুতে বসে আছে তার মা। হাতে তালপাখা। হলদেটে কাপে চা দিয়েছে, জামবাটি ভর্তি আউস-মুড়ি। ছেলেটা কথা বলতে বলতে মুড়ি চিবাচ্ছিল। তার সহজ চোখে মুখে 'সাঁতার জানি, ডুববোনা' এমন একটা ভাব।

গোয়ালঘরের এককোণে শাড়ি ছাড়তে ছাড়তে রাধা এসবই দেখছিল। দিনকাল বড় খারাপ। কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না। বিশ্বাস করলেই ঠকতে হয়। বেশ কয়েকবার ঠকতে ঠকতে আসল নিয়ে ফিরে এসেছে সে। তার রূপটাই তার কাছে কাল, দু'মুখো সাপের চেয়েও হুঁশিয়ার মানুষগুলো যখনই সুযোগ পায়, বিষ ঢেলে দিতে চায় শরীরে। বিষাক্ত শরীরের কোন দাম নেই রাধা জানে, আর জানে বলেই গোড়া থেকে সে সতর্ক।

রাধা যখন শংকরের সামনে এল তখন কুপীর শিসের মত তার ভেতরটাও কাঁপছে। টাকাকড়ি, বায়না-পত্তর নিয়ে কথা বলতে তার ভাল লাগে না। সে এখনো পুরোপুরি অভ্যস্ত হতে পারেনি এসবে। কি কথায় কি জবাব ঠিকঠাক মুখে আসে না। তাই বায়না চুক্তির সময় মা থাকে কাছে। মা থাকলে অনেক ভরসা। মা না থাকলে সে যেন অগাধ জলে।

'দাঁড়িয়ে রইলি কেনে বস।' মায়ের কথায় রাধা মাদুরে হাঁটু মুড়ে বসে। আড়চোখে দেখে সামনের আলুথালু চেহারার ছোকরাটাকে। বাতাস-লাগা ক্ষুদে-ক্ষুদে তেঁতুল পাতার চেয়েও অস্বস্তিতে ছটফট করে তার ভেতর। প্রথমটা তার সব সময় এমনই হয়। তারপর আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যায়। তার মা বলে,—'নান্‌কার দল, তোরে যেতে বলচে। যাবি?'

রাধা চুপচাপ। হিলহিল করছে কুপীর শিস। শংকরও চুপচাপ। দাওয়ার এককোণে চুলায় ভাত বসেছে। শুকনো পাতা ঢেলে দিচ্ছে সুধা। ভাত ফুটছে টগবগ টগবগ....।

দাউদপুরের মাঠে রাধার পাঠ শুনেছিল শংকর। আহা, ফাস্টক্লাস! সতী বেহুলার চোখে জল। আকাশে ঝড় বৃষ্টি। মৃত স্বামীকে নিয়ে বেহুলা চলেছে....। আলুথালু কেশ, জোড়া ভুরুর মায়াবী নাচুনিতে হ্যাজাকের আলো যেন ঝিমান। দুঃখিনী বেহুলা গান গেয়ে গেয়ে চলেছে অমৃতলোকে। এদৃশ্য কি ভোলা যায় কখনো?

সেদিন থেকেই যাত্রাপাগল শংকরের ইচ্ছে রাধাকে দিয়ে পরের বই নামান। যাত্রা কমিটির কথামত সে এখানে এসেছে। গ্রামের সকলের ইচ্ছে রাধা হোক রাজা হরিশ্চন্দ্র পালার নায়িকা, সারাটা পথ শংকরের মনে এমন একটা আচ্ছন্নতা কাজ করেছে। আইরেট ধানের সবুজ শিহরণে মুগ্ধ দশদিক, দুধেল ধানের ভেজা শিশির জড়ানো মুখের মত বারবার পথ চলতে চলতে রাধার মুখ ভেসে উঠেছে। সেই রাধা এখন তার সামনে। শংকরের কণ্ঠনালী এখন ডুমুর পাতার চেয়েও খসখসে, কি যেন বলতে গিয়ে হঠাৎ-ই থেমে যায় সে।

রাধা বলে, 'যেতে পারি, কিন্তু মেকাপের আগে টাকা মিটিয়ে দিতে হবে। শেষে টাকা পয়সা নিয়ে কাউমাউ করলে যাবনি।'

—'আমরা তেমন নই।' অনেকক্ষণ পরে শংকরের মুখ থেকে পিছলে আসে কথাগুলো, 'ঘরের মেয়ের মত থাকবা। তোমার কোন অসুবিধা হবেনি।'

—'অসুবিধা হবেনি?'

—'না।'

কথার ফাঁকে রাধার মা উঠে যায় হেঁসেল-ঘরে। যাওয়ার সময় বলে, 'আমার মেয়েটারে তোমরা দেখো বাবা। ও ছাড়া আমাদের আর বাঁচন নেই।'

রাধা যা ভুলে থাকতে চায় সেগুলোই যেন মায়ের কথায় মনে পড়ে যায় তার। মেয়ে হয়ে গাঁ-ঘরে সংসারের হাল ধরা চাট্টিখানি কথা নয়! বাবা বেঁচে থাকলে তার এমন দশা হোত না। প্রাইমারী স্কুলের মাস্টার ছিল তার বাবা। পেটে আলসার নিয়ে চলে গেল চিতায়। তার বছরখানিক পরে বড়দাও হারিয়ে গেল। কাজের খোঁজে কলকাতায় গিয়ে আর ফিরে এল না। এত বছর পরেও তার মা আড়ালে কাঁদে। দাদাটা যে বোকার মত কোথায় হারাল রাধা তা জানে না। তার দাদা যেন শাসমল পুকুরে হারিয়ে-যাওয়া আংটি, হাজার ডুবেও যাকে তুলে আনা যায় না। কেবল ডুবে যায় ব্যথার পাঁকে।

নিজেকে যতটা আড়াল করা যায় তারও বেশী আড়াল করে রাধা আলতো হাসি ফোটাল মুখে। দাদার কথা, বাবার কথা সে ভুলে থাকতে চায়। এছাড়া তার যে কোন উপায় নেই। ঘায়ের উপর নখের আঁচড় কাটলে রক্ত তো বের হবেই।

৩.

সকালবেলায় ফাঁকা আলোর উপর দাঁড়িয়ে শংকর ডাকে, 'কি হ'ল, আসো। দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

রাধার পা সরছিল না। বাড়ির কথা মনে পড়ছিল। আসার সময় আগলটা ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল মা। সুধা বলল, 'তাড়াতাড়ি চলে আসিস দিদি। মার শরীরটা ভাল নেই।'

বায়নাবাবদ শংকর তাকে পঁচিশ টাকা দিয়েছে। সেই টাকাটা মায়ের হাতে ধরিয়ে দিয়ে রাধা বলেছে, 'কোনমতে চালিয়ে নিও মা। দোকানী খুড়াকে দশ টাকা দিও। আর বলো, হাওলাৎ-এ ভুষিমাল দিতে। আমি এলে সব মিটিয়ে দেব।'

বাড়ি ছাড়ার সময় প্রত্যেকবারই রাধা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। রুগ্ন মা'র জন্য তার মন খারাপ করে আরো বেশী। বাবাকে হারিয়ে মা-ই যে তার সব।

ফাঁকা মাঠে রাধা খেজুরগাছের মত দাঁড়িয়ে। এখান থেকে তাদের গাঁখানা দেখা যায় না। দু'খানা মাঠ পেরিয়ে তেসরা মাঠে পা দিয়েছে তারা। এর মধ্যে রোদ শুষে নিয়েছে শিশির। দাঁত বের করা মাঠ এখন তেতে ওঠার জন্য তৈরী। আলের উপর থেকে দূর্বাঘাস ছিঁড়ে নিয়ে দাঁতে কাটে রাধা। বালতি ব্যাগটা নামিয়ে রেখে শাড়ি গুটিয়ে বসে পড়ে আলে।

ব্যস্ত গলায় শংকর বলে, 'করো কি ওঠো। রোদ বাড়লে হাঁটতে পারবানি বলে দিচ্ছি।' একথায় কোন কান দেয় না রাধা, বোবা চোখে দূরের দিকে চেয়ে থাকে।

এদিকে শংকরের তাড়ার শেষ নেই। গাঁয়ে ফিরে তার অনেক কাজ। চাঁদা কাটতে যেতে হবে পাশের গাঁয়ে। গত রাতে রিয়ার্শাল হয়েছে কিনা ভগবানই জানে। যার উপর দায়িত্ব ছিল তার নাম নীলু মাস্টার। দু'দিন থেকে ধীরেনের সাথে কাজিয়া করে মুখ ভার করে আছে। ভাঙ্গানী দেওয়ার চেষ্টা। এমনিতে নীলু মাস্টার বই ভাল ধরে। মাস্টারের কথাগুলো স্পষ্ট-স্পষ্ট, গোটা-গোটা। গলার আওয়াজটাও গম্ভীর। ফিসফিসিয়ে বললেও সবার কানে পৌঁছে যায় কথা। মাস্টার যদি গত রাতে রিয়ার্শালে না গিয়ে থাকে তাহলে বিরাট ক্ষতি। প্রমোদটা বড় তোতলা। সাধারণ পাঠ বলতে গেলেই ঘেমে-নেয়ে অস্থির। রাজা হরিশ্চন্দ্র পালায় চারজন ফিমেল। চারজনের মধ্যে একজন হচ্ছে রাধা। ওকে দেওয়া হবে মেন পাঠটা। রাজা হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রী হবে রাধা। বাদবাকি তিনজন ড্রেস কোম্পানীর মেয়ে। ওদের নিয়ে এত ঝামেলা নেই। ড্রেস বায়না করার সময় যে যার পাঠ বুঝে নিয়েছে। একেবারে যাত্রার দিন আসবে ওরা। তাতেই কামাল হয়ে যাবে সব। এখন সমস্যা রাধাকে নিয়ে। শংকর শুনেছে, রাধা পাঠ পড়তে পারে না। ওর বাবা মাস্টার ছিল, কিন্তু মেয়েটা বেবাক মুর্খ।

হাতে চটি নিয়ে মাঠের মধ্যে নেমে যাচ্ছিল রাধা। শংকর বলল, 'ওদিকে যেও না। শামুক খোলায় পা কেটে গেলে কে তোমাকে সামলাবে?'

—'আমি চিকনিশাক তুলব।'

—'ঘর গিয়ে তুলো, এখানে নয়।'

ধানের নাড়ায় খোচা খেয়ে থমকে দাঁড়াল রাধা। ঘাড় ঘুরিয়ে বলল,

—'তুমি বাপু দেখছি ভাল মানুষ নও।'

—'কেন?'

—'আমাকে অমন দেখার কি হল?'

—'কৈ দেখিনি তো!'

খিলখিলিয়ে হেসে উঠল রাধা। বলল, 'মুড়ি খাবা? মা দিয়েছে।'

—'সকালবেলায় মুড়ি চিবোতে কার ভাল লাগে? আমি খাবোনি।'

দু'হাত চোখের সামনে এনে দূরের দিকে তাকাল শংকর। এখান থেকে ক্যানেলপাড় দেখা যায় না। পরপর দুটো মাঠ পেরিয়ে গেলেই টালিখোলা, ক্যানেলপাড় আর বাঁশের সাঁকো। জোরে পা চালিয়ে হাঁটলেই আধঘন্টায় ছুঁয়ে দেবে ক্যানেলপাড়ের বটগাছটা। শংকর ঢোক গিলে বলে, 'এই তো এসে গেলাম।'

—'আর কত হাঁটব? আমার পা ব্যথা করে।'

একপলক তাকিয়েই শংকর চোখ নামিয়ে নেয়। রাধার মুখে ফোঁটাফোঁটা ঘাম। রোদে লালচে হয়ে উঠেছে তার গালের দু'পাশ। এলোমেলো তাকিয়ে সে শংকরকে বলে,— 'হাঁটতে হয় বলে ভয়ে আমি মামার বাড়ি যাইনে। শুধু তোমার জন্যি আমার এত কষ্ট।'

উদোম মাঠের মাঝে শেষ হয়ে যায় নীল আকাশ তবু ক্যানেলপাড়ের দেখা নেই। কোথায় গেল সেই ঝাঁকড়া মাথার বটগাছটা? রোদ বাড়ে দশদিক জুড়ে, মাটি শুকিয়ে খটখটে হয় আরো। ধুলো ওড়ে গোরুর পায়ে পায়ে। রাধার কোঁচড়ের মুড়ি শেষ। অর্দ্ধেকটা খেয়ে বাদবাকি সে ফেলে দিয়েছে। সেই কখন থেকে গলাটা শুকিয়ে আছে জলের জন্য। ফাঁকা মাঠে জল কোথায়? শেষে শংকর বলে, 'আর একটু পা চালিয়ে চলো। সামনেই শ্যালো মেসিন। সেখানকার জল বড় মিঠে।'

ক্যানেলপাড়ের কাছে এসে চা খায় তারা। খালে তখন ভাঁটার সময়। জলের টানে ভেসে যাচ্ছে খসা পাতা, খড়কুটো আর ফেনা। এ জায়গাটা রাধার বড় চেনা-চেনা লাগে। ক্যানেলপাড়ের হাইস্কুলের মাঠে যাত্রা করে গিয়েছে সে। পালা শেষে মাত্তর পনের টাকা ধরিয়ে দিয়ে ম্যানেজারবাবু হাওয়া। কেউ তার কথা কানে তোলেনি। এরকম অভিজ্ঞতা তার মাঝে-মধ্যেই হয়; তখন চোখ ফেটে জল আসে। 'রক্ত জল করা পয়সা মেরে কেউ সুখ পাবে না'—এমন একটা স্পষ্ট ধারণা তার মনের ভেতর লালিত পালিত হয়। এছাড়াও অনেক কারণ আছে। কাগজে কলমে লেখাপড়া না থাকলে এই এক অসুবিধে। ড্রেস কোম্পানী, ফুলেটওয়ালা, কর্নেটওয়ালা, ড্যান্সারের টাকায় কোন হাত পড়ে না। কারণ ওগুলো সব ঝানু মাথার কাজ। ওখানে কাটা-ছেঁড়া করতে গেলেই মান-সম্মান নিয়ে টানাটানি। শেষে কান টানতে মাথা এসে যাবে।

কাঠের সাঁকোর উপর উঠে এসে রাধা তাকিয়ে থাকে ফেলে আসা পথের দিকে। জলের টানে ভেসে যাওয়া পাতার মত অসহায় মনে হয় নিজেকে। দেশ-গাঁয়ে তার বয়সী মেয়েরা কবে শাঁখা-সিঁদুর পরে শ্বশুরবাড়ি চলে যায় পাল্‌কিতে। আলতা পায়ে নতুন শাড়িতে কাঁখে খোকা নিয়ে ফিরে আসে আবার বাপের বাড়ি। মেলায়-মেলায় চনমনে মনে তারা পাঁপড়ভাজা খায়, দেবস্থানে মানত করে, বটতলায় ঢেলা বাঁধে, রাতকালে ত্রিপল ঢাকা আসরে যাত্রা দেখে ঠাকুর দেবতার। তারপর ঢুলুঢুলু চোখে জ্যোৎস্না ধোয়া পথে কঞ্চির আগোল সরিয়ে পুকুরে পা ধোয়, মাদুরের উপর কাঁথা বিছিয়ে কোলেরটাকে দুধ দিতে দিতে ঘুমিয়ে পড়ে।

এরকম একটা জীবনের জন্য রাধার মন খারাপ করে। যাত্রাদলের মেয়েদের গাঁয়ের লোকেরা ঘেন্না করে না আবার আদর করে কাছে বসাতেও পারে না। ওরা অচ্ছুৎ নয় তবু ওদের ছোঁয়া এড়িয়ে চলে অনেকেই।

নীলকণ্ঠ জানা, তাদের গ্রামের হেডমাস্টার, বাড়িতে এসে শুধু শুধু মুখ শুনিয়ে গেল,— 'শেষ পর্যন্ত মেয়েকে যাত্রাদলে পাঠালে অমৃতের মা, কাজটা কিন্তু ভাল হল না তোমার। সোমত্ত মেয়ে রাত-বোরোতে একা একা ঘুরবে, নাচবে-কুঁদবে, হাসবে-গাইবে, এটা কিন্তু সৃষ্টিছাড়া লক্ষণ! খেতে দিতে না পারো হাতে ঝুলি দিয়ে পাঠিয়ে দাও সেটা অনেক সম্মানের, অনেক ইজ্জত-এর।'

হেডমাস্টারের কথায় কোন প্রতিবাদ করেনি তার মা। শুধু চোখ দুটো সাদা ধুতিতে মুছে মাটির দিকে তাকিয়েছিল অনেকক্ষণ। হেডমাস্টারমশাই আরো বলেছিল, 'যাত্রাদলে গেলে মেয়েদের চরিত্র ঠিক থাকে না। ঘি আর আগুন তুমি পাশাপাশি রাখবে অমৃতের মা?' বেড়া দেওয়ালের পাশ থেকে কথাগুলো কানে এসেছিল রাধার। এই হেডমাস্টারমশাই-এর বড়ছেলে পুকুরঘাটে একলা নাইতে গেলে কাদা ছুঁড়ে মারে বুকে। টাকার লোভ দেখিয়ে টেনে নিয়ে যেতে চায় নির্জন বিলের দিকে।

রাধা যায় না। ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে রুখে দাঁড়ায় শুধু। মেয়েদের যাবতীয় গোপনীয়তা এবং তার শিহরণ কখনো-সখনো উস্‌কে দেয় তাকে। বয়সটা যে আগুন ধরানোর বয়স। তখন সে তার তাতা শরীরটাকে ছুঁড়ে দেয় পুকুরের জলে, দাপিয়ে দাপিয়ে সাঁতার কাটে, শরীর ঠাণ্ডা করে ঘরে ফেরে আবার।

হেডমাস্টারমশাই-এর কথাই ঠিক। যাত্রাদলের প্রায় মানুষের চোখেই শরীরের নেশা। রাধাকে দু'বার গ্রীণরুমে একা পেয়ে দলের ক্যাশিয়ার সাপটে ধরে বলেছিল, 'চল রাধা, আমরা পালিয়ে যাই। এসব রং-তামাসা তোমার আমার জন্য নয়।'

ক্যাশিয়ারের বুকে মাথাটা হেলিয়ে আবেগে চোখ বুঁজে এসেছিল রাধার। একটা বিপরীত সান্নিধ্যের উষ্ণতায় নিজেকে সেঁকে নিতে খারাপ লাগছিল না। ক্যাশিয়ারের হাত তখন রাধার রেশম ঘনকালো চুলে, আদরে আদরে ভেসে যাচ্ছিল গ্রীণরুম। ঠোঁটের উপর ঠোঁট, পায়ের উপরে পা, শঙ্খলাগা পুরুষ সাপের মত। ক্যাশিয়ার বলেছিল, 'আজই চল, আর নয়। এখানে থাকলে আমরা পাগল হয়ে যাব।'

রাধা ঠিক তখন বাতাসলাগা শিরীষপাতা। পুরুষ ঠোঁটে কী থাকে? কলমীশাকের ভুঁই-এর মধ্যে এঁড়ে-বলদ ঢুকে পড়েছে যেন—রাধার শরীর তছনছ হচ্ছিল সেই শরীরের চাপে। তার রক্তের মধ্যে কেউ যেন ঢুকিয়ে দিয়েছে সিদ্ধিগোলা জল। ঘেমে যাচ্ছিল সে।

সুধা জ্বালন খুঁজতে গিয়েছে বাঁশবেড়ে। দুপুরের ঝাঁ-ঝাঁ আলোয় তেঁতুলগাছের নম্র ছায়ায় মা খেজুরপাতা দিয়ে তালাই বুনতেই ব্যস্ত। অমৃতটা স্নান সেরে মাথা খেঁকে বলল, 'ওমা, বড় ভোখ লাগে। কিছু খেতে দাও মা।' নিকোনো উনুনে আগুনের কোন চিহ্ন নেই। তালাইটা হাটে বেচতে পারলে চাল আসবে ঘরে। তারপর উনুনের মুখে ঠেলে দেওয়া হবে আগুন। ভাত ফুটবে। অমৃত দাওয়ার কাছ থেকে নড়বে না; কেবলই দুটো ভাতের জন্য খুনখুন করে কাঁদবে।

এসব ফেলে কোথায় পালাবে রাধা? অগত্যা দু'হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিল ছোকরা ক্যাশিয়ারকে। তারপর আঁচলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল সে।

জোয়ার-ভাঁটার খালের দিকে তাকিয়ে এখন ছলছলিয়ে ওঠে রাধার চোখ। শংকর সিগ্রেট ধরিয়ে ফিরে আসে চায়ের দোকান থেকে। টালিখোলার বলপ্রেসের শব্দ আসছে, ইটভাটির ধোঁয়া উঠছে আকাশের গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

শংকর বলে, 'চলো, এবার যাওয়া যাক। ঐ দেখ নান্‌কা গাঁ, এই এসে গেলাম বলে।'

তখন ঘাড় ঝুঁকিয়ে নোনাখাল থেকে ল্যাটামাছ তুলে নেয় মাছরাঙা, তারপর ডানা ঝাপটে একেবারে বাবলাগাছের মগডালে।

—'ইস!' রাধার মুখ থেকে পিছলে বেরিয়ে আসে আর্তনাদের মত শব্দ।

শংকর বলে, 'দেখে শুনে হাঁট। ফাটা আলে পা ঢুকে গেলে সহজে আর বেরুতে পারবা না।'

৪.

তারামাসির সাতকুলেও কেউ ছিল না। ক্লাবের ছেলেরা বলে-কয়ে রাধার থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে সেখানে। যাত্রার আর মাত্র সাতদিন বাকি। নাট-মন্দিরে এখন পুরোদমে মহড়া চলছে রাজা হরিশ্চন্দ্র পালার। শৈব্যার ভূমিকায় রাধা। মানিয়েছে খারাপ নয়। ভালোর পাশাপাশি অনেক মন্দও আছে তার। মেয়েটার পেটে 'ক' অক্ষর জ্ঞান নেই। চোখ থাকতেও অন্ধ বেচারি!

দশ ক্লাস অব্দি পড়েছিল শংকর। তার উপর ভার পড়েছে রাধাকে তালিম দেওয়ার। এমনিতে শংকরের সময় বড় কম। ঘর-সংসার, চাষ-আবাদ আছে। তাছাড়া তার বাবা বাড়িতে থাকে না। হপ্তা দু'হপ্তা অন্তে ঘর আসে শহরের চাকরির ঝামেলা মিটিয়ে। তখন জবুথুবু হয়ে ভালছেলের মত ঘরেই পড়ে থাকে শংকর। বাবাকে সে যমের মত ভয় করে। একবার বাবার হাতের দশাসই চড় খেয়ে দুদিন কানচল সেঁকতে হয়েছিল হ্যারিকেনে। এখন একুশে পা দিলেও বাবা তার কাছে বিভীষণ।

মাঝে দু'দিন শংকরের সাথে রাধার দেখা হয়নি। ক্লাবের কাজে হঠাৎ সদরে যেতে হয়েছিল তাকে। দু'দিন কেন দু'বেলা না দেখলেই রাধার এখন বুক শুকিয়ে যায়, বড় চিনচিনে ব্যাথা হয় সব সময়। মনটা যেন তার শংকরের কাছে বাঁধা। সে যেন শংকরের হাতের ঘুড়ি, যেমন ওড়ায় তেমনি ওড়ে সে। অথচ, শংকরের তেমন কোন অনুভূতি নেই। সে স্থিরজলের চেয়েও স্থির। রাধার হয়েছে সমস্যা। গাঁয়ের লোকে তাদের এই মেলামেশাকে ভালচোখে দেখে না। বলে, 'আগুন ঘিয়ের কারবার কখন গলে গিয়ে বিপদ বাঁধাবে তা মা শীতলাই জানে।'

শংকরের মা বলে, 'তুই একটু সাবধান হ বাবা! ওরা হলো গিয়ে মায়াবী। ওদের মোহে তুই ভুলিস্নে।'

কিসের মোহ, কিসের যাদু—শংকরের মাথায় কিছু ঢোকে না। রাধাকে তার খারাপ বলে মনে হয়নি কখনো। মেয়েটার মন বট আঠার চেয়েও সাদা। বড় চাঁচাছোলা কথা বলে। অন্যায়ের কাছে গুরুজন-লঘুজন মান্য করে না কিছু। এ গাঁয়ে প্রায় সবাই তার নিন্দে করছে, করুক। সে জানে, সে কোন পাপের কাদা ঘাঁটে না। এসব কারণে বুক ফুলিয়ে চলতে তার ভয় নেই।

এ গাঁয়ের অনেক কিছুই রাধার ভাল লাগে। যে পুকুরে সে নাইতে যায় তার তিনপাড়ে তরলাবাঁশের ঝাড়, ঘাটের বাঁ-দিকের উঁচু ঢিবিটায় তুলসীতলা, বটগাছ আর ঝুরি। সব মিলিয়ে স্বপ্নের মত মনে হয় চারপাশ। নাইতে এসে কিসের মোহে ঘাটেই প্রায় ঘন্টাখানিক কাটিয়ে দেয় সে। দেরী হলে তারামাসি রেগে যায়। কুঁচকান মুখের চামড়া কাঁপিয়ে বলে, 'সোমত্ত মেয়ে অমন ভেজা গায়ে এতটা সময় ঘাটে বসে বসে কি করিস হ্যালা ছুঁড়ি?'

তারামাসিকে বড় নিজের মনে হয় রাধার। এ গাঁকে ভাল লাগার একটা কারণ

তারামাসি। জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে বসে থাকতে তার খুব ভাল লাগে। জলে ঢেউ উঠলে মনটা তার খুশীতে ঝকমকিয়ে ওঠে। নানাবিধ ঢেউ-এর জন্য এ গাঁকে ভালবেসে ফেলেছে সে।

সেই যে শংকরের সাথে এসেছে, তারপর আর ঘরে ফেরা হয়নি রাধার। মাঝে ছোটভাই অমৃত এসে টাকা নিয়ে গিয়েছে। টাকাটা অবশ্য শংকর হাওলাত দিয়েছে। যাত্রা হয়ে গেলে ফেরৎ দেবে।

এখন জোরকদমে মহড়া চলছে। আর মাত্র ক'দিন পরেই যাত্রা। রাজা হরিশ্চন্দ্র পালার ঢেঁড়ি পড়েছে গাঁয়ে গাঁয়ে। সবাই উন্মুখ হয়ে আছে শোনার জন্য।

যাত্রার দিন যত এগিয়ে আসছিল রাধার ভেতরটা তত দুর্বল হয়ে পড়ছিল। এখনও তার পুরো পাঠ মুখস্থ হয়নি। সে নিজে পড়তে পারে না বলেই শংকর তাকে পড়ে শোনায়। নির্জন টালিখোলার খুঁটিতে হেলান দিয়ে শংকরের পাঠ শোনে রাধা। মোহিত হয়ে যায়। পিপাসা মিটে যায় ঐ উদাত্ত দরদভরা কণ্ঠ শুনে, পাঠ শুনতে শুনতে চোখের তারা কেঁপে ওঠে তার। দাতা হরিশ্চন্দ্র যেন বই-এর পাতা থেকে উঠে এসেছেন স্বয়ং। রাধার দৃষ্টি পড়ে না, তাকিয়েই থাকে।

৫.

—'উড়াপাঠ দেখতে যাবুনি?'

ঠকরার কথায় চমক ভাঙল শংকরের। গতকাল তারামাসির বাড়ি থেকে তাকে একরকম তাড়িয়ে দিয়েছে রাধা। ফুঁপিয়ে আঁচলে চোখ মুছে বলেছে, 'হিজরা কোথাকার! তুমি আমার ছিমুতে আসবা না।'

—'কেন?'

এই কেন-র কোন জবাব দেয়নি রাধা। কি জবাব দেবে? মেয়েদের মন যে বোঝে না, তার কাছে কোন আব্দার না করাই ভাল।

নতুন বর্ষায় ভিজে রাধার গা পুড়ে যাচ্ছিল জ্বরে। খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছিল শংকর। তারামাসি তখন ঘরে নেই। কাঠ খুঁজতে সাই-এর (পাড়ার) ভেতরে গিয়েছে।

শংকরকে দেখে রাধা হাউহাউ করে কাঁদল, 'আমাকে ঘর দিয়ে আসবে চল, আমার এখানে ভাল লাগছেনি।'

ভাল না লাগার কোন কারণ ছিল না। শংকর অবাক চোখে তাকাল। রাধার কপালে হাত ছুঁইয়ে বলল, 'শুধু শুধু কেঁদো না। আর তো মাত্র ক'টা দিন। পালা শেষে তোমাকে ঘর দিয়ে আসব।'

শংকরের হাতটা কপাল থেকে ঝাটকা দিয়ে সরিয়ে দিল রাধা। বলল, 'আমাকে ছুয়ো না। ভাল ছেলে তুমি, খারাপ হয়ে যাবে। আমি হলাম গিয়ে নষ্ট মায়াঝি।'

—'কে বলেছে একথা?'

প্রশ্রয় পেয়ে নাক টেনে টেনে ফুঁপিয়ে উঠল রাধা, 'কে আবার বলবে, তোমার মা।'

খারাপ ভালোর কিছুই বোঝে না শংকর। পড়াশুনা না করে সে নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মেরেছে। বরাবরের ছন্নছাড়া সে। যার জন্য বাপে খেদানো মায়ে তাড়ানো ছেলে।

যা ইচ্ছে হয় তাই করে। সে নিজেই নিজের শাসক। ইস্কুলে যাওয়ার চেয়ে পঞ্চায়েতি বাঁধের নতুন মাটিতে পা থেবড়ে ঘন্টার পর ঘণ্টা বসে থেকে আকাশ দেখতে তার ভাল লাগে। ভাল লাগে—ছ্যারাব্যাড়া নীল আকাশের ঐ মেঘের সঙ্গে মিশে যাওয়া চিলের ছায়ায় পা ফেলে ফেলে দৌড়াতে। এতে গ্যাংটায় হোঁচট খেয়ে বুড়ো আঙ্গুলের নখ উল্টে গেলেও তার কোন কষ্ট নেই। খালপাড়, কাঠের সাঁকো, ইটভাটা, টালিখোলা, জোয়ার-ভাটার শব্দ তাকে প্রায় সবসময় আচ্ছন্ন করে রাখে।

ঠকরা বলল, 'চ। যাবিনে?'

—'নারে, যাবনি!'

—'কেন, মন ভাল নেই বুঝি! ঠকরা চোখ কুঁচকে হাসল, 'চ বলছি, গেলে তোরই লাভ হবে। রাধাকে দেখলাম, দাউদপুরের দিকে যেতে।'

হরিতলায় এসে শংকর ঠকরার হাতটা চেপে ধরল নিমেষে। বলল, 'দেখ তুই যা ভাবছিস তা নয়। রাধা আমাকে একদম দেখতে পারেনি।'

—মিছে কথা।

—নারে, সত্যি।

—রাখ তোর সত্যি। মেয়েদের তুই কতটুকু বুঝিস?

আবার হা হয়ে যায় শংকর। ঠকরা বলে, 'খপ খপ চল।'

আল ধরে হাঁটতে হাঁটতে অনেক কথা মনে পড়ে যায় শংকরের। সেদিন সন্ধ্যেবেলায় টালি খোলায় রাধা তাকে কেমন জড়িয়ে ধরেছিল....তারপর ঠোঁটে ঠোঁট, শরীরে শরীর। এমন অবস্থায় শংকর আগে কখনো পড়েনি। সে তো ঘেমে নেয়ে অস্থির, চালু শ্যালো মেসিনের চেয়েও ধক্-ধুক্ করছিল ওর বুক। টাগরা শুকিয়ে কাঠ। কোন মতে রাধাকে ঠেলে দিয়ে পালিয়ে এসেছিল কাঠপুলটার কাছে। ফেরার সময় রাধা একটা কথাও বলেনি।

উড়াপাটতলায় এসে ঠকরা যে কোথায় হারাল, শংকর আর তার দেখা পায়নি। মাইকে তখন 'ও নাগর কইয়া যাও' গান হচ্ছে। নোনাখালে জোয়ারের সময়। শংকর ভাবল, মেলায় এসে একবার রাধার সাথে দেখা হয়ে গেলে ভাল হোত। কয়েকটা কথা শুধাবার ছিল। ফেনামুখো জল আছড়ে পড়ছিল খালের রোগাটে শরীরে। শংকর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। পিলপিল করে লোকজন সব বাঁধের নীচে নেমে যাচ্ছে। বাণ ফোড়া, জিভে ত্রিশূল ঢুকান, শর ভুকানো খেলা শেষ। রাত গাঢ় হলেই পুরুলিয়ার ছৌ নাচ হবে। পঞ্চাশ পয়সা টিকিট। আহা, রাধাকে নিয়ে যদি দেখতে পারত সে!

কার্বাইডের আলোয় ঝলমল করছে জ্যোৎস্না ছড়ান রাত। কি একটা ফুল ফুটেছে খালের ঝোঁপে। গন্ধ আসছে দাবিয়ে দাবিয়ে।

তারামাসির বাড়িতে দু'হাত দিয়ে রাধা সরিয়ে দিয়েছিল তাকে। চোখে মুখে রাগ, উষ্মা। কোঁড়ক লাগা মুরগির মত ফুলে ফুলে উঠছিল রাধার অভিমানী শরীর।

—'কাপুরুষ।' শুধু মুখ ফসকে একটা কথাই বলেছিল সে।

কেন বলেছিল শংকর মাথার চুল ছিড়েও এর উত্তর পায় না। 'শৈব্যাতো এত মমতাহীন নয়। তবে রাধা কেন?'

সেদিন রাধার উপর রাগ হয়েছিল তার। আজ যদি সে রাধাকে সামনে পায় তাহলে এ-প্রশ্নের উত্তরটা সে জেনে নেবেই নেবে।

টালিখোলায় রাধা যখন তাকে কচি অংকুরের মত থেঁতলে দিচ্ছিল তখন রাধাকে সে রাজা হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রী শৈব্যার সাথে মিলিয়ে ফেলেছিল। পরক্ষণেই তার মনে হয়েছিল, রাধা কোনমতেই শৈব্যা নয়, রাধা তার মা। হাতের বাঁধন আলগা হয়ে গিয়েছিল পলকে। ফিঙে পাখির চেয়েও কালচে হয়ে গিয়েছিল তার শরীর। রক্ত উঠে এসেছিল চোখে। আলগা হাতের হারানো মায়ায় রাধাকে সে তাই টানতে পারেনি, পিষে দিতে পারেনি কাঁচা হলুদের মত।

মেলার ভেতর ঢুকে গিয়ে বাহারি ছবির দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে শংকর। কত রং-বেরং-এর ছবি। যা দেখে তাই পছন্দ হয় তার! দেব-দেবীর ছবির পাশে সুন্দরী ললনার ছবি। কারোর খোলা বুক, পরনে খালি এক ফালি ল্যাঙ্গোট। আড় চোখে দেখে। দেখে মাথাটা ঝিমঝিম করে তার।

জ্বরে কাতরাচ্ছিল রাধা। কাঁথা সরিয়ে শরীরের তাপ পরখ করতেই ঘামে থৈ থৈ করছিল রাধার বক্ষদেশ। শংকরের হাতটা আঠার মত লেপটে গিয়েছিল সেখানে। ফ্যাকাসে দু'চোখ তুলে অব্যক্ত যন্ত্রণায় ঠোঁট কামড়ে ধরেছিল রাধা।

শংকর কোন কথা বলেনি। রাধাও কোন কথা বলেনি, কেবল নুনে জোকের মত ছটফটিয়ে উঠেছিল দুবার। শংকর সেই ছটফটানীর মানে বোঝেনি।

দোকানী বলল,—'কি হল, নেবা?'

শংকরের পলকহীন চোখ তখন অন্য একটা ছবির উপর। বেটাছেলেটাকে কোলের উপর তুলে নিয়ে আলগোছে দুধ দিচ্ছে বউটা।

দোকানী বলল,—'হা উটার নাম শিব। ভোলা মহেশ্বর। আর ঐ যে দুধ দিচ্ছে বউটা....মা দুর্গা! নেবা তো লাও। অমন ফটো আর পাবানি!'

ফটোটা ঘোরের বশে কিনে নেয় শংকর। হ্যাজাকের আলোয় দেখে, শিব নেই, দুর্গা নেই। ছবি হয়ে গিয়েছে—সে আর রাধা।

মুগনিপাথর

তপকা (তামাক) ধোঁয়ার কুন্ডলী পাকান মেঘ হাড়িসাই এর মাথায়। সকাল থেকে একটুও রোদের দেখা নেই। চারপাশ থম মেরে গেলে ব্যাঙ মোতার মত চিরিক চিরিক এক ফোঁটা দু' ফোঁটা বৃষ্টি। পচা ভাদরে রোয়ার কাজ সব শেষ। এখন ধানচারার গোড়ায় বুজকুড়ি কাটে ফুসি কাঁকড়া আর কালিয়া কাঁকড়ার ছা। ক'দিন থেকে কোথাও বেরুবার জো নেই। বেরুলেই তেড়ে ফুঁড়ে বর্ষা নামে। পথ ঘাট সব পেছল। কাদা-মাটি চ্যাটচেটে।

কাঙ্গাল গাড়িয়া (পুকুর) ঘাটে পা ধুয়ে চালাটার দিকে চেয়েছিল। ছাল ছাড়ান কুঁকড়ার দশা হয়েছে ঘরটার। বাঁশ-কাঠ গজাল সব কেমন দাঁত বের করান। পচা খড়গুলো ভেজা বনকুয়ার(বনকাক) পালক। জল মানে না, রোদ মানে না। কতদিন ভেবেছে কাঙ্গাল ঘরটা ছাইয়ে নেবে! পারেনি।

ঠকরী, তার বউ রেগেমেগে বলেছে, মুই আর রাঁধি পারিনি গঅ। খরাকালে-খরা, টুকে বর্ষা ঝরলে ছবছর বর্ষা —মুই কোথায় দাঁড়াই কও তো?

একযুগ আগেও বাপ বেঁচে ছিল যখন, বিঘে তিনেক জমির মালিক ছিল তারা। ঘরে দুটো লাঙ্গল, হালিয়া বলদ। খোলের কারবার রমরমা। গ্রাহক এসে বসে থাকে দোরগোড়ায়। সে সময়টা ছাই মুঠালে সোনা হবার সময়। নিজের হাতে পাছিয়া পাছিয়া (ঝুড়ি ঝুড়ি) মাটি কেটে ঘর তুলেছে বাপ-বেটায়। দেওয়ালের পর দেওয়াল। ছঁচ্, গোবরমাটি, খড়কুচা সব কিছুতেই গতর নিঙড়ানো ঘাম। বাপ মারা গেল বড় বানে, সাপের কামড়ে। মা তো তার অনেক আগেই গিয়েছে। সেই সময় ঠকরী আসল বৌ হয়ে। ভাবল দুঃখ ঘুচবে। ঠকরীটার গতর ভারী হল, সন্তান হল না। মনের দুঃখ মনে রইল। খড়খড়ে ঘাসগুলোর চেয়েও শুকনো হয়ে গেল সংসার।

বাপ যখন চোখের পাতা বুঁজল তখন জমিজমার সাথে আর যা যা রেখে গেল তার মধ্যে সবচেয়ে দামী হলো মুগনীপাথর। সফেদ, বট আঠার চেয়েও ঝকমকে সাদা নিটোল—চৌকোনো সের খানিক ওজনের একটা পাথর, সর্বদা চকচক করে নক্ষত্র সমান। সেই পাথরে নিজের মুখটা দেখতে পেত কাঙ্গাল। ঠিক যেন সার্সি।

বিয়ের রাতে ঠকরীকে আগ্রহভরে পাথরটা দেখিয়েছিল সে। কড়িঘরের ভেতর লাল কাপড়ে যত্নে জড়ান থাকত পাথরটা। বাপ বলেছিল, দেখে-শুনে রাখবি, এ হিলা মায়াবী পাথর। কুন সময় হড়কি যাবে টের পাবুনি।

ড্যামা ড্যামা চোখ তুলে ঠকরীর বিস্ময়ের আর ঘোর কাটে না। চোখের দৃষ্টি আটকে গিয়েছিল দুধসাদা পাথরে। ফুর্তিতে টগবগ বরবেসি কাঙ্গাল বলেছিল, —অমন হা কি

করিকি দেখোটা? এর কীর্তি শুনলে মাথা খারাপ হি যাবে বলেই, অতীত পুকুরে ডুব দিয়েছিল সে।

ভাল লেঠেল ছিল তার বাপ। তল্লাট জুড়ে নাম। তখন হাড়িসাই-এর বসবাস এখানে ছিল না। এখানে ছিল কেয়া-পানস্ বন। দিনমানে ঝাড়া (বাহ্যি) ফিরতে ভয় পেত মানুষে। পকাসিমা গাছ আর হাড়মটমটির ঝোপ। তার সাথে পাল্লা দিয়ে মাঠবাবলা আর লালকচার ঝাকড়া ঝাঁকড়া মাথা। কাশগাছ আর মশনা বন সার সার। একেবারে ধার বরাবর কাঁটা বাঁশের ঝাড়, খানা-ডোবা আর বয়িরকুল গাছের গোমরাভারী মুখ। সাঁঝ হবার আগে শেয়াল ডাকত, বনবেড়াল চাষীপাড়া থেকে কুঁকড়া ধরে এনে ঝপাঝপ লুকিয়ে যেত আড়ালে। কোকর (কুকুর) গুলো হা-পিত্তেশে চোখে তাকিয়ে থাকত শ' গজ দূর থেকে। বনে ঢুকতে তাদেরও ভয়।

সেই বন কেটে বসত বানাল জ্ঞাতিভাইরা। হাড়িপাড়া কখনোই চাষীপাড়া বামুনপাড়ার পাশাপাশি থাকবে না। ওরা তো যমজ ভাই নয়, ওরা অচ্ছুত, ছোট লোক, হাড় হিংলা মানুষ। জমিদার চৌধুরীবাবুর নির্দেশে লেঠেলরা ভেঙ্গে তছনছ করে দিয়ে গেল পুরনো হাড়িসাই। ওখানে জমিদারবাবুর বাগান বাড়ি তৈরি হবে। পুকুর কাটা হবে। পুকুরের দু'ধারে লাগান হবে নামী-দামী ফুলের চারা। রাস্তার ধারে এমন চোখ ধাঁধান জায়গা আর কোথায়? বাস্তুছাড়া হল বাপ। বোচকা-বুচকি, কাচ্চা-বাচ্চা, হাঁস-মুরগী, গোরু-ছাগল সব নিয়ে উঠে আসতে হল এক ঘনঘোর অমাবস্যায় এই বন-বাদাড়ে।

আসার সময় প্রতিবাদে রুখে উঠেছিল বাপ। ছড়ান বুকের পেশী ফুলিয়ে সিংহবিক্রমে বলেছিল—কাজটা ভালা হিলানি জমিদারবাবু। এ ভিটা মোর মেনকার। আপনার বাপো দানপত্র লিখি দিচে দু' যুগ আগে। সে কাগজ এখনও মোর কড়িঘরে গুঁজা।

—হারামজাদা, মুখে মুখে তর্ক করিস, তোর এতদূর স্পর্ধা? চোখ উপড়ে নেবো।

চোখ উপড়ে নেওয়ার সুযোগ পায়নি জমিদারবাবু। তার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাপ। প্রায় কাবু করে ফেলেছিল জমিদারকে, সেই সময় লেঠেলরা পেছন থেকে ডাং মারল মাথায়। মারার সাথে সাথেই তুলসীমঞ্চের পাশে গড়িয়ে পড়ল অবশ গতর। কাঁকরগুড়ি, গ্যাংটা মাটি রক্তকষে ছয়লাপ হলো।

বিলাসী জমিদার সেই বাস্তুভিটায় পুকুর খনন করল। ছ'মাস ধরে চলল পুকুর কাটার কাজ। একদিন খরাবেলায় মাটি কাটার সময় হুস করে বেরিয়ে এল এক পাথর। জমিদার দেখল, সবাই দেখল, সাদা ধবধবিয়া একটা পাথর। মহা উল্লাসে পাথরটাকে ঘর নিয়ে গেল জমিদার। কর্তামাকে দেখাবে।

কিন্তু সবার কপালে সব সয় না। পরের দিন সকালে বাপকে পাথরটা ফেরৎ দিয়ে গেল চৌধুরী জমিদার। বলল,—নে রাখ। এটা তোর পাথর। এ পাথর আমার কোন কাজে আসবে না।

—মোর পাথর? কথা শুনে বাপের গলায় ভড়কে যাবার সুর।

জমিদার বলে,—হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা তোর পাথর। কালরাতে স্বপ্নে দেবী আমাকে বলল, আমাকে তুই রেখে আয়, নাহলে তোর সর্বনাশ হবে। আমি মণ্ডলা হাড়ির ঘরের

মুগনিপাথর। আমাকে তুই রেখে আয়।

—এ পাথবের কি গুণ বাবু?

—তা জানিনা।

—তাহিলে এ নির্গুণা পাথর লিইকি কি করবা বাবু! বরং মোকে দশটা টাকা দেন খেয়ে বাঁচি।

সে রাতে আর এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখল বাপ। ঘরের কোণ থেকে ছিটকে এল অদ্ভুত আলোর ধারা। সেই আলোর মধ্যে থেকে ভেসে উঠল আশ্চর্য এক দেবী মূর্তি। মোহনী গলায় সেই দেবী মূর্তি বলল,—ভয় পাসনে, আমি তোর সাথে আছি। আমাকে ঘরে রাখ, তোর মঙ্গল হবে। ন্যায়ের পথে চলবি, সত্যকথা বলবি, পরের উপকারে ঝাঁপিয়ে পড়বি—তাহলে দেখবি আমি তোর সাথে আছি। পাপ করলে আমাকে আর পাবিনে।

রাতভোর আর ঘুমোতে পারেনি বাপ। জলে ভরে উঠেছিল তার দু'চোখ। টিনের বাক্সটার উপর অযত্নে রাখা পাথরটা তুলে নিয়েছিল কোলে। মুহূর্তে রোমাঞ্চিত হয়েছিল তার শরীর। বুঝতে পেরেছিল এটা যে সে পাথর নয়। এটা এমন পাথর যার স্পর্শে বিনাশ হয় পাপ। পাপী পায় দন্ড। অনাথ পায় নাথের দর্শন।

চাঁচারি আর আউড় (খড়) চুঁইয়ে টপটপিয়ে জল ঝরছিল। গতরাতে বৃষ্টিটা জব্বর হয়েছে। খলাবাহিরে (উঠোন) লিল্ (শ্যাওলা) পড়ে জমে রয়েছে সেই জল। ঘাড় মটকান ডাহুকের মত চালাঘরটাকে নিষ্প্রাণ মনে হল কাঙ্গালের। পায়ের কাদো (কাদা) মুছে ঘাড় দাবিয়ে ভেতরে ঢুকে এল সে।

আগে থেকেই জামবাটিতে তানুভাত বেড়ে রেখেছিল ঠকরী। দাঁত মেজে এসে কাঙ্গাল প্রতিদিন তানুভাত খায় সকালে। তাটিতে (বাটিতে) বাসি শিলমাছের টক, পুরানা তেঁতুল দিয়ে রেঁধেছে ঠকরী।

পিঁড়িটা পেতে দিয়ে ঠকরী বলল,—খাও। খাড়িই রইল্যে কেনে? মাছি বসবে।

—ঘরটা ছাইতে হিবে বউ। নাহিলে ভাঙ্গি যাবে। কুনদিন চাপা পড়বা মোর মেনে।

—আগে খাও তো! তারপর যা হয় হিবে।

পিঁড়িতে পা মুড়ে বসে জামবাটিটা নিজের কাছে টেনে নিল কাঙ্গাল। কিছুক্ষণ আগে ছঁচ (ন্যাতা) দিয়েছে বউটা। গোবর মাটির গন্ধ আসছিল।

—আর কিছু লিবে?

খেতে খেতে হাত থামাল কাঙ্গাল, গটে (একটা) ঝাল বিহে।

—ঝাল তো নেই।

—পেঁইজ?

খুঁজে পেতে একটা পচা-হজা পেঁয়াজ বাড়িয়ে দিল ঠকরী। তোলায় পাওয়া আনাজ, বেশীর ভাগই দয়া-দাক্ষিণ্যের দান। কানা, পোকা, শুটকো, খেগরো। —আজকাল হাট ঝাঁটিইকি লাভ নেই। কেউ আর আগের মতুন তোলা দেয়নি। পেঁয়াজের অর্দ্ধেকটা কামড়ে পাতের গোড়ায় থুঃ করে ফেলে দিল কাঙ্গাল।

—হা, অতবড় গটে হাট। পুরাটা ফেরে ঝাঁটিইতে গেলে মাজা কন্‌কন্ করে। গাঁটে

গাঁটে ব্যথা হয়।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ঠকরী। ঘরের ভেতর এই দিনের বেলাতেও ঘুলঘুলি আঁধার। চোখটা রগড়ে নিয়ে বলল,—কমিটিবাবুকে কওনা, টাকাটা যেন বাড়িই দেয়।

—২৫ টাকাই সময় মত দেয়নি! টাকা বাড়িইতে কইলে কাজই ছাড়িই দিবে।

—দেয় দিক।

—তাহিলে খাবু কি? বাবু কয়, ভাত ছিটিইলে কুওয়ার (কাক) অভাব? না পুশিইলে ছাড়ি দে। রামধন কাজটার লাগি ফ্যা ফ্যা করি ঘুরেটে।

এবার আর কথা বলার ক্ষমতা থাকে না ঠকরীর। ঘাড় নীচু করে তানুভাত গিলছে কাঙ্গাল। ওর রোগা পেটটা জোলোঘাস খাওয়া গরুর মত ফুলে উঠছে ধীরে ধীরে।

—আর টুকে টক দিই?

—তোর আছে তো?

—আছে গ অ আছে। তুমি খাওনা পেট পুরিইকি।

নোলার বশে খেতে গিয়ে বিপদ বাধায় কাঙ্গাল। শিলমাছের মাথায় পাথর থাকে। সেই মাথা বেখেয়ালে চিবোতে গিয়ে কড়াং করে শব্দ হয়। যন্ত্রণায় গঙিয়ে উঠল সে। দোক্তা-পান খাওয়া ক্ষয় দাঁতটা ছিটকে পড়ল ভেতরে। আলগা মাড়ি উপচে দিল রক্ত। চাক চাক কাঁচা রক্ত। রি রি করল মাড়ির চারপাশ, জ্বালা জ্বালা করে উঠল ভেতরটা। মুখ চেপে বাইরে বেরিয়ে এল সে। এসেই ওয়াক্ থু করে ফেনা সমেত ছেপ ফেলে দিল খলাবাহিরে।

রক্তের ভেতর থেকে মিছরিদানার মত স্পষ্ট হয়ে উঠল একটা সাদা পাথর। তার পাশে হেলিয়ে পড়ে আছে হলদেটে দাঁত।

পেছনে কখন ঠকরী এসে দাঁড়িয়েছে টের পায়নি কাঙ্গাল। দেখে শুনে মিয়ান স্বরে বলল, —হ্যাঁগা, শিলমাছে পাথর থাকে জানোনি বুঝি!

—তুই চুপ যা।

কথাটা শেষ করে দম ধরে থাকল কাঙ্গাল। বরাত মন্দ হলে এমনই হয়। নাহলে ঘুসুর (শুয়োর) পেটে দিচ্ছে কোনদিন কিছু হয়নি, আজ হঠাৎ শিলমাছে শুলোনী! তার যা বয়স—এই বয়সে গাঁ ঘরে অনেকেরই সন্তান হয়। অথচ, তার কপালটা ফোঁপরা বিয়ের কুড়ি বছর পরেও ঠকরীর কোল শূন্য। দিনকে দিন জালি না আসা কুমড়ো গাছের মত মুটিয়ে যাচ্ছে বউটা। ডাক্তার জবাব দিয়েছে, ঠকরীর আর কাচ্চা-বাচ্চা হবে না।

সকালবেলায় ভাঙ্গা দাঁত আর শিলমাছের পাথর দেখতে দেখতে চোখে জল চলে আসে কাঙ্গালের। তার এখন কোন সম্বল নেই। বাপ মারা যাবার দু'বছরের মধ্যে জমিগুলো গেল। হালের বলদ মরল ডুবাঘাস খেয়ে। মা গেল ক্ষয়রোগে। আজ এই ঝিমান ন্যুব্জ শরীর নিয়ে সে বেঁচে আছে বংশে বাতি দিতে।

ক্রমশঃ ঝাপসা হয়ে আসছিল তার সাদাটে দুই চোখ। সে বুঝতে পারল, শরীরের যাবতীয় শিরা-উপশিরা আজ যেন ঝিমিয়ে বইছে। রক্তের গতি আছে, কিন্তু তা যেন আগের মত নয়। বজবজানি দুঃখে জিভ আর টাগ্‌রা শুকিয়ে একসার। পুরো শরীর নিংড়ে ফের

একবার ছেপ ফেলল কাঙ্গাল। মুখের লালাগুলোর লালচে ভাব এখনও যায়নি। অভ্যাসবশতঃ লিকলিকে জিভ ছুঁয়ে আসছে ফাঁকা মাড়ির অংশ।

ঠকরী বলল,—উঠো, বসিকি কি হবে? ডাক্তার দুয়ারকে যাও।

—মোর কাছে পয়সা-কড়ি কিছু নেই। শুধু হাত পা লিইকি গেলে তো অষুধ দিবেনি ডাক্তার।

—টুকে দেখি শুনি খাইলে তো এমন বিপদ হিতানি।

ঠকরীর প্রশ্নে দম ধরে থাকল কাঙ্গাল। উত্তর করল না। বাসি টক ভিজে ভাত দিয়ে মেখে খেতে তার বড় ভাল লাগে। মা বেঁচে থাকতে কত খেয়েছে। তখন দিনকাল এত খারাপ ছিল না। মুরালা মাছ, রুটি মাছ, তেলতাপড়ি মাছ আর লহরা মাছের টক, চালতা কিংবা পুরনো তেঁতুল দিয়ে কত বার যে খেয়েছে। ভাবতে গেলে জল চলে আসে জিভে।

মুগনিপাথর লোকের দুয়ারে নিয়ে গেলে তার খাতির যত্ন খারাপ হোত না। যেন জামাই আদর। গ্রামের চুরি-চামারি হলে ডাক পড়ত কাঙ্গালের। লোক এসে তোয়াজ করে, খাতির যত্নে তপকা বিড়িতে আপ্যায়ণ করে নিয়ে যেত তাকে। বিচার বসতো দোষীকে সাজা দেবার জন্য। দশ গাঁয়ের মুরুব্বি আসত। শুয়োর মারা হতো। লাল শালু মোড়ান পাথরটা জনসমক্ষে বের করে তার উপর ফেলে দেওয়া হোত তিন ভাঁড় পাঁচুয়া। চেটে পুটে খেত নেশায় কাতর মানুষগুলো। তারপর চলত সারাদিন ধরে বিচার। রাত হলে কার্বাইড গ্যাসলাইট জ্বলত, হ্যাজাক জ্বলত। সেই আলোয় সমবেত মানুষজন দেখত সাদা মেঘের চেয়েও সাদা একটা পাথরের ভেল্‌কি। একে একে এগিয়ে আসত সন্দেহজনক মানুষ। মা শীতলার নাম স্মরণ করে ভয় ধুক্‌ধুক্ বুকে পাথরে রাখত হাত। নির্দোষ হলে কিছু নেই, দোষী হলেই আটকে যেত হাত। যাঁতিকলের ইঁদুরের মত ছট্‌ফট্ করত বেচারা।

বাপের মুখেই গল্প শুনেছিল এমনই এক ছটফটানি দোষী ইঁদুরের। শেষে দোষ কবুল করতেই বেচারার নিস্তার। সেদিনটা ছিল হাড়িসাই-এর সবচাইতে আনন্দের দিন। মুগনিপাথর ভয়ের ঠেলায় ফেরৎ দিয়ে গেছে জমিদার চৌধুরী। পাঁকে পুতে গিয়েছে তার কালো ঘোড়ার পা। সাতজন লেঠেল এসে কোনমতে তুলল সেই ঘোড়া। দেখল ঘোড়া পা হড়কে ঠ্যাঙ ভেঙেছে।

সেদিন রাতেই জলে চুবিয়ে চুবিয়ে মারা হল একটা মদ্দা শুয়োর। সঙ্গে জ্বালাভর্তি পাঁচুয়া। যে যত খুশী গিলুক, নাচুক-কুদুক। হৈ-হুল্লোড় আর মাতলামিতে ভরে উঠুক হাড়িসাই-এর নিঃশ্বাস।

মুগনিপাথরকে ঘিরে নাচতে থাকা মানুষগুলোর পা এখন টালমাটাল। আকাশে অর্দ্ধগোলাকার চাঁদ উঠেছে। শিরীষ গাছের পাতায় জ্যোৎস্না পিছলে পুকুরের জলে পড়েছে।

সবার মধ্যিখানে একটা পাথর—কি তার গুণ কেউ জানে না! গাঁয়ের ৭০ বছর বয়স্ক মুরুব্বি বলল—এ হল মুগনিপাথর, দেবত্ব পাথর, বাপো মেনে গড় কর, গড় কর। মনোবাসনা পূর্ণ হিবে।

অর্দ্ধভুক্ত কালো কালো পরিপাটিহীন মানুষগুলোর গর্বের আর শেষ নেই। —হা, দেবতা পাইছে গো মণ্ডলা। শিলপাথর নয়, গ্যাংটা গুড়ি নয়, একেবারে মুগনিপাথর!

—মোর মেনকার দুর্দশা ঘুঁচবে ইবার। দেবতা চাইলে কি না হয়।

—শালা জমিদার, তু মোর মেনকে ভিটাছাড়া করলু, তোর ভালা হিবেনি। মুখে রক্ত উঠিকি মরবু। ধড়ফড়িই কি মরবু। গায়ে পোক্ হি কি মরবু।

হা-হা-হা অট্টহাস্যে মাতাল পুরো পাড়া। গোড়ালি ফাটা পায়ে ধরিত্রীর হৃদস্পন্দন উঠে আসছিল তাদের খেঙড়ো বুকে। পা টলছে, টলুক। চোঁয়া ঢেকুর উঠছে, উঠুক। একমণি লোহার কড়াই-এ শুয়োরের মাংস ফুটছে টগ্‌বগ্।

—জমিদারের মাথাটা পাইলে আগুনে সেঁকি লিতি।

—বড় জ্বালিইচে চৌধুরীদের মেজকর্তা। বউ-ঝিউড়িরা ঘরের বাইরে যাইতে সাহস পাইতানি। শালা পাঁঠা। ফের হাড়িসাই-এ আসলে খাসি করি দিবা।

—চুপ যা।

মুরুব্বির গুরু গম্ভীর কথায় নাচ থেমে যায়। ঢোল-ডগর কাঁসি-সানাই-খোল-করতালের শব্দ মিলিয়ে যায় বাতাসে। মানুষগুলো ঝুঁকে পড়েছে মুরুব্বির দিকে। মুরুব্বির একহাতে তেল-সিঁদুর। ওগুলো মুগনিপাথরে লেপ্‌টে দিয়ে বলল, আয় বাপো মেনে, খঁড়ে খঁড়ে টিপা লে। মঙ্গল হিবে তোদের। অত বয়স হিলাবায়া (ছেলে) অমন খঁড়ে পাথর আর দেখিনি!

—পরশপাথরে লোহা সোনা হয়। খুড়ো গো, এ আবার পরশপাথর নয়তো? লারাণ হাতের কাছে কিছু না পেয়ে অঁটার (কোমর) ঘুন্‌সি থেকে লোহার চাবিটাই ঘষে দিল মুগনিপাথরে।

লোহা লোহাই থাকল। সোনা হল না।

হতাশ লারাণ বলল,—এ কেমন পাথর গো খুড়া, এ যে নির্গুণ মাকাল ফল। কেবল রূপে বলিহারী, কাজে ফোঁপরা! এযে দেখছি, ঝাল-নুন বটিতেও লাগবেনি!

—তুই চুপ যা লারাণ, দুটো পয়সার মুখ দেখিকি কাকে কি কউটু? পাপে যে মরি যাবু। চোখ দিকি রক্ত বেরিইবে।

—আরে ছাড় তো তুমার কথা। পাথরকে আবার ভয় কি?

—ভয় নেই! হ্যাঁরে, তোর বুকের ছাতি অতো বড়? আয়, অগিই আয়। মায়ের দুধ খাইলে লাথ মারিকি চলি যা এ পাথরকে?

—শালগ্রাম শিলা দেখচো খুড়া? কুচকুচিয়া কালা কিন্তু গুণে শীতলা।

—দেখচিরে বাপো, সব দেখচি। বয়স তো মোর কম হিলানি। তিন কুড়ি দশ। দেখি দেখি মোর চুল পাকি গেলা।

—চকমকি পাথর দেখছ?

—তাও দেখচি। হা, লক্ষ্মণপুরের সাউ দুয়ারে। ঝামা-ইঁটার মতুন দেখতে। ঠোকাঠুকি করলেই আগুনের ফুলকি। সেই আগুনে বিড়ি ধরিয়ে খেয়েছি।

চুমকি পাথরের কথা পাড়ল বৈদ্যনাথ। বেশ রসিয়ে রসিয়ে বলল,—সাপে কাটলে ভয় ডরের কিছু নাই। চুমকিপাথর বসিই দাও ক্ষতে। হড়হড়িয়ে বিষ টানবে। আর কষ্টিপাথর? তার কথা তো সবাই জানে। সোনা চিনতে কষ্টিপাথরের জোড় পাওয়া ভার!

লারাণ যেন অল্প জলের চুনামাছ। তড়বড়ানি তার বেশী। এমনিতে সে সিঁদেল চোর। সিঁদ কাটতে গিয়ে প্রায়ই ধরা পড়ে মার খায়। মুগনিপাথরটা তুলে নিয়ে তাচ্ছিল্য মিশিয়ে বলল,—এটার কি দাম? কি হবে শুধুমুধু রেখে?

—তাহলি ফেকিই দে।

পাথরটা নিয়ে সভার মাঝে ছুঁড়ে ফেলতে চায় লারাণ কিন্তু পারে না। তার হাতের সাথে লোহার চুম্বকের মত আটকে গেছে পাথর। নড়ে না, চরে না। বেগতিক দেখে চেঁচিয়ে ওঠে সে, পাড়া কেঁপে ওঠে তার আর্তনাদে। কালপেঁচা উড়ে যায় এক গাছ থেকে আরেক গাছে।

লারাণ বলে, মোরে বাঁচাও খুড়া। পাথর যে আর ছাড়েনি?

—আগুন খাইচু এবার অঙ্গার হাগ। দাড়িতে হাত বুলিয়ে শান্ত তাকায় মুরুব্বি। তালপাখা, জলের ঘটি হাতে ভিড় করে দাঁড়াল কাঁদুনী বউ-ঝিউড়িরা। লারাণের বউ কপাল চাপড়ে মুরুব্বির পায়ের তলায় পড়ল,—ও খুড়া, খুড়া গো, এযে আক্কুসী পাথর। মোর মানুষটারে বাঁচাও গও।

—লারাণ তো গটে চোর। তারে বাঁচাই কি কী লাভ?

—তুমার দু'টা গোড়তল ধরি। কচি বউটা হাউহাউ করে কাঁদল। কাঁখের ছেলেটা ধুলোয় গড়াগড়ি খেল অনাদরে।

শেষে দোষ কবুল করতেই পাথর খসল গতর থেকে। যেন বাসি ফুল ঝরে পড়ল মাটিতে। উপস্থিত সবাই ধন্য ধন্য করে উঠল ভয়ে ও ভক্তিতে। মাঝখান থেকে কদর বেড়ে গেল মঙলার! সে বিড়িতে টান দিয়ে হুংকার দিয়ে বলল,—এবার থিকে বাপো মেনে সাবধান হও তুমরা। চুরি-চামারি ছাড়। সৎ হও। খাটি খুটিকি খাও। নাহিলে এ মুগনিপাথর কাউকে ছাড়িকি কথা কইবেনি।

তারপর থেকে পাথর যেন মঙলার ঘরের সন্তান। সেই সন্তান এখন ঘর ছাড়া। টিলির সাথে ধানক্ষেত থেকে ফিরে আসার পরই পাথরটা কড়িঘর থেকে উধাও। পাগলের মত তন্ন তন্ন করে খুঁজেও মুগনিপাথরের হদিস পায়নি কাঙ্গাল।

টিলি বলেছিল— দেখবা গো, ও পাথর একদিন হারাবেই। ও থাকবেনি। ও অলুক্ষুণে পাথর তুমার সব খাবে।

—খাক, তুর কি? তুর এত গা জ্বলে কেনে রে?

—পাথর আমার সতীন।

—ছ্যা ছ্যা, মুখে তুর বুড়া হালিয়ার (বলদ) নাদ পড়ু। জানু, পাথরটা মোর ছুয়া (ছেলে)। ওকে ছাড় মুই রই পারিনি।

—কুঁজার আবার চিৎ হবার সখ। বাঁজা গাছে ফুল আসেনি গো, তুমি কি এটা জানোনি?

—মোর গাছে ফুল আসবে, ফল আসবে। সবুর কর। সময় হিলে দেখবু।

লাউডগার মত শরীর হিলিয়ে হিসহিসিয়ে হেসে উঠেছে টিলি, গুন্ডি দোক্তা দেওয়া পানটা কলদাঁতে চেপে বলেছে—গাছে কাঁঠাল মুঁচে তেল। হা, ঠকরীদি যা মুটিইচে ওর

আর সন্তান হিবেনি। কুনদিন দেখবা শ্বাসনালী চর্বিতে বন্ধ হিইকি এক্কেবারে ডাঙ্গা পড়িয়ার ঘাট!

কথাটা খারাপ লাগলেও মনে মনে মেনে নেয় কাঙ্গাল। সদরের বড় ডাক্তার বলেছে, বউটা বাঁজা। রাত জেগেও কোন লাভ নেই।

মনটা বসে গিয়েছে সেই কথায়। চল্লিশ পেরলো, এখনও ভোঁ-কটা সংসার। কেউ আর গলা জড়িয়ে 'বাপ' বলে ডাকল না। বংশে বাতি দেওয়ার কেউ নেই। এ কি কম পরিতাপের কথা!

ঠকরী প্রায় বলে,—তুমি আর গটে বিয়ে কর। মুই তার দাসী হইকি রইবা।

কথাটা অন্তর থেকে বলে না ঠকরী, বললে কাঙ্গাল আর একবার ফুঁস করে জ্বলে উঠত। এই বয়সেও বাবা হওয়ার ক্ষুধাটা তাকে ঠায় বসিয়ে রাখে রাতভোর। তখন টিলির কথা মনে পড়ে।

টিলিটা বনটিয়ে। খাঁচায় পুরলে কেবল ছটপটানি। শিকল কেটে পালিয়ে যাবার ধান্দা।

হাটখোলায় তোলা তুলতে গিয়ে টিলির সঙ্গে আলাপ। ছাচুন (ঝাঁটা) বেচতে হাটে এসেছিল সে। খেজুর পাতার ছাঁচুন। টাকায় দু'টো।

কাঙ্গাল গিয়ে বলল, তোলা দাও। হাট ঝাঁটুনোর তোলা।

হা করে তাকিয়ে ছিল টিলি। অস্পষ্ট গলায় বলেছিল,—গটে টাকা মোটে বিচচি। এর থিকে কি দিবা তুমায়? মোর দুয়ারে দুটা পেট, গটে টাকায় কি হয়?

—যা হয় দাও। কথা শেষ করে ঘুলঘুলি চোখে কাঙ্গাল গিলছিল টিলিকে। এত দিন, এত বছর ধরে হাট ঝাঁটাচ্ছে টিলির মতন এমন একটা মেয়ে সে যেন আর দেখেনি! কাঙ্গালের ছুঁকছুঁকানী হাঁড়ি খাওয়া কুকুর চোখে টিলির আস্ত শরীর। ভেতরটা তার গুড়গুড় করছিল ভয়ে।

চাষীঘরের কাঁচা বিধবা সে, অভাবের তাড়ানায় ঝাঁটা নিয়ে এসেছে বাজারে। যেন নিজেকেই সে বেচতে এসেছে এখানে। তার দীঘল টানা চোখে অবিশ্বাসের ছায়া। হাটে-বাজারে খারাপ লোকের অভাব নেই। তাছাড়া, তার শরীরটাও আশ্বিন মাসের নদী-নালার মত ভরাট। হাসলে, কথা বললে, টোবা লেবুর মত ফুলে ওঠে দু'গাল। গজ দাঁতটা বেরিয়ে পড়ে হঠাৎ। টানা ভুরুর নীচে দীঘল দু'চোখে যেন কত দিনের অতৃপ্তি।

মা তার খুনখুনে বুড়ি, মোটে চোখে দেখে না, শ্রবণশক্তি পাতলা। জমি-জমা কিছু নেই। যা ছিল জ্ঞাতি গুষ্টি মেরে খেল সব। মা-বিটিতে দু'জনে মিলে রইবে কোথায়? মাথা গোজার একটা জায়গা ছিল। মা মরার পরে সেটাও হাত ছাড়া হ'ল। কুকুরগুলো একা ঘরে তাকে কেবল খাবলাতে আসে, খাবলে-খুবলে একসার। শেষে যা ছিল সব গুছিয়ে-গাছিয়ে চলে এল হাটখোলায়। বড় ইস্কুলের পিছনে তালপাতা দিয়ে কুঁড়েঘর বানিয়ে দিয়েছে কাঙ্গাল। দিনভর খেজুর পাতা কাটে, চেরে, শুকায়। শেষটায় ছাঁচুন বেঁধে হাটবারে হাটবারে বসে যায় মাছ হাটের পাশে।

এই হাটখোলায় তাকে ঘিরে বাজার এখন গম্‌গম্‌। চ্যাংড়া ছুঁক ছুঁকানি মরদগুলো পয়সা ছুঁড়ে দেয় তার দিকে। টিলি সে পয়সা নেয় না। থু করে ফেলে দেয়। বানে ভাসা এঁটো

পাতা সে নয়। সে হলো বাঁধা পুকুরের শালুক ফুল। ঢেউ দিলেও আপন জায়গায় ধীর স্থির।

একদম প্রথম দিন থেকেই মেয়েটার উপর কাঙ্গালের চাপা একটা টান। বড় আপন মনে হয় ওকে। এই অল্প বয়সে কপাল পুড়ল মেয়েটার. যার জন্য মাঝেমাঝেই কঁকিয়ে ওঠে তার ভেতর। ছোটবেলা থেকেই এ গাঁয়ে সে মানুষ, অথচ একজনও বলল না, আয়রে টিলি, তুই আমার দুয়ারে থাক। খাটবি খাবি, আপন বুনের মত থাকবি।

বরং উল্টোটাই ঘটেছে টিলির কপালে। তার মা মারা যাওয়ার পরে তার পোকাড়ে কপালটা একেবারেই পুড়ল। এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় তাকে নিয়ে গেল সান্ত্বনা দিয়ে। সেই ঘনঘোর বর্ষারাতে ঘুম ভাঙ্গতেই টিলি দেখে মানুষটা উদোম শরীরে তাকে নিয়ে টানা হিঁচড়া শুরু করেছে। বাধা দিতে গিয়ে কোন ফল হ'ল না। ভাগ্যের জোরে বেচে গেল সেবার, কেননা সব বীজে তো অঙ্কুর হয় না!

বিকেলের মলিন আলোয় থান ধুতি পরা টিলিকে দেখে অবাক হয়েছিল কাঙ্গাল। অথচ বছর তিনেক আগে এই হাটখোলা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে রঙ্গিলা শাড়ি পরে সে শ্বশুর ঘর গিয়েছে। কাঙ্গালের হিসেব ভুল হচ্ছিল, কোনমতে মেলাতে পারছিল না সে সেই হিসেব। করকর করছিল চোখের ভেতর।

—তুমার এদশা কে করলা?

—মোর কপাল দাদা। মানুষটা পেটে ঘা নিয়ে বড় হাসপাতালে গেলা, আর আইলানি।

—তোমার শ্বশু-শাশু?

—তার মেনকার কথা কওনি। সব লিইকি খেদিই দিলা। মোকে কইলা,

—সর্বনাশী, রাক্ষুসী। তু মোর ছেলেকে খাইচু। এ দুয়ারে তোর কুনো স্থান নেই।

আঁটা থেকে শালপাতা মোড়ান পানটা বের করে এগিয়ে দিল কাঙ্গাল। বলল,—মন খারাপ করবুনি, সবই কপাল। নিয়তি! ভাগ্য বলিকি গটে জিনিস আছে, তাকে তো মানতে হিবে।

—হঅ, তা যা কইচো।

—পানটা খাও।

—মোর কুনো লিশা নেই।

—বাঁচবো কি লিইকি তাহলে?

চমকে তাকাল টিলি। সজল চোখ। সুড়ুৎ করে নাক টেনে নিয়ে বলল,

—পেটে ভাত-ই জুটেনি, তার উপরে পান।

—লাও, খাওনা কেনে। আমি তুমার দাদার মতুন। দিচ্ছি খাও।

কাঙ্গাল জোর করে হাতে গুঁজে দিল পানটা। বলল,—ছাঁচি পানে ঝাল বেশী। চিবিয়ে পিক ফেলি দাও। নাহিলে মজা পাবনি।

পিক ফেলেনি টিলি। চারমাস পরে কাঙ্গালের সন্তান গর্ভে নিয়ে ধানক্ষেতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলেছে,—এ তুমি কি করলা গো দাদা, এখুন আমি কুনঠি যাই।

—যাবু আর কুনঠি, হাঠতলায় থাক। মুই তো আচি।

—তুমি আমার ধর্ম লিচো, সব লিচো, অখন মোকে ঘর লিই চলো। হাটতলায় একা রইতে মোর ভয় করে।

—দূর পাগলি, একা রইব কেনে মুই তো আসবা।

—চোরের মত আসবা তাই তো! শুইকি, ফুর্তি করিকি কাটু পড়বো ভোররাতে। কেউ জানবেনি, তাই তো!

—কেনে কও এসব কথা! মুই কি চোর?

—চোর হিলে তো ভালা হিতা, তুমি গটে সাপ। শয়তান, ডাকু। মোকে ভুলিই ভুলিই একি করলা তুমি!

কান্নার তোড়ে কাঙ্গালের দু'হাতের বেড় থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল ঢিলি। তার দু'চোখে তখন রাগ। চোখ তুলে তাকাতে পারছিল না ঘেন্নায়। ধান খেতের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে সাপের মুখ থেকে ছাড়া পাওয়া মাদী ব্যাঙের মত হাঁপাচ্ছিল।

—এ ঢিলি, যাবিনিগো, তুমার বান (দিব্যি), মা শীতলার বান। এ ঢিলি? রোদের মধ্যে কেঁপে যাচ্ছিল কাঙ্গালের ভয়ার্ত গলা। ফাঁকা মাঠে ছড়িয়ে পড়ছিল তার আকুতি। থমকে দাঁড়িয়ে ঢিলি বলল,—মোর এ জীবন রাখার কুনো দাম নেই। মুই গলায় ফাঁস লিবা।

—মোর বান, এ ঢিলি, এ পাপ তুমি করবানিগো। যে আসেটে, আসতে দাও। তার তো কুনো দুষ নেই। তুমার দু'টা গোড়তল ধরি।

—কুলাংগারকে বাঁচিই রাখি কী লাভ? বাপ কুলাংগার হিলে ছেলেও কুলাংগার হিবে। কাঁটা গাছের বীজে কখনো চন্দন গাছ হিবেনি। মুই মরবা, তাকেও মারবা।

—অতো বড় গটে জীবন, একা রইব কি করি?

কাঙ্গাল এগিয়ে গিয়ে হাত ধরে ঢিলির। ট্যাক গজান দেহলতাকে টেনে নেয় বুকে। শান্ত প্রকৃতিতে উথলানো দুধের মত দুটো হৃদয় আদিম খেলায় মেতে ওঠে আবার।

সরু যে পথটা এঁকে বেকে হাড়িসাই-এ ঢুকেছে তার দু'পাশে হাড়মটমটি আর তেকাঠি গাছের ঝোপ। এ বোশেখেই নতুন মাটি পড়েছে। হাঁটতে গেলে চ্যাট চ্যাট করে কাদা। পা আঁটকে যায় এঁটেল মাটিতে। খুব সাবধানে হিসাব করে পা ফেলছে কাঙ্গাল।

সকাল বেলায় ঠকরী তাকে হাটখোলায় আসতে দেয়নি। মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছে—যদি যাও তো মোর মাথা খাও। বর্ষা বাদলের দিনে তুমি ঘরে থাক বাপু। মোর ডান চোখটা নাচেটে।

কাঙ্গাল তাকে বোঝ দিয়ে বলেছে,—আজ মোকে যাইতেই হিবে। আজ যে মিটিং।

—মিটিং?

—হুঅ। লারাণটা মোর পাথর লিচে। শালা চোর, আজ ওর সাজা হিবে। পঞ্চাতবাবুরা কইচে আজ একটা হেস্তা নেস্তা হিবে।

—হাঁ গঅ, মুগনিপাথর ঘুরোন পাবা মোর মেনে?

—পাবা তো!

—সত্যি মোর গা ছুঁইকি কও তো?

মিথ্যে মিথ্যি গা ছুঁয়েছে কাঙ্গাল। মুগনিপাথর কোথায়, কার ঘরে, একথা হলফ করে

কেউ জানে না।

পাকা রাস্তায় উঠে আসতেই শেষ হয়ে এল বিকেল। মরা বিকেলের ঝিমানো আলোয় শকুন উড়ছিলো আকাশে। উপর আকাশে তখন চাক বেঁধে আছে আঁধার। নারাণের বড় ছেলে পরাণ-এর সাথে দেখা হ'ল মুখোমুখি। বাপের মুখ রেখেছে ছেলেটা। বাপের বদ বিদ্যা সব কটাই তার আয়ত্বে।

কাঙ্গালকে দেখে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ফুঁসে উঠল সে,—খুড়া, শুনো তোমার সাথে কথা আচে?

—কি কথা?

—তুমি নাকি কইচো, মুই মুগনিপাথর চুরিইচি।

দম ধরে থাকে কাঙ্গাল। বলে,— কে লিচে মুই কারও নাম স্পষ্ট করি কইনি। মুই দেখিনি কাউকে, তাই নাম কই কি করি?

—কাজটা কিন্তু ভাল করোনি। মোর মাথা গরম, কখন কি করি দিবা তখন মোকে দোষে দিবোনি!

—কি করবু তুই? চোরের মার বড় গলা। থাম।

—থামবা কেনে, তুমার ভয়ে?

—তোর বাপো গটে চোর থিলা। তুইও চোর। তোর মুখে ভালা কথা মানায়নি।

—তোর বাপোতো চিটিংবাজ, লোক ঠকিইকি খাইচে। গটে সাদা পাথর লিইকি ব্যবসা শুরু করথিলা, শেষে তো মরলা সাপের কামড়ে। হুঁ বলেকি,—মুগনিপাথর—দেবত্ব পাথর! যত সব বুজরুকি! ভাবছ, মোর মেনে কিছু জানিনি।

—কি জানু তোরা?

—ওসব পাথর-মাথর কিছু না। স্রেফ পয়সা কামিইবার ধান্দা।

—চুপ কর! নাহিলে গটে চটকান (চড়) মারি দিবা। যত বড় ছুয়া (ছেলে) নয় তত বড় কথা?

ঘনায়মান অন্ধকারে খুড়া-ভাইপো মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। দুজনেরই চোখ লাল। গরম নিঃশ্বাস।

তখনই শুরু হল ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। বাজ পড়ল মাঝের আকাশে। দুড়দাড় করে ভিজে গেল দু'জনেই। দু'জনকে দেখে নেবে বলে দু'দিকে ছুটল দু'জনেই। হাটখোলা অব্দি আসতেই কাঙ্গাল একেবারে কাক ভেজা। থরথর করে কাঁপছে। এই দুর্যোগে টিলির কাছে গেলে দুটো সুখ-দুঃখের কথা বলা যায়।

মেয়েটার পেট নেমেছে ভাদ্র মাসের পেল্লাই কাখুরের (কুমড়ো) মত। বেঢপ পেটটা নিয়ে কোথাও বেরুতে পারে না। হাটখোলায় বেরুলে লোকে দেখে তাকে হাসে। বলে,— রাঢ় মায়াঝির মরণ দেখ। কার কাছে শুয়ে পেট বাঁধাল কে জানে।

শত জেরার মুখেও টিলি কাঙ্গালের নামটা বলেনি। বুকে হাওয়া লাগিয়ে কাঙ্গাল সুপুত্রের মত ঘোরে। মাঝে মাঝে দু' পাঁচ টাকা যা পায়, সংসার খরচের জন্য টিলির হাতে তুলে দেয়।

কুঁড়ে ঘরটার কাছে যেতেই আকাশ নামল জোরে। ভেজান কপাট সরিয়ে ভেতরে ঢুকে এল কাঙ্গাল। এসেই থ।

মেঝের উপর কাঁথাকানি চেপে প্রসব বেদনায় কাতরে যাচ্ছে টিলি। তার চোখময় জল। সারা মুখে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। ঠোঁটের উপর দাঁত বসিয়ে সে দু'হাতে চেপে ধরল কাঙ্গালের পা।

—ওগো, তুমি আমাকে বাঁচাও। আমি আর বাঁচবোনি গো!

ঘন অন্ধকারে কেউ কারোর মুখ দেখতে পায় না। জলের ছাট আসে। উত্তর দিকে বাজ পড়ে হঠাৎ। তখনই টিলির নাড়ি ছিড়ে বরিয়ে আসে রক্তঢেলা। বিদ্যুৎ-এর আলোয় কাঙ্গাল দেখল, ছেলেটার গায়ের রং বজ্রের মত। গুড় গুড় ধ্বনি নয় একেবারে বজ্র গলায় হাত-পা ছড়িয়ে কেঁদে উঠল শিশু। কাঙ্গাল উবু হয়ে উত্তাপ নিল তার প্রথম ফসলের। বাবার হাত থেকে প্রথম যেদিন মুগনিপাথর নেয়—সেই অনাস্বাদিত স্পর্শ অনুভূতি আজ যেন ফিরে এল আবার। শিরায় শিরায় খেলে গেল সেই স্পর্শ অনুভূতি। মুহূর্তে শিহরিত, রোমাঞ্চিত হ'ল কাঙ্গাল! অপলক দৃষ্টিতে, এক অতি প্রাকৃতিক পরিবেশে কাঙ্গাল দেখল, টিলির কোল আলো করা সন্তানটি যেন তারই ঘরের মুগনিপাথর।

লু

ঠেলতে-ঠেলতে একেবারে রেললাইনের ধারে, লঝ্‌ঝড় সাইকেলটা আর চলছিল না, লাট্টু ব্যাগ দুটোকে হ্যান্ডেল থেকে নামিয়ে এনে চারা অশ্বত্থ গাছটার ছায়ায় গিয়ে বসল। গা বেয়ে যেন নদী নামছে ঘামের, মাথার উপর রাক্ষুসী এক সূর্য—তার দানব কিরণে পৃথিবীর ঘাস-মাটি-লতা-পাতা পুড়ছে শ্মশানের কুচুটে ঘ্রাণ ছড়িয়ে। লাট্টু পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ বুক পিঠ গলা মুছল ভালো করে, লক্ষ্য করল ভেজা রুমালে উঠে এসেছে থোক থোক ময়লা—আজ নিয়ে পরপর তিন দিন তার গা ধোওয়া হয়নি, ঘরে যে জল ছিল না তা নয়—জল ছিল কিন্তু নানান বদ্‌খচ্‌ ঝামেলায় সে আর সময় করে উঠতে পারেনি। সমস্ত শরীরে এখন একটা চ্যাটচেটে ভাব, বুকের চামড়ায় পোস্টারের মতো সেঁটে আছে গেঞ্জি, জামাটাও মানচিত্রের নদীর মতো নুন ফুটিয়েছে পিঠে, ফলে সমস্ত শরীর জুড়ে কেমন অতি চেনা ভ্যাপসা একটা গন্ধ—এমন গন্ধ যে শরীরে লুকোনো থাকে রেশনের গুম্‌সা চালের মতো তা সে জানত না, জেনে আনন্দ হয় না বরং মনটা বিষিয়ে ওঠে। লালী তার বউ, কখনো তার দেহ সুষমায় এমন গন্ধ যে পায় না তা নয় কিন্তু সেই গন্ধ কাঁটালীচাঁপা ফুলের গন্ধ, বাসমতী চালের গন্ধ, নদীর গন্ধ, নারীর গন্ধ—সেই নির্যাসমন্ডিত গন্ধ তার অতি চেনা, লালী যখন সম্পূর্ণ শিল্প লালিত্যে ভরপুর হয়ে ওঠে অন্তরঙ্গ মুহূর্তে তখন সে এই গন্ধটি পায়।

রেললাইন চলে গিয়েছে এঁকেবেঁকে, রোদে চকচক করে ধাতব পাত—খোলা তরোয়াল যেন ঝল্‌কায়—তার চারপাশে গিট্টি পাথরগুলো দানবের চোখের চেয়েও কট্‌কটায়। যেখানে লাট্টু বসে আছে তার নিচে হাওড়া-মাদ্রাজ লাইন—কিছুক্ষণ আগে একটা মেল ট্রেন গিয়েছে জমি কাঁপিয়ে—তার উত্তেজনায় এখনো পাখিগুলো ডানা ঝাপটায় আকাশে, বাতাস সুস্থির না হলে তারাও সুস্থির হয়ে গাছের ডালে বসতে পারে না। ঠিক উপরের লাইনটা বম্বে-লাইন, জোড়া সাপের মতো চলে গেছে টাটার দিকে, লাট্টু মনে করতে পারে না—সে কোনদিন ঐদিকে গিয়েছে কিনা অথচ তার বাবা ছিল হেড-খালাসী—বছরে পাশ পেত তিনটে, ছ'টা পি. টি. ও. তবু কোনদিন তাদের যাওয়া হয়ে ওঠেনি যেমন সবাই যায় বৎসরান্তে—এটা-সেটা দেখে ফিরে আসে নিজস্ব ঠিকানায়, তারপর গল্প-গুজবে মাতিয়ে তোলে পাড়া। লাট্টু জানে—বাবা কেন যেতে পারত না, আসলে মাত্রা ভাঙা সাপ এক জায়গায় জীবন বিতিয়ে দেয় অর্থাৎ যে মানুষের কোমরের শক্তি নেই লাট্টু সেই প্রথম অনুভব করে। রেল-কোয়ার্টার ছিল না, ছিল ঘিঞ্জি বস্তিতে একটা দশ হাত বাই আট হাত মাপের টালির ঘর—প্রতি মাসে তার বাবা ভাড়া গুণে দিত পঞ্চাশ টাকা, তবু খাটা পায়খানায় গিজগিজ করত পোকা—একটু সন্ধে নামলেই নেশাখোর মানুষরা টালমাটাল পায়ে হাঁটাচলা

করত বস্তির অলিতে-গলিতে। অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির মানুষ ছিল লাট্টুর বাবা, মদ্যপ জুয়াড়ী মানুষের ছায়া মাড়াত না, বিড়ি-পান সিগারেট খেত না—শুধু শীতঋতুতে দু-কাপ চা খেত এবেলা-ওবেলায়। লোকে মান্য করত তার বাবাকে, বলত—এমন মাটির মানুষ আর হয় না। জুয়া-মদের আখড়ায় থেকে যে মানুষটা বদ নেশা করে না—বলতে হবে তার বুকের জোর আছে। বাবার জন্য গর্ববোধ হতো লাট্টুর—গর্বটা এমনই মধুর—যা সে কারোর কাছে উচ্চকণ্ঠে বলত না, মানুষ, যেমন বিমোহিত চোখে দূর থেকে পুষ্প-উদ্যানের দিকে চেয়ে থাকে তেমনই তাকিয়ে থাকত লাট্টু—তার বুকের ভেতর ছোট্ট সুখের একটা নদী বয়ে যেত—সেই প্রবাহিত স্বচ্ছতোয়া নদীর কথা সে ছাড়া আর কেউ জানত না। নদী যে শুকিয়ে যায় সে বোধ তখন লাট্টুর হয়নি, নদী একদিন শুকিয়ে গেল—তার মা শাঁখা ভেঙে সিঁদুর তুলে বিধবা হলো—তারা দুই ভাই মায়ের শোককাতর দৃষ্টির মধ্যে বেড়ে উঠল যেমন জংলা গাছগুলো অনাদরে বেড়ে ওঠে—তেমন। তিন-চার ঘরে বাসন মাজত তার মা, আয় সামান্য—তাতে অভুক্ত পেটের দাবি মিটত না, খাঁই থেকে যেত—আর সেই খাঁই না মেটাতে পেরে মনের ভেতর গুমরে মরত তার মা। লাট্টু তখন স্কুলের শেষের ক্লাসে, একদিন দুম্ করে পড়া ছেড়ে দিল সে—মায়ের রুগ্‌ণ মুখের দিকে তাকিয়ে সে হাত কামড়াল, হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াতে লাগল উপার্জনের রাস্তা। পেয়েও গেল, বস্তির একটা উচাটেমার্কা ছেলে তাকে নিয়ে গেল বাজারের সাট্টার আড্ডায়, ধারে টিকিট কিনে বেচতে লাগল কমিশনে। ততদিনে তার মায়ের হাত-পায়ের হাজাগুলো বর্ষার ছাতুর মতো ফুটে উঠেছে কদর্যভাবে—লোকে বলল, লাট্টুরে, তোর মাকে একবার হাসপাতালে নিয়ে যা—এগুলো হাজা নয়—মনে হয়, গায়ে কুঠ ফুটেছে। লোকের ধারণাই ঠিক। ডাক্তারবাবু বললেন, লেপ্রসি, তবে ভয়ের কিছু নেই—রেগুলার ট্রিটমেন্ট করলে সেরে যাবে। সেখানেই লালীর সাথে আলাপ, রোগা ছিপছিপে মেয়েটা বড় পান খেত—সে প্রায়ই আসত তার বাবার সাথে হাসপাতালে, তার চোখ দুটো এত অদ্ভুত মায়া জড়ানো, লাট্টু সেই স্বপ্নিল চোখের মায়ায় শত অভাবেও ফেঁসে গেল। লালী এই মাস-তেরো হলো মা হয়েছে, তার কাঁখের সন্তানটি বড় ভোগে—প্রায়ই সর্দি-কাশি-জ্বর—কখনো বা বুকে শ্লেষ্মা জড়িয়ে ঘড়ঘড়িয়ে দম আটকে যায়। তখন লালী এবং লাট্টু—দুজনেই কাতর গলায় ভগবানকে ডাকে, ঠাকুর, একে তুমি ছিনিয়ে নিও না।

—রাখে হরি তো মারে কে? লাট্টুর বাবা বলত এই কথাগুলো—লাট্টু শুনত; কিন্তু অর্থ বুঝত না। আজ সে নিজে বাবা, তাই বাবার কথার অর্থ সে সঠিক বুঝেছে। আজও আসার সময় লালী বলেছিল, যেও না গো, লোটনের শরীরটা বড় খারাপ, সারারাত শুধু কেশেছে—ওকে আজ ডাক্তারের কাছে নিয়ে চলো। এখনকার জ্বর ভালো নয়, সঠিক ওষুধ না পড়লে বিপদ ঘটে যেতে পারে।

বিপদ নিয়েই মানুষের ঘর-সংসার, লাট্টু তাই বিপদকে এত ভয় পায় না, তাছাড়া ভয় পেলে তার একদন্ড চলবে না—সে এখন যে পেশায় নিযুক্ত তা অনেকটা জহিরিলা সাপের মুখ থেকে বিষ বের করার চেয়েও মারাত্মক। তার কাজে পরতে-পরতে ঝুঁকি, একটু এদিক ওদিক হলেই থানা-পুলিশ-জেলহাজত—মান-সম্মান নিয়ে টানাটানি। যদিও

সে এখন মান-সম্মানের তোয়াক্কা করে না। লাট্টুর মা ঘরে মদ বানায়, সেই মদ পলিথিনের ক্যানে ভরে লাট্টু দোকানে দোকানে, ডেরায়-ডেরায় দিয়ে আসে। এতে লাভ মন্দ নয়, সংসারটা চলে যায়।

মাইল তিনেক পথ ঠ্যাঙানোর পর ফুস্ করে হাওয়া বেরিয়ে গিয়েছে সাইকেলের, প্লাস্টিকের সাপের মতো টায়ার এখন চুপ্সানো, লাট্টু সেই টিউব দাবানো সাইকেলের দিকে চেয়েছিল চুপচাপ। বাবার স্মৃতি বলতে এই সাইকেলটা, ভেবেছিল—রেল কোম্পানী থেকে টাকাগুলো পেলে নতুন আর একটা কিনে নেবে কিন্তু তা আর হয়নি। বাবা মরার আগে গলা অব্দি ধার করেছিল—তা শোধ দিয়ে যা অবশিষ্ট ছিল সেই টাকায় মায়ের ইচ্ছে অনুযায়ী সে পল্টুকে একটা পান-বিড়ির গুমটি দোকান বানিয়ে দিয়েছে রাস্তার ধারে। পল্টু পান-বিড়ি বেচে, সেই সঙ্গে সাট্টার টিকিটও। সন্ধের পর থেকে তার দোকানের পিছনে চোলাই-হাঁড়িয়া পাওয়া যায়। পল্টুটা দাঁড়িয়ে গেলে লাট্টুর অত চিন্তা ছিল না—কিন্তু তারা দুই ভাইয়ে যা কামায় তার অধিকাংশটাই পুলিশের হিস্সা দিতে বেরিয়ে যায়। গায়ে বড় বাজে, মেহনতের পয়সা—বে-মতলবে অন্য কেউ চুষে খেলে। তাই গত সাতদিন থেকে লাট্টু অন্য রাস্তা নিয়েছে। পল্টুর দোকানের ঝাঁপ ক'দিন থেকে বন্ধ। লাট্টু একাই ঘোরে দোকানে দোকানে, মাল সাপ্লাই দিয়ে চতুর গিরগিটির মতো সরে পড়ে—যদি কোথাও সে পুলিশের গন্ধ পায় তাহলে ভুল করেও সে আর ওপথের ছায়া মাড়ায় না। পলিথিনের ক্যানে মদ ভর্তি, সেই ক্যান ঢাকা থাকে চটের ঝোলায়—বাইরে থেকে দেখলেও সহজে কেউ বুঝতে পারে না, লাট্টু সাইকেল চালিয়ে পাঁচমোড় থেকে মেছোবাজার, মেছোবাজার থেকে পোস্টাপিসের মোড় কিংবা সেখান থেকে ধোপাপাড়ায় চলে যায়। স্বচ্ছন্দ তার গতি, ভয়-ডর নেই—ভয়-ডর থাকলেও তা বুকের এককোণে লুকোনো, মুখে-চোখে তার ছায়া পড়ে না। দীর্ঘদিনের অভ্যাসে সে এখন পুরোদস্তুর সাপ্লাইওলা—তাকে না দেখলে দশ-বারোটা চা-পান বিড়ির দোকান, অন্তত তিনটে ঝুপড়ি-হোটেল একেবারে অন্ধকার।

চারা অশ্বত্থের ছায়ায় লাট্টুর সামান্য ঝিমুনি এসেছিল কিন্তু মালগাড়ির খটাঘট আওয়াজে সে ধড়ফড়িয়ে তাকাল, বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল ভয়ে, গার্ড-সাহেবের শেষ বগিটা চলে যেতেই সে নিশ্চিন্ত মনে আকাশের দিকে তাকাল। পুলিশ-ভীতি তাকে আজ ক'দিন থেকে জেঁকে ধরেছে। হিস্সা নিয়ে ঝামেলা, পুরনো রেটে রাজি নয় ওরা—নতুন রেটে টাকা দিতে গেলে ভাগের মা গঙ্গা পাবে না। তবু সমঝোতায় আসতে চেয়েছিল লাট্টু, ওরা রাজি নয়—দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলেছে—নতুন রেটই চাই। সবাই দিচ্ছে, তুই কেন দিবি না! না দিলে বস্তি চড়াও হয়ে চুল্লী-হাঁড়িকুড়ি সব ভেঙে দিয়ে আসব। জলে বাস করে কুমীরেব সাথে লড়তে সে চায় না, ধড়ে জান থাকলে জল থেকে মানে মানে উঠে আসাই ভালো। কিন্তু ঝাড়া হাত-পা নিয়ে ডাঙায় থাকলে তার পেট চলবে কি করে, কি করে লোটনের আধা সের দুধের দাম সে যোগাড় করবে। লালী ভীতু স্বভাবের মেয়ে, সব শুনে কেমন ফ্যাকাশে মুখে বলেছিল, পুলিশের সাথে লড়তে যেওনি। না পোষায় তুমি এ ধান্দা ছেড়ে দাও। দোকানটা দুই ভাইয়ে মিলে চালাও। যা হবে তাতে আমাদের চলে যাবে।

—দোকান চালাতে দিলে তো!

—কেন, দেবে না কেন? দোকান তো কারোর বাপের নয়?

লালী অবুঝ, সে জানে না—সরকারী জায়গায় গুমটি পান-বিড়ির দোকান—পুলিশ চাইলে ব্যাঙের ছাতার মতো যখন খুশি ভেঙে দিতে পারে। তবু এক অনমনীয় জেদে লাট্টু টইটুম্বুর, সে হারবে না—সহজে মাথা নত করবে না—জীবনধারণের জন্য তার এই নিরন্তর লুকোচুরি খেলা—এ যেন তার কাছে সাট্টার বাজি ধরার মতো। সে তো সহজে এ পথে নামতে চায়নি, মায়ের কুষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই সংসারটা যে বেসামাল হয়ে উঠেছিল, দুটো ভাত কিংবা রুটির জন্য তাদের ক্ষুধার্ত চোখ লোভী পশুর মতো ব্যাকুল চোখে তাকাত। যখন মানুষের চোখ পশুর চোখের চেয়েও কদর্য হয়ে ওঠে তখন সে চোখ থেকে সততা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেলে তার জন্য সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তিটি দায়ী থাকে না। রেল কোম্পানীর কাছ থেকে বাবার টাকাগুলো পাওয়ার জন্য রবারের হাওয়াই চপ্পলের গোড়ালিটা ক্ষয়ে গিয়েছিল নিদারুণভাবে, বারবার যাওয়া-আসায় বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল ধৈর্যের। যে মানুষটা জীবিত অবস্থায় মদ পান বিড়ি ছোঁয়নি, তার.মৃত্যুর মাত্র আড়াই মাস পরে তার স্ত্রীকে জীবনধারণের জন্যে চোলাই মদের ভাঁটি খুলতে হয়, নতুন হাঁড়িতে ভাত পচিয়ে মেশাতে হয় বাখর বড়ি—দিনরাত তার রমণীয় আঁচলে, পবিত্র দেহলতায় মিশে থাকে নেশালী দ্রব্যের উগ্র মাদকীয় গন্ধ। এসব ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস ছাড়া আর কিছু নয়। তাই লাট্টু কোনদিন আসামীর কাঠগড়ায় তার মাকে দাঁড় করাতে পারে না, মায়ের প্রতি তর্জনী উঁচিয়ে সে কোনদিন কথা বলতে পারে না, তার গলা কাঁপে, কণ্ঠরোধ হয়ে আসে—সে কখনো লালীকেও বোঝাতে পারে না, জীবন একটা সরলরেখা নয়—জীবন বাঁক খাওয়া নদী, পাকদণ্ডী পথ, কাঁটা বেগুনের ঝাড়—যা মাটি ছেড়ে এক বিঘৎ বাড়লেই ছাগলে মুড়িয়ে খাবার ভয়।

বস্তির তরলা মাসী আসত তাদের বাড়িতে, তার ছেলে হাবলুরও চোরাই মদের ব্যবসা, ভাঁটিখানা আছে—সেই মাসীই গুপ্ত মন্ত্র দিয়ে গেল লাট্টুর মায়ের কানে-কানে। আঁতকে উঠে লাট্টুর মা বলেছিল, ও হর্বেনি দিদি, অমন ঝুঁকির কাজ আমার দ্বারা কোনদিনও হয়নি। তোমার কথা শুনে আমার গা-হাত-পা থরথর করে কাঁপছে। বস্তিতে থাকি বলে এখনো তো মানসম্মান, বিবেক সব কিছু খুইয়ে বসিনি।

—তাহলে মর। চটে উঠেছিল তরলা মাসী, তার বয়স্ক মুখে কি ভীষণ কাঠিন্যের রেখা, শক্ত ঠোঁট নাড়িয়ে সে বলেছিল, ছেলেপুলেগুলো শুকিয়ে মরবে চোখের সামনে—সেটা কি দেখতে তোর ভালো লাগবে? তোর লাট্টুর একটা গতি হলে ধান্দাটা ছেড়ে দিস। যতদিন ওর কিছু না হয় ততদিন এটাকে অবহেলা করা ঠিক নয়। আমি তোর ঘরের মানুষটার কাছে ঋণী, সে আমাকে সময়ে-অসময়ে দেখত। যে আমাকে দেখেছে, আমি তাকে দেখব। সাঁঝের বেলায় তুই আমার ঘরে আসিস, আমি তোকে পাখি পড়নোর মতো করে সব শিখিয়ে দেব। দেখবি, কাজটাকে যত কঠিন ভাবিস—তত কঠিন নয়—সব একেবারে জলের মতন সহজ।

লাট্টু দেখেছে—প্রথমদিন চুলায় আগুন ধরিয়ে সেই উদ্‌গত ধোঁয়া-মিশ্রিত আগুনের

দিকে তাকিয়ে তার মা কেমন অবুঝ নয়নে কাঁদছিল, সেই কান্না নিজের অসহায়ত্বের জন্য নয়, সর্বগ্রাসী দারিদ্র্যের জন্য নয়—সেই জলজ কান্নাময় অনুভূতি ছিল তার মানবিক অধঃপতনের জন্য। লাট্টুর মা এখন আর কাঁদে না, সেই কোন কাকভোরে উঠে চুলা ধরায়, গুড়াখু দিয়ে দাঁত মাজে, তারপর গনগনে আগুনের দিকে তাকিয়ে মাদকীয় চড়া গন্ধের সাথে নিজেকে কেমন মিশিয়ে দেয়। লাট্টুর বেশ মনে আছে—ছোটবেলায় মাকে জড়িয়ে ধরে শুলে মায়ের খোলা চুলের ভেতর থেকে ঠান্ডা তেলের মিষ্টি এক বাস্না বেরত, কোন্ সুবাসিত তেলের গন্ধ তা সে স্পষ্ট বুঝতে পারত না তবে পরিচিত কোনো সুগন্ধের সাথে হুবহু মিলিয়ে ফেলত সে—তখন মাকে মনে হত—গন্ধরাজকন্যা—কোন সুদূরে তার ঘর, সেখানে এই বস্তির কেউ যায়নি, যেতে পারেনি—কেবল তার মা গিয়েছে সেই সুগন্ধ সমর্পিত রাজ্যে। এখন মায়ের লাবণ্য মুছে চোখের কোণে জমেছে শাওনের মেঘ, মাথার চুলে কি আশ্চর্যভাবে ছড়িয়ে আছে পেঁয়াজের শেকড়ের মতো অদ্ভুত এক বিন্যাস—যা দেখে লাট্টু অনুমান করে বয়সের কাঠঠোকরা পাখিটা হরদম ঠুকরে যাচ্ছে তার মাকে—মায়ের এখন বিশ্রাম দরকার। মদ-ভাঁটির-দুর্গন্ধ পেরিয়ে মা-কে কোথাও নিয়ে যাওয়া দরকার। নিয়ে যাবে লাট্টু, এ বিষয়ে সে নিশ্চিত—শুধু চাকরির অপেক্ষায়—তখন সে মুক্ত বিহঙ্গ, স্বপ্নেও ভাববে না এই ঘৃণ্য জীবনের কথা।

রেল কোম্পানীতে চাকরী হবে, কথা দিয়েছেন মাতব্বর এবং এই আশায় বাবার চাকরির পাঁচ হাজার টাকা সে এবং তার মা পে-অফিস থেকে তুলে এনে সরাসরি ধরিয়ে দিয়েছে সেই লোমশ, ঘড়ি-বাঁধা ফর্সা ধবধবে হাতে। মেডিকেলের পর আরো দিতে হবে পাঁচ হাজার...তারপর লাট্টুর আর কোন চিন্তা নেই, পাশ তুলে সে মাকে নিয়ে ঘুরে আসবে কাশী-গয়া-মথুরা বৃন্দাবন—মা দু'চোখ ভরে দেখবে যা সে জীবন ভরে দেখতে চেয়েছে—যা সে দেখতে পায়নি—এবার দেখবে, নিশ্চয়ই দেখবে। চারা অশ্বত্থের ছায়ায় বসে মনে মনে তেতে উঠেছিল লাট্টু, মাকে নিয়ে সুখের কথা ভাবতে তার ভালো লাগে কেননা মা তার কাছে রামায়ণ, মহাভারত— গন্ধরাজ তেল—সেই মহীয়সী মহিলা যাঁর পদ্মকোমল হাজায়-ফাটা পা-দুটো ছুঁয়ে থাকলে জীবনের সমস্ত পাপ ধুয়ে যায়।

কিন্তু ভাবের রাজ্যে বসে থাকলে আসল কাজটি হয় না, এখনো লাট্টুর তিনটে দোকানে তাগাদা বাকি, দু'ক্যান ভর্তি মাল পৌঁছানো বাকি—সাট্টার টিকিটগুলোও বেচা হয়নি, পকেটের ভেতর ভাঁজ হয়ে পড়ে আছে। এদিকে রোদের যা ঝাঁঝ তাতে মাথায় চাল রাখলে মুড়ি হয়ে যাওয়ার দশা; তার উপরে সাইকেলটাও ঠিকসময় খোঁড়া হয়ে গেল। বেরবার সময় লালী বারেবারে মুখ শুকিয়ে কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলেছে, নিজের চোখে লোটনের অবস্থা তো দেখে গেলে, গায়ে ধুম জ্বর—আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরো। পুলিশের সাথে ঝামেলায় যেও না, ওরা যা বলে মেনে নিও, তুমি না-ফেরা পর্যন্ত আমি খুব চিন্তায় থাকব।

সত্যিই চিন্তায় থাকে লালী, বাঘের থাবা আর পুলিশের হাত—দুটোকেই বড় ভয় পায় সে। সঙ্গে মাল থাকলে বিপদ যে কখন হামলে পড়বে তার কোন ঠিক নেই, শুকনো ডাঙায় আছাড় খেয়ে যে কোন সময় তার হাড়গোড় ভেঙে যেতে পারে, যে-কোন সময়

তার হাজতবাস হতে পারে। তাই সাহস থাকলেও সেই সাহসের ভেতর থেকে ভয়ের হিম সাপটা মাঝে মাঝে ফণা তোলে, ফোঁসফাঁস নিশ্বাস ছেড়ে লাট্টুকে সতর্ক করে দেয়, লাট্টু আগের তুলনায় আরো সতর্ক হয় কিন্তু শীতের ফুলকপির মতো একেবারে ঝরঝরে হতে পারে না।

সাইকেলটার অবস্থা দেখে লাট্টুর যেটুকু মনোবল ছিল সেটুকুও যেন ঢিল খাওয়া কাকতাড়ুয়ার মতো মুখ থুবড়ে পড়ে, সে দরদরিয়ে ঘামতে থাকে—লোটনের জ্বরো মুখটা মনে পড়তেই সে আবার খাড়া হয়ে দাঁড়ায়, মুখ ফাঁক করে শ্বাস নিয়ে সাইকেল ঠেলতে-ঠেলতে নেমে আসে পিচ রাস্তায়। চৈত্রমাসের দুপুর, পিচ গলছে, পায়ের হাওয়াইটা আটকে যায় নরম পিচে, সাইকেলের সামনের চাকা কিছুতেই যেন আর গড়ায় না। রেললাইনের নিচের দিকটায় সে খুব কম আসে, এলাকাটা ভালো নয়—লোহা-চোর আর ওয়াগান ব্রেকারে ঠাসা—আর মানুষগুলোও রুক্ষ-কর্কশ, কথা-বার্তার কোন ছিরিছাঁদ নেই তবু লাট্টু এখানেই আসে—কেননা রেললাইনের ধারে তিনটে ঝুপড়ি দোকানে মাল ভালো বিকোয়, পেমেন্ট দিতেও কোন ঝুট-ঝামেলা করে না। তাই ঝুঁকি নিতে লাট্টু পিছ-পা.হয় না, ঝুঁকি না নিলে ঘরে বসে মৌজ করে তার এই ধান্দা চলবে না। সামনে তাতা হাওয়া—লাট্টু অনুভব করল—ক্যানে নয় মালগুলো যেন তার পেটের ভেতর ঢলঢল করে নড়ছে। যদি এমন হতো—ক্যানে না থেকে মালগুলো যদি তার পেটের ভেতর থাকত তাহলে পুলিশ কেন, পাকা ঘুঘু অফিসারও টের পেত না তার অন্দিফন্দি। উদ্ভট ভাবনায় মনে মনে হেসে ফেলল সে, তখনই একরাশ ধুলো এসে তার মুখগহ্বরে ঢুকে গেল; শুধু মুখ নয়, নাকে-চোখে ধুলোর ঝাঁপটা লেগে সে বেশ নাজেহাল হয়ে পড়ল। তবু কোনমতো চোখ ডলে নিয়ে সে সাইকেল দোকানটার দিকে তাকাল, যেটুকু আশার আলো খুঁজকড়ি কাটল তা ফুস্ করে দমে গেল কেননা সাইকেল দোকানের লোহার টুলে বসে খৈনি ডলছিল একটা খাকী পোশাকের পুলিশ। দূর থেকেই সতর্ক হলো লাট্টু, বুকের ভেতরটা জ্বালা করে উঠলেও সে সাইকেল নিয়ে রাস্তার একপাশে গিয়ে দাঁড়াল। হ্যান্ডেলের দু'দিকে দুটো ক্যান—যদিও চটের ঝোলায় ক্যান দুটো দেখা যায় না তবু বিশ্বাস নেই যদি কৌতূহলবশত শুধায়, এতে কি আছে—তাহলে কি জবাব দেবে—বলবে কি কেরোসিন আছে দাদা। লাট্টু বুঝতে পারছিল—সে খুব ঘাবড়ে গিয়েছে, আর সে যখন ঘাবড়ে যায় তখন তার মায়ের মুখটা মনে পড়ে, আজও তার কোন ব্যতিক্রম হলো না, ঢোঁক গিলে সে সাইকেল ঘুরিয়ে নিল ভিন্ন দিকে, কিছুটা উল্টোপথে হেঁটে এসে ভাবল, কাজটা সে ঠিক করেনি, তার আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার দরকার—পুলিশটা নিশ্চয়ই দিনভর সাইকেল দোকানে বসে থাকবে না, সে তো চাকা সারিয়েই চলে যাবে রেল-ইয়ার্ডে। অগত্যা আবার দাঁড়িয়ে পড়ল লাট্টু, পকেটের কোণ থেকে ভাঙা সিগ্রেটের টুকরোটা বের করে এনে, পরপর খান তিনেক দেশলাই কাঠি খরচ করে—অবশেষে ধরিয়ে ফেলল সিগ্রেটটা। দু'গাল ধোঁয়া ছাড়তেই লালীর কথা মনে পড়ল। গরীব ঘরের মেয়ে তবু মদ-হাঁড়িয়া বিড়ি-সিগারেট কোন কিছুই পছন্দ করে না লালী, মাথায় অভিমানী হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করিয়ে ছাড়ে, বলো, আর কোনদিন খাবা না। আমার দিব্যি, আমার মাথার দিব্যি।

কোনদিনও দিব্যি কাটে না লাট্টু, মোচে তা দিয়ে মজা করে হাসে, পুরুষমানুষ, দু-একটা সিগ্রেট-বিড়ি না খেলে যে মানায় না। তাছাড়া আমি যাদের সাথে ঘুরি, মেলামেশা করি তারা যে সবাই খায়।

—তারা খেল বলে তুমিও খাবে? ঠোঁট ফোলাত লালী, ছলছলে চোখে তাকিয়ে দৃঢ়স্বরে সে বলত, বাবা খেত না, তার ছেলে হয়ে তুমি কেন খাবে? যে পয়সায় বিড়ি-সিগ্রেট খাও—সেই পয়সায় কোন কিছু খাবার কিনে খাও। তোমার 'পরিশ্রমের শরীর—ধোঁয়া গিললে সাইকেল টানতে পারবা না। তার উপরে দারু-হাঁড়িয়ার গ্যাস—সেটাও খুব মারাত্মক।

লালীকে বুকের কাছে টেনে এনে খুব করে আদর করত লাট্টু, মাথায় হাত বুলিয়ে নরম গলায় বলত, সব ছেড়ে দেব, আগে রেলের কাজটা হতে দাও। কোন্ মানুষটা চায় বলো তো মদ নিয়ে চোরের মতো ঘুরতে?

ভাঙা সিগ্রেটটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল তবু পুলিশটার যাওয়ার কোন লক্ষণ নেই, সে আরো মৌজ করে বসে গল্প জমিয়েছে সাইকেল দোকানীর সাথে। মনে মনে খুব বিরক্ত হচ্ছিল লাট্টু, তার যদি সামর্থ্য থাকত তাহলে পুরো মাল সে ঢেলে দিত নালীতে—তারপর বুক ফুলিয়ে গট্‌গট্ করে হেঁটে যেত সামনে দিয়ে। লাট্টুর আর তর সইছিল না, ক্ষিদেয় ছুঁচোয় ডান মারছিল পেটে, সেই কোন সকালে চা আর দুটো বাসি রুটি খেয়ে বেরিয়েছে তারপর কাজের ঝামেলায় খাওয়ার কথাও মনে হয়নি, কিন্তু এই অবেলায় স্নান-খাওয়া বিনে তার পুরো শরীরটা কেমন গুলিয়ে উঠল। অমনি সে একটা বুদ্ধি খাটাল। সাইকেলটা শুইয়ে দিল পুটুসঝোপের আড়ালে, ঝোলা দুটো নিয়ে সে নেমে এল ডাউন লাইনে তারপর বহুশ্রাব্য একটা গানের কলি ভাজতে-ভাজতে সে এগিয়ে গেল ঝুপড়ি দোকানগুলোর দিকে। খোয়া পাথরে হাঁটতে তার কষ্ট হচ্ছিল, মাঝে-মাঝেই ঘামে ভিজে পিছলে যাচ্ছিল চটি তবু সেই কষ্ট তার কাছে কোন কষ্টই নয়—বেশ ফুরফুরে একটা আমেজ ছড়িয়ে যাচ্ছিল মনে, আর মাত্র ক'পা হাঁটলেই সে ঝুপড়ির দোকান গুলোয় পৌঁছে যাবে, তারপর মাল খালাস করে নিশ্চিন্ত—তখন তাকে আর কে ধরে! লম্বা লম্বা পা ফেলে সে যখন হাঁটছিল, তখন পিছন থেকে কে যেন ছুটে এল ধড়ফড়িয়ে, লাট্টু মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। একটা পঁচিশ-ত্রিশ বছরের পোড় খাওয়া যুবক—যার চোখের দৃষ্টিতে ভাঁটার আগুন, পোশাক-আশাকে জংলীপনা, সে তার খোঁচাখোঁচা দাড়িতে হাত বুলিয়ে কর্কশ গলায় শুধোল, কি আছে থলিতে?

—কেরোসিন। থতমত খেয়ে জবাব দিল লাট্টু।

ছেলেটা এগিয়ে এল সামনে, তার হাতে লোহার একটা রড, সেই রডটা রেল লাইনে সজোরে বাড়ি মেরে বলল, মামদোবাজি রাখ। কেরোসিন থাকলে এপথে কেন যাচ্ছিস? নামা তোর ব্যাগ, আমি দেখব—

লাট্টুর মুখ-চোখ শুকিয়ে গেল তবু সে ক্ষীণ গলায় প্রতিবাদ করে বলল, তুমি কে, তোমাকে আমি ব্যাগ দেখাব কেন? পথ ছাড়, আমাকে যেতে দাও।

—যেতে দেবার জন্য অতদূর থেকে ছুটে আসিনি। শালা, তুই একটা ঘুঘু মাল। তোকে আমি চিনি। তুই তো বিষ্ণুর দোকানে চোলাই দিস—তাই না? পুলিশ এসে আমাদের

শাসায়। আজ তোকে আমি ছাড়ব না—বেপাড়ায় এসে মাল বেচে যাস—ট্যাক্সো দিতে হয় জানিস না বুঝি? ছাড়, বিশ টাকা। নাহলে আজ তোর আমি প্যান্ট খুলে নেব।

—বিশ টাকা! এত টাকা আমি কোথায় পাব।

—তুই পাবি, তোর বাপ পাবে। ছেলেটা চোখ-মুখ কুঁচকে কঠিন চোখে তাকাল, তারপর ঠোঁট দুটো শুয়োরের মুখের মতো করে বাঁ-হাত দিয়ে অদ্ভুত কায়দায় শিস্ ছুঁড়ে দিল বাতাসে, একবার নয়—পরপর তিনবার। তার সেই শিস শুনে পুটুস ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল আরো তিনজন, তাদের কারোর গায়ে ঘোড়া-ছোটানো গেঞ্জি, কারোর গেঞ্জিতে লেখা 'কিস্‌মি'। লাট্টু হাল ছেড়ে দিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল, সর্ব-সাকুল্যে তার পকেটে দশ বারোটা টাকা পড়ে আছে, কেননা সন্ধের পরে মাল বেচে পেমেন্ট দেয় অনেকে, কিন্তু একথা সে এদেরকে বোঝাবে কি করে? নিজের অক্ষমতায় দপদপিয়ে উঠল কপালের দু-পাশ, অসহ্য যন্ত্রণায় সে অনুভব করল পায়ের তলার মাটি যেন সরে যাচ্ছে, সে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে—এমনকি তার দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে উঠছে এই কটকটে অসহনীয় দুপুরে। তবু যতটুকু শক্তিতে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে একজন অমানুষের সামনে, ঠিক ততটুকু শক্তিতে ঝোলা দুটো ধরে দাঁড়িয়ে থাকল প্রাণপণে। এই লাইনে এই ধরনের অভিজ্ঞতা তার এই প্রথম, ফলে সে কি করবে বুঝে উঠতে পারছিল না, তবু সে আড় চোখে নিজেকে বাঁচাবার জন্য আঁকুপাঁকু করে রাস্তা খুঁজছিল, কিন্তু নির্জন রেল-লাইনে সে কাউকে দেখতে না পেয়ে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেওয়া দৃষ্টিতে ঐ নিষ্ঠুর মানুষগুলোর দিকে তাকাল—তার চোখে-মুখে প্রকটিত হলো বিষণ্ণ আর্তি, এই জটিল পরিস্থিতি থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য সে যথাসম্ভব করুণতার প্রলেপ দিল চোখে-মুখে। ঝাঁ করে শকুন যেমন দূর আকাশ থেকে নেমে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভাগাড়ে, তেমন অতর্কিতে একজন ছুটে এসে হ্যাঁচকা টানে কেড়ে নিল একটা থলি, অন্য থলিটাও ছিটকে গেল। খোয়াপাথর ভিজিয়ে পৃথিবীর মাটিকে ভিজিয়ে দিল—তার মনে হল, তার বৃদ্ধা মা যেন হুমড়ে পড়ে ধরিত্রী মায়ের রেণু আঁকড়ে কাঁদছে, তারই চোখের জলে ভিজে যাচ্ছে ঘাস-লতা-পাতা এবং ধূলিকণা। প্রতিরোধ করার আগেই ওরা তাকে ল্যাং মেরে ফেলে দিল রেল-লাইনে, তারপর পকেট তল্লাসী করে যা পেল তাই নিয়ে চলে গেল রেল-লাইন ধরে, যাওয়ার আগে তারা ক্যান দুটোকে নিয়ে যেতে ভুলল না।

কতক্ষণ মুখ থুবড়ে পড়েছিল লাট্টু তা সে নিজেও জানে না, সূর্য পশ্চিম দিগন্তে হেলে পড়তেই তার হুঁশ হলো—যত তাড়াতাড়ি হোক তার ঘরে ফেরা দরকার, কেননা আসার সময় সে দেখে এসেছে লোটনের গায়ে ধুমজ্বর, ছেলেটা ক'দিন থেকেই ভুগছে—তাকে আজ ডাক্তাখানায় নিয়ে যাওয়া দরকার, না হলে আরো বেশি বাড়াবাড়ি হলে তারা দু'জনেই দিশেহারা হয়ে পড়বে। লালী বলেছিল, তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরো, তুমি না এলে আমার বড় চিন্তা হয়। এ কথা যে লালী কোনদিন বানিয়ে বলে না, এ-কথা যে তার অন্তরের কথা—কপালের থেঁতলে যাওয়া চামড়ার রক্ত মুছতে মুছতে টের পায় লাট্টু, একটা বুনো ঝড় এসে তার ভেতরটা কাঁপিয়ে দেয়। তখন লাট্টুর মনে হয়—অন্তত লালীর জন্য, লোটনের জন্য তার এক্ষুনি ঘরে ফেরা দরকার নাহলে সে নিজের কাছেই বা কি

কৈফিয়ৎ দেবে। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেও দু'বার টলে পড়ে গেল লাট্টু, সেই অতি চেনা মাদকীয় গন্ধটি তার নাকে এল, ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে স্পর্শ করল ভেজা খোয়া, তার হাত কেঁপে উঠল, বুকের খোদল থেকে বেরিয়ে এল আর্তনাদ, চেনা গন্ধটা তার নাকের গহ্বরে, চোখের থলিতে ঢুকে গিয়ে অশ্রু হয়ে বেরিয়ে এল, সেই শক্ত নিরেট খোয়ায় হাত বুলিয়ে সে তার মায়ের শরীরের ওম পেল, মা—মাগো, তোমাকে এমনভাবে আমি নষ্ট করলাম, আমি তোমার ছেলে হয়েও তোমার মান বাঁচাতে পারলাম না! চোখের জলে লাট্টুর পৃথিবী যখন ঝাপসা হয়ে এল, যখন আধপোড়া মানুষের চেহারাটা তার বিদ্রোহ ঘোষণা করল সংসারী লাট্টুর উপর তখন—উন্মুক্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে লাট্টু প্রতিজ্ঞা করল, আর নয় মা। আর তোমাকে আমি চুলাভাটির কাছে যেতে দেব না। আর কোনদিন তোমার হাতে বাখর বড়ির ঠোঙ্গাটা আমি তুলে দেব না। তুমি গন্ধরাজ কন্যে, তোমাকে আমি সুগন্ধের দেশে ফিরিয়ে দেব। শুধু আমার চাকরিটা হতে দাও, তখন দেখো, তোমার লাট্টু কেমন শুধরে গিয়েছে। নিজের সাথে কথোপকথন যেন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে হাড়-মাস-মজ্জা দেখা। ভাঙা সাইকেলটা নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে লাট্টুর মনে হল, তার মায়ের যদি হঠাৎ করে কুষ্ঠ না হতো তাহলে তিন ঘরে ঝি-গিরির কাজটা যেত না, আর সেই বাঁধা কাজগুলো না হারালে মাকে আজও এই খারাপ পেশায় নিযুক্ত হতে হতো না। মানুষ দুর্ভাগ্যের সাথে পথ চলতে পারে না, মানুষই দুর্ভাগ্যকে একদিন ছেড়ে চলে যায়, নয়তো দুর্ভাগ্যই একদিন পিছু হটে যায। কিন্তু লাট্টুর জীবনপ্রবাহে দুর্ভাগ্য যেন ছায়ায় মতো, প্রেতের মতো ঘুরছে—দিনরাত অষ্টপ্রহর সে পিছু ছাড়ছে না লাট্টুর—এই দমবন্ধ করা জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে সে। যে ব্যবসায় মানসিক শান্তি নেই—সেই ব্যবসার অর্জিত অর্থে জীবনধারণে তার কোন পক্ষপাতিত্ব নেই, সে চায়—সৎ সরল, নিষ্পাপ জীবনযাপন—যা এই কঠিন সময়ে হীরকখন্ডের চেয়েও দুষ্প্রাপ্য। তার বাবা বলত, মানুষ হারতে-হারতে জেতে, একদিনে শুঁয়োপোকা থেকে প্রজাপতি হয় না, একদিনে একটা পুকুর জলে বোঝাই হয় না। সব মানুষই প্রথমে সাফসুতেরা নালীর মতো থাকে, ধীরে ধীরে তাতে ময়লা জমলে সংস্কারের দরকার হয় নাহলে দুর্গন্ধ ছাড়ে, অন্যেও বিষিয়ে ওঠে। এই বিষাক্ত ঘৃণ্য জীবন কোনদিনও কাঙ্খিত ছিল না লাট্টুর, অথচ সপরিবারে এই পঙ্কিল জীবনকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে তারা। যখন ভাবনারা আক্রান্ত করে লাট্টুকে, তখন মনে-মনে নিজেকে সাহসী, উদ্যমী কর্মঠ করে তোলার চেষ্টা করে সে; তার সমস্ত চেষ্টা যখন একটা বিন্দুতে এসে ঘনীভূত হয় তখন হতাশার শিকড়কে সমূলে উৎপাটিত করতে সমর্থ হয়। যে জ্বালা, পরাজয়, ব্যর্থতা আজ তার মনের ভেতরে—তার থেকে রেহাই পাবার জন্য আজ তার লালীর মুখোমুখি হওয়া একান্তই দরকার, সে জানে—আগুনে পুড়ে গেলে কাঁচা আলু ছ্যাচা যেমন পোড়া ক্ষতে উপকারী তেমনই লালী তার হৃত মনোবল ফিরিয়ে আনার এক অব্যর্থ ওষুধ।

কিন্তু টালির ঘরে কমা তালা, এক শ্মশান প্রেতপুরীর নীরবতা বিরাজ করছিল বস্তিতে, কাউকে না দেখতে পেয়ে বুকের ভেতরটা অজানা ভয়ে মুচড়ে উঠল লাট্টুর, সে ভেবে পেল না, এই অবেলায়, ঢিমে সূর্যের অপ্রতুল তাপে ঘরশুদ্ধ মানুষগুলো কোথায় যেতে

পারে। কুলগাছের কালচে পাতার আড়ালে তখনও কাক ডাকছিল কর্কশ গলায়, বাতাসে চাপা, দমবন্ধ করা এক উত্তেজনা — আর সেই উত্তেজনাটাই কিভাবে যেন তার সমস্ত শরীরে মিশে গেল, সে অনুভব করল — এই ধারাবাহিক তীব্র প্রবাহে কোথাও যেন ছন্দপতন ঘটেছে নাহলে কেন বারবার ককিয়ে উঠছে তার অন্তরাত্মা। কতক্ষণ বোবার মতো দাঁড়িয়ে থাকল ঘরপানে চেয়ে লাট্টু জানে না, বস্তির হাবলু এসে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কালসিটে দাঁত দেখিয়ে ভেজা বেড়ালের গলায় বলল, চ গুরু, তোর সাথে দুটো কথা আচে। মাসী বলে গ্যাচে—তুই আসলে তোকে নিয়ে হাসপাতালে যেতে। তোর ব্যাটা,—'লোটন' না 'ঘোটন'—তার খুব বাড়াবাড়ি হয়েচে। তোর ভাই রিক্‌সো ডেকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। তোর বউটা খুব কান্‌ছিল! মাইরি, এমন কান্‌ছিলো আমার গায়ের লুমা চেগিয়ে উঠছিল।

লাট্টু ফ্যালফ্যাল করে হাবলুর মুখের দিকে তাকাল, ওর কাটা কাটা কথাগুলো সূচের মতো বিঁধছিল গায়ে তবু কেমন শান্ত চোখে তাকিয়ে সে বলল, লোটন .... আমার লোটনের কি হয়েছে রে হাবলু?

—আমি শালা কি ডাক্তার—যে বলব? সাইকেলের পিছে বসে পড়—আমি বোঁ-বোঁ করে চালিয়ে নিয়ে যাবো। সাইকেলের সীটের ওপর বসে হাবলু উঠতি নায়কের চোখে লাট্টুর দিকে তাকাল ; লাট্টু ভাবলেশহীন, অনড় একখণ্ড পাথর, রেগে লাল হয়ে হাবলু বলল, তুই মাইরি একটা মাল! তোর ছেলেটার অসুক, আর তুই মাল নিয়ে গিয়েছিস, —ছ্যা! আমি হলে যেতাম না, অমন মাল নালীতে ঢেলে দিতাম। এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে হাবলু ব্যতিব্যস্ত চোখে লাট্টুর মুখের দিকে তাকাল, কপালের ছ্যাচা চামড়ায় তখনও রস কাটছে, হাবলু আশ্চর্য গলায় শুধোল—হ্যারে, ঝাড় খেয়েছিস বুঝি। কে ঝাড়ল,— পুলিশ না পাবলিক।

কষ্টের হাসি হেসে লাট্টু বলল, পড়ে গিয়াছিলাম রেল-লাইনে, খোয়ায় ছেঁচে গিয়েছে। ও কিছু নয়। তুই চালা—

কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে বসেছিল লাট্টুর মা, হাসপাতালের চৌহদ্দিতে এ-বছর কৃষ্ণচূড়ার চায জমেছে ভালো, এই গরমের দিনে নীল আকাশের নিচে লাল ফুলগুলো দিব্যি মানায় অথচ ঐ কটকটে লালফুলগুলো দেখে লাট্টু কেবলই পুলিশের অগ্নি উদ্দীপক লাল চোখগুলোকে দেখতে পায় আর মনে-মনে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়ায়। আজ কিন্তু তার এমন অনুভূতি হলো না, আজ তার মনে হল—কৃষ্ণচূড়া ফুলগুলো যেন যমরাজের ক্ষুধার্ত চোখ, একগাছ লালফুল যেন শ্মশানের লেলিহান শিখা। সাইকেল থামিয়ে ঝটপট একটা সিগ্রেট ধরিয়ে হাবলু বলল, ঐ দেখ, তোর মা বসে। যা ঝটপট খবরটা জেনে আয়। তারপর দুজনে গেটের সামনে চা খাবো।

শেষ পর্যন্ত লাট্টুর আর চা খাওয়া হলো না, তাকে দেখতে পেয়ে ডানা-ভাঙ্গা পাখির মতো আছড়ে পড়ল লালী, মরিয়া হয়ে দু'হাতে বুক খামচে ধরে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে বলল, এই তোমার সময় হলো, কেন এলে—না এলেই তো পারতে? হা দেখ, তোমার লোটন শুয়ে আছে, শেষ সময়ে সে তোমাকে খুব খুঁজছিল। আমি তাকে দুধ

দিলাম— সে খেল না ; উগরে দিল। বলো, বলো——এখন আমি কাকে নিয়ে থাকব? কে আমাকে 'মা,-মা' বলে ডাকবে। ওগো, তুমি কেন আর একটু আগে এলে না!

শোক প্রলাপে উন্মাদিনী লালী মূর্ছা গেল ঘনঘন, লাট্টুর বৃদ্ধা মা তার কপালে হাত বুলিয়ে দিল মৃদুমৃদু। লাট্টুর ছোট ভাই বলল, দাদা, যা হবার তা তো হয়েছে, এবার সই সাবুদ করে লোটনকে নিয়ে শ্মশানে চল। আকাশের অবস্থা ভালো নয়। ঝড় বৃষ্টি নামলে পরে আরো ঝঞ্ঝাট বাড়বে।

একটা রিকসায় পাশাপাশি দু'জন—লাট্টুর কোলের উপর চিরনিদ্রায় শায়িত লোটন, রিকসা চলছিল ঢিমে তালে শ্মশানের দিকে। চাপ-চাপ অন্ধকার উগরে দেওয়ার প্রস্তুতিতে মগ্ন আকাশ, লাট্টু ভয় পেয়ে পল্টুর হাতটা আঁকড়ে ধরল সজোরে, তারপর ঝাঁকুনি খেয়ে ডুকরে উঠে শুধোল, হ্যারে, এই সামান্য জ্বরে কেউ কোনদিন পর হয়ে যায়? লোটন কি বুঝতে পেরেছিল আমি তাকে ভালোবাসি না, যত্ন নিই না, আমি তার বাবা হয়েও বাবার দায়িত্ব পালন করি না!

ঐ অতটুকুন ছেলে—তাকে দেখে শ্মশান ডোম বলল, চার হাত মাটির নিচে পুঁতে দেব, বুকের উপর ইট-পাথর লেদে দেব, যাতে শ্যাল্ শকুনে তুলে না খায় তার জন্য ঘন ঘন ফণীমনসার কাঁটা পুতে দেব তবে বাবু, পুরো পঞ্চাশ টাকা লাগবে—যা আক্রাগন্ডার দিন—এর কমে পারব না।

শোকমুহ্যমান লাট্টু, কেঁদে কেঁদে তার চোখ তখন শুকনো, মাত্র পাঁচ টাকা শ্মশানডোমের হাতে গুঁজে দিয়ে কোদাল নিয়ে নিজেই সমাধি দিল লোটনকে। ফিরে এল সন্ধে পার করে, তখন টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, বাতাসে জলজ গন্ধ— তার মা কাঁথ-দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে বাইরে, তার সামনে ভাঙা কাঠের চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসে আছে চেনা পুলিশ, তার নতুন সাইকেলটা সজনে গাছে ঠেস দেওয়া। অসময়ে পুলিশ কেন, লাট্টু আর ভাবতে পারছিল না—ভেজা গায়ে কাঁপতে-কাঁপতে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল।

লালী কান্না ভুলে চাপা গলায় বলল, হিস্‌সা নিতে এসেছে। আমি বললাম, কাল আসতে— কিছুতেই রাজি হচ্ছে না—কি করি বলো তো!

মাটির মতো শান্ত লাট্টু গর্জে উঠে বলল, দাঁড়াও, ওকে জন্মের মতো হিস্‌সা দিয়ে দিই,—উস্, এরা কি মানুষ না রাক্ষস—আমি আর ভাবতে পারছি না—। বলেই সে ঘরের কোণ থেকে মরিয়া হয়ে তুলে নিল চুলা খুঁচানো লাঠিটা, বেরিয়ে আসতে যাবে তখনই লালী তার ছিপছিপে শরীরে অষ্টমী দুর্গার শক্তি সঞ্চয় করে দাঁড়িয়ে পড়ল দরজায়, তুমি যাবে না, যাবে না বলছি। ওদের সাথে তুমি কি পারবে? তোমার কি আছে? কিছু নেই! ভাটি উঠে গেলে আমরা সবাই শুকিয়ে মরব। সবাই তো অমৃত বেচতে পারে না, কেউ কেউ বিষ বেচেও বেঁচে থাকে। এই কঠিন সময়ে বেঁচে থাকাটাই বড় কথা, কেমন করে বেঁচে আছি সেটা কিন্তু বড় কথা নয়। কথাগুলো না শেষ হতেই লালীর দু-গাল ভিজিয়ে টলটলে জল নেমে এল চিবুকের সীমারেখায়, সেই জলবিন্দু স্পর্শ করল রূপোর হারছড়া। কম্পিত চোখে শোকাতুরা লালীকে দেখছিল লাট্টু, চোখের জল জীবনে সে বহু দেখেছে কিন্তু এমন হৃদয় পুড়ানো, হৃদয় জুড়োনো চোখের জল সে বুঝি আর

দেখেনি। থাক-থাক মাটির হাঁড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে লাট্টু বলল, হিস্‌সা দেবার মতো আমার কাছে আর কিছু নেই। যা ছিল সব আমি শ্মশানেই দিয়ে এসেছি।

লালী ক'মুহূর্ত ভাবল তারপর রূপোর হারছড়াটা খুলে ধরিয়ে দিল লাট্টুর হাতে, এই হারটা লোটন হওয়ার পর তুমি আমাকে দিয়েছিলে, আজ লোটন নেই, এটা তুমি দিয়ে দাও। লালী যেন কলজে-উপড়ে লাট্টুর হাতে দিল—এমন অসহায় ডুবন্ত, বিপর্যস্ত চোখে তাকাল।

পুলিশ চলে যাওয়ার পর অন্ধকার ঘরে চুপচাপ বসে থাকল লাট্টু। লালী আঁচ ধরিয়ে তোলা উনুনটা রেখে এল বাইরে তবু উল্টাপাল্টা হাওয়ায় ধুঁয়ো এসে ভরিয়ে দিয়েছে ঘর। জ্বালা জ্বালা করছিল লাট্টুর চোখ। চোখ রগড়ে সে লালীকে শুধোল, এত ধুঁয়ো তো আগে ছিল না? চোখ দুটো আমার পুড়ে যাচ্ছে লালী। লালী শূন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, আমারও। বলেই সে আঁচলে চোখ মুছে নিল সহসা, লাট্টু দেখল—ধোঁয়া নয়, শোকের গরম কাজলে চোখ পুড়ে গেছে লালীর তবু সেই চোখে আলোর জন্য কত তীব্র ছটফটানি।

টিকলি

ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই পরমা উদ্বিগ্ন স্বরে বলল, জানো তো, আজও ঝগড়ু এসেছিল।

আমি ফ্যানের সুইচটা অন্ করে দিয়ে চেয়ারে বসে পড়লাম এবং বসেই পরমার দিকে সপ্রশ্ন চোখে তাকালাম। পরমা আবার সেই একইরকমভাবে ভেঙে পড়া, বিপর্যস্ত গলায় শুধোল, কি হবে গো, ওরা যদি টিকলিকে নিয়ে চলে যায়? প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়েই পরমা কেমন জড়োসড়ো চোখে আমার দিকে তাকাল, ওর চোখে-মুখে গভীর চিন্তার ছাপ, ভয়ে ওর মুখটা বড্ড শুকনো দেখাচ্ছিল। আমি বুশ-শার্টটা খুলে হ্যাঙারে ঝুলিয়ে দিয়ে পরমাকে বললাম, টিক্‌লি কোথায়, তাকে তো দেখছি না?

পরমা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, খেয়ে-দেয়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছে। তুমি আসবে আসবে করে অনেকক্ষণ সে জেগে ছিল। তারপর তোমার আসতে দেরি দেখে আমি ওকে ঘুমিয়ে পড়তে বললাম।

—ভালই করেছো। আমি স্বস্তির শ্বাস ফেলে একটা সিগ্রেট ধরাই। পরমা আমার মুখোমুখি বসে সংশয় প্রকাশ করে বলল, কি গো, তুমি কিছু বলছো না যে! ঝগড়ু যদি সত্যি সত্যি টিকলিকে নিয়ে যায়, কি হবে গো? সেই থেকে আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না। আমার মাথাটাও ঠিকঠাক কাজ করছে না।

পরমার চাপা ফোঁপানীটা আমার কানে বিঁধল, তাকিয়ে দেখি ছলছল করছে ওর আতঙ্কগ্রস্ত চোখ দুটো। ওকে যে কি বলে স্বান্ত্বনা দেব মনে মনে সেই কথাই আমি হাতড়াচ্ছিলাম। কিন্তু জুতসই তেমন কোন সান্ত্বনাবাক্য হঠাৎ করে আমার মাথায় এলো না। আমি নিরুপায় চোখে ওর দিকে তাকালাম। রক্ত কাঁপানো ভয়টা আমাকেও পরাস্ত করল সম্পূর্ণভাবে। আমি হেরে যাওয়া চোখে পরমার দিকে তাকাতেই সে আমাকে তীক্ষ্মদৃষ্টিতে বিদ্ধ করে বলল, জানতো, ঝগড়ু আজ একা আসেনি। তার সাথে একটা ছেলেও এসেছিল। ছেলেটা বার-বার করে টিকলিকে কেমন দেখছিল। ভয়ে টিকলিও পালিয়ে গেল বড় ঘরে। ওরা যতক্ষণ ছিল ততোক্ষণ সে আর বাইরে বেরয়নি। খাওয়ার সময়ও ওকে দেখলাম কেমন মুখ গুঁজে বসে আছে। কোন উৎসাহ নেই, খেতে হয় তাই খাচ্ছে। আমার মনে হয় টিকলিও ভয় পেয়ে গিয়েছে ওদের দেখে।

পরমা কথাগুলো বলেই হাঁপিয়ে উঠেছিল, বুকচাপা এক উত্তেজনায় ও যেন স্বস্তি পাচ্ছিল না কিছুতেই। অস্বস্তিটা শুধু ওর নয়, আমারও। আমাদের দু'জনের জীবন একই সুতোয় বাঁধা। আর সেই সুতোর মাঝখানে একটা উজ্জ্বল ফুল হলো আমাদের টিকলি। এতদিন আমাদের তিনটে জীবন একই গাছের তিনটে ফুলের মত সুসজ্জিত ছিল, আজ তারই একটা জোর করে কেড়ে নিতে চাইছে ঝগড়ু কুংকল। আমাদের জীবনে যে ছন্দ

এবং মিল তা হঠাৎ করে কেটে যাওয়ার আশঙ্কায় আমরা দু'জনেই রীতিমতন ভীত। টিকলির উপর অনিবার্যভাবে সেই প্রভাব পড়েছে, আগের সেই স্বচ্ছন্দ গতি এবং প্রাণময়তা সে যেন নষ্ট করে ফেলেছে। আমি নিশ্চিত জানি, এর জন্যও ঝগড়ু কুংকলই দায়ী। অথচ আমাদের কারোরই কিছু করার নেই। আমরা অসহায়, মূক-বধির মানুষের মত নিরুপায়।

বিহারের এই আদিবাসী অধ্যুষিত পাহাড়ী জায়গাটায় আমার বারো বছর কেটে গেল। এখানকার ছোট্ট রেল স্টেশনটা আমার কর্মস্থল। পঞ্চাশ কিলোমিটারের মত ব্রাঞ্চ লাইন চলে গিয়েছে উড়িষ্যার খনি অঞ্চলে। এই রেল লাইনটার রক্ষনাবেক্ষণের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব আমার। লাইন খারাপ হলে আমি সদলবলে গিয়ে লাইনটাকে মেরামতের চেষ্টা করি। তাছাড়া, দৈনন্দিন কাজ-কর্ম তো লেগেই আছে। বিশেষত, বর্ষাকালে আমি দম ফেলার সময় পাই না, তখন অত্যাধিক কাজের চাপে আমাকে ডুবে থাকতে হয়। ঘর সংসারের উপর আমার তখন বিশেষ একটা লক্ষ্য থাকে না। আমি পুরো সেকশনের দায়িত্বে আছি ফলে দায়িত্ব এড়িয়ে গেলেই অপরাধবোধ মনের মধ্যে জমা হয়। এই লাইনে সারাদিনে মাত্র একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন। ফলে প্রত্যেকটি কামরায় ঠাসা ভর্তি থাকে যাত্রী। কোন কারণে যদি দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে সেক্ষেত্রে আমারও জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। শত-শত মানুষের নিরাপত্তা যেখানে জড়িয়ে সেখানে আমার উদাসীন থাকাটা শুধু অন্যায় নয়, পাপও। পরমাকে আমার চাকরির গুরুত্বের কথা বুঝিয়ে বলেছি। একদম প্রথম দিকে ও একা থাকতে ভয় পেত, এখন ওর আর ততোটা ভয় নেই। থাকতে থাকতে পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিয়েছে ও। রাতে যখন আমাকে সেকশনে যেতে হয় তখন ওকে একাই তাকতে হয়। আমি জানালা-দরজা ভালভাবে বন্ধ করে দিয়ে যাই। শুধু তাই নয় - বাইরে থেকে গেটে আমি তালাবন্ধ করে দিই। অনেক রাতে ফিরে আসলে তালা খুলে আমি আবার ঘরে ঢুকি। চাকরির বছর খানেক পরেই দেখা-শোনা করে পরমার সাথে আমার বিয়ে হয়। বিয়ের মাস খানেকের মধ্যেই ওকে আমি কোয়ার্টারে আনি। সেই থেকে ও আমার সাথে সংসার ধর্মে জড়িয়ে পড়েছে, আমার এই ছোট্ট সংসারের উপর ওর অশেষ টান, মায়া-মমতা সবকিছুই আমি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারি। পরমা সুগৃহিনী, এ বিষয়ে আমার কোন দ্বিমত নেই। ও সুন্দর করে ঘর সাজাতে পারে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ওর স্বভাব। ও খুঁতখুঁতে কিন্তু শুচিবায়ুগ্রস্ত নয়। ওর কথামত সোফা-কাম-বেড থেকে শুরু করে ফ্রিজ-টিভি কোনটাই আমি বাদ দিইনি। সামর্থ অনুযায়ী কিস্তিতে কিনেছি। ও আমার কাছে যা যা আব্দার করেছিল তার সব কিছুই আমি ধীরে সুস্থে পূরণ করেছি। শুধু ওর একটা আব্দার আমি পূরণ করতে পারিনি, আমি নিঃসন্তান। বিয়ের তিন বছরের মাথায় আমি জেনে যাই আমার অক্ষমতার কথা। ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে আমি সেদিন পরমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারিনি। আমার স্পষ্ট মনে আছে শীতের সন্ধ্যায় আমি গলগলিয়ে ঘামছিলাম। বাহ্যজ্ঞানরহিত শোকাহত কোন মানুষের মত আমি বেশ কিছু সময় কোন কথা বলতে পারিনি। ডাক্তারের দেওয়া মেডিকেল রিপোর্টটা তখন আমার হাতের ঘামে ভিজে ন্যাতা। পরমাই ব্যাকুল হয়ে শুধিয়েছিল, কি হয়েছে তোমার, অমন করছো কেন? আমি কোন উত্তর দিতে পারিনি। পৃথিবীর যাবতীয় হিমশীতল কুয়াশায়

ভরে গিয়েছিল আমার দু'চোখ, হৃর্ৎপিন্ডের গতি পলকে পলকে আমার শারিরীক অক্ষমতাকে জাহির করে দিচ্ছিল তীব্রভাবে। পুরুষত্বহীনতা কি কোন অভিশাপ, না রোগ—এই এক দ্বন্দ্বে আমি মানসিক দিক থেকে চরম বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। সেদিন পরমাই আমাকে এই কঠিন সমস্যা থেকে উদ্ধার করে। ডাক্তারী রিপোর্টটা আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে এক ঝলক চোখ বুলিয়ে সে আমকে বলেছিল, তুমি পুরুষ, পুরুষের মত বেঁচে থাক। প্রতিটি গাছই যে ফুল-ফল দেবে সংসারে এমন তো কোন মাথাব দিব্যি নেই। গাছের ফল ফুল যেমন প্রয়োজন ছায়াটাও তো তার চেয়ে বেশী প্রযোজন। তোমার ছায়াই হলো আমার আশ্রয়। শুধু আশ্রয় নয়, আশ্রম। তোমার আশ্রমেই আমি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চাই। নিজেকে দুঃখী ভেবে তুমি আমাকে দুঃখী করে দিও না। সেদিন পরমাকে মনে হয়েছিল সে আমার আত্মার অর্দ্ধাঙ্গিনী নয়, সে আমার যাবতীয় সত্বা। যে হীনমন্যতা আমার মনে দানা বেঁধেছিল। তাকে ভালবাসার স্নিগ্ধ পরশে সমূলে উৎখাত করেছিল পরমা। ওর মধ্যে হয়তো কিছুটা নিঃসঙ্গতা ছিল এবং সেটাই স্বাভাবিক তবু কোনদিন ভুল করেও আমি ওকে অনুশোচনায় দগ্ধ হতে দেখিনি। সংসারের কাজে অষ্টপ্রহর ডুবে থেকে মানসিক শূণ্যতাকে পূরণ করতে চাইত সে। আমি যখন অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকতাম কিংবা সেকশনে চলে যেতাম দীর্ঘসময়—তখন ঐ অখন্ড অবসরে ওর প্রিয় সঙ্গী ছিল বই, বই ভালো না লাগলে ও হাতের কাজ করত। আমাদের কোয়ার্টারের সামনে ছিল এক ফালি জমি। এখন সেই ছোট্ট জায়গাটা তারকাঁটায় ঘেরা পড়ে সুন্দর একটা বাগান। বাগানে যে বিভিন্ন ধরনের ফুল ফুটে থাকে এবং তা পথচারীর দৃষ্টি আকর্যন করে—এর নেপথ্যে পরমারই সক্রিয় ভূমিকা জড়িয়ে রয়েছে। প্রতিটি ফুলগাছের উপর পরমার টান এবং সেবা-যত্ন আমাকে রীতিমত মুগ্ধ করে। ওর সময় কাটানোর পন্থাগুলো আমাকে ভাবায়। আমার দৃঢ় ধারনা ওর এই যাবতীয় সখ গড়ে উঠেছে সেই অপ্রতিরোধ্য শূন্যতা থেকে— যে শূণ্যতা মানুষকে কখনো নিষ্কৃতি দেয় না। তাই ও যতই স্বাভাবিক হোক না কেন, আমি ওর মধ্যে বিরাট এক আক্ষেপকে লুকিয়ে থাকতে দেখি। এই আক্ষেপ এবং হতাশা আমার মধ্যেও আছে যা থেকে আমিও কখনো বিরত থাকতে পারি না। ক্ষতস্থানের উপর সব মানুষেরই নজর চলে যায় আগে। আমি আমার ক্ষতস্থানকে আড়াল করতে গিয়ে ব্যর্থ হই। তাই আমার ছোট্ট সংসারে অনেক ফাটল থাকা সত্বেও আমি সুখী, অন্য দশ-পাঁচটা মানুষের মত আমার বুকে এখন কোন সমস্যার পাথর নেই।

সাত কিলোমিটার দূরে রেল লাইনে ক্র্যাক দেখা দিয়েছে—এমন সংবাদ গ্যাংম্যানদের মুখে পেয়েই খুব সকালেই পুশ-ট্রলি নিয়ে আমাকে চলে যেতে হলো। ঐ অত ভোরে পরমা আমাকে চা, জল-খাবার করে দিয়ে বলল, দুপুরে যদি না আসতে পার তাহলে লোক পাঠিয়ে দিও, আমি খাবার পাঠিয়ে দেব। এই রোদের মধ্যে তোমার আর কষ্ট করে আসার দরকার নেই, রোদ পড়লেই বিকেলের দিকে ধীরে-সুস্থে এসো। টিকলি তো আছেই। আজ ওর স্কুল ছুটি। কোন কিছু দরকার পড়লে ওকে দিয়ে আনিযে নেব।

আমি সংগে সংগে বাধা দিয়ে বলে দিলাম, টিকলিকে পাঠিও না। তোমার যা দরকার আমাকে বলো, আমিই এনে দিয়ে যাচ্ছি। ও ছেলেমানুষ, ওর দ্বারা কি সব কাজ গুছিয়ে

করা সম্ভব হবে?

আমার কথার প্রত্যুত্তরে পরমা কিছু বলেনি। টিকলি ওর মরুভূমি হৃদয়ে এক চিলতে জল। ওকে সে কোন কারণেই নজর ছাড়া হতে দেয় না। লোকে যে বলে, এক গাছের ছাল আরেক গাছে লাগে না—একথা আমি মানতে রাজি নই।

টিকলি আমাদের মেয়ে নয়, মেয়ের মত। সাত বছর ধরে সে আমাদের সুখ-দুঃখের সাথী, আশা-ভরসার রক্ষাকবচ। রক্তের সম্পর্ক নেই তবু এক প্রগাঢ় মায়ামমতার স্নেহচ্ছায়ায় সে আমাদের অতি নিকটজন, পরম আত্মীয়। ওর বাবা ঝগড়ু কুংকল এখান থেকে মাইল পনের দূরের একটি গ্রামে থাকে। সে অতি সাদাসিধে মানুষ, কিন্তু তার বড় টাকার লোভ। খেতে ভালবাসে অথচ ভাল-মন্দ খাওয়ার সামর্থ নেই। চাঁদমনি হলো টিকলির মা যাকে আমি কোনদিনও দেখিনি। তবে ঝগড়ু কুংকলের মুখে শুনেছি, সে ছিল বড় রূপসী মেয়েছেলে যার জন্য তার কপালে সুখ সইল না। গ্রামের মুখিয়া তাকে স্যাঙা করে ঘর বাঁধতে চেয়েছিল, চাঁদমনি তাতে রাজী হয়নি। ঝগড়ু কুংকলের কাছে চাঁদমনির স্বাচ্ছন্দ না থাক সুখের অন্ত ছিল না। ঝগড়ুর ছিল কয়েক বিঘা ডাঙা পড়িয়ার (মাঠ) জমিন, শুধু বর্ষাকাল ছাড়া সেখানে কেউ কোনদিন সবুজের মুখ দেখতে পেত না। রোহিনী পূজো সেরে, বদা (পাঁঠা) বলি চড়িয়ে তার মাংস গাঁ শুদ্ধু লোকে ভাগাভাগি করে খেয়ে তবেই চাষকাজে নামত তারা। চাঁদমনি ছিল একাই একশো। যেটুকু জমি ছিল তা সে নিজের হাতে চাষ করত ঘরের মানুষটাকে সাথে নিয়ে। চাঁদমনি খাটত আর ভেজা আলে সাটপাট হয়ে শুয়ে থাকত ঝগড়ু কুংকল। সংসারে তার মন ছিল না, তার মন ছিল নেশায়। সকালে ঘুম থেকে উঠে হাঁড়িয়া না হলে তার চলতো না। হাঁড়িয়া দিয়ে সে মুখ ধুতো। হাঁড়িয়াকে সে রগড় করে বলত, সফেদ চা। আর সেই সফেদ চা-ই ছিল তার দিবারাত্রির ধ্যানধারণা। সারাক্ষণ যে মানুষটা নেশার ঘোরে মশগুল, সে সুস্থ পায়ে দাঁড়াবে কখন? যে মানুষটা দাঁড়াতে পারে না, সে কি করে হাল ধরবে মাঠে, মাটি কাদা করে ধান রুইবে মাজা ধাপিয়ে। তাই সব কিছু একা হাতে করতে হতো চাঁদমনিকে। ঘর যাওয়ার সময় সে শুধু মানুষটাকে হাত ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে যেত। মানুষের যে সামান্য বুদ্ধিটুকু আছে তার ছিটেফোঁটা বুদ্ধিও বুঝি ঝগড়ু কুংকলের ছিল না। চাঁদমনির তাই সমস্যার শেষ ছিল না। ঘরের মাথা যদি নড়বড়ে হয় তাহলে সুযোগ খোঁজে অনেকেই। গাঁয়ের মুখিয়াই হলো চাঁদমনি প্রথম দাবিদার। কিন্তু তার অন্যায় আব্দার নস্যাৎ করে দিল চাঁদমনি। তার কাছে মনুষ্যত্ব এবং ইজ্জত দুটোই দামী। এ দুটোকে সে হারাতে চায় না শত ঝঞ্ঝাটেও। ফলে মুখিয়ার রোষের আগুনে দিনের পর দিন পুড়তে হলো তাকে। শেষে অপবাদ নিতে হল ডাইনীর। গাঁয়ে বিচার বসল। চাঁদমনিকে গাঁ ছেড়ে চলে যেতে হবে অবিলম্বে। ঝগড়ু মাথা পেতে নিল সেই রায়। কিন্তু গাঁ ছাড়ার আগের দিনই ঘটে গেল সেই অঘটন। চাঁদমনিকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারল ওরা। রাতের অন্ধকারে ঐ মুখিয়াই ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। তখন গভীর রাত। এলোমেলো হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ল সেই আগুন। সেই আগুনে পুড়ে গেল শুকনো বাবুইঘাসের জংগল। আর ঘরের মধ্যে শুকনো দুব্ ঘাসের মত জ্বলে গেল চাঁদমনি। ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেল ঝগড়ু আর তাদের একমাত্র মেয়ে পালো। সেই

মেয়েকে সংগে করে গাঁ ছেড়ে পালিয়ে এল ঝগড়ু। তিন দিন তার খাওয়া নেই। সে এসে বসেছিল সামনের ঐ নিমগাছটার ছায়ায়। মেয়েটা কুঁকড়ে শুয়েছিল মাটিতে। ঝগড়ু পাকা নিমফল কুড়িয়ে তার রসগুলো খাওয়াচ্ছিল মেয়েকে। ডিউটি থেকে ফেরার পথে ঝগড়ুকে আমি প্রথম দেখি। ওর পরনে লেংটির মত একফালি কাপড়। এ ছাড়া পুরো গা খানা উদোম। কালো ঝুল চেহারার মাঝ বয়েসী লোকটাকে দেখে আমি প্রথমে পাত্তা দিইনি। পাশ কাটিয়ে চলে যাব—ঝগড়ু আমাকে ডাকল, এ বাবু। টুকে খাড়িই যাও। আমাকে দাঁড়াতেই হলো। ঝগড়ুর মত লোক এ অঞ্চলে প্রায়ই আমার নজরে পড়ে, যাদের পরিচয় কেবল মানুষ—এ ভিন্ন এদের আর কোন পরিচয় নেই। এরা নিম্নবিত্তের নিচেও পড়ে না, আবার এরা ভিখারিও নয়। এরা যে সঠিক কোন পর্যায়ে পড়ে তা আমার জানা নেই। তবে এদের দুঃখ-দুর্দশা দেখলে কষ্ট পাওয়ার মাত্রাটা আমার বাড়ে। আমি এদের কোন সাহায্য করতে পারি না। আমার তেমন আর্থিক সচ্ছলতা নেই। তবু ঝগড়ু তার শীর্ণ দু'হাত পাখির মত মেলে ধরে আমার গতি রোধ করে দিল। আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার চোখে-মুখে বিরক্তির সুক্ষ্মরেখাগুলো কিলবিল করে নড়ে উঠল। ঢোক গিলে কঠিন গলায় জিজ্ঞেসা করলাম, কি চাও তুমি? ঝগড়ু কোন কথা না বলে শুয়ে থাকা শীর্ণকায় পালোকে দেখিয়ে সে আমার অনুভূতি আদায় করতে চাইল। ওর মতলবটা বুঝতে পেরে আমি আরো কঠোর হয়ে বললাম, পথ ছাড়। আমাকে যেতে দাও।

ঝগড়ু ভয় পেয়ে পথ ছেড়ে দাঁড়াল, ওর চোখে মুখে করুণ এক আর্তি যা আমার হৃদয় ছুঁয়ে গেল। আমি ওকে একটা টাকা দিতেই ও সেটা ফিরিয়ে দিল। অনুনয়ের স্বরে বলল, বাবু, মোকে রুপিয়া নাই চাই। মোকে দুটা রুটি দাও। হা দেখো গো, মোর বিটিটা কেমুন ভোখ্ তরাসে ধুঁকছে। আচ লিয়ে তিন দিন মোর মেনে কিছু খাই নাই। যেটিই গিয়েচি সেটিই ভাগায় দিচে। মুই তো কোকর (কুকুর) নাই, মানুষ গো। হা-দেখ, আমার চক্ষু-কান-গলা-মুখ সব আচে।

ঝগড়ু পেশাদার ভিখারি নয় তা আমি ওর কথায় বুঝতে পারি। শুয়ে থাকা মেয়েটি তখন উঠে বসেছে। ওর শুকনো মুখের উপর মাছি উড়ছিল ভনভনিয়ে। পাকা নিমফলের গন্ধে ম-ম করছিল গাছের তলাটা। আর ঝিরিঝির পাতার ফাঁক দিয়ে যতটুকু আকাশ দেখা যাচ্ছিল তার সবখানেই কালো মেঘের দৌরাত্ম্য। পাহাড়ী এলাকার বর্ষা বড় ছল-চাতুরী জানে। তার ছল-চাতুরীর কিছুটা এখন আমি আন্দাজ করতে পারি। বৃষ্টি আসতে পারে এই ভেবে আমি কিছুটা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি। এদিকে ঝগড়ুর আবেদন নাকচ করে যেতে পারি না। কি করব যখন ভাবছি, তখন পরমা এলো হাসি-হাসি মুখ করে। আমাকে শুধোল, এখানে কি করছো? আমি কিছু বলার আগেই সে সমস্ত ব্যাপারটা অনুমান করে নিয়ে ঝগড়ুকে শুধোল, তোমার মেয়ে বুঝি, কি নাম ওর?

ঝগড়ু নাম বলতেই গুটিগুটি পায়ে, পালোর দিকে এগিয়ে গেল পরমা। অবিকল মাতৃস্নেহে সে পালোর নোংরা চুলে হাত ছোঁয়াল। আর হাত ছোঁয়ানোর সাথে সাথেই সশব্দে কেঁদে উঠল পালো, তার কান্নায় চাঁদমনির জন্য বিলাপ ঝরে পড়ল নিমেষে। ঝগড়ু সবিস্তারে চাঁদমনির হতভাগ্যের কথা আমাদের শোনাল, সব শুনে আমি স্তম্ভিত। পরমা

চোখের জল মুছে কেমন উদাস চেয়ে রইল মেয়েটির মুখের দিকে। তারপর সান্ত্বনার গলায় বলল, কেঁদো না। মা-বাবা কারোরই চিরদিন থাকে না। সবাইকে একদিন না একদিন চলে যেতেই হয়। তা নিয়ে এত ভেঙে পড়লে তোমার শরীর খারাপ হয়ে যাবে। চলো, তুমি আমার সাথে চলো। মনে হচ্ছে, তোমার ক্ষিদে পেয়েছে। আমি তোমাকে খেতে দেবো, চলো।

ঝগড়ুকে সাথে করে পালো সেই প্রথম আমার কোয়ার্টারে আসে। বারান্দায় বসিয়ে তাদের পেট ভরে খেতে দেয় পরমা। যতক্ষণ না খাওয়া শেষ হয় ততক্ষণ সে দাঁড়িয়ে থাকে মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে। ঝগড়ু খাওয়া-দাওয়ার পর এঁটো থালা-বাসনগুলো ধুয়ে দিতে চাইলে কিছুতেই পরমা তাকে তা করতে দেয় না। খাওয়া শেষ করে ঝগড়ু একটা আশ্চর্য প্রস্তাব দিল। সে ইতস্তত গলায় বলল, মাইজি, বিটিটারে দেখভাল করার জন্যি কেউ নেই। ওরে লিয়ে মুই যাবা কুনঠি? মোর ইচ্ছা পালোরে তুমারমেনে রাখি দাও। মায়াঝিটা মোর সব কাজে পাক্কা। তুমার থালা-বাসন মাজি দিবে। কাপড়া কাচি দিবে। চাপাকল থিকে ঘড়া ভরি জলও আনি দেবে। তুমার কুনো অসুবিধা হবেনি। বলেই সে পরমার দিকে সাগ্রহে তাকাল। পরমা মনে মনে হয়তো এটাই চাইছিল, সে খুশি হল। বলল, ঠিক আছে, থাকুক। আমাদের কোন অসুবিধা নেই। আমি তো একাই, ও আমার কাছে মেয়ের মতোই থাকবে। সময় পেলে তুমিও মাঝে মধ্যে এসে দেকে যেও। তোমার জন্য আমার দরজা সব সময় খোলা থাকবে।

ঝগড়ু চলে যাওয়ার সময় ওর হাতে দশটা টাকা ধরিয়ে দিয়েছিল পরমা। টাকাটা পেয়ে ঝগড়ু খুশি মনে চলে গেল। সেই পালো এখন আমাদের টিকলি, পরমা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে বলে, 'পালো' আবার কারো নাম হয় নাকি? আজ থেকে ওর নাম টিকলি।

সেদিনের সেই ছোট্ট টিকলি আজ চোদ্দ-পনের বছরের কিশোরী। ও যখন শাড়ি পড়ে ঘুরে বেড়ায় তখন ওকে কলেজে পড়া মেয়েগুলোর মত দেখায়। ওর চঞ্চল চোখ দুটোয় সব সময় দুরন্তপনা আর দুষ্টুমী মিশে আছে। ওর চেহারায় এমন একটা বাড়তি আকর্ষণ আছে যা খুব সহজলভ্য নয়, কদাচিৎ চোখে পড়ে। এক মাথা রেশম ঘন চুল, ভুরুর নিচে চোখ দুটো সবসময় মনোহর কাজল টানা। ওর মা চাঁদমনি যে রীতিমতন সুন্দরী ছিল তা এখন টিকলির মুখের দিকে এক ঝলক তাকালেই বোঝা যায়। টিকলি ঠিক ফর্সা নয়, আবার কালোও নয়, অমাবস্যা পূর্ণিমার মাঝামাঝি একটা বিতর্কিত রঙ। তবে শরীরের ত্বক এতো মসৃণ, অবিকল কাঁচের মত দেখায়। পরমা একদিন ভাবগম্ভীর স্বরে বলল, টিকলি যে অন্য কারোর মেয়ে এটা এখন আর বোঝাই যায় না। ও এখন আমাদেরই মেয়ে। তবে মেয়ে হয়ে জন্মেছে যখন, তখন ওকে তো বিয়ে দিতেই হবে। তখন আমি কি করে থাকবো বলো তো? ও ইস্কুলে চলে গেলে সময়টা আমার কাটতেই চায় না। ভাবি, কখন চারটে বাজবে, কখন টিকলি আসবে। ওর আসার পথ চেয়ে মাথাটা আমার ধরে যায় গো।

আমি ওকে আশ্বস্ত করার জন্য বলতাম, ওকে নিয়ে তোমার এতো ভাবা ঠিক নয়। টিকলি তো এখন আর ছোট নেই। আরো ওর স্কুলও তো বেশী দূরের পথ নয়। ওর

সংগে রেল-কলোনীর আরও অনেক মেয়েরাই তো যায়।

তখনকার মতো পরমা চুপ করে গেলেও ওর মনে টিকলিকে নিয়ে নানান ধরণের চিন্তা। টিকলিকে সে রান্না ঘরে যেতে দেয় না — সেদিন স্টোভ ধরাতে গিয়ে ছ্যাঁকা খেয়েছিলো বলে। সামান্য ফোস্‌কা নিয়ে ছিল কব্জির কাছে। তাতেই ডাক্তার আনতে হলো আমাকে।

খেতে বসার সময় পরমা বলল, যাও না টিকলিকে ডেকে তোল। ও অনেকক্ষণ থেকে শুয়ে আছে, ওর মনটা বিশেষ ভালো নেই। আমি তো কত করে ডাকলাম, তবু ও উঠল না।

টিকলি এমনিতে শান্ত তবে কোন কারণে ওর মনে যদি আঘাত লাগে তবে তা সহজে ভোলে না। ওর স্বভাবে চাপা একটা জেদ আছে যা অনেক সময় আমার কাছে অসহনীয় ঠেকে। কিন্তু পরমার প্রশ্রয়ে ওর সেই জেদটা অনেক সময় আব্দারে পরিণত হয়। আর সেই আব্দার পূরণ করে পরমা। টিকলির ব্যাপারে ওর কোন বিরক্তি নেই। আমি যদি কখনো কোন কারণে টিকলিকে বকি তাহলে আড়ালে পরমা আমাকে শাসন করে। অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, ওর কে আছে তুমি যে অমন করে বকো? খবরদার তুমি ওকে আর বকবে না।

দুপুরের দিকে রোদের প্রকোপ আরো বেড়ে যায়। রেল কোয়ার্টারগুলো পুড়তে থাকে রোদে। আমাদের বাসার সামনে যে নিমগাছটা আছে তার শুকনো ডালে সর্বক্ষণ কিচির-মিচির পাখি ডাকে। সেই ডাক শুনতে শুনতে আমি কখনো বিভোর হয়ে যাই। দূরের ধোঁয়াশা পাহাড়গুলোর দিকে তাকিযে আমার কেমন মন খারাপ করে। ঐ পাহাড়গুলোর উল্টো দিকে ঝগড়ু কুংকলের ঘর, সেখানে সে আর যায় না। এক অভিশপ্ত স্মৃতি সেখানে গেলে তাকে তাড়া করে, চাঁদমনির ব্যাকুল প্রশ্ন, মৃত্যুকালীন কাতরানী এবং দীর্ঘশ্বাস তাকে কিছুতেই তিষ্টতে দেয় না। তাই গ্রামে গিয়েই সাথে সাথে ফিরে আসে ঝগড়ু। পোড়া ভিটেবাড়ির স্মৃতিচিহ্ন তার মনটাকে পঙ্গু করে দেয়।

খাওয়ার সময় পরমা আমাকে বলে, জান তো ঝগড়ু আজ মদ খেয়ে এসেছিল। ওর গা থেকে ভক্‌ভক্‌ করে মদের গন্ধ বেরচ্ছিল। ও আমাকে পাত্তা না দিয়ে সরাসরি ঘরে ঢুকে এলো। আমাকে বলল, পালো কোথায় মাইজী, তাকে আমি নিয়ে যাব। কথা শেষ করে পরমা আমার দিকে কাতর চোখে তাকাল তারপর যে ঘরে টিকলি শুয়ে ছিল সেই ঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলল, টিকলি চলে গেলে আমি আর বাঁচব না গো! তুমি যা হোক কিছু একটা ব্যবস্থা করো। এতবড় ধাক্কা আমার পক্ষে সামলানো খুব কঠিন হবে।

গলায় ভাত আটকে গেল আমার, খাওয়া থামিয়ে আমি অর্থপূর্ণ চোখে পরমার দিকে তাকালাম, তুমি ভেঙে পড়ো না, শক্ত হও। এত সহজে ভেঙে পড়লে বিপদের সময় আমিও মনের জোর হারিয়ে ফেলব। ঝগড়ুকে আবার আসতে দাও, সে আসলে আমি তাকে সব কিছু বুঝিয়ে বলব। বুঝিয়ে বললে সে নিশ্চয়ই আমার কথাটা রাখবে। আমার যতদূর বিশ্বাস মানুষ হিসাবে ঝগড়ু ততোটা খারাপ নয়। আসলে অভাবই ওর স্বভাবকে নষ্ট করে দিয়েছে।

—অভাব তো অনেকেরই থাকে তবে সেই অভাবকে মূলধন করে ও আমাদের এমনভাবে বিরক্ত করবে? রাগে চোখ জ্বলে উঠল পরমার।

আমি ওকে শান্ত করার জন্য বললাম, তুমি আর উত্তেজিত হয়ো না, ঝগড়ুকে আসতে দাও। ও আবার কখন আসবে বলেছে?

— বিকেলে। উত্তর দিয়ে মুখ নামিয়ে নিল পরমা। আমি খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়লাম। মনে অশান্তি থাকলে শান্তি করে কি খাওয়া যায়? একটা সিগ্রেট ধরিয়ে আমি আবার চেয়ারে গিয়ে বসলাম, বাইরে তখন রোদের ফুল ফুটে আছে, মাটি পুড়ে যাওয়ার গন্ধে চারদিক বড়ো গুমোট। নিমগাছটাকে কেমন ন্যাড়া ন্যাড়া লাগে যদিও কচি পাতায় ঠাসা ওর ডালগুলি। ঝগড়ু কুংকল আমার মন জুড়ে বসে আছে, কিছুতেই আমি ওকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারছি না। ঐ লোকটিকে নিয়েই এখন আমাদের সংসারে অশান্তি। পরমা এখন ঝগড়ুকে আর সহ্য করতে পারে না। ঝগড়ু এলে ও কেমন ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকে। ওর সপ্রতিভ মুখ তখন পাংশু বিবর্ণ দেখায়। এর আগে যতবার ঝগড়ু আমাদের বাসায় এসেছে ততবারই সে দশ বিশ টাকা না নিয়ে যায়নি। পরমাই তাকে দিয়েছে। কিন্তু সেই টাকায় সে মহুয়া-মদ বা হাঁড়িয়া কিনে খেয়েছে। ভাতের থেকে মদটা তার কাছে বিশেষভাবে জরুরী। আমি তাকে কত বোঝানোর চেষ্টা করেছি কিন্তু সে আমার কথায় কর্ণপাত করেনি। এক মুখ হেসে কালো-কালো দাঁত দেখিয়ে সে বলত, বাবু, নিশা না করলে মুই বাঁচবানি? মোর তো কিচু নেই, এই নিশাটাই আচে। এটা ছাড়লে মুই মরি যাবা বাবু।

ওর কথাগুলো কাতরাণির মত শোনাত। পাহাড়ী খনিজ এলাকায় মদের গুরুত্ব দুধের মত। রাস্তার দু'ধারে হাঁড়িয়ার ঠেক, চুল্লুভাটি। দিনরাত অশান্তি, ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকে। হাঁড়িয়াতে আজকাল ওরা ইউরিয়া মেশায়, এতে নেশা অরো তীব্র হয় কিন্তু শরীরে ধ্বস নামে দ্রুত। আগে ঝগড়ুকে যতটা হৃষ্ট পুষ্ট প্রাণবান দেখেছিলাম, এই কয়েক বছরে তার অর্দ্ধেকটা নেই। মরা গাছের ডালের মত চিমড়ান তার দেহ, শ্রীহীন মুখের হাড়গুলো জেগে উঠেছে কদাকার ভাবে। দীর্ঘ রোগ ভোগের পর মানুষের যেমন ক্লান্তি আসে— তার হাঁটা চলায় তেমন শ্লথ এবং জড়তা। কথা বলার সময় লাল চোখটা যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। মনে হয়, এই বুঝি ওর দম আটকে যাবে। ও যখন আসত তখন খালি হাতে কখনো আসত না। কখনো দোনায় করে ছোলা সেদ্ধ, কখনো বা রং করা জিলিপি, যখন যা পারত তাই সে টিকলির জন্য নিয়ে আসত। টিকলি সেগুলো না নিলে অভিমানে ভেতরটা গর্জে উঠত ঝগড়ুর। রেগে আগুন হয়ে বলত, তা নিবি কেন, তুই তো এখুন বড় ঘরের ঝিওড়ি। বাবুর ঘরে থাকি-থাকি তুই ও বাবু হয়েচিস! মোর ছোলা সিজানো তুর পসোন্দ হবে কেনে? এসব অখন তুর মুখে পেকিইলে (দিলে) উগরি আসবে। টিকলি সব শুনে বড় ঘরে ঢুকে ফুঁপিয়ে উঠত অভিমানে। আমি ওকে বোঝালে সে ঠোঁট ফুলিয়ে বলত, আমি ওগুলো খাবো না বাবু, ওগুলো খেলে আমার শরীর খারাপ করবে। টিকলির যুক্তি ভিত্তিহীন নয়। ওর যেখানে নাড়ি কাটা হয়েছিল সেখানে ও এখন নেই। ও এখন রেল কলোনীর অন্যান্য মেয়েগুলোর সাথে পাল্লা দিয়ে পড়াশুনা করে, নাচ-

গান-সেলাই কোনটাতে সে পিছিয়ে নেই। সে যখন রাস্তা দিয়ে যায়—আমি দেখেছি, অনেকেই তার মুখের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে। যে কোন বর্ণোজ্জ্বল ফুলের সাথে কিংবা রঙিন প্রজাপতির সাথে ওকে আমি তুলনা করতে পারি। গত সাত বছরে টিকলি তার পুরনো, দেহাতি চাল-চলন সব ভুলে গিয়ে এস মফঃস্বলীয় আদব-কায়দায় মানুষ হয়ে উঠেছে। এবং এটাই স্বাভাবিক। ঝগড়ু যখন গাঁ থেকে আসে তখন পরমা এবং আমি জোর করে টিকলিকে তার কাছে পাঠিয়ে দিই। দু একবার গিয়ে টিকলি আর তার বাবার সাথে দেখা করত না। সংকোচজনিত লজ্জায় গোলাপী হয়ে উঠত তার পদ্মপাতা উজ্জ্বল মুখমন্ডল। ঝগড়ুকে আসতে দেখেই সে লুকিয়ে যেত ঘরের ভেতর। বহু ডাকাডাকির পর সে এলেও গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে থাকত, ঝগড়ুর কাছে ঘেঁষতো না। আমি ওকে বোঝাতাম, টিকলি, এটা তোমার অন্যায়। হাজার হোক সে তোমার বাবা। তাকে তোমার সম্মান করা উচিত, যারা মা-বাবাকে সম্মান করতে জানে না—তারা কারোরই আদর ভালোবাসা পায় না। সবাই তাদের খারাপ বলে।

টিকলি খুব মন দিয়ে আমার কথাগুলো শুনতো। ওর ছোট্ট হৃদয়ে যে প্রতিক্রিয়ার ঝড় উঠত তার আভাস সমস্ত মুখমন্ডলে ফুটে উঠত। সে আমার কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে সরে এসে বলত, বাবার কাছে আমি যেতে চাই বাবু। কিন্তু বাবাই আমাকে তার কাছে যেতে দেয় না। বাবা যখন এখানে আসে সব সময়ে মদ খেয়ে আসে। তার মুখ দিয়ে বিশ্রী গন্ধ বেরয়, আর ঐ গন্ধটাই আমি একদম সহ্য করতে পারি না, আমার বমি আসে। তুমি নিষেধ করো বাবু, বাবা যেন আর এখানে মদ খেয়ে না আসে।

—তুমিও তো নিষেধ করতে পারো? তুমি তার মেয়ে। সে নিশ্চয়ই তোমার কথা শুনবে।

আমার কথা শুনে টিকলি কেমন যেন কষ্ট করে হাসত, আমি কতবার বলেছি—সে আমার কথা শোনেনি। আমার বাবা বলে,—দারু-হাড়িয়া না খেলে মুই খাবোটা কি? এক বাটি হাড়িয়া পঞ্চাশ নুয়া দাম। তিন-চার বাটি হাঁড়িয়া খেলে পেট ভরি যায়। মোকে আর ভাত খাইতে হয়নি।

টিকলির কথা শুনে আমি চুপ করে থাকি। সমস্যাটা এত গভীরে প্রোথিত উপর-উপর শুনে যার সমাধান করা যায় না। টিকলি তার বাবার কাছে সহজ হতে চাইলেও সহজ হতে পারে না। আমাদের এই পরিবেশ ওর সরলতাটুকু কেড়ে নিয়েছে। ও যে পরিবেশ থেকে এখানে উঠে এসেছে—তার ছিটে-ফোঁটাও এখানে সে পায় নি। ঝগড়ু প্রায়ই আসত, তার এই আসার কোন ধারাবাহিকতা ছিল না। যখন সে খুব অর্থনৈতিক সংকটে পড়ত তখনই সে আসত। পরমার কাছ থেকে সে টাকা নিয়েই চলে যেত। তার আসার উদ্দেশ্যটাই ছিল টাকা। সেখানে কন্যা-স্নেহের সামান্য ছায়াটুকুও থাকত না।

একবার সে এসে জেদ ধরল টিকলিকে নিয়ে হাটে যাবে, টিকলিকে সে কিছু 'মন পছোন্দ সামান' নিজের হাতে কিনে দিতে চায়। তার এই আব্দার অন্যায় বা যুক্তিহীন নয়। টিকলি তখন সবে দশ বছরের মেয়ে, তার তখন চোখ-মুখ খুলেছে, সর্বোপরি সে ভাল-মন্দ বুঝতে শিখেছে। ঝগড়ু যখন নিয়ে যেতে চায় সেক্ষেত্রে আমাদের বাধা দেওয়া

সাজে না। পরমা প্রথম থেকেই ইতস্তত করছিল। আমি ওকে বুঝিয়ে বলাতে ও নিমরাজি হ'ল। একরকম অনিচ্ছার গলায় সে বলল, আমি কেন বাধা দেব? ও যদি যেতে চায় যাক। অন্য কারোর সাথে তো যাচ্ছে না। ও যাচ্ছে তার বাবার সাথে। টিকলিকে যাওয়ার কথা বলাতে সে প্রথমে রাজি হলো না শেষে আমরা জোরাজুরি করাতে ও নিরুপায় হয়ে রাজি হলো। দুপুরবেলায় গেল, সন্ধেবেলায় সে কাঁদতে-কাঁদতে ফিরে এল একা। ভয়ে শুকনো মুখ, রোদের মধ্যে হাটে ঘুরে-ঘুরে কেমন পিঙ্গল দেখাচ্ছিল তার কচি নিমপাতা মুখ। কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই ও আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। আমি ওর মাথার চুলে হাত দিয়ে আদর করে বললাম, তুমি কাঁদছো কেন টিকলি, তোমার কি হয়েছে? সে ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, বাবা আমাকে জোর করে হাঁড়িয়া খাইয়ে দিয়েছে। এই দেখ না আমার জামাটা কেমন ভিজিয়ে দিয়েছে হাঁড়িয়ায়। আমি খাইনি বলে সে আমাকে বাটি ছুঁড়ে মেরেছে। আমাকে গালি দিয়েছে।

আমি এবং পরমা দু'জনেই হতবাক। ঝগড়ুর কাছে এতটা অসভ্যতা আমরা কেউই আশা করিনি। টিকলি অনর্গল কেদে-কেঁদে যে কথাগুলো বলছিল, তার সারাংশ হলো : আদিবাসীদের হাঁড়িয়া না খেলে ধর্ম নষ্ট হয়। অতএব টিকলিকেও হাঁড়িয়া খেতে হবে। হাঁড়িয়া হলো শীতল পানীয় যা খেলে পেট ঠান্ডা থাকে। আর পেট ঠান্ডা থাকলে শরীর ঠান্ডা থাকে। শরীর ঠান্ডা থাকলে মনও ভালো থাকে। যারা হাঁড়িয়া খায় না তারা সিংবোঙার কাছে অপরাধী। তার মা চাঁদমনি হাড়িয়া বানানোয় পটু ছিল। অতএব তাকেও হাঁড়িয়া বানানো শিখতে হবে। সেটা রেলবাবুর বাসায় থেকে হবে না। তাকে পালিয়ে যেতে হবে। তারা পালিয়ে যাবে এমন জায়গায় যেখানে রেলবাবু কোন খোঁজই পাবে না। টিকলি রাজি হয়নি, ফলে তাকে চড়চাপড় মেরেছে ঝগড়ু। বলছে, পড়া-লেখা শিখে কি হবে? তোকে মুই মুখিয়ার বেটার সাথে বিয়ে দিব। তাদের খাপরার ঘর আর অনেক ধানী জমিন আছে। তুই সুখে থাকবি বিটি।

জোর করে টিকলিকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল ঝগড়ু। মেয়েকে হাটে নিয়ে গিয়ে চুড়ি-মালা কিনে দেওয়া, এটা তার একটা অজুহাত। ঝগড়ু যদি হাঁড়িয়ার নেশায় রাস্তার ধারের নালীটায় না পড়ে যেত তাহলে টিকলির হয়তো এখানে ফেরা আর সম্ভব হোত না। পরমা ঘটনার অনুপুঙ্খ বিবরণ শুনে খুব ভেঙে পড়েছিল। আমারও যে কষ্ট হয়নি তা নয়। টিকলির উপর আমাদের যে অধিকার তার চেয়ে শত গুণ বেশী অধিকার ঝগড়ুর। সে যদি কোনদিন এসে টিকলিকে ফিরিয়ে নিতে চায় তাহলে আমি ওকে ঠেকিয়ে রাখতে পারব না। আশ্রয়দাতার থেকে পিতার অধিকার অনেক বেশী—এই সত্য পরমা মন থেকে মেনে নিতে পারে না। টিকলির উপর ওর অন্ধ ভালবাসাই এর জন্য দায়ী। সে একদিন আমার কাছে অন্যায় আব্দার করে বলল, তুমি ঝগড়ুর সাথে একটা মীমাংসা করে নাও। টিকলিকে ছেড়ে আমি কোনমতেই থাকতে পারব না। ও চলে গেলে তারপরের দিনই তুমি আমার মরা মুখ দেখবে।

আমি আঁতকে উঠে বলেছি, এ তুমি কি বলছো? টিকলি আমাদের মেয়ে নয়। ওর

উপর আমাদের কি জোর খাটানো উচিত হবে? আর জোর খাটালে ঝগড়ু তা মেনে নেবে কেন?

—তাহলে ঝগড়ু কি জোর করে টিকলিকে কেড়ে নিয়ে যাবে? আমি এতদিন মানুষ করলাম, আমার কি তাহলে কোন দাবি নেই?

—দাবির প্রশ্ন পরে বিচার্য। টিকলি ঝগড়ুর মেয়ে। ও যদি তার মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় তাহলে সে আমাদের কোন বাধা-নিষেধ শুনবে না।

—আমি যদি ওকে টাকা দিই?

আমি স্তম্ভিত হলাম পরমার কথা শুনে, তার মানে? তুমি কি টাকা দিয়ে টিকলিকে কিনে নিতে চাও?

—না, ঠিক তা নয়। ঝগড়ুর তো টাকার লোভ। যদি টাকা দিলে ও রাজি হয়ে যায়। ইতস্তত ভাবে কথাগুলো বলে পরমা কেমন চুপসে যাওয়া গলায় বলল, আমি ঠিক বোঝাতে পারব না—ওকে আমি কতটা ভালবাসি। ও আসার পর আমি কলকাতায় যাওয়ার কথাও ভুলে গিয়েছি। এই ক'বছরে টিকলি আমার মনটাকে পুরোপুরি বদলে দিয়েছে। ও না আসলে আমি হয়তো পাগল হয়ে যেতাম। তুমি তো চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বারো ঘন্টা লাইনে থাকো, তুমি আমার একাকীত্বটা বুঝবে কি করে? মেয়েরা শুধু অর্থ চায় না, অর্থের বাইরেও তারা অনেক কিছু চায়। তুমি আমাকে সব কিছু দিয়েছো, কিন্তু তুমি যা পারোনি টিকলি তা আমাকে দিয়েছে। এখন যদি সেই সম্পদ আমার কাছ থেকে কেউ জোর করে কেড়ে নেয় তাহলে তা সহ্য করা আমার পক্ষে নিদারুণ কষ্টের হবে। আমি সারাজীবন কষ্ট করেছি—আমি আর কষ্ট স্বীকার করতে পারব না। নিমেষে সজল হয়ে উঠল পরমার চোখ। সে যেন তার অশ্রুসিক্ত চোখ দিয়ে আমাকে আঘাত হানতে চাইল।

বিকেলের আলো মরে যেতেই ঝগড়ু এল আমাদের বাসায়। অত্যধিক নেশা করার জন্য ওর পা দুটো টলছিল স্রোতের মুখে আটকে যাওয়া প্যাকাটির মতো। গায়ে ওর একটা হাফ-শার্ট ছেঁড়াখুঁড়া জামা। জামাটা এতো পুরনো যে তার আসল রঙ চেনা দায়। সম্ভবত এই জামাটাই আমি ওকে দিয়েছিলাম প্রায় এক বছর আগে। ওর পরনে যে ফুলপ্যান্টটা আছে সেটাও বহুদিন আগে আমিই ওকে দিয়েছিলাম। এখন সেই শক্ত-সমর্থ প্যান্টটার হাঁটুর কাছে ছেঁড়া; পেছনে কাঁথা সেলাই করার মত বিরাট একটা তালি। ঝগড়ু এসে নড়বড়ে পায়ে আমার সামনে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল। আমি ওকে বসার জন্য টুল দিতে ও টুলের উপর বসল না। মেঝেতে হাঁটু মুড়ে বসল। আমি একটা সিগ্রেট ধরিয়ে ওর দিকে একটা সিগ্রেট এগিয়ে দিলাম। ও আমার সিগ্রেটটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, মুই সিগারেট খাই নাই বাবু, মুই চুট্টা খাবা। বলেই সে একটা চুট্টা ধরিয়ে, ধোঁয়া ছেড়ে আমার দিকে কড়া চোখে তাকাল। আমি সেই চোখের দিকে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারলাম না, ভয়ে আমার বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। আমি চোখ নামিয়ে নিলাম।

চুট্টায় ফুক-ফুক টান দিয়ে ঝগড়ু আমার দিকে ঝগড়া করার মনোভাব নিয়ে বলল, বাবু, ইবার মুই পালোরে ঘর লি যাবা। সে না থাকাতে মোর বড় অসুবিধা হয়টে। কথাটা শুনে মুখটা সাদা হয়ে গেল আমার। কিছু বলার আগেই দেখি পরমা এসে জড়োসড়ো

শরীরে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে। ওর থমথমে মুখে বিষণ্ণতার কালো মেঘ। দম ধরে সে দাঁড়িয়ে থাকল অনেকক্ষণ।

ঠোঁটের কোণে তাচ্ছিল্যের একটা হাসি ফুটিয়ে আমি বললাম, তুমি যে বলো তোমার ঘর নেই তাহলে এ অবস্থায় তুমি পালোরে নিয়ে কোথায় তুলবে?

আমার হাসিটা সহ্য হলো না ঝগড়ুর, সে জ্বলন্ত চুট্টাটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে বলল, সিঁটা মোর ব্যাপার মুই বুঝবা।

—তার মানে?

—মানেটা খুব সোজা। ঝগড়ু ফিচেল চোরের মত হাসল, মোর বিটি, মুই তাকে ঘর লিই যাবা—তাতে কার কি?

আমি থতমত খেয়ে চুপ করে গেলাম। পরমা থাকতে না পেরে বলল, টিকলিকে আমরা সাত বছর ধরে মানুষ করেছি। ওর উপর আমাদেরও একটা দাবী আছে যা তুমি অস্বীকার করতে পারো না?

ঝগড়ু গুম হয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর সে তার নেশাচ্ছন্ন চোখ তুলে বলল, সি কথা মুই মানি। কিন্তুক —ঝগড়ু ভাববার জন্য কিছুক্ষণ থামল। তারপর নোংরা জামায় মুখের ঘাম মুছে কঠিন গলায় বলল, বিটিটা জোয়ান হিচে। মুই বাপ, মোর তো গুটে দায়িত্ব আচে। মুই তার ব্যা (বিয়ে) দিবা। টকা (ছেলে) দেখচি। সে হিলা মোর গাঁয়ের মুখিয়ার ছুয়া লক্ষণ। ছুয়াটা (ছেলেটা) খনিতে কাজ করে। হাজার টঙ্কার উপরে মাহিনা। খাপরার ঘর আর দশ একর জমিন আচে। সিথায় ব্যা-ঘর হিলে বিটি মোর সুখে রইবে। আর মোরও দুঃখ ঘুচবে। মুখিয়া কইচে, সে মোকে চারটা খাসী দিবে, আর দুটা হালের বলদ দিবে। হাজার টঙ্কা নগদ দিবে। কও বাবু, অতো পাইলে মোর কি কুনো দুঃখ থাকবে?

ঝগড়ুর প্রশ্ন বোঝাই মুখের দিকে আমি তাকিয়ে থাকতে পারি না। আমার কান ঝাঁ-ঝাঁ করে। আমি কি উত্তর দেব ঝগড়ুকে তা হঠাৎ করে বুঝে উঠতে পারি না। ভগবান যেন আমার বুদ্ধি সব লোপ করে দিয়েছেন। আমি যখন কলকলিয়ে ঘামছি তখন পরমাই মুখ খুলল। সে খুব মোলায়েম স্বরে বলল, টিকলি তোমার মেয়ে। তাকে তুমি নিয়ে গেলে আমরা বাধা দেব না। কিন্তু ও চলে গেলে আমার বুক ভেঙে যাবে। ওকে এতো কষ্ট করে পড়ানোটাই মাটি হয়ে যাবে।

—গরীবের মায়াঝি, সি ইতো পড়ালিখা শিখে কি করবে? জজ-হাকিম তো হিবে নি? সি তো হাঁড়িশালে রাঁধাবাড়া করবে। থালা-বাসন ধুবে। ঢেঁকিশালে ধান কুটবে। টকা-ছকা (ছেলে-মেয়ে) পালবে। তার অতো পড়ি-লিখি কি হবে?

আমি যেন সমস্যার অকুল-পাথারে পড়েছি। ঝগড়ুকে বশ করার মত কথার শক্তি আমার নেই। তবু ভার মাথাটা তুলে বললাম, টিকলি তোমার মেয়ে, তাকে তুমি যখন খুশি বিয়ে দিতে পারো। কিন্তু ওকে যখন আমরা ছোট থেকে মানুষ করেছি তখন সংগত কারণে ওর উপর আমাদেরও একটা দাবি আছে। সেই দাবি নিয়ে বলছি, টিকলির এতো অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়ার কোন যুক্তি নেই। আর এক বছর পরে ও ম্যাট্রিকটা পাশ করবে তখন নয়তো বিয়ের কথা ভাবা যাবে।

—ততদিন মুই বাঁচবানি বাবু? হাত কচলে উঠে দাঁড়াল ঝগড়ু, মোর বয়স হিলা, মায়াঝিটার ব্যা-ঘর. দেখি গেলে মনে সুখ লিয়ে মরতে পারবা।

—তোমার কি এমন বয়স হয়েছে, তুমি তো আমারই বয়েসী!—কথার ফাঁদে আমি ওকে লটকে দেওয়ার চেষ্টা করলাম। ঝগড়ু আমার থেকে দ্বিগুণ চালাক। সে গলা খেকারি দিয়ে বলল, কুথায় মাটি আর কুথায় সোনা! মোর সাথে কি তুমার তুলনা চলে গো বাবু? মুই হলি ভিখমাঙা, তুমি হলে রেলবাবু। মোর শুখা ভাত জুটেনি, তুমি ঘি ভাত ছাড়া খাইতে পারোনি। কেনে মিচির্মিচি মোর মায়াঝিটাকে আটকি রাখচো। তাকে ছাড়ি দাও। তার মা নেই। তার এট্টা গতি করি মুই মরবা। ঝগড়ু কিছুতেই বুঝবে না, আমি ওর হাতটা ধরে মিনতি করে বললাম, তোমাকে আর ঘুরে-ঘুরে ভিক্ষে করে খেতে হবে না। তুমি আমার এখানে থেকে যাও। আমি তোমাকে খাওয়া-পরা সব দেব। আর সময় হলে ধুমধাম করে দু'জনে মিলে টিকলির বিয়ে দেব। আমাদের শেষ বয়সটা মেয়ে-জামাই নিয়ে সুখেই কেটে যাবে।

প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে আমার হাতটা ছাড়িয়ে নিল ঝগড়ু, ঘৃণায় বেঁকে-চুরে উঠল তাব মুখ, মুই জলকেঁচুয়া নই যে তুমার ঘরে গুলামী করবা। মুই ভিখ্‌মাঙি খাবা কিন্তুক উঁচা মাথা ধাপিইবানি।

—তাহলে তুমি কি করতে চাও? আমি গলা চড়িয়ে রক্ত চক্ষু মেলে ঝগড়ুর দিকে তাকালাম।

ঝগড়ু ঘাবড়াল না, তেজের সাথে বলল, পালোকে মোর সাথে ঘর লিয়ে যাবো। তাকে বাহির করি দাও। মোর হাতে সময় বড় কম গো। পরমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। সে স্পর্ধিত স্বরে বলল, সে যাবে না। তাকে কি তুমি জোর করে নিয়ে যাবে?

—ভালা কথায় না হলে জোর করবা। ঝগড়ু আগের মতই দৃঢ় স্বরে বলল, পরের সোনা কানে পিঁধচো, লাজ লাগেনি তুমাদের? ছ্যা, ইটা কি বাবু—ভদোরলোকের কাজ? খমতা থাকলে অমন গুটে ছুয়া করি লাও। মোর ছুয়াটারে নিয়ে কেনে ইতো টানাটানি? মুই গরিব বলেই কি অতো জোর-জবরদোস্তি? দাঁড়াও দেখাইটি মজা। রাগে গজগজিয়ে উঠে দাঁড়াল ঝগড়ু। হাত-পা নেড়ে সে চিল্লিয়ে উঠল, পালো, এ পালো,—তুই বারিই আয় বিটি। মুই তোকে ঘর লি যাবা।

পালো ওরফে টিকলি পর্দা সিয়ে ঝড়ের বেগে ঢুকে এল ঘরের ভেতর। এতক্ষণের যাবতীয় কথোপকথন সে পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছে। ঘরে ঢুকেই সে ঝগড়ুর দিকে আগুন ঝরানো চোখে তাকাল। তারপর দম নিয়ে বলল, আমি তোমার সাথে যাবো না তুমি চলে যাও বাবা।

—মুই চলি যাবা, কুন্ঠি যাবা? ঝগড়ু দাঁত বের করে বোকার মত হাসল, তুই ছাড়া মোর কেউ নাই বিটি। চ মা, চ। ভালা ঘরে তোর ব্যা দিবা। বড় সুখে থাকবু সিথায়।

—আমার সুখ চাইনে। মাইজীকে ছেড়ে আমি আর কোথাও গিয়ে সুখ পাবো না। তুমি চলে যাও বাবা। যে গ্রামের মানুষ আমার মাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছে—সে গ্রামে আমি জ্ঞান থাকতে পা দেবো না।

ঝগড়ু কেমন হতাশ চোখে তাকাল, তুই যাবুনি বিটি?

টিকলি আরো কাছে সরে এসে কঠিন স্বরে বলল, না, যাব না। মরে গেলেও সেখানে আমি আর যাবো না।

— তোকে রেলবাবুরা জড়ি-শিকড়ি খাইয়ে বশ কবেচে। আপন মনে বিড়বিড়িয়ে উঠল ঝগড়ু, তারপর নিজের বুকে থাবড়া মেরে বলল, মোর পোড়া কপাল নাহিলে নিজের বিটি কখনো কি পর হয়ে যায়? এর মধ্যে নেশ্চয়, কিচু চাল আচে। মুই ছাড়বানি, মুই গুণিনের কাছে যাবা। খড়ি কাটবা, বিচার চাইবা। গুণিনের চোখকে ফাঁকি দিবে অমন মানুষ এ অঞ্চলে নাই। আমি আজ যাইটি কিন্তুক ফির আসবা। সেদিন খালি হাতে যাবানি। তোকেও টানতে-টানতে লি যাবা।

রাগে গজরাতে গজরাতে চলে গেল ঝগড়ু। সে চলে যাওয়ার পর টিকলি অঝোর ধারায় কাঁদল। ওর এখন বোঝার মত যথেষ্ট বয়স হয়েছে। আমি ওর মাথায় হাত রেখে বললাম, ছিঃ টিকলি, কাঁদে না। তুমি বড় হয়েছো। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ তোমাকে জোর করে বিয়ে দিতে পারবে না। তুমি ভয় পেও না, যেমন মন দিয়ে পড়াশুনা করছিলে তেমনই করে যাও। মনে রেখো, তোমাকে একদিন দশজনের একজন হতে হবে। সেদিন তোমার বাবার আর কোন দুঃখ-কষ্ট থাকবে না। সেদিন আজকের ঘটনার কথা তোমার বাবাও ভুলে যাবে।

গ্রীষ্মকালটা চোখের সামনে দিয়ে বৈশাখী মেঘের মতো নাচতে-নাচতে চলে গেল। বর্ষার শুরুতেই ঠান্ডা লাগিয়ে জ্বরে পড়ল টিকলি। জ্বর ছাড়ল প্রায় দশ-বারদিন পরে। ওকে নিয়ে খুবই চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল পরমা। সেরে উঠতেই ও কালীমন্দিরে গিয়ে পূজা দিয়ে আসল। আমাকে বলল, মেয়েটাকে তুমি সঙ্গে নিয়ে বিকেলবেলায় একটু ঘোরাবে। সব সময় বাড়িতে থেকে ও বদ্ধ-হাওয়ায় হাঁপিয়ে উঠেছে। এই কথাটা পরমার একার নয়, ডাক্তারও আমাকে বলেছেন। অনেক কষ্টে রবিবারের বিকেলে একটু সময় বের করতে পারলাম। টিকলিকে বললাম, তুমি তৈরী হয়ে নাও। আজ তোমাকে পাহাড়ের কাছে ঘুরতে নিয়ে যাবো। ওখানে একটা সুন্দর নদী আছে। বর্ষার সময় পাহাড়ী নদী বড়ো সুন্দর দেখায়। তোমার খুব ভালো লাগবে।

শাড়ি পরে দশ মিনিটের মধ্যে তৈরী হয়ে নিল টিকলি। আমার কাছে এসে ক্ষীণ স্বরে বলল, বাবু, চলো।

পরমা আমাকে সতর্ক করে দিয়ে বলল, দেরী করবে না কিন্তু। সন্ধে লাগার আগেই ফিরে এসো নাহলে আমি চিন্তা করব।

অত বড় মেয়ে তবু আসার সময় সে পরমার গালে নিঃসংকোচে আদরের একটা চুমু এঁকে দিল। হাসি মুখে বলল, তুমি ভাববে না মাইজী, আমি সন্ধের আগেই ফিরে আসব।

মোটর সাইকেলটা নিয়ে মোরাম ফেলা পথটা ধরে পাহাড়েরর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম আমি। টিকলি আমার পিছনের সিটে বসে। কিছুটা যাওয়ার পর সে আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলল, বাবুগো, একটু আস্তে চালাও! আমার খুব ভয় লাগছে। বৃষ্টিতে রাস্তা বড় পেছল। যে কোন মুহূর্তে বিপদ হয়ে যেতে পারে।

আমি ওকে অভয় দিয়ে বললাম, তোমার ভয় নেই টিকলি. তুমি শক্ত করে আমাকে ধরে থাকো। আমরা তাড়াতাড়ি গিয়ে, তাড়াতাড়ি ফিরে আসব।

মিনিট কুড়ি চালানোর পর পাহাড়ের কাছে পৌঁছে গেলাম আমরা। আমি মোটর সাইকেলের স্টার্ট বন্ধ করতেই লাফ দিয়ে নেমে পড়ল টিকলি। তারপর দ্রুত পায়ে হেঁটে গেল নদীটার কাছে। নদীর দু'ধারেই বুনো লতা-পাতার ঝোপ-ঝাড়। হরেক রকমের ফুল ফুটেছিল সেখানে। সেখান থেকে এক থোকা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে সে তার খোঁপায় গুঁজল। তারপর আমার দিকে বেশ কতকগুলো ফুল এগিয়ে দিয়ে বলল, বাবু, এই ফুলগুলো তুমি যত্ন করে রেখে দাও। এগুলো আমি মাইজীর জন্য নিয়ে যাবো। মাইজীও খুব ফুল ভালবাসে। ওর কথা শুনে আমি মুগ্ধ হ'লাম। ও যখন এক পাথর থেকে আরেক পাথরে লাফিয়ে-লাফিয়ে নদীর কাছে যাচ্ছিল আমি তখন ওকে চিৎকার করে সাবধান করে দিলাম। ও পিছন ফিরে তাকিয়ে সুনার ফুলের মত হাসল। আমাকে সাহস দিয়ে বলল, ভয় নেই বাবু, আমি পড়ব না। মায়ের সাথে আমি যে কত দিন নদীতে স্নান করতে গিয়েছি—তার কোন গোনা-গুনতি নেই। মা আমাকে সাঁতার কাটা শিখিয়েছে। জানো বাবু, আমাদের গ্রামেও এমন একটা নদী আছে—যার জল বর্ষাকালে একেবারে গেরুয়া রঙা। আর সেই জলে কত রকমের মাছ। মা আর আমি আঁচল বিছিয়ে কত রঙ-বেরঙের যে মাছ ধরতাম। তারপর সেই মাছ শিশিতে পুরে রেখে দিতাম। মা বলত, বর্ষাকালে মাছেদের পেটে ডিম হয়, সেই ডিম ফুটে বাচ্চা হয়, সত্যি?

আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিতেই টিকলি কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। পাথর থেকে সে আবার ফিরে এলো ডাঙায়। আমাকে একটা ঘাস দেখিয়ে বলল, বলতো বাবু, এই ঘাসটার কি নাম?

আমি অনেক ভেবে বললাম, বাবুইঘাস।

টিকলি কিৎ-কিৎ খেলার মতো হাসতে-হাসতে বলল, এটার নাম ঘোড়াঘাস। জানো বাবু, ঘোড়াঘাসের দু'ধারে বেশ ধার থাকে, লাগলে গা-হাত-পা চিরে যায়। আর তাতে ঘাম লাগলে জ্বালা করে।

আমি অন্য একধরণের ঘাস দেখিয়ে বললাম, বলতো টিকলি, এই ঘাসটার কি নাম?

টিকলি হাসতে-হাসতে বলল, কাঁকড়াঘাস। বাবু, তুমি কাঁকড়া খাও না? বর্ষার সময় কাঁকড়ার গায়ে তেল হয়। আমার মা কলমকাঠি ধানের ক্ষেত থেকে ধরে আনত দুধী কাঁকড়া। আঃ, তার গায়ে কি তেল! আর জানো তো, কাঁকড়াটা অবিকল দুধের মত দেখতে। খুব টেস্টফুল...

রোদ কমে আসতেই মাথার উপর দিয়ে একটা টিং-টড়ং পাখি শিস দিতে দিতে উড়ে গেল। টিকলি আনন্দে হাত নাড়িয়ে বলল, দেখো বাবু, পাখিটা কত সুন্দর! এই পাহাড়টায় যে কতরকমের পাখি আছে, আমার মনে হয় কেউ বুঝি সব পাখির নামও জানে না। বাবু, তুমি ডুর পাখি (গুড়ুল পাখি) দেখেছো, কোনদিন ডুর পাখির মাংস খেয়েছো?

আমি না বলতেই টিকলি খুব হাসল, জানো তো ডুর পাখি খুব দ্রুত ছুটতে পারে। ওরা ভীষণ চালাক হয়। পাখিদের মধ্যে ওরাই মনে হয় সব থেকে বেশী চালাক।

পাহাড়ের উল্টো দিকে অস্ত যাচ্ছিল সূর্য। আমাদের ফিরতে হবে অনেকটা পথ। আমি টিকলিকে বললাম, চলো, এবার ফেরা যাক। ঘরে তোমার মাইজী নাহলে চিন্তা করবে।

টিকলি আমাকে বলল, আর একটু দাঁড়াও বাবু, আমি একটা চিহড়পাতা ছিঁড়ে আনি। জান বাবু, চিহড়পাতা আর পদ্মপাতায় খুব একটা অমিল নেই। ও একটা চিহড়লতা ছিঁড়ে আনল জংগল থেকে। আমি মোটর সাইকেলটা ঠেলতে-ঠেলতে নিয়ে এলাম চওড়া রাস্তায়। স্টার্ট দিতে যাবো, এমন সময় দেখি জংগল থেকে বেরিয়ে এল চার-পাঁচজন ছোকরা। তারা কুর্মী ভাষায় কথা বলছিল, সে ভাষার আমি কিছু বুঝি না। টিকলি বোঝে। সে নিচু স্বরে বলল, বাবু, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চলো। ছেলেগুলোর মতি-গতি ভাল বুঝছি না।

টিকলির কথায় আমি রীতিমতন শিউরে উঠলাম। মোটর সাইকেলটা স্টার্ট দিতে গিয়ে পরপর দু'বার ব্যর্থ হলাম। ভয়ে টিকলি আমার শরীরে ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে, আমি দেখলাম— ওর সারা মুখে ভয়ের ঘাম। তবু সে আমাকে সাহস দিয়ে বলল, ভয় পেও না বাবু। ওদের মধ্যে একজনকে আমি চিনি। ঐ কালো করে লম্বা মতন ছেলেটা বাবার সাথে এসেছিল। ঐ ছেলেটাই হলো মুখিয়ার ছেলে। আর ঐ বেঁটে ছেলেটা মুখিয়ার ছেলের বন্ধু। ওরা ক'মাস থেকে আমাকে খুব জ্বালাতন করছে। ইস্কুল যাওয়া-আসার পথে ওরা আমাকে যা-তা কথা বলে। আমি ওদের পাত্তা দিই না তবু ওরা আমাকে জ্বালায়।

আমি ভাল করে দেখলাম—ওদের হাতে কোন অস্ত্র আছে কিনা। লাঠি ছাড়া ওদের হাতে কিছুই ছিলো না। তবু আমি ভয় পেয়ে শক্ত করে টিকলির হাতটা চেপে ধরলাম। ওদের লক্ষ্য যে টিকলি তা ওদের হাবভাব দেখে বুঝে নিতে কোন অসুবিধা হলো না।

আমি মোটর সাইকেলে স্টার্ট দিয়েই টিকলিকে বললাম, বসো। ওরা তখনই ছুটে এসে আমাদের ঘিরে ধরল। আমি কম্পিত গলায় শুধোলাম, কি চাও তোমরা?

ছেলেগুলো একসাথে হা-হা করে হাসল। তারপর টিকলির দিকে নোংরা চোখে তাকিয়ে জোর গলায় বলল, একে চাই। একে ছেড়ে দিয়ে আপনি মোটর সাইকেল নিয়ে চলে যান। আপনাকে আমরা বাধা দেব না।

—তার মানে?

—মানেটা খুবই সহজ। ওদের মধ্যে থেকে সেই লম্বা, কালো ছেলেটা এগিয়ে এল, নেশায় তার চোখ লাল, পা টলছিল, সে টেনে-টেনে বলল, টিকলির সাথে আমার বিয়ে পাক্কা। ওর বাবাকে আমি পাঁচশ টাকা দিয়েছি। টিকলি এখন আমার। বলেই সে টিকলির হাতটা ধরে হ্যাঁচকা একটা টান দিল, সিটের উপর থেকে হুড়মুড়িয়ে টিকলি ছিটকে পড়ল নিচে, তার কপালের কাছটায় সামান্য লেগেছিল, কাদামাটিগুলো মুছে নিয়ে সে একটা গোল পাথর হাতে নিয়ে রুখে দাঁড়াল। রাগে ফুঁসে উঠে বলল, কেউ আমাকে ছোঁবে না। আমাকে ছুঁলে পাথর ছুঁড়ে তোমাদের মাথা আমি থেঁতলে দেব। তোমরা ভাবছোটা কি, শক্তি কি শুধু তোমাদের একারই আছে। আমিও আদিবাসী মেয়ে, জীবন দেব কিন্তু ধরম দেব না। ওদের মধ্যে একজন পাগলা হাতির মত তেড়ে গেল টিকলির দিকে। অব্যর্থ নিশানায় হাতের পাথরটা সবেগে ছুঁড়ে দিল টিকলি। আমি দেখলাম চোখের নিমেষে ছেলেটা কাদার মধ্যে লুটিয়ে পড়ল হাত-পা ছড়িয়ে। আঘাতটা ওর মাথায় লেগেছে। টিকলি যখন

আর একটা কুড়াতে যাবে এমনি পেছন থেকে তাকে জাপটে ধরল হৃষ্ট-পুষ্ট আর একজন। ভয়ে প্রাণপণে 'বাবুগো' বলে চিৎকার করে উঠল টিকলি। আমি বাধা দিতে যাবো এমন সময় অতর্কিতে একটা লাঠি এসে সজোরে আঘাত করল আমার মাথায়। মাটিতে পড়ে যাওয়ার আগে আমি দেখলাম, ওরা তিন চারজন মিলে টিকলিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে নদীর ধারের ঝোপটায়। তারপর আমার কিছু মনে নেই। জ্ঞান ফিরতে দেখি টিকলি আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। ওর সারা শরীরে দংশনের দাগ। আমি টিকলির ক্ষত-বিক্ষত মুখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। টিকলি তার ছেঁড়া শাড়িটা বুকের উপর জড়িয়ে নিয়ে আমাকে টেনে তুলল বহু কষ্টে। আমি উঠে দাঁড়াতেই আবার সশব্দে কেঁদে উঠল টিকলি, বাবুগো, এত করেও আমি নিজেকে বাঁচাতে পারলাম না। ওরা আমাকে নষ্ট করে পালিয়ে গেল। মাইজীর কাছে আমার এই পোড়ার মুখ দেখাব কি করে?

থেঁতলে যাওয়া ফুলগুলো টিকলি যখন উবু হয়ে তুলে নিচ্ছিল তখন আমি দেখলাম—ওর গোড়ালীর কাছে জমাট বেঁধে স্তব্ধ হয়ে আছে রক্তধারা। অতো কষ্টের মধ্যেও ফুলগুলো সে সযত্নে তুলে নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বলল, মাইজীকে দিও বাবু। মাইজী বড় ফুল ভালবাসে। আমি ওকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মত কাঁদলাম। টিকলি তার কাঁপা আঙুলগুলো দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিল আমার, বাবু, কেঁদো না, কাঁদলে যে পশুগুলোকে সম্মান করা হয়।

টিকলিকে নিয়ে ঐ অবস্থায় আমি থানায় গিয়েছিলাম। যেহেতু দুজনকে টিকলি ভালোমতন চেনে সেই জন্য অপরাধী কঠোর শাস্তি পাবে এমন একটা ধারণা আমার মনে জন্ম নিয়েছিল। ও.সি. সবশুনে চোখের চশমা খুলে দায় এড়িয়ে বললেন, আপনি যদি বলেন তো আমি ডাইরি লিখে নিচ্ছি। কিন্তু ডাইরি করে আপনার তেমন কিছু ফায়দা হবে না। বরং কোর্টে আপনিই হ্যারাশ্‌ড হয়ে যাবেন। আজ পর্যন্ত খুব কম রেপ কেসের ফয়সালা হয়েছে। উল্টে মেয়েটার নামে সর্বত্র বদনাম রটবে। এই কলঙ্ক মাথায় নিয়ে মেয়েটার কি আর বিয়ে হবে?

টিকলি পাশে বসে সব শুনছিল। চোখের জল মুছে সে বলল, আমি আমার বিয়ের জন্য ভাবি না। যারা অপরাধী তাদের আপনি সাজা দিন দারোগাবাবু।

কোন এক অজ্ঞাত কারণে অপরাধীর সাজা হলো না। টিকলির ভবিষ্যৎ ভেবে আমিও মধ্যবিত্তের মত চুপ করে থাকলাম।

এই ঘটনার দু'মাস পরে শরতের এক ফুটফুটে সকালে ঝগড়ু এলো। এবার ওর পোষাক-পরিচ্ছদ সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। ধুতি পরেছে, গায়ে নতুন একটা ছিটজামা। যাকে কোনদিন মাথায় চিরুনি দিতে দেখিনি তার মাথায় সুগন্ধি তেলের বাস পেলাম। পায়ে চামড়ার চটি। ঝগড়ু এসে চেয়ারে আমার মুখোমুখি বসল। সিগারেট ধরিয়ে বলল, রেলবাবু, তুমি মোকে হাজার টঙ্কা দিলে পালোকে মুই আর কুনোদিন লিতে আসবানি।

আমি ব্যাকুল হয়ে শুধোলাম, যা বলছো তা সত্যি?

ঝগড়ু পান চিবানো দাঁত বের করে হাসল, সিংবোঙার দিব্যি দিয়ে বলল, মুই মিচা কথা কইনি। মিছা কথা কইলে মোর মুখে পোকা হবে।

আমি ভরসা পেয়ে বললাম, এই হাজার টাকা নিয়ে তুমি কি করবে? ঝগড়ু হাত কচলে বলল, মুখিয়ার টাকা মুই ঘুরোন দিবা। সে মানুষটা তো ভালা নয়। তার ছুয়াটা মোর চাইতে ঢের বেশী মদ খায়। গুটে রাঁঢ় রাখচে টাউনে। সে আমার বিটিটাকে লিয়ে মারি ফেলবে। তার বাপো তো মোর বউটাকে জ্বালিই মারচে। মুই নাক-কান মুলচি, মোর অমন সোন্দর পড়া লিখা জানা মায়াঝিটাকে ঐ মুর্খের হাতে দিবানি। আজ থিকে পালোর সব দায়-দায়িত্ব তুমাদের। মুই যেমন আসতি তেমন আসি কি দেখি যাবা।

ঝগড়ুর সরল স্বীকারোক্তিতে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। পরমা যখন আলমারী খুলে টাকাটা বের করে ওর হাতে দিতে যাবে তখন বড় ঘর থেকে চিলের মত ছুটে এল টিকলি। টাকাটা ছোঁ-মেরে কেড়ে নিয়ে বলল, খবরদার মাইজী, বাবার হাতে টাকা দিও না। মাতাল মানুষরা সরল হয় আর সরল কথায় ওরা মানুষের অনেক ক্ষতি করে। যে বাবা তার মেয়েকে মাত্র পাঁচশ টাকায় একটা লম্পট, চরিত্রহীনের হাতে বিক্রি করে দেয়—তার কথাকে গুরুত্ব দেওয়া আদৌ উচিত নয়।

মেয়ের ক্রোধী মুখের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড়িয়ে ওঠে ঝগড়ু, তুই অতো লিঠুর হোস নে বিটি। মোর মুখপানে গুটে বার তাকা। তাকিয়ে টঙ্কাটা তুই দি দে।

টিকলি রাগে ফুঁসে উঠে বলল, হ্যাঁ দেব। তুমি একটু দাঁড়াও। বলেই দ্রুত পায়ে সে আবার বড় ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। খুঁজে-পেতে বেরে করে আনল সেদিনের সেই রক্তমাখা শাড়িটা, দলা করে ছুঁড়ে দিল তার বাবার মুখের উপর। তারপর কান্নায় ভেঙে পড়ে বলল, এতে যা রক্ত আছে সেই রক্তের দাম হাজার নয়, আরো অনেক বেশী। এই শাড়িটা তুমি মুখিয়ার ছেলেকে দিয়ে দিও। তোমার মেয়ের রক্ত এই শাড়িতে মিশে আছে। আর এই রক্তপাতের জন্য আমি তোমাকে দায়ী করি। তাই আজ থেকে তুমি আর আমার বাবা নও, তুমি একটা জল্লাদ। টিকলি যখন উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছিল তখন শাড়িটা বুকে চেপে নিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ঝগড়ু। যাওয়ার আগে সে টিকলিকে বলল, মুই যাইটি কিন্তুক ফির আসবা। সেদিন তোর এই লুগাতে (শাড়ি) আরেক জনের লহু দেখবু। নাহলে মোর নাম ঝগড়ু কুংকল নয়, মোর জনমই মিছা।

পূজোর মাত্র দিন দশেক বাকি হঠাৎ একদিন থানা থেকে ডাক আসল আমার। সেপাইটি সেলাম ঠুকে বলল, সাব আপনাকে দেখা করতে বলেছেন। আরজেন্ট দরকার আছে, আপনাকে এক্ষুণি আপনার মেয়েকে নিয়ে যেতে হবে।

সেপাইটার কথা শুনে আমি আকাশ থেকে পড়লাম। কি করব যখন ভাবছি তখন সেপাইটা বলল, আমার সংগে গাড়ি আছে। আপনি রেডি হয়ে নিন। আপনাকে সংগে নিয়ে যাব, বড়বাবুর এমনই নির্দেশ।

আমি শুধোলাম, কি ব্যাপার, এত ব্যস্ততার কি আছে? আমরা ধীরে-সুস্থে যাচ্ছি, আপনি যান।

সেপাইটি তবু গেল না। সংবাদটা দিয়েই সে গেটের বাইরে গাড়িটায় গিয়ে বসল। আমি যখন টিকলিকে নিয়ে বাইরে এলাম তখন পরমাও দেখি শাড়ি বদলে থানায় আসার জন্য প্রস্তুত। আমি অপ্রস্তুত গলায় বললাম, তুমি কোথায় যাবে? তোমাকে তো ডাকেনি।

পরমা কেমন ম্লান চোখে তাকাল, মেয়েকে আমি আর তোমার সাথে একলা ছাড়ব না। আমার বহু শিক্ষা হয়েছে। সেদিন তুমি যদি অতো দেরী না করতে তাহলে এই অঘটনটা ঘটত না।

পরমা পরোক্ষভাবে সেদিনের ঘটনার জন্য আমাকে দায়ী করল। আমি কথা না বাড়িয়ে সোজা গাড়িতে গিয়ে বসলাম। টিকলি এসে বসল পরমার পাশে।

গাড়ি চলছিল, হঠাৎ আমার কানে এল টিকলির কথা। ও চাপা গলায় পরমাকে বলছিল, বাবা মনে হয় বদলা নিয়েছে। নাহলে হঠাৎ আমাকে কেন থানায় ডাকবে? জানো মাইজী, তাই যদি হয় তাহলে ঐ মানুষটাকে আমি দেবতা জ্ঞানে পূজো করব।

পরমা নীরব চোখে তাকিয়ে থাকল টিকলির দিকে, এক অজানা ভয়ে তার মুখে কোন কথা নেই।

থানায় আসতে আমি দেখলাম, বেঞ্চিতে বসে আছে ঝগড়ু। সে আমাকে দেখে অবজ্ঞাভরে চোখটা সরিয়ে নিল অন্যদিকে। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার ঝগড়ু, থানায় কখন এলে?

ঝগড়ু আমার কথার কোন প্রত্যুত্তর করল না। ও.সি. আমাকে দেখতে পেয়েই ডাকলেন, আমি তার দিকে এগিয়ে গেলাম। বড়বাবুর ঘরটাতে আগে থেকেই বসেছিল জনা পাঁচেক লোক। তার মধ্যে দু'জন ছোকরা যাদের আমি দেখেছিলাম নদীর ধারে। টিকলিই আমাকে চিনিয়ে দিয়েছিল লম্বা রোগা ছেলেটা হলো মুখিয়ার ছেলে। পাশে বসে আছে যে সে মুখিয়ার ছেলের বন্ধু। চোখাচোখি হতেই ওরা সামান্য কেঁপে উঠে চোখ নামিয়ে নিল নিচে। অপরাধী শাস্তি পাবে—এই ভেবে আমি ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম। থানার ও. সি. বললেন, বসুন, আপনার সাথে আমার অনেক জরুরী কথা আছে।

আমি ফাঁকা চেয়ারটায় বসে পড়লাম। মাথার উপর পাখা ঘুরছিল তবু দরদরিয়ে ঘেমে গেলাম আমি। পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাড়-গলা-মুখ মুছে আমি আবার ও. সি.-র দিকে কৃপাপ্রার্থীর চোখে তাকালাম। ও.সি. আমাকে খোঁচা মেরে বললেন, আপনাকে মশাই আমি খুব ভালোমানুষ বলেই জানতাম। এখন দেখছি পৃথিবীর কাউকেই আর বিশ্বাস করা যাবে না। সবাই ভদ্রবেশী চোর-ডাকু।

সম্মানে ঘা লাগতেই আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হঠাৎ কেন আপনি এমন কথা বলছেন, আমার অপরাধ?

—কি করেন নি মশাই, পৃথিবীর জঘন্যতম অপরাধটি আপনি করেছেন। আবার বড় মুখ করে বলছেন, আমার কি অপরাধ?

আমি সবিনয়ে সেই একই প্রশ্ন ফিরিয়ে দিলাম। এবার ও.সি. চেয়ারের হাতলে ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠলেন রাগে, আপনার নামে নারী অপহরণের কেস আছে। ও.সি. গ্যাস-লাইটার জেলে ঘন ঘন সিগারেটে টান দিয়ে আমার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন, আপনার বাড়িতে যে মেয়েটি থাকে তাকে কি আপনি এনেছেন? এনে থাকলে ইমিডিয়েট ডাকুন। থানাতেই সব মীমাংসা হয়ে যাবে।

টিকলিকে ডাকতে হলো না, সে পরমার সাথে এলো। ও.সি.-র ঘরে ঢুকেই সে তর্জনী

তুলে চিৎকার করে বলল, দারোগাবাবু, এই ছেলে দুটোই.. আমাকে..!

— শাট আপ! তার কথা আটকে গেল দারোগাবাবুর ধমকে। মুখ নীচু করে সে চড়ুই ছানার মত কাঁপতে লাগল ভয়ে। আমি টিকলিকে এত অসহায় কোনদিনও দেখিনি। টিকলি ঠোঁট কামড়ে আক্রোশে তাকিয়েছিল ছেলে দুটোর দিকে। তার যদি নখ থাকত সে তাহলে ওদের ছিঁড়ে ফালাফালা করে দিত এমন নির্মম তার দৃষ্টি। যদি চোখে আগুন থাকত তাহলে সেই আগুনে সে যেন পুড়িয়ে ছারখার করে দিত ওদের।

দারোগাবাবু একটা চেয়ার দেখিয়ে টিকলিকে বলল, বসো।

টিকলি বসল না, ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়ে থাকল খুঁচিয়ে দেওয়া রাগে।

গত দু'মাসে আমি টিকলির চেহারার আমূল পরিবর্তন দেখেছি. এবং কথা-বার্তায় সে আর আগের মত মুখচোরা নেই। তাকে কেউ কিছু বললেই যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দেয়। নিজেকে নিয়ে সে এখন আর অতো বেশী ভাবে না। নদীর ধারের দুর্ঘটনার পর থেকেই সে মনের দিক থেকে বিকলাঙ্গ হয়ে পড়েছিল যদিও মুখে তার কোন প্রকাশ নেই, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে সে শুকিয়ে যাওয়া নদী। আমাকে সে প্রায়ই বলত, বাবু, এত বড় অন্যায় করেও ছেলে দুটোর কোন সাজা হলো না—এ তোমাদের কেমন থানা গো? আমি ওকে বোঝাতাম. সাজা হবেই, আজ না হোক—দু'দিন পরে অবশ্যই হবে। মানুষের সাজা না পেলেও ভগবানের কাছে এরা কোনদিন নিষ্কৃতি পাবে না। তাঁর খাতায় সব লেখা আছে। তিনি সব পাওনা-গন্ডা সময় হলেই মিটিয়ে দেবেন। তুমি অতো ভেবো না। ভেবে-ভেবে তোমার শরীরটা যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

—আমি তো নদীর ধারে নষ্ট হয়ে গেছি বাবু, আমার আর নষ্ট হবার কোন ভয় নেই। শুধু মাইজী আর তোমার জন্য আমার কষ্ট হয়। নাহলে কোনদিন আমি গলায় দড়ি দিতাম।

—ছিঃ, এমন কথা ভুল করেও মনে স্থান দেবে না। সেদিন যা ঘটেছে সেটা একটা দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষের জীবনে এমন দুর্ঘটনা বহু ঘটে, দুর্ঘটনাকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা কর। তোমার সামনে এখনও বিরাট আলোর ভবিষ্যৎ পড়ে আছে।

পানসে, বিষণ্ণ হেসে টিকলি বলেছিল, আমার মায়ের কথা আমি ভুলতে পারি না বাবু। ওরা তো আমার মাকে ষড়যন্ত্র করে মেরেছে। ওরা আমাকেও মারতে চায়। আচ্ছা বাবু, মায়ের ভাগ্য নিয়ে কি মেয়েরা জন্মায়?

এ প্রশ্নের উত্তর আমার দেওয়া হয়নি। ওর মাকে নৃশংসভাবে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল—এ ঘটনা সত্যি। চাঁদমনি ছিল উদার প্রকৃতির কর্মঠ মেয়েমানুষ অথচ তাকে ডাইনি সন্দেহে পুড়িয়ে মারল গ্রামবাসীরা। সেদিন ঝগড়ুর যে ভূমিকা ছিল তা সে পালন করেনি। তাড়া খাওয়া ভীতু ইঁদুরের মত সে পালিয়ে এসে আত্মরক্ষা করেছে। একমাত্র মেয়ে টিকলির উপর পিতা হিসাবে তার যে দায়িত্ব ছিল— সেই গুরু দায়িত্ব সে পালন করেনি—এড়িয়ে গিয়েছে। এখন সাত বছর পরে ডাগর মেয়েকে সে পণ্য হিসেবে বিক্রি করে দিতে চায় অন্যের কাছে। বিয়েটা তার একটা অজুহাত।

আমি ঠোঁট কামড়ে ও.সি-র মুখের দিকে তাকালাম। ও. সি. ঝগড়ুকে ডাকার জন্য

সিপাইকে নির্দেশ দিলেন। ঝগড়ু এসে হাতজোড় করে দাঁড়ালেন। ও. সি. ওর দিকে তর্জনী তুলে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই মানুষটিকে চেনেন?

আমি বললাম, চিনি, ওর নাম ঝগড়ু কুংকল।

—ভেরি গুড! চেনন যখন তখন তো ভালই হলো! তাহলে শুধু শুধু ওর মেয়েটাকে আটকে রেখেছেন কেন? কারোর সোমত্ত মেয়েকে দিনের পর দিন ঘরে আটকে রাখার অধিকার আপনার নেই। ও থানার শরণাপন্ন হয়েছে। ও আপনার নামে নারী অপহরণের কেস করেছে। সেইজন্য আপনাকে আমি ডাকতে বাধ্য হয়েছি। আপনি ভদ্রলোক, তার উপরে গভর্মেন্ট-এমপ্লয়ি। এমন মারাত্মক কেস আপনার নামে হলে আপনার এতদিনের চাকরিটি নষ্ট হয়ে যাবে। তাই এখনো সময় আছে, ঝগড়ুর সাথে কেসটার মীমাংসা করে নিন। নাহলে আপনাকেই ঠকতে হবে।

ঝগড়ু রাগে বেঁকে উঠে বলল, মুই কুনো মীমাংসার মধ্যে যাবানি। মুই মোর বিটি চাই। মুই বাঁচি থাকতে মোর পালো কেনে নোকরাণী হবে রেলবাবুর দুয়ারে? কেনে, মোর কি হিম্মৎ নেই বিটিকে পালবার?

চেয়ারে বৃদ্ধ মতন একজন বসেছিলেন, তিনি হলেন ঝগড়ুদের গ্রামের মুখিয়া। আমার দিকে তাকিয়ে সেই ধূর্ত ভদ্রলোকটি বললেন, মেয়েটিকে ছেড়ে দাও রেলবাবু নাহলে তোমার কিন্তু ভালো হবে না। এটা আমাদের এলাকা। আমাদের এলাকায় এরকম জোরজুলুম আমরা বরদাস্ত করবো না। সরকারের নিয়ম আছে, আদিবাসীদের জমিন কেবল আদিবাসীরাই নিতে পারে। মেয়েদের বেলায় আমরা তেমন একটা রুল বানিয়ে নিয়েছি। আমাদের ঘরের মেয়েরা তোমাদের ঘরে কেন দাসীবৃত্তি করতে যাবে বলো? 'কেন, আমরা কি সব মরে গিয়েছি?

থানার বড়বাবু সমর্থন করলেন মুখিয়ার কথা। আমি কুঁকড়ে যাওয়া চোখে পরমার দিকে তাকালাম। পরমা টিকলির হাতটা শক্ত করে ধরে অস্ফুটে বলল, টিকলি আমাদের মেয়ে, ওকে আমার ঝিয়ের চোখে দেখি না।

দারোগাবাবু চটে ওঠা গলায় বললেন, টিকলি কি আপনার পেটের সন্তান? পরমা পিন ফোটানো বেলুনের মত চুপসে গেল মুহূর্তে। দারোগাবাবু সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বললেন, ওর নাম পালো। ওর বাবার নাম ঝগড়ু কুংকল। ও একটা আদিবাসী মেয়ে। শুধু নাম পাল্টে দিলেই যে ও আপনাদের মেয়ে হয়ে যাবে—এমনটা ভাবলেন কি করে?

—শুধু জন্ম দিলেই কি বাবা-মা হওয়া যায়? যে প্রতিপালন করে তার কি কোন ভূমিকা নেই? সে কি এতোই অবহেলার পাত্র? পরমার চোখ থেকে আগুন ঝরে পড়ল।

পরমার তেজদীপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে দারোগাবাবু কেমন ঘাবড়ে গেলেন, তাহলে আমাকে আইনের পথই নিতে হয়? সোজা আঙ্গুলে ঘি না উঠলে আঙ্গুলে তো বেঁকাতেই হয়, কি বলেন?

মুখিয়া হে-হে হেসে সমর্থন জানাল ও.সি.-কে। আমি খুব ভেঙে পড়া স্বরে বললাম, তাহলে এটা কি আপনার শেষ রায়?

ঠোঁটের কোনটা চিকণ হাসিতে বেঁকে গেল ও.সি.-র রায় দেবার মালিক আমি নই,

রায় দেবে কোর্ট। আমি একটা সমাধানে আসতে চেয়েছিলাম—আপনি যদি রাজি না থাকেন আমাকে তাহলে অন্য পন্থা নিতে হবে।

টিকলি এতোক্ষণ রাগে পুড়ছিল, সে ঝগড়ুর দিকে আঙুল তুলে বলল, ঐ লোকটা আমার বাবা নয়, ও আমার ভালও চায় না। ও হলো একটা ব্যাপারী। ও হলো একটা টাকার ভিখারী।

—তা তো কইবু মা।—কপাল চাপড়ে হা-হুতোশ করে কেঁদে উঠল ঝগড়ু, নিরুপায় দেখে সে আছাড় খেয়ে পড়ল দারোগার পায়ের উপর, মুই গরিব মানুষ বাবু। তুমি হলে ভগমান, তুমি এর বিচার কর।

বিচার হলো। বিচারে টিকলিকে ওরা নিয়ে গেল টেনে-হিঁচড়ে। যাওয়ার সময় কান্নায় লুটিয়ে পড়েছিল টিকলি। আমি এবং পরমা কেউই তাকে শেষ বিদায় দিতে পারি নি। দারোগাবাবু পাকা লোক। মুখিয়ার এবং ও.সি.-র নির্দেশে সাদা কাগজে আমাকে লিখে দিতে হলো, টিকলির ওপর আমাদের কোন দাবি নেই। মুখিয়া সেই স্বীকারোক্তির কার্বণ কপিটি চার ভাঁজ করে পকেটে পুরে চলে গেলেন। শূন্য বুকে বাসায় ফিরে এলাম আমরা।

সময় কারোর জন্য থেমে থাকে না।

আমি পরমার দুঃখী মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, চলো, এবার পুজোয় কলকাতা থেকে ঘুরে আসি। এক জায়গায় থেকে জীবনটা বড় একঘেয়ে হয়ে গেছে। কয়েকদিন ঘুরে আসলে তোমারও ভাল লাগবে।

পরমা আমার দিকে উদভ্রান্ত চোখ তুলে তাকাল। আমি লক্ষ্য করলাম ওর চোখে অশ্রুবাষ্প। ঠোঁটটা নড়ছিল ওকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করে। আমি গিয়ে ওর মাথায় হাতটা রাখতেই ঝাঁকা দেওয়া শিউলিগাছের মত পরমা টুপটুপিয়ে কাঁদল, আমি কোথাও যাবো না গো, আমার আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। আমি জানি, টিকলি আবার ফিরে আসবে। ও আমাকে ছেড়ে কোনদিনও থাকতে পারবে না। আমরা কলকাতায় চলে গেলে ও যদি এসে ফিরে যায়?

পুজোর ক'দিন ঘরে বসেই কাটিয়ে দিলাম। পরমার মন-মেজাজ ভাল নেই। একদিন সন্ধ্যায় ওকে আমি জোর করে নিয়ে গেলাম দুর্গা পুজোর প্যান্ডেলে। প্রবাস এলাকায় একটা মাত্র পুজো হয়েছে। মায়ের মুখদর্শন করে আমরা আবার ফিরে এলাম।

বিজয়ার দিন সকালবেলায় পরমা আমাকে বলল, আজ বড় টিকলির কথা মনে পড়ছে গো। এই দিনটাতে ও আমার লালপেড়ে গরদের শাড়িটা পরে কেমন ছোটাছুটি করত ঘরে। ওর ছেলেমানুষীপনা দেখে আমি কত হাসতাম। বলতাম, বড় হ, তোকেও এমন একটা শাড়ী কিনে দেব। বলেই সে ভেজা চোখটা মুছে নিল আঁচলে। আমার দিকে আশার চোখে তাকিয়ে সে মিনতি-মাখানো গলায় বলল, আজ তো তোমার ছুটি। একবার যাও না গো মেয়েটা আমার কেমন আছে দেখে আসো। তোমার তো মোটর সাইকেল আছে, ঝগড়ুদের গ্রামে যেতে বেশী সময় লাগবে না।

আমি রাজি হলাম, তাহলে তুমিও চলো। এক সাথে দু'জনেই ঘুরে আসি। তুমিও অনেকদিন ওকে দেখোনি। তোমারও একবার চোখের দেখা হয়ে যাবে।

পরমা মুখ ঘুরিয়ে নিল অন্যদিকে। আবদ্ধ কান্নায় থমথম করছিল ওর ফর্সা সুন্দর মুখটা। আমার হাতে একটা প্যাকেট ধরিয়ে দিয়ে বলল, আমি যাবো না গো। আমি গেলে টিকলি আমাকে কিছুতেই ছাড়বে না। তুমি যাও। আমার হয়ে এই প্যাকেটটা তুমি ওকে দিয়ে দিও।

আমি বিস্মিত স্বরে শুধোলাম, কি আছে ওতে?

পরমা বলল, সেই লালপেড়ে শাড়িটা। আজকের দিনে টিকলি এই শাড়িটা পরতে ভালবাসত।

পরমার চোখের দিকে তাকিয়ে নিমেষে ভিজে গেল আমার চোখ দুটো। আমি ওকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, তুমি চিন্তা করো না। আমি ওর কুশল সংবাদ তোমাকে এনে দেব।

তৈরী হয়ে আমি যখন বাইরে এলাম তখন দেখি থানার সেই জিপ গাড়িটা এসে আমাদের গেটের সামনে দাঁড়াল। ড্রাইভার ঘন ঘন হর্ণ দিয়ে সজাগ করতে চাইলো আমাকে। আজকের দিনে থানার গাড়িটা দেখে আমি বেশ ঘাবড়ে গেলাম। থানা মানেই আমার কাছে এখন একটা ভীতির ব্যাপার। পুলিশ-দারোগা দেখলেই আমি তাদের এখন এড়িয়ে চলি। গাড়ির হর্ণ শুনে পরমাও ছুটে এসেছে উদ্বিগ্ন পায়ে। আমাকে বলল, দেখো তো, কে এল আবার?

আমি ভীতু পায়ে এগিয়ে গেলাম জিপের দিকে। ড্রাইভার মানুষটি সজ্জন, তিনি শান্ত স্বরে বললেন, আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। আপনাকে এক্ষুণি একবার থানায় যেতে হবে। বড়বাবু ডেকে পাঠিয়েছেন। খুব জরুরী দরকার।

— কেন? আমার গলাটা অস্বাভাবিক রকমে কেঁপে গেল। ড্রাইভার আমার দিকে সাবধানী চোখে তাকিয়ে শুধোলেন, টিকলি আপনাদের কে হয়?

আমি কাঁপা গলায় বললাম, ও আমাদের মেয়ের মত।

পরমা সন্তুষ্ট হলো আমার উত্তরে। সে এগিয়ে এসে আগ্রহভরে বলল, সে আমাদের মেয়ের মতো নয়, সে হলো আমাদের মেয়ে। আমাদের আশা-ভরসা-স্বপ্ন। কেন কি হয়েছে ওর?

ড্রাইভার ঢোক গিলে এড়িয়ে গেলেন প্রশ্নটা, না, তেমন কিছু নয়। টিকলি তার স্বামীর সাথে থানায় এসেছে। আপনারা এক্ষুনি চলুন। দেখা হয়ে যাবে।

থানায় পৌঁছতেই আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। পরমা কেমন ঘাবড়ে গিয়ে আমার হাতটা শক্ত করে চেপে ধরল। ওর মুখে কোন কথা নেই, আমিও রীতিমতন বোবা। আমাদের দেখতে পেয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলেন দারোগাবাবু। তার অন্যমনস্ক চোখ, আঙুল কামড়াচ্ছিলেন আপন খেয়ালে। মাথা থেকে টুপিটা খুলে মার্জিত স্বরে বললেন, সরি, আপনাদের বিরক্ত করতে হলো। আপনাদের মেয়ে টিকলি মানে 'পালো' সে একটা বড় অঘটন ঘটিয়ে ফেলেছে। মেয়েটার মধ্যে যে এত তেজ ছিল তা আমি আগে বুঝতে পারিনি। যদি বুঝতে বুঝতে পারতাম তাহলে আমি ঐ লম্পটটার হাতে মেয়েটা তুলে দিতাম না। দারোগাবাবুর কথায় চাপা হেঁয়ালীর সুর। আমি থাকতে না পেরে বললাম, টিকলি কোথায়, ওকে তো দেখছি না?

দারোগাবাবু আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন থানার পিছনের মাঠটাতে। আমি দেখলাম, একটা চারা আমগাছের নিচে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে ঝগড়ু। শোকে পাথর তার শরীর। আমাকে দেখে সে চুল চেপে ডুকরে উঠল কান্নায়, বাবু গো, সর্বনাশ হিচে। জোর খাটাতে গিয়ে মুই টিকলিকে হারিইলাম। সে বড় জিদ্দি মায়াঝি গো! সে মুখিয়াকে মারচে, তার ছুয়াটাকেও মারলা। ওটে টাঙ্গি দিয়ে সে দু'দুটা মানুষ খুন করলা! তারপর, নিজেও গলায় ফাঁস ঝুলিয়ে মরলা।

একই ভ্যান-রিকসায় পাশাপাশি শোওয়ানো ছিল তিনটে মৃতদেহ। পরমা যখন টিকলির বুকে আছাড় দিয়ে কাঁদছিল তখনই বিসর্জনের জন্য মা দুর্গাকে নিয়ে ক্লাবের ছেলেরা গেল নদীর দিকে। আমি ঝাপসা চোখে দেখলাম, অসুর নিধনকারী মা দুর্গার সাথে আমাদের টিকলির কোন অমিল নেই। সেই লালপেড়ে গরদের শাড়িটা টিকলির উপর সযত্নে বিছিয়ে দিয়ে পরমা কোলপাঁজা করে নামিয়ে আনল তাকে। তারপর সযত্নে শুইয়ে দিল মাটিতে। রাগে তখনো দপদপ করছিল ওর চোখ। দারোগাবাবু তাকে বাধা দিতে গেলে পরমা সক্রোধে বলল, আপনিই বলুন, ঐ পাপীগুলোর পাশে আমাদের টিকলিকে কি মানায়? ও মাটির মেয়ে, ওকে আমি মাটিতেই শুইয়ে দিলাম।

রক্ত

রাতে কেউ কারোর মুখ দেখতে পায় না, শুধু মাজায় বাড়ি খাওয়া সাপের মত গর্জায়। অনেক রাতে হাওয়া থেমে গেলে এক খন্ড সাদা মেঘ ঝুলে থাকে আকাশে। অবিকল সাদা বেড়াল ছানার মত হেঁটে যায় চাঁদের কাছাকাছি, যেন চাঁদকে খাবলা মেরে সে ছুটে পালিয়ে যাবে অন্যত্র। ছাইবর্ণ মেঘটাও কম যায় না! স্বাতী-নক্ষত্রদের পাশ কাটিয়ে সেও ছুঁতে চায় চাঁদকে। একসময় মেঘে-মেঘে প্রবল সংঘর্ষ, বিদ্যুৎ খেলে বেড়ায় আকাশে। কুলগাছের কাঁটা ডালে তারস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে সদ্য ডিম ফোটা পাখির ছানাটা। হয়তো ক্ষিদেয় তার ঘুম ভেঙে গেছে নয়তো বিদ্যুৎ-এর পিলে চমকানো আওয়াজে।

কামিনীর ঘুম আসেনি, দাওয়ায় খেজুরপাতার মাদুরে সে ছটফট করে। এত বড় রাতে চোখে এক ফোঁটা ঘুম নেই। পেটের শত্রু দুটোও ঘুমায়নি। তারাও ঠায় জেগে আছে। দু'জনের মুখ দু'দিকে। যেন কেউ কাউকে চেনে না, দু'জনেই দু'জনার জন্মশত্রু।

তাদের মধ্যে বড়টার নাম মাধব। ছোটটার নাম যাদব। ওরা দুই ভাই। কামিনীর গর্ভের সন্তান। অথচ এখন কেউ কাউকে চেনে না। ছোটটার দোকান আছে রেল ইস্টিশানের বাজারটায়। দোকানটায় বিক্রিবাটা নেহাৎ কম নয়। তবু তার টাকার খাঁই মেটে না। দোকানটাকে সে সার্সি আয়নায় সাজাতে চায়। দোকান ভরে থাকবে রঙ-বেরঙের ছবিতে। যে দেখবে তাক লেগে যাবে তার। পান খেতে এসে চুল আঁচড়াবে বাবুভাইরা। সিনেমার ছবিগুলো দেখে চোখটা ফেরাতে পারবে না কিছুতে। এরপরেও আর একটা মোক্ষম জিনিষ চাই তার, সেটা হল—টেপ-রেকর্ডার। আজকাল টেপরেকর্ডার না হলে পান-দোকান জমে না। দোকানের ইজ্জোত বলতেই হিন্দি গান। এসব কোনটাও নেই যাদবের। থাকবে যে টাকা কোথায়? টাকা গাছের পাকা কুল নয় যে ঝাড়া দিলেই টুপটুপ করে পড়বে। তাই সে ঘর এসেছে মাকে পটাতে। মাকে পটালে বাপও পটে। মা যদি কান হয়, বাপ হলো মাথা। কান ধরলে কি মাথা আসে না? কিন্তু ঘরে এসে তার অসুরের রাগ। ড্যাবড্যাবানো চোখে সে দেখছে দোরগোড়ায় বসে আছে মাধব। তার হাতখানিক তফাৎ-এ একটা মিষ্টির হাঁড়ি। চিকচিকি ঠোঙায় আপেল-আঙ্গুর। একটা বড় সাইজের বেদানাও আছে। প্রথম দর্শনেই তাকে হারিয়ে দেয় মাধব। দাদার কাছে ছোটবেলায় ড্যাং-গুলি খেলায় কতবার হেরেছে। এই বয়সে হারলে শুধু খচখচ করে বুক। সুখের বদলে শুধু অসুখ ঢেকুর। গা-হাত-পা চুলকায়। মনটা কেন্নোর মত গুটিয়ে থাকে। দাদার কাছে হেরে গেলে সবার কাছে হেরে যাওয়া হয়। মাধবের বউ হলো লীলা, তার লীলা একমাত্র মাধবই বোঝে। যাদবের বৌ শীলা। তার মন শীলপাথরের চেয়েও শক্ত। যাদব এত কড়া ধাতের মানুষ তবু বৌ-এর কাছে সে জব্দ। ঠেলেঠুলে গুঁতোগাতা দিয়ে সেই বউই পাঠিয়ে দিল তাকে জোর করে।

শীলার মুখটা বাঁশপাতার মত লম্বা। নাকটা মুখের তুলনায় ছোট, চোখা নয়—লক্ষ্মী বোঁচা। সে যখন কথা বলে তখন নাসিকা গহ্বরে বাতাস স্বচ্ছন্দে খেলে বেড়ায় না। তার নাকজড়ানো খোনা কথাগুলোয় বিষমাখা। কথা বলার সময় তার চোখমুখ আশ্চর্যরকমভাবে বেঁকে যায়। মনে হয়, টিটিনাস রোগী। সেই শীলা পাথর চোখে তাকিয়ে ধমকের ঝ্যানঝ্যানে স্বর ছড়িয়ে বলেছিল, যাও না কেন, এখন না গেলে কখন যাবা? তুমার বাপ আর ক'দিন বাঁচবে? এই সময় পাশে গিয়ে দাঁড়াও। শেষবলায় যদি কিছু দয়া করে দিয়ে যায়। কুড়িয়ে পাওয়া ধন লক্ষ্মী গো, অবহেলা করলে ঠকবা।

যে বাপকে জ্ঞানপড়ার পর থেকে পুছে দেখেনি তার শেষ সময়ে পাশে গিয়ে দাঁড়াতে সঙ্কোচ হচ্ছিল যাদবের কিন্তু শীলার অগ্নি চোখের দিকে তাকিয়ে তার বুকের সাহসটা পাট ফেঁসোর মত পুড়ে গেল। শীলা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছিল, হাজার হোক তুমি তার সন্তান। সন্তান যদি দোষ করে বাপ কি তা মনে রাখে গো? যাও না, খপখপ যাও। ভাগের সময় না গেলে তুমাকে ওরা ভাগিয়ে দেবে। তুমার বড়দা তো একটা চীজ। মা খানাও ধান্দাবাজ। আর আমার ননদ, সে তো খালি প্রসাদ পাওয়ার জন্য হাঁড়ি-খাওয়া কুকুরের মত ছুকছুকিয়ে মরছে। সময় মত না গেলে তুমার হাতে ওরা একটা কাঁচকলা গুঁজে দেবে। তুমি চুসতে চুসতে ঘরে ফিরে আসবা। এ যুগে মা বাপ ভাই বোন কেউ কারোর নয়। পচা পান দিয়ে কি পান বানানো যায় গো?

শীলা যে এত হিসেবী, বুদ্ধিমতী তা আগে জানত না যাদব। যখন সে দশটা টাকা চাইল ফল-মূল কেনার জন্য তখন মুখ ভার করে বেঁকে বসল শীলা। তবু সেই বিচিত্র দর্শন মুখের দিকে তাকিয়ে কাচুমাচু গলায় যাদব বলেছিল, বাপটার অসুখ। এই অবস্থায় কি খালি হাতে যাওয়া যায়? লোক শুনলে যা-তা বলবে। হাজার হোক আমার একটা ইনকাম আছে।

—কি আমার ঘোড়ার ডিমের ইনকাম! যে হাতে তুমি খয়ের মাখো, সে হাত সাফা করতে সাবান জোটে না, তার আবার বড় বড় ফুটানীর কথা। আমার দিকে দেখো, শাড়ির বয়স এক বছর, ব্লাউজের বয়স দেড়। পায়ে একটা চামড়ার চটি নেই, প্লাস্টিকের চটি পরে পরে পা'টা আমার পাঁচড়ার দাগে ভরে গেল। গায়ে মাখার জন্য একটা বাস সাবান পাইনে। বাসতেল সেই বিয়ের দিন মেখেছিলাম। এই তো তুমার ইনকাম! এই ইনকামে ফল নিয়ে গেলে লোকে হাসবে।

দশ টাকা নয়, আপ-ডাউন বাস ভাড়া চার টাকা, সেই সঙ্গে জলপানি হাত খরচ সর্বসাকুল্যে আরো এক টাকা। একটা পাঁচ টাকার নোট পকেটে পুরে সটান বাসস্ট্যান্ড অব্দি ছুটে এসেছিল যাদব। ছুটে এসে নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছিল সে। শীলা দোকান সামলাবে। সে যখন দোকানে বসে ইচ্ছে করেই বুকের কাপড় ফেলে দেয় তখন তার দোকানে বিক্রিবাটা ভালই হয়। ছেলেছোকরার ভিড় হয় বেশী। লোফার মাতাল ঠগ জুচ্চোর কেউ আর বাদ যায় না। শীলা যখন চুনের সাথে খয়ের মেশায় তখন তার দেহলতা হাওয়া লাগা শিমডগার মত নড়ে। শরীরের মাংসল অংশগুলো ঝাঁকুনিতে দৃশ্যমান হয়। তখন দু' খিলির জায়গায় চার খিলি পান খেলেও কারোর গায়ে লাগে না। এ জগতে

প্রায় মানুষই সার্কাস দেখতে ভালোবাসে আর যারা সার্কাস দেখাতে পারে তারাও আদৃত হয় চাটনীর মত।

যাদবের আর ফল আনা হয়নি। স্ত্রী বশীভূত মানুষ মাকাল ফল নয়, পাঁকাল মাছ নয়, বিছুটির ঝোপ নয়— খচ্চড়ের খচ্চড়— এক কথায় অনবদ্য ম্যাড়া। ভেড়ার স্বভাবের সাথে তাদের স্বভাবের খুব একটা অমিল নেই। যাদব এসেছে খালি হাতে, মাধব এসেছে ফল নিয়ে। এখানেই মাধব তার থেকে এক ধাপ এগিয়ে। তার উপরে মাধব হলো পিতা—মাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। জ্যেষ্ঠ সন্তানের উপর বাবা-মায়ের দয়া-মায়া কিংবদন্তী স্বরূপ। বাপ-মা মরলেই বড় ছেলে মুখাগ্নি করে, লাশের দখল বড় ছেলেরই জন্মগত অধিকার। যে সৎকার করে তার সৎ অধিকার দিনের আলোর চেয়েও স্পষ্ট, তার দাবী খুব সহজে নস্যাৎ করে দেওয়া যায় না। ছোট বা মেজোর দাবী যদি পাকাটি হয় তাহলে বড়র দাবী কঞ্চি যা সহজে ভাঙে না, আর ভাঙলেও প্রথমে মচকায়, তারপর বারংবার মচকাতে মচকাতে এক সময় ভেঙে যায়। যাদব তাই সঙ্গত কারণে আর জন্মভিটায় পা দিয়ে বিব্রতবোধ করে, অসহায় বিপন্নতার ছাপ তার সারা মুখে ঘাম নুনের মত ফুটে ওঠে। স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করলেও সে স্বাভাবিক হতে পারে না। পায়ে যদি কাঁটা ঢোকে তাহলে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয়। বুকে যদি কাঁটা ঢোকে তাহলে শত ডাক্তারে মিলে তা বের করতে পারে না। যে কাঁটা বের করা যায় না সেই কাঁটার দংশনে জ্বলতে থাকে যাদব। তার গোলগাল মুখে ছায়া পড়ে দুর্ভাবনার। চোখ কুঁচকে মুখটা ছোট হয়ে আসে। চোখের দৃষ্টিশক্তিও সংকীর্ণ হয়। মুখটা দুঃখী, অম্বলপিত্তর রুগীর মত শুকিয়ে আমচুর হয়। তখন তাকে যদি কেউ সান্ত্বনা জানায় তাহলে তাকে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া বলে। মাধব সেয়ানা ছেলে, এই পঁয়ত্রিশ বছরে তার মাথার চুল পেকেছে, চেহারাটা ঝানু নারকেল। খেজুরের শুকনো ডালের মত তার ব্যবহার। একটু বেকায়দা হলে কেবলই কাঁটার আঘাত। ছোট ভাই যাদবকে দেখে সে আদৌ সুখী হয় না, তার মুখের ভাবটা এমন যেন কেউ জোর করে তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে। মাধব এসেছে আগে, তখন ফুরফুরে রোদ, ফড়িংগুলো পেছন নাচিয়ে উড়ছিল আকাশময়। ধানের ক্ষেতে সোনালী খড়ের মাজা নোয়ানো দৃশ্য। ধানের শিষে শরৎকালের রোদ, রেল লাইনের ধারে ধারে কাশফুলের দোলা। আর পুটুস ঝোপে মশার গানের শেষ নেই! থোকা থোকা বহুবর্ণ ফুলের দিকে তাকিয়ে জলে লাফিয়ে ওঠে রুই মাছের মত সুখ ঘাই দিয়েছে মনে তার। যদি বাপকে সে বাগে আনতে পারে তাহলে তো কথাই নেই, এক লাফে এক কাঁদি পাওয়ার মত অবস্থা। তার লীলা, লোকে তাকে বলে লাজবতী। কেউ তাকে বলে সাজবতী, কেননা সে বড় সাজতে ভালবাসে। তিন ছেলের মা, অথচ কিশোরীপনা এখনো ভুলতে পারেনি। বাস্তুসাপের বিলম্বে খোলস ছাড়ার মত অবস্থা। ফেরিওলার কাছে থেকে এই গেল হপ্তায় মাধব তাকে একটা নাইটি কিনে দিয়েছে কিস্তিতে। সেই নাইটি পরে দিনের বেলাতেও লীলা ঘোরে শরীরে অবাঞ্ছিত লালিত্য ফুটিয়ে। রেল লাইনের ধারে, খাপরার ঘরে তারা ভাড়া থাকে ষাট টাকায়। জল বইতে হয় রেলের পাম্প-হাউস থেকে। তখন তার পায়ে থাকে ফটফটে আওয়াজ তোলা চটি, হাতে পলিথিনের বালতি। এক বালতি জল আনতেই

তার দেহ কাঠামো ঠেকো দেওয়া কলাগাছ। ফি-হপ্তায় তার ডাক্তার চাই, সিনেমা হলে একটা বই দেখা চাই, নির্জলা সন্তোষী মায়ের উপোষ চাই, এরকম অনেক 'চাই' নিয়ে লীলাবতীর অতৃপ্ত ভুখা হৃদয়। মাধব তার কাছে ছেলেমানুষ, হাতের পুতুল, দম দেওয়া উড়োজাহাজ। বেশী ত্যাড়াবাঁকা কথা বললে লীলা তাকে তুড়ি মেরে, তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দেয়। তার খুব বাপের বাড়ির গর্ব। তার দাদা মালগাড়ি থেকে কয়লা নামায় হাবিলদারের সাথে সাট করে। তার বাবা হলো মদমাষ্টার, সকালে দাঁত মাজে মদ দিয়ে। তার মা তিনশ জর্দা আর গুন্ডি দেওয়া পান খায়। এহেন সংসারে যার জন্ম সে কখনো পরাধীন ভাবে বাঁচতে পারে? পাড়ার ছেলেরা তাকে ভালোবেসে বলে ডাসা পেয়ারা। আসলে সে কচি বেল। কেননা তার গায়ের রংটা পেয়ারার নয়—কিছুটা সবুজাভ কচি বেলের মতই।

লীলা বলতো, আমি শ্যামলা নইগো, আমি হলাম কাচবর্ণ। আমার মনটাও কাচের মত ফরসা। সে মিথ্যা বলে না, মাধব তা জানে। লীলার মন কাচ নয়, ঘষা কাচ। কাছ থেকে তাকে চেনা যায় না। সে হলো বহুরূপী গিরগিটি। ক্ষণে রুষ্ট, ক্ষণে তুষ্ট। কখনো নীল কখনো বা লাল, কখনো বা কালো। তার কালো মুখ অবিকল পেঁচার মত দেখায়। সে পেঁচা মুখ নাড়িয়ে সে মাধবের মনে বিষ ঢুকাল। বলল, তোমার বাবা কেবল যাদবের একার নয়। তোমরা দুই ভাই। সম্পত্তি যা থাকবে তার ভাগ আধা আধি। তা বলে, আমি কুড়ুল দিয়ে চিরতে বলছি না, আমি বলছি হকের জিনিস ছাড়বে কেন, হক ছাড়লে রকে বসবে। তখন মাথার চুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে টাক হবে। সেই টাকে হাত বুলিয়ে খুসকি খুঁটবে। আর সেই খুসকি চুলকে চাবড়া চাবড়া ঘা হবে। সেই ঘা থেকে যেদিন রক্ত-পুঁজ বেরোবে—সেদিন বুঝবে সংসার কি জিনিস, কত ধানে কত চাল হয়!

একরকম লীলাই তাকে জোর করে ঠেলে পাঠাল। বলল, যাও না, ঘরে তো বসেই আছো, ঘরে বসে তুমি তো কুঁজো হয়ে গেলে। অন্তত এই দুর্দিনে বাবার কাছে গিয়ে মাজাটা সোজা করে এসো। এই মাঝ বয়সে বাত ধরলে গলা দিয়ে যে ভাত নামবে না, চর্বি জমে ফুটোটাও বন্ধ হয়ে যাবে। তাই এখনো সময় আছে, বাবার সামনে গিয়ে মাথা হেঁট করে দাঁড়াও। বাবার দয়ার শরীর, সে তোমাকে খালি হাতে ফেরাবে না।

মাধব প্রতিবাদ করেছিল, বাবা যদি সব আমাদের দিয়ে দেয় তাহলে মায়ের কি হবে? এই বুড়ো বয়সে তাকে কে দেখবে?

—যার কেউ নেই তাকে তো ভগবান দেখে। আর ভগবান না দেখলে, রেললাইন দেখে। আর রেল লাইন না দেখলে ফলিডল দেখে। ফলিডল যদি বেইমানী করে তাহলে গরু বাঁধার রশিগুলো দেখে। তোমাদের সংসারে আয় না থাক, রশির তো কোন অভাব নেই। শক্ত দেখে একটা বেছে নিয়ে কড়িকাঠে ঝুলে পড়লেই হলো।

—ছিঃ, মায়ের সম্বন্ধে তুমি এমন ভাবতে পারলে? এই মায়ের জন্য আমি পৃথিবীর আলো দেখেছি। এই মা না থাকলে আমি তো আঁতুড়ঘরেই মরে যেতাম। এই মায়ের জন্যি আজ আমি তোমার পাশে হেসে হেসে কথা বলছি।

—মা, মা করো না তো? অমন মা সবার আছে। কিন্তু তোমার মা সবার থেকে

আলাদা। অমন মন্থরা, কুঁজী বুড়ি আমার জীবনে দেখিনি। ওর মুখ দেখলে সারাদিন আমার ভাত জোটে না।

লীলার কথায় চাবুকের সপাং সপাং আঘাত। মাধবের ঠোঁট দুটো কেউ যেন সেলাই ফুঁড়ে বুজিয়ে দিল। মেয়েমানুষ গলা চড়ালে মাইকও ফেল। হারা বাজিও তারা তখন জিতে যায়। তাদের চোখের জল সোনা গলানো অ্যাসিডের চেয়েও গাঢ় পুরুষের মন গলিয়ে লতলতে করে দেয়। মাধব হলো তেমন পুরুষ যে কিনা বউকে তারকা রাক্ষসী জ্ঞানে ভয় করে। আর সেই ভয়ে নাক কান বাঁচাতে জন্ম ভিটায় ছুটে এসেছে সে-ও।

কানন তাদের ছোট বোন। সেই তো শহরে গিয়ে খবর দিল, শনিবার বাবা ঘরে আসবে। দাদারে, তোরাও চল—যা আছে সব ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিয়ে নেবো। আমরা ছাড়া তো বাবার আর কেউ নেই। কানন ঘর ঘর গিয়ে খবর দিয়েছে। যাদব থাকে কুলী মহল্লায়। সেখানে সে দু'দিন থেকেছে। মাধবের কাছে তার খাতির যত্ন ভালই হয়, সেই জন্য বড়দার কাছে থেকেছে পাক্কা তিন দিন।

এখন একই বিছানায় বিপরীতে মুখ ঘুরিয়ে পিঠজোড় লাগা যমজ সন্তানের মত পড়ে আছে মাধব আর যাদব। কানন শুয়েছে তার মায়ের পাশে, তার তিনটে ছেলে-মেয়ে চালকুমড়োর মত ডাগর পেট নিয়ে ঘুমের ঘোরে সরতে সরতে দাওয়ার একেবারে শেষ দিকে। গভীর রাতের বাতাস গোমড়া মুখো। হয়ত মানুষের সাথে বাতাসও জেগে থাকে। এই গোমড়া মুখো বাতাসে শীত মিশে আছে বিষফোঁড়ার যন্ত্রণার হয়ে।

খাওয়ার সময় মায়ের সাথে একচোট হয়ে গেল যাদবের, সে বরাবরের একটু ছন্নছাড়া এবং একগুঁয়ে। সে যে রাগী দামড়া একদম ছোটবেলা থেকেই টের পেয়েছিল কামিনী। ছেলের কথায় তাই মুখ বুজে পড়েছিল কামিনী। ধৈর্য শক্তির একদম চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল সেও, যাদব ভাতের থালা সরিয়ে দিয়ে সরাসরি তার বাবাকে দোষারোপ করে বলেছিল, বাপ হলো একটা সেয়ানা শেয়াল। সে শুধু আমাদের জন্ম দিয়েই খালাস, বাপের কোন দায়িত্বই পালন করেননি। আমাদের চোখ ফুটল কিন্তু সে আমাদের হাইস্কুলে ভর্তি করলো না। আমরা বখে গেলাম। চোখ মুখ হাত পা সব ডাগর হলো কিন্তু তা কোন কাজে লাগল না। এখন আমি পান সিগ্রেট বেচি কিন্তু তাতে পেট চলে না। দোকানে বসে আমি কুঁজিয়ে গেলাম। যখন অফিসার বাবুরা আমার দোকানে পান সিগ্রেট খেতে আসে তখন আমি হাকরা বাছুরের মত তাকিয়ে থাকি। বাবা আমাদের মানুষও করেননি, বলদও করেননি। যদি বলদও হতাম তাহলে লাঙ্গল টেনে জীবনটা আমার ধন্য হতো। এখন না হয়েছি বলদ না হয়েছি মানুষ—কোন কিছু হতে পারিনি বলেই জীবনটা বিষিয়ে গেল।

যাদবের কথায় নড়েচড়ে বসেছিল মাধব। এই বয়সে তার মাথার চুল পাতলা। রাতে ঘুম হয় না দুশ্চিন্তায়। তার বড় মেয়ের বয়স এখন ১৩, আর পাঁচ বছর পরেই মেয়েটা বিয়ের যোগ্যতা পেয়ে যাবে। সে বেশ ভারিক্কী গলায় বলেছিল, যাদবের কথাই ঠিক। বাবা যদি সময় মতো পাঁচনের ঘা দিয়ে কান লাল করে ইস্কুলে পাঠাত তাহলে আজ আমাদের এমন দশা হতো না। আমাদের এই দুর্ভাগ্যের জন্য বাবাকেই আমি দায়ী করি।

বাবা বরাবরের তালকানা। দায়িত্বহীন মানুষ। জীবনভর যা কামিয়েছে তাতে শুধু পেট পুজোই হলো। ফলে, আমরা এক একটা ছাগল হলাম, কেউ আর মানুষই হলাম না!

—ছাগল হলেও তো কাজে লাগত। বাজারে মাংস হয়ে বিকোতাম। আমরা ছাগল নয়, কাক। এযুগে কাক ছাড়া কাকের মাংস কেউ খায় না। যাদব প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল মাধবের কথায়। কামিনী তার পাকা চুলের মরা নিকি খুঁটে বলেছিল, যত দোষ সব তোর বাবার। তোরা সব ধোয়া তুলসী পাতা। পড়ার সময় পড়লি না, ডাং-গুলি খেলে বেড়ালি। গোঁফে রেখা ফুটতেই যে যার একটা বিয়ে করে বসলি—এখন তোর বাবাকে দোষ দিয়ে কি হবে? দোষ দে অদৃষ্টকে। দোষ দে—তোদের ভেতরে যে পশুটা বসে গজরাচ্ছে তাকে। মিছিমিছি যে মানুষটা মরতে বসেছে—তাকে আর টানাটানি করে কষ্ট দিস না।

ঝগড়াটা চরমে উঠত কিন্তু কানন এসে মিটিয়ে দিল। তার বক্তব্য, বাবা যখন এখানে আসেনি তখন নিজেদের মধ্যে চুল ছেঁড়াছেঁড়ি করে কি হবে? তার চেয়ে রাত হয়েছে এবার যে যার মত খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়। ভোর ভোর উঠে যে যার কাজে চলে যা। বাবা আমাদের চেয়ে ঢের বেশী চালাক। আমরা যদি ডালে ডালে ঘুরি তাহলে বাবা ঘোরে পাতায় পাতায়। আমরা যদি পাতায় পাতায় ঘুরি তাহলে বাবা ঘোরে শিরায় শিরায়। সেই বুড়ো মানুষটা আমাদের তিনজনকেই হারিয়ে দিল। তার বুদ্ধির কাছে আমরা এখনো নাবালক।

কাননের কথা নেহাৎ উড়িয়ে দেবার মত নয়, তাই চুপ করে গিয়েছিল মাধব এবং যাদব। মাকে ছেড়ে দিয়ে তাদের যত রাগ পড়ল বাবার উপর। ঐ রোগা প্যাংলা মানুষটার বুদ্ধির কাছে তারা দুই ভাই দুটো ভেড়া ছাড়া আর কিছু নয়। অসুখটা আজ সাত বছর ধরে দেখা দিয়েছে নকুলের। প্রথমে কানের লতি লাল হয়, তারপরে নাক। হাত পায়ের আঙুলগুলো কুঁকড়ে যায় তারপরে। ঘা হয়, রস কাটে। সেই সংগে বেদনা। রেল হাসপাতালের ডাক্তার বলল, কুষ্ঠ হয়েছে। নিয়মিত ওষুধ খেলে সারবে। নকুল গোপনে ওষুধ খেয়েছে তবু রোগটা সারল না। জন্মের মত আঁকড়ে ধরল তাকে। তবু এই রোগজ্বালা নিয়ে ডিউটি যেত নকুল। কিন্তু ভাগ্য মন্দ হলে যা হয়, একদিন সে ধরা পড়ে গেল খোদ অফিসারের সামনে। মেমো লিখে মেডিকেলে পাঠানো হ'ল তাকে। ডাক্তার বললেন, যতদিন না রোগটা ভালো হয় ততদিন 'সিক'-এ থাকতে হবে তাকে।

কপালে না থাকলেক ঘি ঠকঠকালে হবে কি? ছ'মাস না ফুরোতেই ছুটি সব ফুরিয়ে বেতন কাটা গেল নকুলের। কপালে হাত দিয়ে কামিনী বলল, এবার কি হবে গো? বেতন না পেলে দিনগুলো যাবে কি করে?

নকুল বলল, ভাবিস নে। আমার দু'দুটো ছেলে। অসময়ে তারা নিশ্চয়ই আমাদের দেখবে?

অসময়ে সুখের পায়রা কখনো দুঃখের পায়রাদের খোঁজ-খবর নেয় না। সূর্য পূর্ব দিকে উঠল, পশ্চিম দিকে অস্ত গেল। গায়ে ঘা নিয়ে নকুল এখন নড়তে চড়তে পারে না। তার কাতরানী শুনে গ্রামবাসীরা সহানুভূতি জানাল না। উল্টে তারা হুকুম করল, গাঁ ছেড়ে চলে যেতে হবে। একটা মানুষের জন্য পুরো গাঁ কেন কুষ্ঠ গাঁয়ে পরিণত হবে। শত মানুষের

চাপের কাছে একটা মানুষ ফুৎ-করে উড়ে গেল। নকুল গ্রাম ছাড়ল, কিন্তু কামিনী থেকে গেল গ্রামের বাড়িতে। সারাদিন টো-টো করে ঘুরত নকুল, দুপুরে রেল লাইনের ধারে বটগাছটার ছায়ায় গোগ্রাসে গিলত ভাতগুলো। কামিনী বলত, গাঁয়ের জায়গা জমিন বেচে দিয়ে শহরপানে উঠে এসো। গাঁয়ের মানুষের মন বড় কুঁচুটে। ওরা তোমাকে রোগ ভাল না হওয়া পর্যন্ত গাঁয়ে ঢুকতে দেবে না। অতদিন কি করে আমি একলা থাকব? রাতকালে একা আমার বড় ভয় করে।

কামিনীকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা জানা ছিল না নকুলের। সে প্রায় রাতে লুকিয়ে গাঁয়ে ফিরত। দুর্ভাগ্যবশত একদিন ধরাও পড়ে গেল। সেদিন চেনা মানুষগুলো তাকে আর ক্ষমা করল না। মারধর করে আবার গ্রামের সীমানা পার করে দিল। তারপর থেকে ভুল করেও আর গাঁয়ের ফেরার কথা বলত না কামিনী। মানুষ না ঠকলে শেখে না। যতদিন বাঁচা ততদিন শেখা। নকুল আক্ষেপ করে করে বলল, আর আসব না বউ, মরি তো পথেই মরব। পথই আমার আসল জায়গা। ভেবেছিলাম, ছেলে দুটো আমার ডান হাত বাঁ হাত। এখন দেখছি, সেই হাত দুটোতেও আমার কুষ্ঠ হয়েছে।

মাধব যাদব এবং কানন তিন জনের উদ্দেশ্য ভিন্ন হলেও তাদের অজ্ঞাত দাবী প্রায় একইরকম। মাধব চায় তার বাবার চাকরিটা, যাদব চায় টাকা আর কাননও তার মন্দ ভাগ্যকে ফেরাতে চায় বাবার কৃপায়। সেবা করার সুযোগ থেকে ওরা তিনজনেই বঞ্চিত। নকুল এদের হাড়ে হাড়ে চেনে। এরা গাছেরও খায়, তলারও কুড়োয়। তারপর পাতা ফুটো করে পালিয়ে যায়।

অসুখের জ্বালা মানুষ সহ্য করতে পারে কিন্তু মানসিক সংঘাতকে মানুষ এড়িয়ে যেতে পারে না। যতদিন যাচ্ছিল ততই ভেঙে পড়ছিল নকুল। তার শরীর স্বাস্থ্য মন কোনটাই আর আর আগের মত ঝরঝরে স্ফূর্তিবাজ ছিল না। গ্রাম থেকে বিতাড়িত হবার পরেই সে হয়ে উঠল এক ভবঘুরে মানুষ। চাল নেই, চুলো নেই, দায় নেই, বন্ধন নেই এমন এক ন্যালা ক্ষ্যাপা মানুষ। কামিনী গামছায় করে ভাত বেঁধে আনত তার জন্য। সেই ভাতে হাত ডুবিয়ে কখনো ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেঁদে উঠত নকুল। তার সেই হৃদয়স্পর্শী কান্না দেখে কামিনীর চোখেও জল আসত। আঁচলে মুখ ঢেকে ডুকরে উঠত বুড়িটা। দৃষ্টিকটু ক্ষতগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাঙা মনে ঝিম ধরে বসে থাকত সে। নকুল তাকে আশ্বস্ত করে বলত, রোগজ্বালা নিয়ে এই মনুষ্য শরীর, রোগ জ্বালাকে আমি তাই ভয় পাইনে। মরণ আমাকে ছাড়বে না এতো আমি জানি। তারজন্যও আমার কোন চিন্তা নেই। আমার কেবল একটাই চিন্তা—আমি মরে গেলে তোর কি হবে, কে তোকে দেখবে?

নকুলের এই দুশ্চিন্তা মন গড়া নয়। নিজের চাকরিটা কামিনীর নামে লিখিয়ে দেওয়ার অনেক চেষ্টা করেছিল সে। কিন্তু বাবুরা তাতে রাজি হয়নি। বাবুদের যুক্তিকে সে খন্ডন করতে না পেরে কপাল চাপড়ে ফিরে এসেছে। কামিনীর চাকরি না হবার সংবাদটা ছেলেরা কি ভাবে জেনে যায়, সেই থেকে ওরা পিছনে লেগে আছে নকুলের। জান থাকতে নকুল ও ভুল কখনো করবে না, সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ছেলেদের থেকে পালিয়ে বেড়ানো এখন নকুলের একটা বড় কাজ। আগে সে সাহেবমাঠে ঘুরঘুর করত কিন্তু সেখানে একদিন মাধবকে

দেখতে পেয়ে সে বড় বেকায়দায় পড়ে গেল। মাধব তাকে জিলিপি, মুড়ি আর এক পুরিয়া খৈনী এনে দিল। কাকুতি মিনতি করে বলল, বাবা তোমার তো এখন যাওয়ার সময়— এই যাওয়ার বেলায় আমাকে একটু দেখো। তিনটে ছানাপুনে নিয়ে আমার সংসার চলে না। প্রায় দিনই উপোস দিতে হয়। তোমার চাকরিটা যদি আমার নামে লিখে দিতে খেয়ে পরে বাঁচতাম। মাধবের কথা এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বের করে দিল নকুল। ছেলে মেয়ের কথায় আজকাল তার মনে শ্যাওলা জমে না। সে নির্বিকার, উদাসীন। জীবনের প্রতি তার আর মোহ নেই। কাঁদি কেটে নেওয়া কলাগাছের মত তার বেঁচে থাকা। এই অর্থহীন বেঁচে থাকার কি দাম?

যাদব তাকে একদিন আবিষ্কার করল রেল লাইনের ধারে। নকুল চট বিছিয়ে পথচারীর কাছ থেকে ভিক্ষা চাইছিল খুবলানো শরীর দেখিয়ে। ভিক্ষাবৃত্তি তার পেশা নয়। কিন্তু একটা কাজের মধ্যে থাকা যায় বলেই সে ভিক্ষাবৃত্তির আশ্রয় নিয়েছে। তাকে ঐ অবস্থায় দেখে কিছুটা সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল যাদব। পরে সামলে নিল নিজেকে। নকুলের খেয়ো হাতটা ধরে সে নায়কোচিত গলায় বলেছিল, আমরা বেঁচে থাকতে তুমি ভিক্ষে করবে— এটা কখনো হতে দেব না। চলো, আজকেই তোমাকে ঘরে নিয়ে যাবো। আমরা যদি নুন-ভাত খেয়ে বাঁচি তো—তুমিও নুন-ভাত খেয়ে বেঁচে থাকবে। তুমি লোকের কাছে হাত পাতলে আমরা ছোট হয়ে যাবো। সবাই আমাদের মুখে থুতু দেবে।

যাদবের ঘরে মাত্র দু'রাতও টিকতে পারেনি নকুল। ফি-কথায় যাদব টাকা পয়সা আর চাকরিটা কিভাবে বাগানো যায় এই নিয়ে উত্যক্ত করেছে তাকে। অবশেষে একদিন ভোরবেলায় যাদবের বাসা থেকে পালিয়ে এল সে। যে সুখের গায়ে স্বার্থের পিঁপড়ে হাঁটে সেই সুখ তার দরকার নেই।

বাপ মরলে ছেলেরা তার চাকরি পাবে এই লোভে মাধব যাদব দু'জন দু'জনের শত্রু। দেখা হলে তারা একে অন্যের কুশল সংবাদ পর্যন্ত নেয় না। পাশ কাটিয়ে, মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। সারাদিন তারা হন্যে হয়ে নকুলকে খোঁজে।

কামিনী তাদের দুঃখ করে বলেছিল, তোদের বাপের শরীর ভালো নাই। সে আর হপ্তাখানিক টিকবে কিনা সন্দেহ আছে। কথাগুলো শেষ করেই কান্নায় ভেঙে পড়েছিল কামিনী। ছেলেরা তার হাতে একটা করে টাকা গুঁজে দিয়ে আর কাল বিলম্ব করেনি। মরার আগে বাবাকে যে করেই হোক ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলতে হবে। মৃত্যুর পরে ইউনিয়নের দু'চারজন লোক ডেকে এনে বুক ভাসিয়ে কাঁদলেই কারোর সাধ্য নেই যে চাকরি রোখে। সেই চেষ্টায় মাধব-যাদব পাগল।

একদিন ধোপার মাঠের নিকষ আঁধারে নকুলকে খুঁজতে এসে মাথা ঠুকে গেল মাধব আর যাদবের। সেই প্রস্তর কঠিন অন্ধকারে দেশলাই জ্বেলে দু'জন দু'জনকে দেখল। আঁতকে উঠে পিছিয়ে গেল ক'পা। যাদব অবাক গলায় শুধোল, দাদা, তুই—এত রাতে?

মাধব ম্রিয়মান স্বরে বলল, এই এসেছিলাম একটু ঘুরতে। তা, তোর খবর কি? অন্ধকারে কি করছিস?

মাধব তুড়ি মেরে ক্লান্তি দূর করে বলল, কি আর করব, যা গরম—হাওয়া খাচ্ছিলাম।

সামান্য কথাবার্তার পর আবার দু'জনে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল দুদিকে। প্রগাঢ় অন্ধকারে, অর্জুন গাছের নীচে ছেলেদের কথাগুলো কানে গিয়েছিল নকুলের। ঐ নিকষ ঘন অন্ধকারে ছাতা ধরা দাঁত দেখিয়ে কেমন খিলখিল শব্দে হেসে উঠেছিল সে। ভ্যাপসা গরমে তার ঘাওলো থেকে রস চুঁয়াচ্ছিল অনবরত। অসহ্য বেদনায় এক সময় স্তব্ধ হয়ে গেল তার হাসি। শুকনো গলাটা একবিন্দু জলের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল পলকে। ধোপার মাঠের পাশ দিয়ে করপোরেশনের ড্রেন। দিনের বেলায় বহুবার ড্রেনটাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করেছে নকুল কিন্তু কোনদিনও পারেনি। চাপ চাপ অন্ধকারে সেই ড্রেনের দিকে এক বুক পিপাসা নিয়ে এগিয়ে গেল সে। কিছুটা গিয়ে সে আর হাঁটতে পারছিল না, অস্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল জলের শব্দ। সেই নোংরা, কিলবিল পোকা ভর্তি জল তাকে ডাকছিল নীরব হাতছানিতে। তার ডাক অপ্রতিরোধ্য। দুর্নিবার।

সকালে ধোপারা যখন কাপড় শুকাতে মাঠে এল তখন বেশ ফুটফুটে রোদ সর্বত্র। মৃত নকুলকে তারাই টেনে তুলল ড্রেন থেকে। সৎকার সমিতির গাড়িটা এসে কাঠ হয়ে যাওয়া নকুলের লাশটার দখল নিল। গাড়িতে তোলার আগে তারা খুলে ফেলে দিল নকুলেব রক্তমাখা ধুতিটা। তারপর সাদা ধবধবে কাপড়ে ঢেকে নিয়ে গেল নকুলের ঘা-পুঁজ ভর্তি দেহটা।

দুপুরে গামছায় ভাত বেঁধে নিয়ে কামিনী বুড়ি যখন গ্রাম থেকে এল তখন ঢোল-কলমী গাছে আটকে গিয়ে পতপত করে উড়ছিল নকুলের রক্ত-পুঁজ মাখা ধুতিটা। সব শুনে বুড়ি বুক ভাসিয়ে কাঁদল।

মাধব যাদব এলো তারও অনেক পরে। তাদের হন্তদন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে নির্বাক বুড়ি বুকের জল ভাসল না। শুধু কঠিন চোখে তাকাল। তার বয়স্ক ঠোঁটের কোণে তাচ্ছিল্য আর অবজ্ঞার হাসি।

দুপুরের চড়া রোদে কলকল করে ঘামছিল মাধব আর যাদব। অর্জুনগাছের ডালে একটা কাক ডাকতে ডাকতে মুখে রক্ত তুলছিল এক নাগাড়ে। সে দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে মাধব যাদব প্রায় একই গলায় শুধোল, বাবা কি কিছু রেখে যায় নি?

বুড়ি ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

তারপর সে সমান দুটো টুকরো করলো ধুতিটার। দু'ছেলের হাতে সেই রক্ত-পুঁজ মাখা ধুতিটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, এই নিয়ে তোরা সুখী হ বাপ। অর্থের চেয়ে রক্ত বড়। আর সেই রক্তই তোদের জন্য রেখে গিয়েছে তোদের বাবা। তোরা যে রক্তের ঋণ এইভাবে চুকাবি সেই মানুষটা কোনদিনও ভাবেনি। চোখে যদি জল থাকে তাহলে দুই ভাইয়ে মিলে বুক চাপড়ে কাঁদ। তোর বাপ ঐ অর্জুনগাছের ছায়ায় বসে কাঁদত। তোদের চোখের জলে সেই মানুষটা যদি শান্তি পায় তো পাক।

নাগর

সুধাদাস রসের নাগর।

খেরি বলেছিল, তুমায় দেখলে আমার দিন ভাল যায় গো কত্তা। সময় হলে এট্টু আধটু দেখা দিও।

তা দেখা দেয় সুধাদাস। এখন ভরা ভাদোর মাস। খালধারের জমিগুলোতে দমফেলা চাষবাস। মাঠ রসবতীর রসাল বুকের চেয়েও মোহময়ী। জ্ঞানগম্যিহীন চাযে মাঠের উপর এখন মানুষের দাপট। হাল-বলদ কিযাণ-কর্ষণে মাটির গ্যাজরা ওঠা মুখ। এক কড়া ঘোলা জল তার বুকে। সেই জলে ফাৎনার মত ডুবে আছে ধানচারা। জলঘুঘ্‌রো চরকি কেটে নড়ে। ফুসি কাঁকড়া আর কালিয়া কাঁকড়ার ছা-গুলোও কম যায় না। সুযোগ পেলেই কুটুস করে কেটে দেয় ধানচারা। পলকা ধানের গোড়া ভেসে ওঠে জলে। বাবুর নির্দেশে সুধাদাস তাই আলের ধারে ধারে ঘোরে। তার খালি পা. ফাটা গোড়ালিতে ভাঙা শামুকের চুমা। আঙুলের ফাঁক-ফোঁকরে লবণাক্ত হাজা। রক্ত চুয়ালে চিনচিন করে সর্বাঙ্গ তবু দম নিতে শেখেনি সুধাদাস। আলিঘাস আর দুবঘাসে তার স্বচ্ছন্দ যাতায়াত। চাপড়াঘাস আর মুথাঘাসে তার যত ভয়। খোঁচা লাগলেই রক্তারক্তি কান্ড। তলা ক্ষয়া পা'টার উপর কারোর যেন দয়ামায়া নেই। সব মুখিয়ে আছে পেড়ে ফেলার জন্য।

এর মধ্যে শুধু খেরি বাদ। তার কাজলঘন চক্ষু দুটো কৃষ্ণভোমরার ডানা, এক মাথা থাক-থাক কেশবিন্যাসে অতল কুয়ার আঁধার। সেই আঁধারের রং কটা নয়, একেবারে কৃষ্ণপক্ষের রাত। পিঠময় লতানো চুলে জোয়ারখালের ঢেউ। সুধাদাস রসের মহাজন। কণ্ঠা কাঁপিয়ে গান ধরে, 'একি দেখি কেশের বাহার/তারা নেই, চুমকি নেই—কট্‌কটিয়া আঁধার।'

গান শুনে তাবৎ লোক হাসে। ঠোঁট কাটা মানুষটা বলেই ফেলে, এ বেটা পাগল না ছাগল! দেখদিনি দামড়া বয়সে বকনা স্বভাব গেলোনি।

লোকের কথায় সুধাদাসও হাসে। ঘুলঘুলি চোখে চেয়ে থাকে নিষ্পলক দূরের দিকে। সে চোখের ভাষা বোঝে, এমন সমঝদার মানুষ কোথায়? তবু লোক ঠোঁট বেঁকিয়ে টিপ্পনি কেটে বলে, যাদু জানে ঝাঁকড়া মাথার লোকটা। না হলে কথায় কেনে চিটেগুড়ের আঠা? ও হলো গিয়ে ঘরজ্বালান পরভুলানো মানুষ। ওরে এড়িয়ে চলা ভাল।

খেরি বলে, ও পাগল নয় গো। ও হলো গিয়ে রসকলির জোঁক। যখন ঝোপ বুঝে কোপ মারে তুমরা কেউ টের পাও না। ওর কথা শুনে আমার বুকের ভেতরটা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যায়।

খালধারে খেরির মদভাটির দোকান। পুরুষমানুষের নিত্য সেখানে আনাগোনা। ভাতার

খেদানো বউটা এখন খালধারের চতুর লালচিঁয়া। ধরতে গেলে ফসকে পালায়। মনের ভেতর তখন শুধু চিঁয়ামাছের ছড়ছড়ানি। খেরি হাসে। মানুষগুলোর চোখে আদিম বন্য নেশা। শরীর দড়ো করে সে বুক শানিয়ে দাঁড়ায়। বুকের বাগানে পলাশ ফোটা ফাগুন। বসন্ত সমাগম। ছাই মুঠালে যার সোনা হয়, তার শীত গ্রীষ্মে কি ফারাক? খেরির ভাগ্য রংচটা আকাশ হলেও তাতে রামধনু খেলে হরসময়। গতরটা তার ছিলার চেয়েও টানটান। খালের টান মলিন দেখায় চটুল চোখের ইশারায়। পুরো গতর পলি নরম লতলতে।

সুধাদাস রগড় করে বলে, লহরা মাছের বেটি গো লহরা মাছের ছা। তা বলি, তুমার গতরটা আমারে এট্টু ছুঁতে দেবা?

চতুর বুক নাচিয়ে খেরি তখন জোয়ার আসা নোনাখাল। মুখে হাত চেপে পিচকিরির ছড়ানো রঙের মত হাসি। খালের ধারে কত রকমের গাছপালা, পাতার ছায়া। ঠান্ডা হাওয়া। শাখা-প্রশাখায় প্রেম-ভালবাসার দোলানি। ডাগর ছায়ায় খেরির মুখটা তখন জলে ধোয়া বাতাসা।

শ্রাবণ গেল, ভাদোর এল তবু ঘাম শুকাল না গতরের। মাঠগুলোর কচি সবুজ দেহ। হাওয়া মারলে ক্যাতুকুতু দেওয়া সর্পিল চমক। কোমর ডোবা জলে সেই চমক খেরির চেয়েও কম কিছু নয়। ধানচারা তখন নাবালিকা নয়, রীতিমতন কিশোরী। শামখোল পাখির ছায়ায় তার বাড়বাড়ন্ত গতর। মাটি আঁকড়ে প্রাণ শুষে নেয় ধরিত্রীর।

সুধাদাসের তখন অষ্টপ্রহর কাজ। আলের নালিঘাসে পা রেখে সে ছুটে বেড়ায় এ মুড়ো থেকে সে মুড়ো। হাওয়াকে বলে, তুই আমায় উড়িয়ে নে। আকাশকে বলে, আয় বেটি, তুই আমার কোলে আয়।

হাওয়া থামে না, আকাশ কথা শোনে না।

গলার রগ ফুলে যায় সুধাদাসের। গলা চড়িয়ে বলে, খবরদার, ধানচারা গুলান বাড়চে, তোরা কেউ ওদের ছিমুতে যাবিনে।

—তুমি কে হে?

—আমি আগোলদার। হা-হা-হা।

হাওয়া ফিরে যায় গোঁসায়। আকাশের গোমড়াপারা মুখ। সুধাদাস নিজেকে শোনানোর মত করে বলে, যা তোরা সব পেলিয়ে যা। আমারে এট্টু একা থাকতে দে। আমার এখন আরাম দরকার।

দুপুরবেলায় আমড়াছায়ায় গান গাইছিল খেরি, বুকের কাপড় আধফেলা। মাথার উপর ছেরানো রোগে কাহিল ভাদোরমুখো আকাশ। সুধাদাস পা টিপে টিপে হাঁটে। হাতে একতারা, গলায় তুলসীকাঠের মালা। খালি পায়ে খালধারের নোনা কাদা। জর্দাপানে ঠোঁট রাঙিয়ে রগড়ের গলায় বলে, একি দেখি আমি, আমার ছিমুতে কি দোঁড়িয়ে, খেরিরানী? গুনগুনানি থেমে যায় খেরির। গলায় ঝংকার তুলে বলে, বলি, কেমন মুনিষ গো তুমি? আমি যে অবলা নারী, আমার পিছে কেনে তুমার এতো খবরদারি?

হাসি চাপতে পারে না সুধাদাস। এককালে সে ছিল ডাকসাইটে যাত্রাদলের বিবেক। এখন সেই গলায় হরেকৃষ্ণ হরেরামের রেণু। সুধাদাস মজা করে প্রায়ই বলে, এ কৃষ্ণনাম

নয় গো, এ হলো গিয়ে রাধিকার মন ভুলানো যাদু। তুমরা কেউ নিতে চাইলে নাও। যাওয়ার বেলায় সবাইকে আমি বিলিয়ে যাব।

—পাগলামি রাখোদিনি। খেরির গলায় অভিমান।

একটা প্রেমকাতুরে মুখের দিকে তাকিয়ে পলক পড়ে না সুধাদাসের। বুকের ভেতর, কলিজার চারপাশে কেবলই মেঘ ডাকার আওয়াজ। মাসটা ভাদোর—মেঘ চমকায়, বরষা ঝরে—হাওয়া লেগে ছিটিয়ে পড়ে কামনাভেজা বকুল। বাতাসও বড় সাজতে জানে এ সময়। আর্দ্র হিমেল স্যাঁতস্যাতে তার স্বভাব। অবিকল আদুরী কণ্ঠের ঢঙে হাঁটা-চলা। ভাদোর মাসের বাতাস যেন প্রেমের বাথান। মন ভিজে যায়, শিউরে ওঠে গা। রাগ নেই, কেবলই নরম সোহাগ। নিরালা গোপনে ফুল ফোটে ভালবাসার। আকাশ তার সুগন্ধ পায়, আর কেউ নয়। চারাধানের গোড়ায় গেঁড়ি-গুগলির যেমন সতর্ক যাতায়াত, ঠিক তেমনি সুধাদাস আসে বিল-ভুঁই পেরিয়ে, কাঠপোল পেরিয়ে একলা খেরির কাছে। খেরিও অপেক্ষায় থাকে। সুধাদাস বসন্তকালীন স্বচ্ছ নির্মল বাতাস। তখন অস্থিরতা খেরির সর্ব শরীরময়। শুধু দৃষ্টি বিনিময়, তৃষ্ণিত চোখের সেতু বেয়ে একে অন্যের নিকটে পৌঁছে যাওয়া। কারোরই ভয়-ডর নেই। খেরি তো খোঁচা খাওয়া, ধোকা খাওয়া রাণী মৌমাছি। তার দুঃখ তলহীন। সুধাদাস হৃদয় বোঝে খেরির। আর বোঝে বলেই ওঝা হয়ে নির্মূল করতে চায় দুঃখের শিকড়।

খেরি আফসোসের সঙ্গে বলে, পুরনা ঘায়ে মলম লাগালে চট করে সারেনি গো কত্তা। সারলেও সেই ক্ষতদাগ হঠাৎ করে মেলায়নি। আমার দুঃখ লিয়ে আমারে থাকতে দাও গো কত্তা, নেড়ে-ঘেটে উলঝাল করে দিওনি।

সুধাদাস হাসে, দুঃখ কার নেই বলো, ঐ যে ছোটপারা ফুল, তারে গিয়ে শুধাও—তারও দুঃখ তুমার চেয়ে কম নেই।

খেরির অবসন্ন, আত্মমগ্ন চোখের দৃষ্টি। স্বামী খেদানো বউ খালপাড় সমাজে ভেসে যাওয়া শুখা পাতা। তার কোন গন্তব্য নেই। শুধুই এলোমেলো ঢেউয়ের মাথায় ভেসে যাওয়া।

নন্দলাল তার স্বামী। মানুষটা মন্দ নয়। সুপুরুষ হলেও মনের দিক থেকে সে একটা কাপুরুষ। নিজের গলা থাকলেও অন্যের গলায় কথা বলতে ভালবাসে।

খেরি বিয়ের অত বছর পরেও সন্তানহীনা। ফাঁকা উঠোনে সে গোবরছড়া দেয়, ছঁচ দেয়। কোল ফাঁকার জন্য সে একলা দায়ী। শহরের ডাক্তার বলেছে, সে বাঁজা।

সেদিন থেকে ধসে পড়েছে পাড়, মনের শক্তি খসে পড়া বালির বাঁধ। দিনরাত গঞ্জনা, মখমল শরীরে পাঁচনের দাগ কতদিন আর মুখ বুজে সহ্য করা যায়? খেরি পারেনি। নন্দলাল তাকে বড় বাঁধের উপর টেনে-হিঁচড়ে ফেলে দিয়ে বলেছে, এ মুখো আর হবিনে। তুর নেশ্বাসে বিষ, সোনার সনসার আমার জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে গেল।

সেই যে ঢিপা ছেড়েছে শ্বশুরের ভুল করেও সেদিকে মুখ ফেরায়নি খেরি। সর্বদা একটা অতৃপ্তির চোঁয়া ঢেকুর বিস্বাদ করেছে তার মন। কিছু ভাবতে গেলেই মাথাটা আরো ভার হয়ে ঝুঁকে গিয়েছে মাটির দিকে। চাঁদ-তারা-ফুল-আকাশ সব তখন পচা ঘায়ের চেয়েও

কদর্য। হাহাকারে অস্থির শরীরের শাখা-প্রশাখা। শুধু খালপাড়ের ঠান্ডা বাতাসে দাঁড়ালে মনটা কিছুটা স্থিতু হয়। কিন্তু জীবনের প্রতি ঘেন্নাটা কিছুতেই কমে না। ইচ্ছে হয় উঁচু খাল পাড় থেকে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়তে। যে দেহ স্বামীর সেবায় লাগে না, সেই পাথর দেহ ভালবেসে আঁকড়ে ধরে কি লাভ? চোখ ফেটে জল আসে খেরির। কিন্তু মরতে তার ভয় করে। ধানচারা যেমন লিকলিকে শিকড়ে বাঁচিয়ে রাখে নিজেকে তেমনি এক প্রাকৃতিক মায়ায় সে-ও বেঁচে থাকতে চায় অনিবার্য কারণে। ঘরছাড়া মানুষ ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে বারবার। খেরি স্বপ্ন দেখতে ভয় পায়। স্বপ্ন দেখে ডুকরে ওঠে সে।

সুধাদাস তাকে সাহস জুগিয়ে বলে, ঘর পুড়ে গেলে তা আবার নতুন করে ছাইতে হয়। পোড়াঘরের কলঙ্ক দাগ নতুন ঘরই বদলে দেয়।

পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকে খেরি। নতুন আশা বুকের ভেতর বীজ পুঁতলেও প্রশ্রয়ের আলো-বাতাস-জল সিঞ্চনে সেখানে প্রাণের কোন স্পন্দন মেলে না। ফলে নিরুত্তর থাকে খেরি। স্বপ্ন দেখতে ভালবাসলেও ছেদ নেমে আসে তখনই।

অথচ উৎসাহ পেয়ে মুখোমুখি সরে আসে সুধাদাস। খেরির হাতটা সবেগে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, ভয় পেওনি গো। আমি তো সুখের কাঙাল নই, দুঃখের নাগর। তুমার ঐ ডাগর চোখের ভাষা আমি বুঝি। যত দুঃখ আচে, সব তুমি আমারে দাও। এই ভাদোর মাসটা জোয়ারের মাস। তুমার সব দুঃখ-জ্বালা আমি ভেসিয়ে নিয়ে পেলিয়ে যাব।

খেরি যেন চৈত্রদগ্ধ, ঝলসান চটাওঠা ফুটিফাটা মাঠ। পচাধানের নাড়ার মত খোঁচা-খোঁচা স্মৃতিচিহ্ন তাকে ছেড়ে কোথায় পালিয়ে যেতে চায় না। সুধাদাসের হাতের উষ্ণতা ধীরে-ধীরে ছড়িয়ে পড়ে তার শরীরে। এমন আনন্দঘন নৈশব্দ্যময় ঝিরিঝিরি কচি নিমপাতা শিহরণ জীবনে তার প্রথম নয়। নন্দলালও ছিল সুধাদাসের মত ভাবুক মানুষ। ভালবাসতে জানত। ভালবাসার সময় সে ছিল ধবল মেঘের চেয়েও দুরন্ত, দোয়েলপাখির শিসের চেয়েও তার কথা ছিল মধুর মর্মস্পর্শী। আলিঙ্গনে মনে হত—বুকটা বরফের মত হিম হয়ে জমে আছে পুরুষ বুকে। ঠোঁটে কম্পন। এমন কি চুলের গোড়াতেও সেই কাঁপুনি। হিল্লোল। আপসেই অর্ধোনিমীলিত হোত ডাগর কাজল ভাসা চোখ। টানটান ভুরুর মাঝখানে ঘাম নামত নাক বরাবর, প্রসারিত স্ফীতকায় নাকের পাটায় গোলাপী আভা। তখন মরে গেলেও কোন দুঃখ থাকত না খেরির। সেই নষ্ট হওয়া, হারিয়ে যাওয়া সুখানুভূতি সুধাদাস তাকে জোর করে ফিরিয়ে দিতে চায়। মানুষটা পারে না হেন কাজ ত্রিভুবনে নেই। সারা শরীর আন্দোলিত করে সে শুধায়, রা কাড়। এই পচা ভাদোর মাস আমাদের মিলনের মাস। শুধু তুমি একবার হা-করলেই বুকের ভেতর জেবড়ে ধরব আমি। আমার বুকে এট্টা ধানকুটা মেসিন আচে। তুমি চাইলে ঝরঝরে চালের মত তুমারে আমি মাথায় করে বয়ে বেড়াব।

অদ্ভুত তন্ময়তায় খেরি নিশ্চুপ। সুধাদাস ঠোঁট কামড়ে বলে, তুমার ভাগ্য আর আমার ভাগ্য একই কালিতে লিখা। আমারও বৌটা পেলিয়ে গেল পোয়াতি অবস্থায়। বিশ্বেস কর, তারে আমি কত খুঁজেচি। সেটাও ছিল এমনই এট্টা পচা ভাদোর!

—ভাদোর মাস কি দুঃখের মাস?

—আমি তো জানিনে খেরি। ডানে-বাঁয়ে মাথা ঝাঁকায় সুধাদাস। শুধু এটুকুন জানি, ভাদোর মাস আমার কাছে প্রেম-পীরিতের সবুজ মাঠ। এ সময় মাঠ-ঘাট সবই জলময়। রূপবতী আকাশও ঋতুমতী। সে-ও বড় কাঁদে এ সময়টায়। তার কান্না আমি শুনি। আর ঐ ওড়না পরা মেঘটারে দেখে বউটার চাঁদমুখ বড় মনটারে খুঁবলায়। বউটা ঐ মেঘগুলানের মত। কোন মেঘটা যে আমার বউ, তা আমি জানিনে। তাই পুরা ভাদোর মাসটা আমি আকাশপানে চেয়ে থাকি। দু' চক্ষের পাতা এক হয় না। ঘুমিয়ে গেলে বউ যদি আমার মাথার উপর ছায়া ফেলে পেলিয়ে যায়। সে আমার কাছে হেরেচে তাই বলে আমি তো তার কাছে হারতে পারি না।

—তুমি তারে বড় ভালবাসতে তাই না কত্তা? খেরির প্রশ্নে চমকে তাকায় সুধাদাস, তার কবিয়ালের মত চুলগুলো ঝাঁকিয়ে তীব্র প্রতিবাদে স্বরে বলে, না-না-আ-আ, তারে ভালবাসব তেমন বুকের জোর আমার কুথায়? আমি জানি নে—গাছ বেশী ভালবাসে মাটিকে না মাটি বেশী ভালবাসে গাছকে! তবে এটকুন জানি—এ দু'য়ের সম্পর্ক বড় মিঠে। তাহলে মাটি কুনোদিন গাছকে বলত না—আমার বুকে আসো। আমার ছায়ায় তুমি আরামে নিদ যাও। আকাশকে আমি একদিন ডেকে আনব। বলব'খন, তুমি তার পানে চাও।

ঢকঢক করে পচা গুড়গাদের তাড়ি খায় সুধাদাস। তিন গেলাস রস তার পেটের ভেতর নড়ে-চড়ে। কলকল শব্দ তোলে। ঢেকুর হয়ে সেই শব্দ আছড়ে পড়ে খেরির কানে। শূন্য গেলাসটা ছাড়িয়ে নেয় সে। আধো-গলায় বলে, আর খেওনি গো কত্তা। এসব জিনিস শরীলের জন্যি ভালো নয়।

—সব আমি বুঝি। কিন্তু মন মানে না। তুমার কাছে আমি নিজের ঘা সারাতে আসি। এসে দেখি তুমারও ঘায়ে বোঝাই অঙ্গ। আমি যে ছোঁব—ছুঁতেই আমার ভয় করে।

—ঘেন্না হয় না?

—ঘেন্না? কাউরে ঘেন্না করলে নিজেরে আগে ঘেন্না করা হয়। সব মানুষই তো নিজেকে বড় ভালবাসে। তাই ঘেন্নার কথাটা বাদ দেওয়াই ভাল।

কথায় কথায় রোদ পড়ে। বাতাসে ঝিমুনীর আভাস। খালধারে মানুষের যাতায়াত কমে। নির্জন বাঁধের দু পাড়ে খড়কুটো ওড়া ঘূর্ণি ঝড়। নৌকো-ডিঙা আছাড় খায় জলে। তেমনি সুধাদাসের মন চায় আছড়ে পড়তে খেরির সুরভিত, ভাদোর মাসের রাঙাধুলা কাদার চেয়েও নরম বুকে।

খেরি চোখের পলকে মরে যায়। ভয় মিশানো স্বরে বলে, নিজেরে বাঁধ দাও। সব মানুষের ভেতর এট্টা নদী বয়। যে নদীতে ভাঁটার চেয়েও জোয়ার বেশী। আজ নয় আর কুনোদিন এসো। আমি যদি তুমার হতে পারি তাহলে তুমার কাছে ধরা দেব। নাহলে ফুল-প্রজাপতির সম্বন্ধ পাতিয়ে সুখ পাইনে।

—আমি তুমারে ঠিক বুঝতে পারিনে!

—আজ অব্দি কেউ তো কাউরে বোঝেনি। কেবলই বোঝার ভাণ। এই যে নোনাখাল—অত বড় সমুদ্র কি তারে বোঝে?

একটা বিড়ি ধরিয়ে বেজার মুখে বাঁধের উপর উঠে আসে সুধাদাস। বাতাসে তার

ছন্নছাড়া চুলগুলো ঝাউ ডগার মত নড়ে। মাথা উঁচু করে হেঁটে আসে ঝুরি নামান বটতলা অব্দি। তার ঘর নেই, সংসার নেই শুধু মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই আছে। সেখানেই ফিরে যেতে চায় সে।

ভাদোর মাসের শেষাশেষি খেরির সাথে সুধাদাসের দেখা হয় শহরে যাওয়ার বড় রাস্তায়। পরনে তার লালপেড়ে একটা শাড়ি, গায়ে লম্বাহাতা ব্লাউজ—লাল দগদগে সিঁদুরেড় ফাটান সিঁথি। দেখা হতেই মুখ নামিয়ে নেয় খেরি।

সুধাদাসের হাতে একতারা আর ভিক্ষাপাত্র। বাবুর মাঠ পাহারার কাজ সে ছেড়ে দিয়েছে বহুদিন। যে কাজে তার দুঃখ বাড়ে সে কাজে তার মন নেই।

বউটা ধান রুইতে পারত। খরানিতে কলসী ভরে জল দিত বীজতলায়। হাসোন মুখের ঝকঝকে দাঁত দেখিয়ে কোমরে ছন্দ তুলে নাচের মুদ্রায় চলে যেত পুকুরপাড়ে। হুড়হুড়িয়ে জল ঢালত বীজতলায়। এমনি করেই শুখা মাটিতে কচি ধানের সাড়া। বউটাও খেতে পারে না, পোয়াতি। লিকলিকে ধানচারার দিকে তাকিয়ে স্ফীত পেটটায় হাত বুলাত সুখে।

এ দৃশ্য মাঠে দাঁড়ালে মনে ভাসে সুধাদাসের। হাজার চেষ্টাতেও তখন.কাজে মন বসে না। বাবু একদিন ধরে ফেলল হাতে-নাতে। রেগে আগুন হয়ে বলল, তোর চক্ষু দুটো ফকিরের, মনটা তোর বাউলের। এ সংসার তোর জন্যি নয়। মাঠ আগলাবি? এমন দড়ো কাজ তোর দ্বারা হবেনি। আমার ভাত তো মাগনা নয়। এই নে তোর সমবছরের হিসাব। আমি আলাদা লোক দেখেছি। তুই এবার অন্য পথ দেখ।

সেই যে বন্ধনহীন বেরিয়ে আসা তারপর সুধাদাস বড় একলা। খালধারের চা- দোকানে তাকে মাঝে-মধ্যে দেখা যায় যাত্রা-বাউলের আখড়ায় তার চরণের ধুলো পড়ে সর্বদা। সুধাদাস দরদ মিশিয়ে গায়, জীবনের কুনো শিকড় পেলাম না।/জীবন হল নীল দরিয়ার ছোট্ট সেই ডিঙা,/তলা ফুটা পাচ কাঠের ডিঙা।/জীবনের কুনো তল পেলাম না।/জীবন হল নোনাখালির ধুলা/মন চল রে একলা!

খেরি ঝাপ বেড়ার ঘরে হুড়কো তুলে চোখ রগড়ে কাঁদে। জীবন তার কাছে শুধু কান্না। দীর্ঘপথে ক্ষীণ একটা ছায়া। ফাটা ভুঁই, চৈত্রের সীমাহীন ধুলো ওড়া আকাশ। দুটো জীবন দু'দিকে প্রবাহিত। একটা সুতোয় মালা হয় না। অথচ এ গাঁয়ের সবাই জানে—খেরি হল সুধাদাসের রাঁঢ়।

কত সহজে মানুষ কত নির্মম কথা মুখ ফসকে বলে ফেলে। প্রতিক্রিয়া থাকে নজরের আড়াল।

সুধাদাসকে কেউ শুধালে সে ভাবগম্ভীর গলায় জবাব দেয়, যা বলো তা ডাহা মিছে নয়, আবার হাওয়ার মতন সত্যিও নয়। দুটো জীবন এক জমিতে পড়েচে। বাতাসে উড়ে উড়ে তা আবার এক জায়গায়। আকাশ তাদের ছায়া দেয় এ কথা সত্যি। তাদের আলো দেয় সূর্য দেবতা—এ-ও সত্যি। তবু, দু'জনের মন দু' মুড়ায় বাঁধা। আবার নতুন করে পিছু হটে এক হওয়া যায় না ভাই!

—এসব পেঁচানো কথা তুমার মতন বাউল-ফকিরের গলায় মানায়।

—কথা পেঁচিয়ে ধরলে পেঁচানো। যেমন সার্সি। উল্টোপানে মুখ দেখতে পাবা না।

সুধাদাস একতারায় ঝংকার তুলে বাউল বাতাসে শ্বাস নিতে-নিতে খালপাড় ধরে শহরের পথে মিশে যায়।

এদিকে খেরি বুক ভাসিয়ে কাঁদে। নন্দলাল আবার বিয়ে করে এই খালপাড় ধরে ফিরে গিয়েছে গাঁয়ে। গলায় তার কাগজফুলের মালা, হাতে পেতলের যাঁতি পায়ে নতুন জুতো। ভ্যান-রিক্সোর দিকে সে-ও ছুটে গিয়েছে বর-বউ দেখার প্রত্যাশায়। দেখেছে দু' চোখ ভরে। চোখে কুল ছাপান জল। চোখও যে নোনাখাল হয়, সেই প্রথম তার জানা। পুরুষকে যা সহজে মানায়, নারীকে কি তা মানায়? নারী জগতের মা। ফুল-ফল এবং নদীর সৃষ্টিকর্তা। এই প্রকৃতি সে কি করে পরিত্যাগ করে? তাই সুধাদাস গঞ্জে-গাঁয়ে ভিক্ষা করে। খেরির ইচ্ছে থাকলেও ডাকতে পারে না, মুখ ঘুরিয়ে নেয়। অসহায় ঠোঁট দুটো কেবল কাঁপে। ফুলে-ফুলে গুমরে ওঠে বুকের ভেতরটা। সেই শরীরের নদীটা তখন ঝিমানো, শান্ত, সরপড়া। সুধাদাস গাছের চেয়েও নিঃশ্চুপ। সে হল বজ্রাহত বৃক্ষ। শুকনো ডাল-পাতা ছন্দহীন।

সময় এভাবেই ঘুরে যায়। খালের জলে পর্যায়ক্রমে জোয়ার-ভাঁটা খেলে যায়। সবুজ ফসল আবৃত মাঠ একদিন বিধবার সাজ পরে রুক্ষ, অসহনীয় ভিক্ষার চোখে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। চাতকের গলা ফাটানো ডাক খেরির কানকে বিদ্ধ করে, আর সুধাদাস হাতের একতারা ভেঙে, বাউলবেশ ফেলে দিয়ে নেমে যায় যাত্রার আসরে। গান পাগল মানুষটার তখন ব্যস্ততার শেষ থাকে না। খেরির দোকানঘরে কদাচ সে পা রাখে না। যেখানে গেলে উথলে ওঠে শোক—সেই চাউড় দেওয়া শোককে কি করে প্রতিহত করবে সে?

এইরকম এক প্রখর তেজ বিচ্ছুরণকারী মধ্য দিনে আবার খালধারে দেখা হয় খেরির সাথে সুধাদাসের। চেহারায় আগের সেই মাধুর্য নেই, দু'জনের শরীরে পলি পড়েছে সময়ের। সুধাদাসই প্রথম শুধায়, কেমুন আচো গো? বহুদিন তুমার সাথে দেখা হয় না। খেরির ঠোঁটে আবার শুরু হয় সেই পুরনো দিনের কাঁপুনি। ঘামে ভেজা নাকছাবিটায় রোদ পড়ে জ্বলজ্বল করে, তাতে সুপ্ত থাকে না ব্যথাতুর হৃদয়ের অভিব্যক্তি। সজল চোখের দৃষ্টি ঝাপসা দেখায় খেরির। চরম উত্তেজনায় সুধাদাসের দু'হাত আঁকড়ে খেরি টেনে নেয় নিজের কাছে। ফুঁপিয়ে উঠে বলে, আমি মরে যাব গো কত্তা। তুমি সেই যে গেলে আর তো একবার এলে না? আমি কি এতই অপরাধী যার জন্য তুমার এতো অবহেলা।

সুধাদাস শান্ত স্বরে বলে, আমি তো ফিরে আসার জন্যি যাইনি। তোমার বাঁধা পড়া মন, তারে আমি ছাড়াতে পারিনি। আর তুমিও তা ঝেড়ে ফেলে আমার কাছে আসতে পারোনি। আমাদের দুটা জীবন দুটা শুকনো ডাল। দুটা শুকিয়ে যাওয়া নদী। এর বেশী তো আর কিছু নয়।

কম্পিত স্বরে খেরি বলে, আমি চাই ফের শুকনা ডালে পাতা আসুক, ফুলে-ফলে ভরে উঠুক। কত্তা, তুমারে আমি আর যেতে দিবো না। এই খালধার শুধু ভাব-ভালবাসার কথা বলে। আমি তো মেয়েমানুষ, নিজেরে সামলে রাখতে পারি না।

—কি চাও তুমি?

—আমি যা চাই তা তো তুমি একদিন চেয়েছিলে। সেদিন আমি তুমারে ফিরিয়ে দিয়েচি বলে তুমি আমারে আজ ফিরিয়ে দিওনি।

—বয়সটা যে পেরিয়ে গেল। আফসোস ধ্বনিত হয় সুধাদাসের গলায়, সময়েরটা সময়েই ভাল লাগে। সেই যে বলে না, চক্ষেতে পড়িলে ছানি—রাণী গো, তুমারে আমি মেয়েমানুষ ছাড়া আর কিচু দেখি না।

কেমন চুপসে যায় খেরি, ভয় পেয়ে আরো প্রগাঢ়ভাবে আলিঙ্গনে বিদ্ধ করে সুধাদাসকে। ঠোঁটে ঠোঁট ঘষে। স্বপ্নাচ্ছন্ন গভীর দু' চোখে লেপটে দেয় তৃষিত অধর। স্ফীতকায়, সুসংবদ্ধ কোমল পেলব বুকের জাগরিত স্পন্দনে নিমেষে জেগে ওঠে পুরুষ হৃদয়ের নিদ্রিত ঘোড়া। সুধাদাস ক' মুহূর্তের জন্য কোমলতা আচ্ছন্ন, রোরুদ্যমান খেরির মুখের দিকে সংযত চোখে তাকায়। বলে, এ পাপ। তুমি আমায় লুভের পথে নামিও না, তুমার দুটা হাতে ধরি।

খেরি ফুঁসে ওঠা স্বরে বলে, পাপ-পুণ্য সব নিজের কাছে। আমার এই শরীলে এখন পাপের কুনো চেহ্ন নেই। এতদিনের অবহেলায় আমি নিজেরে শুদ্ধ করে নিয়েচি।

—তুমার কপালের ঐ সিঁদুর চেহ্ন—এ আমি কি করে মুছব? আর সিঁদুর মুছলে কি তুমারে আমি পুরোপুরি ফিরে পাব?

এবার আরো চমকে ওঠে খেরি। দু' হাত আছাড় মারে প্রকান্ড গাছের গুঁড়িতে। ভেঙে চুরচুর হয় শাঁখা-চুড়ি। খালে নেমে ধুয়ে আসে সিঁথির দাগ। ছাড়া চুল লুটিয়ে পড়ে দু' বাহুর উপর। খোঁপা বাঁধে না, একপিঠ খোলা চুলে উঠে আসে বাঁধে।

সুধাদাস অবাক, এ কি করলে? এট্টা ছন্নছাড়া মানুষের জন্যি আর একটা গৃহী মানুষকে তুমি খালের জলে ভেসিয়ে দিলে?

— যে আমাকে অনেক আগে ভেসিয়ে দিয়েচে তারে আর আগলে রেখে আমার কুনো লাভ নেই কত্তা। এবার তুমি আমারে গ্রহণ করো। আমার এই শূন্য জীবনকে তুমি তুমার সোহাগ ভালবাসায় ভরিয়ে তোল। পাতা এঁটো হলেও মেয়েমানুষ কুনোদিন এঁটো হয় না—শুধু এই কথাটুকুন জীবনভর মনে রেখো।

কথা হয় খেরিকে নিয়ে শ্রাবণের বৃষ্টিস্নাত দিনে দূরের কোন গ্রামে চিরদিনের জন্য উঠে যাবে ওরা। আর খালধার নয়, এবার মৃত্তিকাস্পর্শী গন্ধে ভরে উঠবে দুটো মরুভূমি-তৃষিত হৃদয়।

যাওয়ার জন্য আয়োজনের কোন ত্রুটি রাখেনি খেরি। উৎসাহ, উদ্দীপনা, বিহ্বলতা সবই তার মাত্রাতিরিক্ত। সর্বস্ব খুয়ানো এক মেয়েমানুষের নতুন করে সংসার ফিরে পাবার তীব্র এক বাসনা। তাই দোকানের ঝাঁপ বন্ধ অনেকদিন। খদ্দের ফিরে যায় খেরির। মদভাঁটিতে মদের মিএগর আর গন্ধ আসে না। হৈ-হট্টগোল ভরা খেরির মদভাঁটিতে শ্মশানপুরীর নীরবতা। খালধারে মানুষ অবাক হয়। কটূক্তি করে, 'দু'দিনের বৈরাগী ভাতেরে কয় অন্ন। রাঁঢ়ের আবার সতীঠাকরুণ হবার বাসনা।' সবই কানে যায় খেরির। যে নিশ্চুপ উদাসীন সাধিকা। দুঃখ ভুলতে এলোচুলে গুনগুনিয়ে গান গায় বিরহের। সামনে পিচ্ছিল জলধারা। চুমকি বসানো আকাশে এখন সুখের আয়োজন।

এমনই এক চুমকি বসানো রাতে শ্বশুরটিপা থেকে লোক আসে। লোক নয় যে তার সামনে হেঁট মাথায় দাঁড়ায় সে হল তার দেওর ব্রজলাল। সাইকেলটা কঞ্চিবেড়ায় ঠেস দিয়ে পরিশ্রান্ত ব্রজলাল বলে, বৌদি গো, দাদার বড় অসুখ। বারবার করে জ্বরের ঘোরে সে তুমারে খুঁজচে। বেশী দিন বাঁচবেনি—যদি একবার আমার সাথে চলো তো বড় উপকার হয়।

আঙুল কামড়ে বাষ্পরুদ্ধ চোখে নির্লিপ্ত তাকিয়ে থাকে খেরি। ফুলে ওঠে কণ্ঠনালী, লেবুকোয়া ঠোঁট। অভিমান থরো-থরো স্বরে সে বলে, কেনে এয়েচো আমার কাচে, আমি তুমাদের কে হই? খেদিয়ে দেবার সময় মনে ছিল না? বলেই কান্নায় ভেঙে পড়ে খেরি। শূন্য হাত তুলে সে আঘাত করে নিজের কপালে। ফুঁপিয়ে ওঠা গলায় বলে, হা দেখ, তুমার দাদারে আমি শেষ করে দিয়েচি। আজই খালের জলে তারে আমি ভেসিয়ে দিলাম। তার কুনো চেহ্নই এখুন কআমার কাচে বেঁচে নেই তুমি ফিরে যাও ঠাকুরপো, কাচের গিলাস ভেঙে গেলে তা আর জোড়া লাগে না।

. ব্রজলাল যখন রাতের আঁধারে ফিরে যাচ্ছিল, তখন বেড়ার একপাশে কাঠের মানুষের মত ঠায় দাঁড়িয়েছিল সুধাদাস। কাঁথ-দেওয়ালে ঠেস দিয়ে অঝোর ধারায় কাঁদছিল খেরি। সুধাদাস গিয়ে তার ঘাম জ্যাবজেবে হাতটা খেরির খোলা কাঁধের উপর রাখে। চমকে উঠে চোখের জল মোছার চেষ্টা করে খেরি। নিজেকে আড়াল করতে গিয়ে বড়ই চোখে লাগার মত ধরা পড়ে যায় সে।

সুধাদাস সান্ত্বনা দিয়ে বলে, কেঁদোনি, আমি সব শুনেচি। এ অবস্থায় তুমার একবার সিখানে যাওয়া দরকার। কাপড়-চোপড় সব গুছিয়ে লাও—এই রাতেই আমি তুমারে পৌঁচে দেব।

—আমি সেথায় যাবোনি। অশ্রুসিক্ত চোখ তুলে খেরি চেপে ধরে সুধাদাসের হাত, এমন কথা তুমি আমারে বলতে পারলে, হ্যাঁ গা—তুমার এট্টু কষ্ট হলোনি? আমি কি তুমার কাছে এতই অবহেলার—

—এ অবহেলা নয়। এ হলো গিয়ে ভালবাসা।

—মিচে কথা। সব পুরুষমানুষই কাদাখোঁচা। তুমি আমারে পর করে দিলেও আমি তুমারে আর ছাড়বোনি। সে মানুষটাও তুমার মতন অভিমানী। আমি তার কাছে গিয়ে এ পোড়ামুখ আর দেখাতে চাইনে।

হঠাৎ অস্বাভাবিকভাবে কেঁপে ওঠে খেরি। দু' চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রুধারা। কি যেন বলতে গিয়ে নিথর হয়ে যায় ঠোঁট। সুধাদাসের কোলের উপর ঢলে পড়ে খেরির পিচ্ছিল, অশ্রুভেজা শরীর।

সুধাদাস বিচলিত স্বরে ডাকে, খেরি, এই খেরি—

খেরির সাড়া মেলে না।

তার প্রাণপাখি উড়ে যাওয়া দেহটা সুধাদাসের কোলের উপর চন্দনগাছের শোভায় নিথর শুয়ে থাকে। তার ছিঁড়ে যাওয়া একতারার মত কঁকিয়ে ওঠে সুধাদাস।

তখন কুসুম ভোর।

খালের জলে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে নৌকোটা। আকাশে তুমুল বৃষ্টি। সর্বত্রই জলের সর্পিল স্পর্ধিত যাতায়াত। খেরি শুয়ে আছে ছইয়ের ভেতর। শান্ত, সমাহিত দেহ। অস্ফুট চোখ। ঠোঁটের গোলাপী জৌলুষ রংচটা, মনমরা। সুধাদাস এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সেই শীতার্ত মুখের দিকে। বুক ফেড়ে কান্না আসে তবু সে কাঁদতে পারে না।

খেরির শ্বশুরটিপা কম পথ নয়। সকাল সকাল পৌঁছাতে পারলে সব দায়িত্ব শেষ। রাতভর সে ঘুমাতে পারেনি। খেরি তার কোলের উপর সেই যে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে— তাকে তো জাগিয়ে দেওয়া যায় না।

পেছনে হাওয়া থাকায় পাল তুলেছে মাঝি। নৌকো যেন ছিলা পিছলান তীর। বৃষ্টি ধরেছে আকাশের, গোমড়া ভাবটাও উধাও।

সুধাদাস দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে অপলক। মানুষ জীবনের রহস্য তার জানা হল না। মনে হয় জীবন একটা বিশাল আকাশ। সেই আকাশ এখন তার কোলের উপর শোয়ানো। এমন সৌভাগ্য ক'জন মানুষের হয়? ভাঙা গলায় একতারা বাজিয়ে সে গেয়ে ওঠে, 'জীবনরে তোর তল খুঁজে পেলাম না!'

জঠরযুদ্ধ

আশ্বিন মাস। উৎসবের মাস।

ভাদ্রের শেযাশেষি আমন ধানের থোড় আসলে ফি-বছর ঢাকের কাপড়টা কেচে, শুকিয়ে নতুন করে পরিয়ে দেয় দুঃখীরাম। তখন ঢাকের গায়ে লেগে থাকা আংটা আর সরু চাম-কাঁকরগুলো ঠিক আছে কিনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নেয় সে। চাম-কাঁকর ঢাকের ডান-বামতালাকে টেনে রাখে টানটান। ঢিলেঢালা হলে শব্দ হবে তালা ফাঁসা, ভ্যাস্‌ভেসে। তা বড় কানে বাজে দুঃখীরামের। বামতালার কাজ সেরে সাঁঝবেলায় 'তা-গুড়-গুড়, ধিনাকে-ধি-ই-ই-নাকে—তা গুড় গুড়্‌ড়্‌-ড়্‌-ড়' ঢাকের বোল তোলে সে। তার দু'হাতের বেতকাঠি ফিনফিনে, বাতাস লাগা বাঁশপাতার মতো নড়ে। ডান-চাম কেঁপে আওয়াজ ভাসে বাতাসে, গা শুদ্ধু লোক ভাবে এবার পূজো এল, বড় পূজো! কাশফুলের দোলানী আর দুঃখীরামের ঢাকের ধ্বনি—দুয়ে মিলে মাতিয়ে রাখে সন্ধের বাতাস।

আশ্বিনের তিন দিন পেরিয়ে যেতেই বেজার মুখে তুলসী বলল, কিগো, ঢাকটা এবার পাড়ো। বায়না-পত্তর এবার বুঝি আর ধরবানি? বৌয়ের কথায় রা কাড়েনি দুঃখীরাম। গালে হাত দিয়ে হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে দ'য়ের মতো বসে ছিল সে।

গদাধরবাবু গাঁয়ের মোড়ল। তিনি বলেছেন, এবার ঢাকি আসবে ভিন্ গাঁ থেকে, দুঃখীরাম বাদ। ব্যাটার বড় তেল বেড়েছে। এ বছর তেলটা একটু শুকোক। আসছে বছর দেখা যাবে।

মোড়ল মশায়ের কথাটা কানে গিয়েছিল দুঃখীরামের। সেই থেকে মনটা তারও গলা-পচা-হজা। গাঁয়ে ভালমানুষ, খারাপমানুষ পাশাপাশি। তারাই দুঃসংবাদটা বাড়ি বয়ে পৌঁছে দিল দুঃখীকে।

কথা শুনে মোটেও দুঃখী হয়নি দুঃখীরাম। পান্‌সে হেসে বলেছিল, জানতাম এমনটা হবে। তবে বাবু পেট মারবে ভাবিনি বাবু। বছরের এই কটা দিন তো আমার সুখের দিন। আমার সুখ কেড়ে নিয়ে বাবু যদি সুখী হয় তো হোক।

মোড়ল মশায়ের কথা তুলসী জানত না। জানলে সে বারবার করে দুঃখীরামকে ঢাক ছাওয়ার কথা বলত না। সাল ভর মুরগা-মুরগী আর বন-ডাহুকের ঢাঙ্গা পাখনা জড়ো করে পুরনো কাপড়ে বেঁধে তুলে রাখে সে। ওগুলো রোদে দিয়ে শুকনো ফনফনে করে বছর বছর নিজের হাতে ঢাকের লেজটা ছাইয়ে দেয় সে। বড় পয়মন্ত তার হাত। ঢাকে হাত ছোঁয়ালেই বায়না আসে, খদ্দের আসে। ফাড়া বাঁশের দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ঠোঁটে হাসি ছড়িয়ে বায়নাদারদের কথা শোনে বউটা।

এ বছর বায়না দিতে কেউ আসেনি। মোড়ল মশায়ের নিষেধ। গদাধরবাবুর জেদ ভীমের

জেদের চেয়েও বেশী। অবিকল ভীমের মতো গোঁয়াড়!

ডোম পাড়ার লক্ষ্মণ বলেছিল, যা না, বাবুর পায়ে ধরে ক্ষমা চা। বল্, আর হবে নি। বাবু তোরে ক্ষেমা করে দেবে। হাজার হোক, সে-ও তো মানুষ। মানুষ হয়ে কেউ কি মানুষের পেট মারে?

লক্ষ্মণের কথায় তেড়ে উঠেছিল দুঃখীরাম। গলা খেঁকরিয়ে বলেছিল, মরে গেলেও যাবনি। মোড়ল মশাই মানুষ নয়, জানোয়ার। জানোয়ারের সাথে আপোস হয়? গাঁ ঘুরতে গিয়েছিল তুলসী। ধূলো পায়ে সাঁঝবেলায় ঘরে ঢুকে এসে সে বলল, আমি সব শুনেচি। তোমাকে এবার গাঁ থেকে ছাঁটাই করেচে। এবার বারোয়ারীতলায় ভিন্ গাঁয়ের ঢাকি আসবে বায়না-পত্তর সব হয়ে গিয়েচে।

কথা শুনে বিরক্ত হয়েছিল দুঃখীরাম। বলেছিল, তুই চুপ্ যা। আমার আর এসব শুনতে ভাল্ লাগেনি। দিনরাত কানের গোড়ায় এক কথা কি ভাল্ লাগে? ·

—এতো দিন আমারে কেনে বলোনি?

—বল্লে তুই কি করতিস্?

—কিচু না পারি, মুখ ভরে গাল তো দিতাম। গাল দিয়ে নিঃবংশ করতাম। ঘাটের মড়া, ধুঁকো বুড়া আমাদের পিছুতে লেগেচে। ওরে যেদিন আমি ধানক্ষেতে পেড়ে ফেলব— সেদিন বুঝবে। রাগে ফুঁসছিল তুলসী। কথাটা কানে যাওয়ার পর থেকে তারও মাথার ঠিক নেই। ঘরের মানুষটার অপমান, তারও অপমান! গায়ে চামড়া থাকতে একি সওয়া যায়?

তুলসীতলায় সন্ধে দিয়ে এসে সে নিজেই ঢাকটা পেড়ে এনেছিল কড়ি বাঁশের গা থেকে। ঝুল, ধুলা-ময়লা সাফ-সুতরো করে বলেছিল, বাজাও। মনের সুখে, হাতের সুখে বাজাও। গাঁ শুদ্ধু লোক শুনুক, মোড়ল মশাই তোমারে ঠকিয়েচে।

দুঃখীরাম নিস্তেজ গলায় বলেছিল, কি হবে বাজিয়ে? দুর্গা মায়ের থানে যখন বাজাতে পারলাম না তখন এ বছর আর ঢাকের কাঠি ছোঁবোনি। দেখি, ঢাকের কাঠি না ছুঁলে পেট চলে কিনা।

বউটা কথা শোনার নয়। তার অভিমান ভাঙাতেই তালাই বিছিয়ে ঢাকের কাঁকরে গোঁজা বেত-কাঠি দুটো নিয়ে নড়ে-চড়ে বসে ছিল দুঃখীরাম। কাচের গেলাসে চা দিয়ে গিয়েছিল তুলসী। হাঁড়িশালে যাওয়ার আগে সে গর্বের হাসি হেসেছিল। অথচ বাজাতে গিয়ে বারবার তাল বোল্ ভুলে যাচ্ছিল দুঃখীরাম। 'টি-যাঁ-তাকে। উরু-রু-রু-টিই...যা তা-কে। উ-রু-রু-টিই তা-কে' বাজাতে গিয়ে বারবার করে 'টেঁ...টেঁ...টেঁ। টিনাকে, টিনাকে, তা গুড় গুড়' বাজিয়ে ফেলছিল সে। একটা পুজোর বাজনা, অন্যটা মঙ্গলঘট তোলার। দুটোর মধ্যে ফারাক অনেক তবু এক হয়ে যাচ্ছিল কিসের ঘোরে।

সঙ্গে সঙ্গে হাঁড়িশাল থেকে ছুটে এসেছিল তুলসী। হলুদ হাতটা আঁচলে মুছে বলেছিল, আগের সালের মত হচ্চেনি গো। ভাল করে বাজাও কানে সব যেন এক সাথে ঢুকে যায়। আলাদা আলাদা চেনা যায় না।

দুঃখীরাম বলেছিল, হাত ভার হয়ে গেচে। আঙুলগুলাও কেমন পুরু পুরু, বুড়া

পুঁইডাঁটির মতোন। এ হাতে আর বাজনা হবেনি, বউ।

—হয়ে ভেসে যাবে। তুলসী ঢাকের উপর কনুই দিয়ে চোখে চোখ রেখে হাসল, ভাল করে না বাজালে পেটেরটাও যে গোমুখ্য হবে। তার মুখ চেয়ে ঢাকের কাঠি শক্ত হাতে ধরো। দেখবা মনে অনেক জোর পাবা।

শেষ ভাদ্রে বছর বছর আমন ধানের থোড় আসলেও তুলসীর দেহ ভার হয় না কোন বছর। মা কালীর কাছে মানত করে এবার তার পেট নেমেছে, ভার হয়েছে দেহ। সেই সুখে বউটার যেন মাটিতে পা পড়ে না। মা লক্ষ্মীর মতো ভরা গতর নিয়ে এদিক সেদিক হেঁটে বেড়ায় বউটা। একা হাতে সংসার সামলায় সে। 'ছড়া' দেওয়া থেকে 'ঘষি' দেওয়া কোন কাজে 'না' নেই তার। বাপুত্তে ছ'কাটা জমিতে আমন রুয়েছে তারা।

দুঃখীরাম নিষেধ করেছিল, যাস নে বউ, এখন তোর মাঠে-ঘাটে যাওয়া বারণ। কখন কি যে হয় বলা যায় না।

তুলসী কথা শোনেনি। সাহস দিয়ে বলেছিল, হাত দুটো তাহলে কিসের জন্যি? যে হাতে হলুদ বাঁটি সে হাতে কাদা ঘুঁটলে দোষ কি? নিজের ভুঁই নিজে রুইবো, এর চেয়ে আর সুখের কি?

কাড়ান হতেই ভুঁই রুয়েছিল দুঃখীরাম আর তুলসী। মোড়ল বুড়ো সাইকেল নিয়ে টেঁরিয়ে টেঁরিয়ে আলের উপর দিয়ে চলে গেল। ঠেস দিয়ে টিপ্পুনী কেটে বলল, বড় সুখে আচো হে দাসের পো। এত সুখ থাকলে হয়!

সাত দিনের মাথায় ধান চারাগুলো নতুন পাতা ছাড়ল কিনা দেখতে এসেই আলের উপর কপাল চাপড়ে বসে পড়েছিল দুঃখীরাম। পায়ের চেটো ডোবা জলে ধান চারাগুলো ভাসছে। কারা যেন সেই পোঁতা ধানগাছগুলো উপড়ে ভাসিয়ে দিয়েছে জলে। তুলসী এসে দেখে-শুনে কান্না আটকাতে পারেনি। কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, চলো, পেধানের কাছে চলো। এ কার কাজ আমি তা ভাল মতোন জানি। নেয্য বিচার না পেলে আমি তার ঘরে আগুন ধরায় দেব।

প্রধানমশাই বিচার করেনি। মোড়ল মশাই ব্লকের মেম্বার। দু'বেলাই বি ডি ও অফিসে ধর্ণা দেন, গাঁ-অন্ত প্রাণ। তার নামে এমন অভিযোগ খাটে না। হাওয়ায় ভেসে গেল তুলসী আর দুঃখীরামের আর্জি।

ভিন্ পার্টির লোক দুঃখীরামকে ফুসলিয়ে বলেছিল, যা, থানায় যা। আমরা তোর পেছনে আছি, একি মগের মুলুক নাকি, যা খুশী তাই করবে? ধানচারা হলো—গর্ভের ভ্রূণের মতো, তারে উপড়ে ফেললে ভ্রূণ হত্যা হয়। এখন যদি কেউ তুলসীর গাভীন পেটে লাথ মারে, গর্ভ নষ্ট করে দেয়—তুই কি তা সয়ে নিবি হ্যাঁরে, দুঃখু?

ঢাকের বাজনা থামলেই মধুর লাগে। কলহ-বিবাদ জুড়োলেই মনের ভার সরে গিয়ে ফুরফুরে লাগে মন। গত তিন মাস থেকে দুঃখীরামের মনটা দুঃখ বুজকুড়িতে ভরা। কাজ-কর্মে আগের সেই শান্তি উধাও। পুরো বর্ষাকালটা সে নিষ্কর্ম্মা। কেউ তাকে ভুঁই রোয়ার কাজে ডাকেনি। অথচ গত বছর সে খাওয়ার সময় পেত না। এসব যে মোড়ল বুড়ার কারসাজি সে সব বোঝে। তুলসীকে বললে সে রেগে ওঠে। বউটার মাথা গরম.স্বভাব।

অল্পতেই ভেঙে পড়ে। বলে, চলোদিদিনি, আমরা এ গাঁ ছেড়ে চলে যাই। বাপের দেশে মেলা কাজ, সেখানে ভাতের অভাব হবে নি। পুরুষমানুষের হাত-পা ঠিক থাকলে তার কি ভাতের অভাব হয় গো?

গাঁ-ছেড়ে কোথায় যাবে দুঃখীরাম? এ গাঁয়ে তার নাড়ি কেটেছে ধাইবুড়ি। বাপ-মা বেঁচে থাকতে তখন গাঁ-ঘরে এত ঝগড়া-কাজিয়া, অশান্তি-বিবাদ, চুলোচুলি, লাঠালাঠি ছিল না। মোড়ল মশাইয়ের বাপ-ঠাকুর্দাই তার বাপকে জায়গা দিয়েছিল ঘর করার। কুয়ো কেটে দিয়েছিল ঘরের ছিমুতে। আপদে-বিপদে পিছনে এসে দাঁড়াত। সাহস দিত। গাঁয়ে তখন এত পার্টি ঢোকেনি। গাঁ ছিল তখন স্বর্গরাজ্য। অথচ এখন?

দুঃখীরামের ধাড়ী ছাগলে ধান খেয়েছিল গদাধরবাবুর ক্ষেতে। আমনভুঁই থেকে তাড়িয়ে ছাগলটাকে ধরে নিয়ে গেল গদাধরবাবুর বছর মাইনে করা মুনিষ। কত কাকুতি-মিনতি করেছিল দুঃখীরাম তবু তার কথা কানে তুলল না কেউ। ছাগলটার জন্য দুপুরবেলায় সে হাজির হয়েছিল গদাধরবাবুর কোঠাবাড়িতে। তাকে দেখে গদাধরবাবুর বড় ছেলে বীরবল বলেছিল, ছাগল হবেনি, ঘর যা। রোজ রোজ তোর ছাগলে ধান খাবে—আর আমরা তা সহে নেব—তা হবে নি। ঘর যা। দাঁড়িয়ে থাকলে পিঠের চামড়া তুলে দেব।

দুঃখীরাম বলেছিল, ছাগলে ধান খেয়েচে তা আমি মানি। কিন্তু তা বলে গাভীন ছাগলটাকে এভাবে রোদের মধ্যে বেঁধে রাখা—এটা কি ঠিক? ধাড়ীটা যে হেপ্‌সে মরে যাবে বাবু।

—ছাগলে খেল ধান, আর তুই গাইচিস্ গান। বারে মজা! জানিস্ ধান রুইতে কত খরচ, তোর ছাগল বেচলেও হবেনি।

—অবলা জীব, ওদের কি শান আছে বাবু। আজকের মতন ছেড়ে দিন। আর কুনোদিন খাবেনি। কথা দিচ্ছি এবার থেকে বেঁধে রাখব।

—আগের বারেও তুই একই কথা বলেছিলিস্। তোর ওটা মুখ না কি—

চুপ্‌সে গিয়েছিল দুঃখীরাম। সাদা ছাগলটাকে দু'চোখের আড়ালে যেতে দেয় না তুলসী। কাঁঠালপাতা, পেয়ারাপাতা, ক্ষুদ্ কুঁড়ো, আটাভুষি যত্ন করে খাওয়ায়। ডাক উঠতেই পশ্চিমপাড়া থেকে ছাগলটাকে পাল খাইয়ে এনেছিল সে। সে নাইতে যাবার পরে পচা দড়া ছিঁড়ে দু-তিনটে ক্ষেত ডিঙিয়ে ছাগলটা ধান খেয়ে এল বাবুর। আজকাল ফসল মানে সার-জল-মেহনত আর টাকা। ছেলেমানুষ করার মতো যত্ন না নিলে ধান হয় না। সেই কষ্টের ফসল খেলে রাগ সবারই হয়।

বীরবল রাগের ঘোরে বলেছিল, ছাগলে মুড়োলে সে গাছ আর বাড়ে না। ওদের মুখে বিষ আছে। সেই বিষে কুঁড়িকুষ্ঠ হয় গাছের।

দুঃখীরাম নিরুত্তর।

বীরবল ছাগলের শিং দুটো শক্ত হাতে ধরে টানতে টানতে বলেছিল, তোর ছাগলে ধান খেয়েছে, সে ধান আমি পেট চিরে বের করে নেব। তারপর, তুই তোর ছাগল নিয়ে যা—আমি তোকে বাধা দেব না।

আঁৎকে ওঠার চোখে তাকিয়ে ছিল দুঃখীরাম। বীরবলের অসাধ্য কোন কাজ নেই।

সে হল বাপ্‌কা বেটা, সিপাই কা ঘোড়া। মন চাইলে সে সব কিছুই করতে পারে। তার ভয়ে পুরো গ্রাম কাঁপে। এবার পঞ্চায়েত ভোটে ভোটবাবুদের বেধড়ক মেরে থানায় গিয়েছিল সে। তারপর, কোর্ট থেকে জামিন নিয়ে গাঁয়ে ফেরে। গদাধরবাবু সেই যোগ্যমান ছেলেকে একটা মোটর-বাইক কিনে দিয়েছেন। বীরবল সেই মোটর-বাইকের ধোঁয়া ছেড়ে এগাঁ-সেগাঁ ঘুরে বেড়ায়। মিছিল নিয়ে যায় কলকাতায়। তার ইচ্ছে, এবার সে এম-এল-এ ভোটে দাঁড়াবে। উপর মহলে তার অনেক জানা-শোনা।

ছাগলটার পেট চিরে দেয়নি বীরবল, একটা আছাড় মেরে ফেলে দিয়েছিল দশ হাত তফাৎ-এ। ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে তারস্বরে কয়েকবার ডেকে ধাড়ী ছাগলটা জিভ বের করে রক্ত ছিটিয়ে দিয়েছিল গর্ভ থেকে। তারপর, মিনিট খানিক ঝাকুনী দিয়ে নড়ে উঠেই চুপ। এ দৃশ্য সহ্য করতে পারেনি দুঃখীরাম। কোমরে গামছাটা বেঁধে নিয়ে আক্রোশে ছুটে গিয়েছিল সে।

তার আগেই গদাধরবাবুর বছর-মাইনে করা মুনিষটা বুক ফুলিয়ে রুখে দিয়েছিল তার গতি। গলা চড়িয়ে বলেছিল, খবরদার আর এগোবিনে! তাহলে লাশ পড়ে যাবে। বড়বাবুর রাগ তো তুই নিজের চোখে দেখলি। ছাগলটার মতোন তোর জানটা বেরিয়ে গেলে তখন তোর গাভীন বউটারে কে দেখবে?

গদাধরবাবুর বছর-ঠিকে মুনিষটা দুঃখীরামের জ্ঞাতিভাই। বাবুর বাড়িতে খেয়ে-দেয়ে চৈত্র মাসের কুমড়োর মতো তার গতর। ভাদ্র মাসের তালের মতো মাথাটায় পুরো গোবর, সার বলতে কিছু নেই। দুঃখীরাম খুব অবাক হয়েছিল, একটা সুস্থ মানুষ দুটো ভাত কাপড়ের লোভে বছরের পর বছর এমন মাথা বিক্রি করে থাকে কি করে?

সাধুচরণকে দেখে দুঃখীরামের মায়া হয়। ইউরিয়া-সুফলার যুগে এমন মানুষ গাঁ-ঘরে আছে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা মুশকিল।

মরা ছাগলটা নিয়ে দেড় ক্রোশ পথ ঠেঙ্গিয়ে থানায় গিয়েছিল দুঃখীরাম। তার পেছনে কাঁদতে কাঁদতে তুলসী।

ছোকরা দারোগাবাবু সব শুনে দাঁত কিড়মিড় করে বলেছিলেন, সেই রাস্কেলটা এখন কোথায়? দুঃখীরাম বলেছিল, আজ্ঞে বাবু, গাঁয়ে।

ছোট দারোগাবাবু সতর্ক করার গলায় বলেছিল, স্যার, বীরবলকে অ্যারেস্ট করার অর্থ ভীমরুলের চাকে ঢিল মারা। ওর বাবা পার্টির ব্লক-লেবেলের মেম্বার। দারুণ হোল্ড।

ধাড়ী ছাগলের দাম বাবদ নগদ দুশো টাকা আদায় করে দিয়েছিলেন বড় বাবু। বীরবলকে পুলিশ মাজায় দড়ি দিয়ে ধরে নিয়ে গেল থানায়।

বিবাদের সূত্রপাত এইখানে। জামিন নিয়ে গাঁয়ে ফিরে এসেছে বীরবল। পুলিশ তার চুল ছিঁড়ে দিয়েছে গাবদাখানিক। সেই খেয়ো জায়গায় চুল গজাতেই সে আগের মতো বিভীষিকাময় হয়ে গেল। পুরনো প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সে উঠে পড়ে লাগল। বড় পুজোর মিটিংয়ে সব ঠিক হয়—কেপ্রতিমা গড়বে, কে ঢাক বাজাবে, কে ডোমসাজ দেবে, কে ফুলসাজ দেবে। কার ভাগ্যে কত টাকা ধার্য্য—এসবই বারোয়ারী মিটিংয়ে ঠিক করে গাঁয়ের মাথারা।

বছর বছর ঢাকের বায়না পেত দুঃখীরাম, সেই সংগে আধ মণ মতো চাল। পুরো পাঁচটা দিন সে প্রাণ ঢেলে বাজাত। ফাঁকি ছিল না তার কাজে। অথচ ফাঁকে পড়তে হ'ল তাকে।

প্রধানবাবুকে বলতেই প্রধানবাবু বললেন, গাঁয়ের বাবুসমাজ তোমাকে আর চায় না। আমি কি করতে পারি? তাছাড়া, বছর বছর তোমার বাজনা শুনে তাদের কান পচে গেছে। এবার তারা মুখ বদলাতে চায়। সেখানে আমি বাধা দেবার কে? দশ জন নিয়েই তো বারোয়ারী। দশজনের কথা ঠেলতে আমি পারব না।

গাঁয়ের পুরুতমশাই বিদ্বান, সজ্জন মানুষ! বললেন, তোমার দুঃখটা আমি বুঝি। কিন্তু দশচক্রে ভগবান ভূত—একথা তো তুমি জান। কলিযুগের হাওয়ায় কেবল পাপের নিঃশ্বাস। এর বিনাশ অনিবার্য। তুমি এক কাজ কর দুখু। যে তোমার হয়ে বাজাতে আসছে তুমি তার কাছে যাও। যতদূর জানি, গুয়ারাম লোক ভাল। বুঝিয়ে বললে সে বুঝবে।

—সে যদি আমার কথা না শোনে?

—না শুনলে লাঠি ধরবা। সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুল বেঁকাতে হয়।

—একজন বাদ্যকার হয়ে আর একজন বাদ্যকারের গায়ে হাত তুলব? আমার অমন হাতে যে কুঠ্ হবে পুরুতমশাই।

—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কি বলেছিলেন জান? সুখ-দুঃখ, লাভালাভ, জয়-পরাজয় যদি কর সমজ্ঞান, পাপ নাহি হয়। এই রূপ সমচিত্ত থাকি, ধনঞ্জয়। যুদ্ধ কর তাতে কিছু নাহি পাপ-ভয়। কহিলাম আত্মতত্ত্ব, শুনহে এক্ষণ/কর্মযোগ-তত্ত্ব, যাবে কর্মের বন্ধন। বুঝলে, কিছু বুঝলে দুখু?

—আজ্ঞে না।

—তোমার দানা কেউ যদি কেড়ে নেয় তাহলে তুমি কি তাকে ফুল-চন্দন দিয়ে পুজো করবা?

—আজ্ঞে না।

—তাহলে ছিনিয়ে খাও। যুগটা হল জোর যার মুলুক তার। মিউমিউ করলে বেড়ালের মত লাথি মেরে ফেলে দেবে। গাঁয়ে আর টিকতে পারবা না।

পুরুতমশাইয়ের কথামত সে গিয়েছিল গুয়ারামের বাড়িতে। দুপুরবেলায় মাঠ থেকে ফিরে গুয়ারাম তখন যাউভাত নিয়ে খেতে বসেছে। তাকে দেখে এঁটো হাতেই উঠে এল। তেঁতুলতলার ছায়ায় দাঁড়িয়ে সে বলল, এসেছো, ভাল কথা। খাও, দাও, বেশ্রাম কর। কিন্তু কাজের ব্যাপারে কিছু বলো না। আমি অপারগ—

নিরুপায় গলায় দুঃখীরাম বোঝাবার চেষ্টা করেছিল, ওরা আমার উপর অবিচার করচে! জ্ঞাতি হয়ে এত বড় অবিচার তুমি মেনে নেবা?

—উপায় নেই, দুখুদা। পেট বড় শত্রু। তার সাথে মালাম (কুস্তি) লড়ে যে পারিনে।

—নিজের পেটের জন্যি অন্যের পেট মারবা?

—উপায় নেই দুখুদা, নিজে বাঁচলে বাপের নাম।

—তুমি এত স্বার্থপর?

—স্বার্থ ছাড়া একটা মানুষ দেখাও দেখি। গুয়ারাম চোখ ছোট করে হেসেছিল। হাসতে হাসতে বলেছিল, তুমিও তো স্বার্থ নিয়ে এখানে ছুটে এয়েচো। কি বল? তোমার গাঁয়ের লোকে আমাকে ডবল টাকা দেবে। এত বড় বায়না কি করে হাতছাড়া করি বল?

থেঁতলান মন নিয়েই খরা পড়তেই ফিরে এসেছিল দুঃখীরাম। গুয়ারাম যে এতটা চশমখোর, চোখের পর্দা ছেঁড়া তা জানা ছিল না। ছেলেটা আগে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরত, তাড়ি খেত, নেশা-ভাং করত। দুঃখীরামের বাবাই ধরে-পেড়ে তার হাতে ঢাকের কাঠি তুলে দেয়। নিজের ছেলের মতো শেখাল। তখন গুয়ারামের দু'বেলা যাতায়াত তাদের বাড়িতে। একসাথে খালের জলে নাইতে যেত তারা। বুনো জাম পেড়ে খেত খরাবেলায়। শ্রাবণ মাসের জলে ভিজে ছিপ নিয়ে মাছের লোভে বসে থাকত খালধারে। বলত, দুঃখুদা, আমার কুনো দাদা নেই গো, তুমিই আমার দাদা। এ জীবনে তোমাদের ঋণ কুনোদিন শোধ দেওয়া যাবে না। তোমার বাপকে আমি গুরু বলে মেনেচি। সে না থাকলে আমার হাতে কুনোদিন ঢাকের কাঠি উঠতো নি।

বেইমান, অকৃতজ্ঞ। দুঃখীরাম ভেতো মনে কুয়োর পাড়টায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তুলসী ঝুঁকে পড়ে জলের দিকে তাকিয়ে ছিল। দুঃখীরামকে দেখে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, দেখ কুয়োর জলে একটা মরা কুকুর ভাসচে। কেউ মনে হয়, মেরে ফেলে দিয়ে গিয়েচে। ইস্ এই পচা দুর্গন্ধ জল কি মুখে তোলা যায়!

দুঃখীরাম ঝুঁকে পড়ে দেখেছিল, জলের উপরে ভাসছে মরা পচা গলা একটা কুকুর। দুর্গন্ধে ভরে আছে কুয়োর ভেতর। মাঝে মাঝে বোঁটকা গন্ধ নাকে এসে বিঁধছিল।

—তুলসী সরে এসে নাক কুঁচকে বলল, এ ঠিক মোড়ল মশায়ের ছেলের কাজ। আমাদেরকে এ গাঁ থেকে না তাড়িয়ে ও মনে হয় মরবে না। সকালবেলায় ওকে আমি এদিক পানে ঘুরঘুর করতে দেখেচি। জান গো, কেমন তাকায়! ভয়ে গা কাঁটা দিয়ে ওঠে।

—ঘরের বাইরে আসিস্ কেনে? তোকে না হাজার দিন বলেচি, বাইরে বেরুবিনে। আমার কথা না শুনলে কুনদিন তোর বিপদ হবে বুঝলি?

—সারা দিন ঘরে বসে থাকা যায়? আমার কি কুনো কাজ নেই?

—তোর কাছে কাজ বড় না জীবন বড়?

—দুটাই।

মরা কুকুরটাকে কোনমতে তুলে এনে দিল দুঃখীরাম। তারপর পঞ্চায়েতের বাঁধের উপর দড়ি বেঁধে টানতে টানতে ফেলে দিয়ে এসেছিল সে। হাওয়া মারলে গাঁয়ের ভেতর গন্ধ ছুটত।

একদিন প্রধানবাবু এসে বললেন, কুকুরটা সরাও দুখু। গন্ধে যে আর টেকা যায় না।

দুঃখীরাম বলল, বাবু এতো বাইরের গন্ধ। কিন্তু ভেতরের গন্ধ আগে দূর করুন। পুরা গাঁটা এখন পচা ভাগাড়। একটা কুকুর সরালে কি পুরো ভাগাড়ের গন্ধ উবে যাবে?

—তার মানে?

—মানেটা খুব সহজ বাবু। যে গন্ধ আপনারা নাকে সইতে পারেন না সেই গন্ধ আমরা পেটে নিই কি করে? আমরাও তো মানুষ।

—তা তো বটেই। হেঁয়ালী ছেড়ে স্পষ্ট করে বলো দেখি কি হয়েছে?

প্রধানমশাইকে কুয়োতে কুকুর ফেলার কথা ফলাও করে বলেছিল দুঃখীরাম। তার কথা শুনে বৃদ্ধ মানুষটা কোন জবাব দিতে পারেননি। মনে মনে মুষড়ে পড়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন—পাঁচ কেজি চুন আর এক পোয়া ফিট্‌কিরি দাম তুই আমার কাছ থেকে নিয়ে নিস। এসব কুকর্ম যারা করে তারা আর যাই হোক মানুষ নয়। মানুষের ছাল-চামড়া পরা বনমানুষ। সমাজশত্রু।

খুব সকালে উঠে ঘরের মানুষটার জন্য রুটি সেঁকে দিয়েছে তুলসী। সেই রুটি গামছায় বেঁধে পূবমাঠ পেরিয়ে পঞ্চায়েতী বাঁধের উপর উঠে পড়েছিল দুঃখীরাম। তার হাতে পাকা বাঁশের লাঠি। কোমরে গোজা শানান চাকু। গায়ের ঢোলাঢোলা জামাটা হাওয়ায় উড়ছিল ফতর-ফতর। আর ধুতির ফাঁকে হাওয়া ঢুকে কেবল পতর-পতর শব্দ। সকালের এই সময়টায় ধানগাছগুলো সুচলো পাতা জাগিয়ে রোদ উঠার অপেক্ষায় ঘুম ভেঙে জেগে থাকে। হরিলুটের বাতাসার মতো রোদ ছড়িয়ে পড়লে রাতের নিংড়ান জল উবে গিয়ে বড় তাজা দেখায় ধানগাছগুলো। কিছুটা এসেই লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল দুঃখীরাম। ধানগাছগুলোকে তুলসীর গর্ভের শিশুর মতো বেড়ে উঠতে দেখে সে। অনাস্বাদিত পিতৃত্বে সে কাহিল হয়ে পড়ে ক্রমশ। রোদ অতি দ্রুত গায়ে তেল মাখার যত্ন নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। হাওয়ায় দোল খায় ধানক্ষেত। ভেজা, জল ধরা ক্ষেত-ভুঁই থেকে তুলসীর শরীরের কোমল-ক্লান্তিময় চেনা সুঘ্রাণ ভেসে আসে বাতাসে। ভাঙা আলোর উপর কাশফুলগুলো মৌলবী সাহেবের পাকা দাড়ির মতো নড়ছে, রোদ পড়ে সেগুলো আরো উজ্জ্বল। আমনভুঁইয়ে এইসময় থোড় আসে। থোড় আসলে তা বুকে পুরে নিয়ে যক্ষের ধনের মত আগলে বসে থাকে ধানগাছগুলো। তাদের দু'চোখ জুড়ে তখন খালি দুর্গা মায়ের উপাসনা। পুরো পূবমাঠ যেন দেবতার প্রাঙ্গণ। মা লক্ষ্মীর বিছানো আঁচল।

আজ পঞ্চমী। ভিন্ গাঁয়ের ঢাকি গুয়ারাম যাবে এই পথ দিয়ে। পাকা সড়ক থেকে নেমেই তাকে মাঠে-মাঠে যেতে হবে গাঁয়ে। গাঁয়ে ঢোকার এই একটাই পথ!

গুয়ারাম তার বাড়া ভাতে কাঠি দিলে দুঃখীরাম চুপচাপ বসে থাকবে এমন ছেলে সে নয়। তারও ঘর-সংসার আছে। পুরুতমশাই বলেছে, সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুল বাঁকাও। আজকাল সহজ, সাদাসিধের যুগ নয়, বেঁচে থাকতে গেলে প্রতি পদক্ষেপেই যুদ্ধ দরকার। তার জন্য রক্তপাত হলেও ক্ষতি নেই। গুয়ারামকে সে এ-গাঁয়ে ঢুকতে দেবে না। একবার ঢুকতে দিলে গুয়ারাম বছর বছর আসবে। শেয়াল যদি একবার আখক্ষেত চিনে যায় তাহলে তাকে ঠেকানো মুশকিল। হাতের লাঠি শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরে দুঃখীরাম সড়কমুখো তাকাল। তার দু'চোখ তখন বাঘের চোখ, সেই বাঘ প্রতিশোধ নেশায় ফুঁসছে।

মাঠপুকুরের চারধারে হাড়মটমটি আর রাং-চিতার ঝোড়। পুকুরের জলে কচুরীপানা আর হদির ছড়াছড়ি। তারই মাঝে বাসি গতরের ধুঁকো চোখ নিয়ে চেয়ে আছে পদ্মকলি, পদ্মফুল। তল্লাট জুড়ে ফাটান কুসুম রঙা রোদ ছড়িয়ে পড়েছে অকৃপণ। হাতের লাঠিটা আঁকড়ে ধরে চুপচাপ মশার কামড় খেয়ে বসে থাকে দুঃখীরাম। দৃষ্টি তার সড়কমুখো।

মানুষের সাথে লড়াই-বিবাদ দুঃখীরামের মনোপূতঃ নয়। সে চালে চাল ঠেকিয়ে

শান্তিতে থাকতে চায়। কারোর পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করার অভ্যাস তার নেই। তবু কেন যে সবাই তার পিছনে লাগে এটাই সে বুঝে উঠতে পারে না। তার খামতি কোথায়? সে তো কোনো অন্যায় করেনি?

ধাড়ী ছাগলটাকে আঁছড়ে মেরে দিল বীরবল। সবাই দেখল জানল তবু কেউ কোন প্রতিবাদ করল না। সবাই যেন বোবা। ধানচারাগুলো উপড়ে ফেলে দিল জলে। তার হয়ে কেউ দুটো কথা বলল না। সবাই যেন ঐ একটা মানুষের ভয়ে চুপ। সে নিজেও এতদিন চুপ ছিল কিন্তু পেটে টান পড়তেই টনক নড়ল তার। সারাটা বছর সে বড়পুজোর জন্য আশায় আশায় বসে থাকে। এবার সেই আশায় ছাই পড়তে সে যেন নিজের ভেতরে জেগে উঠল।

সাধুচরণ তার সাথে যে ব্যবহার করেছে—এমন ব্যবহার কোন জ্ঞাতিভাই করতে পারে বলে তার ধারণা ছিল না। সাধুচরণের উস্কানিতে বীরবল আরো সাহস পেয়ে গেল। সাধুচরণ ঘরের শত্রু, গোত্রের শত্রু, সমাজ শত্রু। এদের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে তার হাত কাঁপলে, ভয় পেলে চলবে না। সেই পৌরাণিক পালাটায় অর্জুন কেমন করে তীর ছুঁড়ল তার জ্ঞাতিভাইদের বিরুদ্ধে। কৃষ্ণ না থাকলে অর্জুন পাগল হয়ে যেত। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাত। লোপ পেত ধর্ম। হাতের লাঠি আঁকড়ে ধরে জঙ্গলের ভেতর লুকিয়ে বসে থাকল দুঃখীরাম। নিজের অস্তিত্বকে সে কোনদিন বিকিয়ে যেতে দেবে না। তাতে যা হয় হোক।

সূর্য মাঝের আকাশে যেতেই গুয়ারামের মুখোমুখি হ'ল দুঃখীরাম। আশ্বিন মাসের রোদে নুন-দেওয়া চারাগাছের মতো ঝিমিয়ে পড়ছিল ধানগাছগুলো। একটা ফিঙে পাখি জ্বালাতন করে মারছিল চরে বেড়ান ষাঁড়টাকে। তার পিঠের উপরে এক খাবলা ঘা। ফিঙে পাখিটা বারবার করে উড়ে এসে ঠুকরে দিচ্ছিল ঘা-টা।

গুয়ারাম বলল, তুমি, তুমি এখানে দুখুদা? কি ব্যাপার ঘেমে-নেয়ে যে একাকার হয়েচো! চলো গাঁয়ের দিকে যাবা না?

দুঃখীরাম ক্রোধ চেপে বলল, আমি তোমার জন্যই দেঁইড়ে আচি।

—কেন?

—কিচু জান না দেখচি? দুঃখীরাম ফেটে পড়ল আক্রোশে, তোমার জন্যি রাতে আমার ঘুম নেই, মনে শান্তি নেই। শরীরটাও চিমড়ে গেল।

—আমার জন্যি?

—তবে না তো কি? দুঃখীরাম পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল কিছুটা, ছাতি ফুলিয়ে বলল, তুমি আমার স্বজাতের লোক, বলতে গেলে জ্ঞাতিভাই। তোমার এমন আদেক্‌লা ভাব—আমার গায়ের লোম চাগিয়ে দেয়। মুখে থুতু উঠে আসে আমার। মুখপানে তাকাতেও ঘেন্না হয়।

—কি ব্যাপার খোল্‌সা করে বলোদিনি।

—তার আগে তুমি বলো, এক গাঁয়ের কুকুর কি আরেক গাঁয়ে যায়?

—যায় না।

—তাহলে তুমি কেন এয়েচো? জ্ঞাতিভাইয়ের ভাত মারতে তোমার এত সখ?

গুয়ারাম ঢাকটা নামিয়ে রাখল মাটিতে। ঘাড়ের কাছে রগড়ান দগদগানে চামে হাত বুলিয়ে বলল, আমি কারোর ভাত মারিনি, পেট মারিনি। আমার বলে নিজেরই পেট চলে না। এক গন্ডা ছানাপুনা নিয়ে আমার যে দিনটা যায় সেই দিনটাই ভাল। তুমি আমার পথ ছাড় দুখুদা, আমি বাজাতে যাব। রোদ চড়ছে। খপ্‌খপ্ আমায় যেতি দাও।

—দেব না-আ-আ-আ। পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে পাগলা হাতির মতো চেঁচিয়ে উঠল দুঃখীরাম, বুক থাবড়ে বলল, জান থাকতে তোমায় আমি যেতে দেবোনি। যেতে হলে আমায় ঠেলে যাও। মাড়িয়ে যাও।

—সরো। সরো বলচি।

—সরব না।

গুয়ারামের ধাক্কায় টলে পড়ে গেল দুঃখীরাম। গড়াতে গড়াতে জলের কাছে গিয়ে ঠেকল। জলশোলার গাছ ধরে হাপড়ে-সাপড়ে উঠে আসল ডাঙায়। চোখ রাঙিয়ে বলল, তুমি আমায় মারলে? তোমার ছাতি এত্তো বড়! দাঁড়াও। কথা শেষ না করেই দুঃখীরাম ছুটে গেল হাড়মটমটির ঝোপে। লুকিয়ে রাখা তেলতেলে লাঠিটা বের করে এনে সে ঠ্যাঙ্গাড়ের মতো দাঁড়াল।

এক পা, দু'পা করে পিছিয়ে যাচ্ছিল গুয়ারাম। ভয়ে তার চোখের তারা চঞ্চল। লাঠিটা বাগিয়ে নিয়ে মাটিতে দু'বার বাড়ি মেরে দুঃখীরাম বলল, পালাচ্চো কুথায়, দাঁড়াও? মায়ের দুধ খেয়ে থাকলে কল্‌জে ঠুকে দাঁড়াও।

—পিছোতে পিছোতে ঢেলায় বেঁধে পড়ে গিয়েছিল গুয়ারাম, সেই ঢেলাটাই চোখের নিমেষে তুলে নিয়ে সেও রুখে দাঁড়াল প্রবল উত্তেজনায়। পুকুরের চারধারে তখন দুটো মানুষ একে অপরকে তাড়া করে ছুটছে। তাদের ক্রোধী পায়ের চাপে থেঁতে হয়ে উঠে যাচ্ছে ধুলো। মানুষ দুটোর ভাঙা ছায়া পুকুরের জলে নড়ে। অশোথ গাছের মগডালে তখন দুটো শকুন ঝিমুনি চোখে তাকিয়ে। তারাও বুঝতে পারে না মানুষ দুটোর ক্রিয়াকান্ড।

এক সময় টাল খেয়ে, কোমর ধরে বাপ্‌রে বলে বসে পড়ল দুঃখীরাম। বাগ বুঝে সাথে সাথে ছুটে গেল গুয়ারাম। গিয়েই চড়ে বসল দুঃখীরামের উপর। তার হাতের লাঠিটা কেড়ে নিয়ে বলল, আমার মাথায় লাঠি ধরো, তোমার সাহস তো কম নয়? তোমার লাঠি যদি তোমার মাথা ফাটাই তাহলে কে তোমারে বাঁচাবে?

কোনমতে শ্বাস নিয়ে ঘড়ঘড়ে গলায় দুঃখীরাম বলল, কুকুরের মতো আমি বাঁচতে চাই না। গাঁ শুদ্ধ লোক আমার শত্রু, সবাই গদাধরবাবুর দলে। আমার গাভীন ছাগলটাকে ওর ছেলে আছড়ে মারল অথচ তার বিচার কেউ করল না। এ গাঁয়ে গরীব মানুষের কোন বিচার নেই।

কথাগুলো গুয়ারামের বিবেকে গিয়ে বাঁধল। মাথা ঝাঁকিয়ে দুঃখীরাম বলল, তুমি হলে জ্ঞাতিভাই। তোমার হাতে মরলে আমার কুনো পাপ নেই। মেরে ফেল। গলা দাবিয়ে মেরে ফেল—

দুঃখীরামের কথাগুলো গুয়ারামের কানে ঢুকল না। সে তাকিয়ে ছিল পুকুরপাড়ে পড়ে থাকা মরা কাকটার দিকে। পাখনা খসা সেই মরা কাকটাকে ঘিরে শোক বিহ্বল আরো

পাঁচ-ছটা কাক।

ওয়ারাম জানে, কাক কখনো কাকের মাংস খায় না। একটা নিম্নস্তরের পাখি যদি এই মতটা মানতে পারে তাহলে মানুষ হয়ে সে কেন পারবে না?

লাঠিটা দুঃখীরামের গলা থেকে তুলে নিয়ে গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল গুয়ারাম। তারপর ঢাকটা তুলে নিয়ে সে বলল, লড়ার আর দরকার নেই। আমি ফিরে যাচ্চি। কাক হয়ে কাকের মান্‌সো খাই কি করে? এত নীচ আমি হইনি। তোমার গাঁ নিয়ে তুমি থাকো। আমি চললেম। দু'পা গিয়েই আবার ঘুরে দাঁড়াল গুয়ারাম। যারা তোমাতে-আমাতে লড়িয়ে দেয় তারা সবার শত্রু। তাদের কুনোদিন ক্ষেমা করো না। কথাগুলো বলেই ঢাকটা কাঁধে ফেলে পাকা সড়কের দিকে চলে গেল গুয়ারাম।

খালাসী

কুম্ভুমশায়ের পাকা দালানে সাধনের ভাল ঘুম হয় না। রাতে এত মশা-মাছির উৎপাত যে একটু ঘুম আসলে ঘুম ভেঙে যায়। কাল অনেক রাত অব্দি পা দাবিয়ে দিতে বলেছিল ড্রাইভারদা। তার কথা অমান্য করার সাহস হয়নি। লোকটা রগচটা। বিগড়ে গেলে মুশকিল। তখন চাকরি নিয়ে টানাটানি। বাস-লাইনে ড্রাইভার-কান্ডাক্টরের মন জুগিয়ে না চললে হেল্পারদের চাকরি যাওয়ার ভয়। শুধু এই একটা ভয়ই দিন-রাত খুবলে খায় তাকে। ভয় নয় তো যেন একটা জ্যান্ত হলহলে সাপ। পেঁচিয়ে থাকে সর্বক্ষণ। নিস্তের নেই, শান্তি নেই। মেপে-মেপে পা ফেলা; বুঝে শুনে কথা বলা। একটু এদিক ওদিক হলেই বিপদের খাঁড়াটা ঘপাৎ করে নেমে আসবে ঘাড়ে। তখন কারোর সাধ্য নেই যে বাঁচায়।

থানার পেটা ঘড়িতে যখন ঢং ঢং করে বারটা বাজল তখন ড্রাইভারদা বলল, 'তুই শুয়ে পড় সাধন। কাল আবার ফার্স্ট ট্রিপ আছে। গাড়ি ধুতে হবে ভোরে। রাত তো অনেক হ'ল। যা শুয়ে পড়্‌গে।'

কন্ডাক্টর নাক ডাকছিল পাশের খাটিয়ায়। জব্বর শীত বলে মাথার উপর পাখাটা মরা। পাখার শব্দ হলে নাক ডাকার গর্জন কিছুটা কমে। ড্রাইভার-কন্ডাক্টর দু'জনেরই নাক ডাকার ধাত। শুলো কি মরল। অমনি পাঁচঘোড়ার ইঞ্জিন স্টার্ট। সব সহ্য কিন্তু নাকের হুঙ্কার সহ্য হয় না সাধনের। সারাদিনের রগড়ান, কচলান গতর তবু হুট করে ঘুম আসে না। বালিশে মাথাটা ডোবালেই বাসের ঘরঘর শব্দ, ঝাঁকুনী-দোলানী সব ঘুরপাক খায় মগজে। লাইনের টুকরো-টুকরো ঘটনা দল বেঁধে বিব্রত করে মারে। বারোটায় শুলে কি হবে ঘুম আসতে রাতটা আরো বুড়িয়ে যায়। তার উপরে কুম্ভুমশায়ের ঘরটা স্যাঁতসেতে, দিনের বেলাও রোদ ঢোকে না। প্লাসটার খসা ইটের গুঁড়োর উপর দিয়ে পিঁপড়ে হেঁটে বেড়ায়। এই জব্বর শীতে কটর-কটর ডেকে ওঠে কোলা ব্যাঙ। লাথ মারলেও সরে না, মড়ার মত পড়ে থাকে ঘরের কোণটায়। রোজই যাবার সময় ব্যাঙটাকে দেখে সাধন। দেখে মায়া হয়। ভগবানের জীব, ঠিক তারই মত অসহায়।

বাড়ি থেকে আসার সময় বিছানা-পত্তর বেশী কিছু আনতে পারেনি। শতরঞ্চিটা পেতে দিলে মেঝে থেকে হিম ওঠে। কোমরের কাছ থেকে হিম ভাবটা উঠে এসে চুলের গোড়াগুলো পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়। তখন গায়ের কাঁথাটা পা থেকে মাথা অব্দি ঢেকে দিলেও শীত যায় না। বুকটা বাতাসে লম্বা মাকড়সার জালের মত কাঁপে। কষ্ট হয়। ঘুম আসে না। রাতে হাওয়া বইলে পুরনো জানলা-দরজার ফাঁক-ফুঁক দিয়ে গুঁড়ো-গুঁড়ো শীতের রেণু ঢুকে আসে। ঘরময় ছড়িয়ে যায় জলীয় অণু। বাইরে টুপটুপিয়ে শিশিরপাতের শব্দ হয়। রাত কাঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। এই ঘনঘোর হিমেল নিঃসঙ্গ রাতকে দেখার কেউ নেই।

খুব মন খারাপ করলে টুক্ করে হুড়কো খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে সে। খদ্দরের চাদর আর নেটে বোনা মাফলারে পুরোদস্তুর ঢেকে নেয় নিজেকে। কুন্ডুমশাইয়ের ঘাস গজান সিমেন্টের বারান্দায় বসে সুদূর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে সে। তারাদের ইতি-উতি চাহনী ভাল লাগে দেখতে। পিটুলিগাছের কালপেঁচাটাও তখন নিশ্চুপ। এত বড় পৃথিবীতে তখন কোন শব্দ নেই, ধ্বনি নেই। কেবল কানে কানে কথা বলার মত এক ধরণের হেঁচকি ওঠার ব্যস্ততা। পিচ-সড়কে ঘেয়ো কুকুরটা কেঁদে যায় এক নাগাড়ে। বোবায় ধরা মানুষের চোখে সাধন তখন তাকিয়ে থাকে স্যাক্‌রাদের বাঁশঝাড়টার দিকে। বাঁশপাতার ফাঁকে আঁবের মত ফুলে থাকে চাঁদ। দুধফুলকা গাছটাও তার নজর এড়ায় না। ভাঙা পাঁচিলের গায়ে অবহেলা নিয়ে কি সুন্দর লক্‌লকিয়ে বেড়ে উঠেছে গাছটা। এই শীতে দুধের ফেনার মত ফুলে ফুলে ঠাসা। ভার-ভারন্ত লাজুকলতা।

কত রাতে কখন যে ঘুম এসেছিল একথা সাধন নিজেও জানে না। খাটা গতরে ঘুম যেন দুরারোগ্য ব্যাধি, একবার ধরলে চট করে ছাড়তে চায় না। থানার পেটা ঘড়িতে চারবার ঘন্টা পড়েছে অনেকক্ষণ আগেই। তবু বিছানা আঁকড়ে নির্জীব পোকার মত শুয়ে আছে সে। চোখে-মুখে ঠান্ডা জলের ছিটে না দিলে ভোররাতের ঘুম চট করে যাবে না। সাধন ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে। বিছানা গুটিয়ে খুব সন্তর্পণে বাইরে আসে সে। ঠান্ডা জলের ছোঁয়ায় পাঁচনের বড়ি খাওয়া এঁড়ে-বকনার মত ছুটে পালায় ঘুম। সে আর দেরী করে না। বালতি দুটো নিয়ে চলে যায় রাস্তার কলটায়। ভোরবেলা কল ফাঁকা। শুধু মেছো বাজারের কুকুরগুলো কুন্ডলী পাকিয়ে আমগাছটার গোড়ায় শুয়ে। সাধনকে দেখে বার দুই ডেকে তারা চুপ করে গেল। জল ভরে আবার ফিরে গেল সাধন। কুয়াশা মাখানো ভোরবেলাটা ভারি মনোরম। সাদা কাপড়ে জড়ান থনথনে বুড়ির মত চেহারা। শীত হাওয়ায় জল হাতটা ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। ঠোঁট দুটোও অবাধ্য। দাঁতে দাঁত লেগে যাবার উপক্রম।

খাটা পায়খানার কাছে জলের বালতি দুটো নামিয়ে রেখে সাধন আবার ফিরে আসে বাস-স্ট্যান্ডে। প্রতিদিনই দু'বালতি জল তাকে আগাম ভরে রাখতে হয়। নাহলে ড্রাইভার-কন্ডাক্টর খিস্তি-খেউরের বান ডাকাবে। প্রাতঃকৃত্য সারার জন্য ওদের দু'বালতি জল দরকার। বাস-লাইনে কাঁচা খিস্তির আলাদ একটা মূল্য আছে। যার যত ধার মুখ তার তত রমরমা।

বারশ বত্রিশ নাম্বার বাসটা সারারাত হিম খেয়ে রামুর চায়ের দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে। প্রতিদিন সকালে বাসটার ঘুম ভাঙায় সাধন। বডি ধোয়ার আগে সে বাসটাকে ছুঁয়ে দেখে বারকতক।

'ফাস্ট-কার' ছাড়বে ঠিক সকাল ছটা-দশে। তার আগে শিরাছেঁড়া রক্তের মতো ছিটকে পড়বে আলো। পাখ-পাখালির গুঞ্জনে মুখরিত হবে আমবাগান। বাস ধোয়া-মোছার কাজ সেরে সাধনকে রেডি হতে হবে তার আগে। নাহলে ড্রাইভারদা মুখ করে।

কোলাপ্‌সিপল গেট খুলে বাসের মধ্যে ঢুকে গেল সাধন। উবু হয়ে সীটের তলা থেকে বের করে আনল বালতি আর মবিলের মগটা। গেট খোলার শব্দে রামু হরেকৃষ্ণ গাইতে গাইতে চোখ তুলে তাকায়।

সাধন হি-হি কাঁপতে কাঁপতে বলে, 'রামুদা, এক কাপ চা দাও জলদি—'

'—আজ যে বড় লেট হল?' রামুর প্রশ্নে নিরুত্তর থাকে সাধন। কয়লার আঁচে ভাঙা তালপাতার ফটফট বাতাস দেয় রামু।

কুন্ডুলিপাকান ধোঁয়া আর কুয়াশা যেন যমজ দুইবোন। সাধন অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে কুয়াশা মাখামাখি ভোরের দিকে।

মাটির ভাঁড়ে ধোঁয়া ওঠা চা ধরিয়ে দেয় রামু। গায়ের চাদরটা ভাল মতন টেনে নিয়ে বলল, 'জব্বর ঠান্ডা পড়েচে তাই না? আজ আবার বৃষ্টি হলে রক্ষে নেই।'

সাধন ঘাড় নাড়ে।

রামু বলে, 'কি যে দিনকাল হলো, পাঁচ বছর আগেও অমন ঠান্ডা পড়ত না।'

কালরাতে ফেরার সময় বাহাদুরপুর ছাড়িয়ে বৃষ্টি নামল। বেশ মোটামোটা ভাতের দানার মত ফোঁটা। সাধন গেটে ছিল। পুরোটাই ভিজে যায় সে।

বেথুয়া আসার আগে জামা-প্যান্ট শুকিয়ে একেবারে খড়খড়ে।

খুচরো পয়সায় চায়ের দাম মেটায় সাধন। পয়সা-কপালে ঠেকিয়ে ক্যাশ-বাক্সে ঢুকিয়ে রাখে রামু।

—একটা বিড়ি হবে রামুদা?

সাধনের প্রশ্নে তির্যক হাসে রামু, 'বিড়ি কেন গো, সিগ্রেট কি দোষ করল? নাও, ঠান্ডায় একটা চারমিনার ধরাও।'

—'আমি বাপু বিড়ির লোক। সিগ্রেট কি আমাকে মানায়?'

—'তোমাকে মানায় না তো কাকে মানায়?' রামু জোর দিয়ে বলে কথাটা, 'বাস-লাইনে কাঁচা পয়সার ছড়াছড়ি। মন চাইলে সিগ্রেট ফেলে তুমি চুরুটও খেতে পার।'

রামুর ইঙ্গিতটা পছন্দ হয় না সাধনের। বাস-লাইনের সবাই কি চোর? মিথ্যে কথা। সবাই শোনা কথা বলে। শোনা কথার কি দাম? সকালবেলায় তর্ক বাধাতে ইচ্ছে করে না সাধনের।

রামু বলে, 'আজও কি লাস্ট-টিরিপ? হোটেল থেকে কি ভাত আনিয়ে রেখে দেব?'

—'ভাত লাগবে না। আমার জন্য এক পিস রুটি আর ঘুগনী এনে রেখে দিও। যাওয়ার সময় নিয়ে যাব।'

—'রাতভর রুটি খেয়ে থাকবে? পারবে তো?'

—'না পারলে উপায় নেই। বড় টানাটানি চলছে। বোনটার অসুখ, এখনও ভাল হল না। ওকে একদিন গোয়াড়ী নিয়ে যেতে হবে।'

কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে রামু। তারপর মাথা চুলকে বলে, 'হোটেলে তো ধার-বাকি চলে। খাও না কেন? বেতন পেলে দিয়ে দিও।'

—'তা হয় না রামুদা। ওজন বুঝে ভোজন করা ভাল। তাছাড়া ধার জিনিসটা আমার পছন্দ নয়। আমার মা বলে, ধার হল সর্বনাশের সিঁড়ি।'

কাচের বয়ামটা শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে আবার যত্ন করে তাকে সাজিয়ে রাখে রামু। বাস-স্ট্যান্ডের এই চা-দোকানটার বিক্রিবাট্টা ভাল। তাছাড়া রামুর ব্যবহারটাও ঝকঝকে। মনে রাখার মত। শুধু ব্যবহার নয়—রামুর চা বেশ উৎকৃষ্ট মানের। গোয়াড়ীবাজার থেকে

দামী চা আনিয়ে নেয় সে। বাসের লোকের সাথে তার দহরম-মহরম প্রচুর। তার কথা কেউ ফেলে না।

বাসের বডি ধোয়া-মোছার কাজে পরিশ্রম আছে। শর্ট-প্যান্ট আর খালি গায়ে সাধনের পুরুষালী চেহারাটা নজর কাড়ার মত। এসব কাজে শরীর-স্বাস্থ্যটাই আসল। তবু, ছ'খানা টায়ার ধুতে গিয়ে হাঁপিয়ে পড়ে সাধন। গা-ময় জলের ছিঁটে। মাথার চুলগুলো পর্যন্ত ভিজে গিয়েছে।

পুবদিক যতই ফর্সা হচ্ছিল ততই কাজের গতি বাড়ছিল সাধনের। এর মধ্যে দু'একজন প্যাসেঞ্জার জানলার ধারে সীট রেখে নেমে গিয়েছে চায়ের দোকানে। আস্তে আস্তে পিটুলিতলাটা ভরে যাচ্ছে মানুষের কথায়। সাধন একবার সলাজ চোখে নিজের দিকে তাকাল। জল গড়িয়ে পড়ছিল চওড়া বুকের চামড়া দিয়ে। এখন আর শীত ভাবটা নেই। জল নাড়া-ঘাটায় শীত উধাও।

খালি বালতিটা সীটের তলায় ঢুকিয়ে হড়বড়িয়ে সাধন নেমে আসে বাস থেকে। লোক বাড়লে খালি গায়ে থাকতে তার লজ্জা। বিশেষত মেয়েরা থাকলে তার লজ্জা পাওয়াটা আরো বেড়ে যায়।

হাটবার বলে বাসে আজ ভিড় বেশী। দেবগ্রাম থেকে ম্যাটাডোরগুলো ব্যবসায়ীদের নিয়ে ভোর ভোর চলে আসে। সাধন একটা ম্যাটাডোরের পিছনে দাঁড়িয়ে চৌরাস্তার দিকে তাকাল। ঘাড় ঝুঁকিয়ে কি যেন দেখার চেষ্টা করল অনেকক্ষণ। তারপর, হতাশ হয়ে চায়ের দোকানে ফিরে এসে বলল, 'আর এক কাপ চা দাও, রামুদা। বেশ কড়া করে বানিও। ঠান্ডায় একেবারে জমে গিয়েছি।'

রামু বলল, 'বসো। তোমার সাথে কথা আছে।'

ভিড় ফাঁকা হতেই রামু ক্যাশ-বাক্সের ড্রয়ার খুলে একটা চার ভাঁজ করা কাগজ ধরিয়ে দিল তার হাতে। চাপা গলায় বলল, 'তোমার চিঠি।'

—'চিঠি!' খুব অবাক হ'ল সাধন।

—'হ্যাঁ গো, সেই মোকামপাড়ার মেয়েটা দিয়েছে। বলল, তোমাকে দিয়ে দিতে। জরুরী কি সব কথা লেখা আছে।'

হতবাক সাধন কোনমতে চিঠিটা ধরে নিয়ে কলতলা অব্দি হেঁটে এল। বুকের ধুকধুকানী তখনো কমেনি। ভিন গাঁয়ের ব্যাপারীরা আগুন পোহাতে খড়কুটো জ্বেলেছে ঠিক টিউবল-এর চারপাশে। সাধনের শীত লাগছিল। সে আগুনের কাছে না গিয়ে চিঠির ওমে নিজেকে সেঁকে নিতে চাইল বারবার।

দুই

ময়না লিখেছে, 'কাল মঙ্গলবার। পারলে একবার বুড়োমাতলায় দেখা করো। আমি পুজো দিতে যাব। তোমার সাথে জরুরী কথা আছে। কোনমতে ভুল যেন না হয়। আর বিশেষ কিছু লিখলাম না। সাক্ষাৎ-এ সব কথা হবে।'

ময়নার চিঠিটা সাধনের বুক-পকেটে রাখা। ঠাকুরের সামনে ধূপ জ্বালতে গিয়ে উতলা

চোখদুটো চিঠিটাকে ছুঁয়ে এল বার কতক। মেয়েদের চিঠি বুকে রাখলে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। অজ্ঞাত এক ভয় মনের অবচেতনে ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়ায়। ভয়টা এমনই যাকে সে অগ্রাহ্য করতে পারে না। অনেকদিন ময়নার কাছ থেকে সে কোন চিঠি পায়নি। যতটুকু আনন্দ পাওয়ার কথা ছিল তা না হয়ে উল্টে বিব্রতবোধ করল সাধন। ময়নাকে সে বোঝাবে কি করে বাস লাইনের ক্যালেন্ডারে কোন লাল দাগ নেই। মালিকের কাছে ছুটি চাইলে মালিক তাকে ছেড়ে কথা বলবে না। পুকুরঘাটে পড়ে গিয়ে মায়ের হাতটা ভাঙল। ছুটির দরকার। মাকে কৃষ্ণনগরে নিয়ে যেতে হবে প্লাস্টার করাতে। অমন জরুরী দরকারের সময় সে ছুটি পায়নি।

গোয়াড়ী বাজারের মালিক বলেছে, 'সিজিনের সময় ছুটি হবে না। দু'এক দিনের জন্য লোক পাওয়া মুশকিল। তুমি লোক ঠিক করে দাও তাহলে দু'দিনের কেন দু'মাসের ছুটি দিয়ে দেব। ছুটি দিতে তো আমার কোন আপত্তি নেই।'

কাচ বাঁধানো মা কালীর ফটোর দিকে তাকিয়ে সাধনের বিড়বিড়ান থেমে যায়। মা কালীকে সে কি বলবে? ছুটির কথা মা কালীকে বলা যায় না। সর্বমোট চারজন দেব-দেবী আছেন। মা দুর্গা, মা কালী, সিদ্ধিদাতা গনেশ আর বাবা বিশ্বকর্মা। সাধন ফুলের মালাগুলো টপাটপ ফটোতে লটকে দিয়ে করজোড়ে প্রণাম করে নেমে এল।

এই সাত সকালে মাথাটা ভার হয়ে আছে সাধনের। বেশী ভাবনা-চিন্তে তার দ্বারা হয় না। তখন সব কাজ গুলিয়ে জবরজং হয়ে যায়। আজ প্রথম বাসে ওঠার সময় টায়ারকে প্রণাম করতে ভুলে গিয়েছে সে। ভাগ্যিস তখন ড্রাইভার পুটুবাবু ধারে কাছে ছিল না। থাকলে বাপের নাম 'খগেন হালদার' করে দিত। পুটুবাবু বলে, 'মানুষের যেমন কলজে তেমনি বাসের হল ইঞ্জিন। মানুষের যেমন পা তেমনি বাসের হল টায়ার। এই দুটো জিনিসের ওপর খেয়াল রাখবি। তাহলে 'ডু স্ফূর্তি, নো চিন্তা।'

ওঠার সময় প্রণাম করতে ভুলে গিয়েছিল কিন্তু বাস থেকে নামার সময় টায়ারে হাত ছুঁইয়ে প্রণাম করল সাধন। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ক্ষমা চাইল মনে মনে।

পুটুবাবু চা খাচ্ছিল রামুর চায়ের দোকানে, সাধনকে দেখতে পেয়ে ডাকল, 'আজ যে বড় মাঞ্জা করে ড্রেস দিয়েছিস! কি ব্যাপার রে, বরযাত্রী যাবি নাকি?'

সাধন লজ্জা পেয়ে মুখ নামিয়ে নিল মাটির দিকে। স্নান করার সময় সরষের তেল পায়নি। সাবান ঘষেছে গায়ে। মাথাটাও শ্যাম্পু করেছে। ফুরফুরে চুলে হাওয়া লেগে ঢেউ উঠেছে মাথায়। রাস্তার দুপাশের ধুলো-বালি দিন-রাত গায়ে লাগে। সাবান ঘষে স্নান করলেও গায়ের চ্যাটচ্যাটানী যায় না। তবে শীতকালে গা-গতরে একটু তেল দিলে চকচক হয় চামড়া। পুটুবাবুর কথায় সাধন নিজের দিকে তাকায়। লোকটার সব ভাল শুধু কথা-বার্তা বড় চাঁচাছোলা। কখন কি বলতে হয় জানে না। অভিমানটা হজম করে সাধন ঘাড় উঁচু করে তাকাল, 'কিছু বলবেন?'

'হ্যাঁ বলব বলেই তো ডাকছি।' চায়ে চুমুক দিয়ে পুটুবাবু বলল, 'বডিটা ভাল করে ধুয়েছিস তো? বডিতে ময়লা লেগে থাকলে মালিক গাল দিয়ে উদ্ধার করবে। আগে

থেকে বলে দিলাম।' চায়ের ভাঁড়ে শেষ চুমুক দিয়ে পুটুবাবু আবার সাধনের দিকে তাকাল, সেয়ানা গলায় বলল, 'ভজহরি যে মালাগুলো দিয়েছে তা মোটা না সরু? ব্যাটা যখন মালা দেবে তখন ভাল করে চেক করে নিবি। পরশু বাসি ফুলের মালা দিয়েছিল। অথচ দাম নিল টাটকা ফুলের। ব্যাটারছেলে দিন-দিন সেয়ানা হয়ে যাচ্ছে।'

—'আজকের মালা তো ঠিক আছে।' সাধনের কথায় বড় চোখ করে পুটুবাবু বলল, 'মালায় গন্ধ ছিল? শুকে দেখেছিস?'

—'ঠাকুরের মালা শুকতে নেই।'

—'মেলা পাকামু করিস না। যা বলছি তাই করবি। এটা আমার অর্ডার। স্টিয়ারিং তো তোকে ধরতে হয় না—আমাকে ধরতে হয়। অ্যাক্সিডেন্ট হলে কোন শালায় বাঁচাবে?' পুটুবাবুকে সমর্থন করল কন্ডাক্টর। কিছুটা কোনঠাসা বোধ করে সাধন। এরা দুটোয় চোরে-চোরে মাসতুতো ভাই। গেট-কালেকশন আর ছাদ-কালেকশানের পয়সাগুলো এরা দুটোয় মিলে নিয়ে নেয়। সাধনের বেলায় লব-ডঙ্কা। বিশেষ করে কন্ডাক্টরের তোষামদে স্বভাবটা সাধনের পছন্দ হয় না। রোগা মানুষগুলো কি সব এমন খিটখিটে?

পুটুবাবু সিগ্রেট ধরাল। ধোঁয়ার রিং তৈরী করে বলল, 'যা হর্ণ দিয়ে আয়। রোজ রোজ এক কথা কি তোকে বলে দিতে হবে? আর হ্যাঁ, সামনের কাচটা একটু মুছে দিস। কুয়াশায় রাস্তা দেখা যায় না।'

ঠিক ছটার সময় বাসের হর্ণ বাজায় সাধন। আগে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বাজাত, এখন ড্রাইভার সীটে বসে বাজায়। এই একটা কাজ তার খুব পছন্দ।

ড্রাইভার সীটে বসে হর্ণ বাজালে এক ধরণের গর্ববোধ তার ভিতরে কাজ করে যায়। যেদিন বাসের পাদানীতে পা রেখেছে সেদিন থেকে ঐ সীটটার দিকে তার নজর। পাইলট লেখা দরজা খুলে সে-ও একদিন ড্রাইভার সীটে বসবে এমন স্বপ্ন সে প্রতিটা মুহূর্তেই দেখে। যার জন্য সে পুটুবাবুকে তোয়াজ করে চলে, মুখে-মুখে তর্ক করে না। পুটুবাবুর জামা-প্যান্ট কাচা থেকে শুরু করে পায়খানার জল পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। এতে সে কখনো নিজেকে হীন ভাবে না। শিখতে গেলে গুরুদক্ষিণা দিতে হয়। একলব্য দিয়েছিল। সে-ও দেবে, যদি সুযোগ পায়।

কাজে অবহেলা করা সাধনের ধাতে নেই। তার বাবা চাক ঘুরাত। হাঁড়ি-কলসী-সরা-ঠিলি গড়ত। দু'বেলা মদ না হলে যে মানুষটার চলত না সেই খ্যাংড়া কাঠি মানুষটা কাজের সময় স্থির, অনড়। জিরতে বললে জিরত না। বলত, 'কাজের সময় কাজ। তখন ডান-বাঁ হলে চলে না। যারা ডান-বাঁ করে তারা তো গোরু।'

বাবার কথাটা সাধনের প্রায়ই মনে পড়ে। বাবা যদি মাতাল অবস্থায় জলে ডুবে না মরত তাহলে এতদিনে কলেজে পড়ত। এই বাসেই রোজ যেত-আসত।

হর্ণ বাজিয়ে সাধন আবার ফিরে আসে পিটুলিতলায়। সনাতনের আসার কথা আছে। সুষমার প্রেসক্রিপশনটা না দিয়ে গেলে ওষুধগুলো কেনা যাবে না। দশদিন হল কাজের

ঝামেলায় সে বাড়ি যেতে পারছে না। বাড়ি গেলে অসন্তুষ্ট হয় পুটুবাবু। চোখ রাঙিয়ে বলে, 'তোর কাজ শেখার মন নেই। শুধুমুধু কেন পড়ে আছিস গাড়িতে। যা ঘরে গিয়ে তোর বাপের মত চাক ঘোরা। তোর দ্বারা স্টিয়ারিং ঘোরান হবে না।'

পুটুবাবুর খোঁচা মারা কথাগুলো সাধনকে আরো জেদী করে তোলে। বা-লাইনে তার বংশের কেউ আসেনি। সেই-ই একমাত্র পুরুষ যে কিনা বাসের পাদানীতে পা দিয়ে রানিং বেল মারে, এক ঘন্টি মেরে থাকিয়ে দেয় বাস। সাধনের এক পাড়াতুতো মামা গোয়াড়ী গ্যারেজের ম্যানেজার। তার ধরাধরিতে বাস-খালাসীর চাকরিটা পেয়েছে সে। অথচ সাধনের ইচ্ছে ছিল গ্যারেজের কাজ শিখবে। গ্যারেজের কাজে ইজ্জৎ আলাদা। কাজটা ভালমত শিখতে পারলে ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না কোনদিন। ইচ্ছেটা তার পূরণ হল না, চাপা একটা দুঃখ থেকেই গেল।

সনাতনের সঙ্গে সাধনের দেখা হয়েছিল তিনদিন আগে। সনাতনই খবর দিল, সুষমার জ্বর এখনো ভাল হয়নি। হাসপাতালের ডাক্তার বলেছে, সদরে নিয়ে যেতে।

সাধনের ইচ্ছে সুষমাকে নিয়ে সে একবার সদরে যাবে। একমাসের কাছাকাছি হতে চলল অথচ এখনও জ্বরটা ভাল হল না। ঘরে গেলে, মা কাঁদে। বলে, 'সাধন রে কিছু একটা ব্যবস্থা কর। সুষমার ভাবগতিক ভাল বুঝছি না। মেয়েটা ভুগে ভুগে একেবারে কালি হয়ে গেল। মেয়েটার মুখের দিতে তাকাতে পারি না।'

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সনাতনের উপর রাগ হল সাধনের। অতবড় ভাইটা একেবারে কান্ডজ্ঞানহীন। সময়ের মূল্য বোঝে না।

চা-দোকান থেকে উঠে এসেছে পুটুবাবু। সাধনকে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল, 'হাঁ করে কি দেখছিস? গাড়ি ছাড়ার যে সময় হল। যা—শেষবারের জন্য টায়ারগুলো একবার চেক্ করে আয়।'

টায়ারটা চেক্ করে আসার পরে কন্ডাক্টর বলল, 'সাধন রে যা তো একটা তিনশো জর্দার পান এনে দে তো। কাল রাতের মালটা ভাল ছিল না। মুখটা হেজে আছে।'

লাস্ট-ট্রিপ থাকলে ড্রাইভার-কন্ডাক্টর দু'জনেই মদ খায়। সাধন হোটেল থেকে কষা মাংস এনে দেয় ভাঁড়ে করে। পুটুবাবু যেদিন বাংলা টানে সেদিন খুব বক্‌বক্ করে। কন্ডাক্টর মদ খেলেই ঝিমায়। তার আলতু-ফালতু বকার অভ্যাস নেই।

একটা আধুলি নিয়ে সাধন চলে গেল মধুর পানের দোকানে। কন্ডাক্টর বলল, 'পানটা বেঁধে আনিস। চুন আনতে ভুলিস না যেন। আর হ্যাঁ, একটু বেশী করে জর্দা দিতে বলবি। মধুটা দিন দিন বড় কৃপণ হয়ে যাচ্ছে।'

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে কথা বলা কন্ডাক্টরের অভ্যাস। একটু রাত জাগলে মেজাজটা তার টংয়ে থাকে। পয়সার ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে বাসের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে থামল। মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'কার্বন সব শেষ। তোর কাছে একটা টাকা হবে? আসার পথে একটা কার্বন আনিস তো।'

এবারও ঘাড় ঝুঁকাল সাধন। এদের ফাইফরমাশের শেষ নেই। যখন যা মনে হ'ল

বলে দিলেই হ'ল। সাধন এতে রাগে না। মনে মনে বিরক্ত হলেও সেই বিরক্তি বাইরে প্রকাশ পায় না। যে সয় সে-ই তো রয়। এতবড় একটা সত্য কি কখনো মিথ্যে হবে। ফাই-ফরমাশ খাটার মধ্যে তার যে স্বার্থ নেই তা নয়। কন্ডাক্টর ছুটি নিলে মাঝে মধ্যেই পয়সার ব্যাগটা তার ঘাড়ে ঝোলে। তখন অন্যরকম মনে হয় নিজেকে। পাদানীতে ঝোলার থেকে ঘাড়ে ব্যাগ ঝোলানো অনেক সম্মানের। বিশেষতঃ মেয়েদের সীটের সামনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটলে গর্বে বুকের ছাতিটা ফুলে যায়। তার হাতের লেখাটা তো খারাপ নয়। এসব গুণ মেয়েদের নজর এড়িয়ে যাবে? যদি এড়িয়ে যেত তাহলে ময়না কেন যেচে পড়ে আলাপ করল? মেয়েটা তো রোজ যেত-আসত। ভীতু চোখ তুলে কখনো-সখনো তাকাত। তখনই ধড়াস করে উঠত সাধনের বুক। ভয় পেত, আবার সাহসও পেত। চোখে যে কি মায়া থাকে? রাতেও মনে পড়ত চোখ দুটো। বড় আটপৌরে মেয়ে ময়না, তবু চেহারার মধ্যে নজর কাড়া একটা দিক ছিল। সাধনের মনে হয় ময়নার চোখদুটো ওর শরীরের সব। ভেজা তুলসী পাতার মত সর্বদা চক্চক্ করত চোখ দুটো আর চোখের মণি দুটো বর্ষার জামের চেয়েও কুচকুচে কালো।

যখন তখন ময়নার কথা মনে পড়লে ছ্যাৎ করে ওঠে সাধনের বুকের ভেরতটা। তখন কষ্টকে আর কষ্ট মনে না। বাস-লাইনে না এলে ময়নার সাথে কি তার আলাপ হোত? অসম্ভব। ময়না ছাড়া সে কোন মেয়ের চোখের দিকে তাকায়নি। তার অত সাহস নেই। ভীতু।

হাটগাছায় রোজ নেমে যায় ময়না। তার হাতে দু'ভাজ করা টিকিট। সাধনও হাত বাড়িয়ে দেয়, 'টিকিট?'

পাতলা কাগজটা সাধনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে ঠোঁটে হাসির সুক্ষ্ম রেখা ফুটিয়ে রোজই কাঁচা পথটা মাড়িয়ে গাঁয়ের ভেতর ঢুকে যেত ময়না। তার হাতে ফোল্ডিং ছাতা, খাতা-পত্তর আরো কত কি। পরে জেনেছিল ময়না চাকরি করে। খুব সামান্য টাকা তার বেতন। কাজও এমন কিছু নয়। দুবেলা সে স্কুলের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের বুলগার-হুইটের খিচুড়ি রান্না করে খাওয়ায়। তাদের দেখা-শোনার সব দায়-দায়িত্ব তার।

বুক পকেটে ময়নার চিঠিটা উঁচিয়ে উঠেছিল। নজর পড়তে সাধন কেমন ভ্যাবাচেকা খাওয়া চোখে তাকাল। কন্ডাক্টর হুঁশিয়ার মানুষ। খোঁচা মেরে বলল, 'দাঁড়িয়ে থাকলি যে! যাবিটা কখন? যা, লেট হলে ফার্স্ট-ট্রেন' যে বেরিয়ে যাবে।

সাধনকে দেখে ড্রাইভার বলল, 'এ্যায় শোন, এক প্যাকেট চারমিনার এনে দে তো। দেখে শুনে কিনবি। কালকের মত ড্যাম্প ধরা মাল না হয়!'

ঢিমে তালে পা ফেলছিল সাধন। সে জানে, সে ফিরে না আসা অব্দি বাস ছাড়বে না। সাধনের মুদুমন্দ হাঁটা দেখে পটুবাবু বলল, 'অমন মেয়েমানুষের মত হাঁটলে বাস ছাড়ব কখন? স্টার্টার কি তোর বোনাই যে লেট হলেও মাগনা-মাগনি ছেড়ে দেবে।

সাধন শুধু একবার করুণ চোখে তাকাল। তাতে খিঁচিয়ে কন্ডাক্টর, 'দেখছিস কি দৌড়ে যা। ছটা দশ হতে আর মাত্র দু মিনিট বাকি আছে।'

সাধন হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এসে দেখল সনাতন তখনও বাস স্ট্যান্ডে আসেনি। মনটা খারাপ হয়ে গেল বড্ড। ভাইটার সাথে কি আজও দেখা হবে না।

ঠাসভর্তি বাসটায় গমগম করছে প্রায় শতেক মনুষ্যের কথা। 'ফার্স্ট-কারে' লেডিসের ভিড়টা কম। ময়না ফার্স্ট-কারে প্রতিদিন যায়। রোজ যে সীটটায় ময়না বসে আজ সেখানে একটা বুড়ি বসেছে। সাধন একপলক তাকিয়ে চোখটা ঘুরিয়ে নিল সেখান থেকে। ফাঁকা মনটা হু হু করে উঠল অজান্তে। আজ ময়না আসবে না, আসার হলে এতক্ষণ সে এসে যেত।

দু'চারবার থাবড়া মারতেই পুটুবাবু ড্রাইভার-সীটের ওখান থেকে তাকাল। চোখা-চোখি হ'ল দুজনের। একটা দু'ভাঁজ ছোট তোয়ালে পুটুবাবুর ঘাড়ের ওপর ফেলা। সাধনের সংকেত পেতেই বাস গড়াল সামনের দিকে। বাসটা যখন ময়রা-দোকনের কাছাকাছি এসেছে তখনই 'দাদা, দাদা' বলে প্রায় শ'গজ দূর থেকে ছুটে আসছিল সনাতন।

মুখ ঝুঁকিয়ে বাসের রডটা শক্ত হাতে আঁকড়ে সাধন ভাইয়ের দিকে তাকাল। রাস্তার দু'পাশের ধুলো উড়ছিল বাতাসে। প্রাণপণ ছুটে এসে সনাতন প্রায় ধরে ফেলেছিল বাসটাকে, সাধনও চেষ্টা করছিল হাত দিয়ে টেনে তুলে নেবে ভাইকে। তারপর কথাবার্তা সেরে বুড়োমাতলায় নামিয়ে দিলেই হ'ল।

সনাতন হয়ত পারত কিন্তু তার চটির নীল ফিতেটা ছিঁড়ে গেল হঠাৎ। গতি থেমে গেল মুহূর্তে। তবু হারার ছেলে নয় সনাতন। সে এক পায়ে চটি আর এক পা খালি এই অবস্থায় ছুটে এল থানার রাস্তার কাছাকাছি। জোরে নিঃশ্বাস ফেলে চিৎকার করে বলল, 'দাদারে, মা বলেছে—সুষমার জন্য আপেল আনতে।' কথা শেষ না করে প্রেসক্রীপশনটা তুলে দিল সনাতন। সে আর যেন কি সব বলছিল কিন্তু ইঞ্জিনের শব্দে কিছুই শুনতে পেল না সাধন। বাসের গতি বাড়ার সাথে সাথে ঝাপসা হতে হতে ক্রমশ হারিয়ে গেল সনাতন।

তিন

কালীগঞ্জ টু কৃষ্ণনগর পথ বেশী নয়। বাস থেমে থেমে যায় বলে আড়াই-তিন ঘন্টা সময় লাগে। আপ-ডাউন প্রায় ছ'সাত ঘন্টার ধাক্কা। দেবগ্রাম, বেথুয়া আর ধুবুলিয়ায় বাস কিছু সময় বেশী থামে। পুটুবাবুর মেজাজ ভাল থাকলে বেথুয়াতেই নাস্তা-জলপানি সেরে নেয় সাধন। গেটের পয়সায় তিন জনের টিফিন খরচা হয়ে যায়। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে পুটুবাবু তার উপরে সদয়। এক কাপ খেঁচা খেলে সাধনকেও না খাইয়ে ছাড়ে না। লোকটার যখন মেজাজ ভাল থাকে তখন একেবারে মাটির মানুষ। কেবল বকর বকর করতেই থাকে। পুটুবাবুর দিল-খোলা ব্যাবহার সাধনের ভাল লাগে। সাধন জেনেছে পুটুবাবু তার মত বাস-খালাসীতে ঢুকেছিল। তখন বাস-লাইনের অত ডিমান্ড ছিল না। লোক পাওয়াই মুশকিল।

দেবগ্রামের পর থেকে ভাল স্পীড তুলেছে পুটুবাবু। চৌত্রিশ নাম্বার জাতীয় সড়ক

ফাঁকা, মাঝে-মধ্যে দু'একটা লরী পাশ কাটিয়ে চলে যায়। বাসের বডির সাথে ঘষটানী লাগার চান্স থাকলে জোরসে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে মুখভর্তি গালিগালাজ করে পুটুবাবু। সাধন তখন রানিং-থাবড়া মারে বাসে। পুটুবাবু ড্রাইভার-সীট থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে আড় চোখে তাকায়। তাতেই পিলে চমকে যায় সাধনের।

নাগাদি পেরিয়ে আসতেই পিছনের চাকাটা বার দুই লাফিয়ে উঠে পাম্প ছেড়ে দিল বিকট শব্দে। ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল বাসটা। ড্রইভার-সীট থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল পুটুবাবু। তারপর সিগ্রেট ধরিয়ে এগিয়ে গেল জোড়া টায়ারটার কাছে। সাধন কাচুমাচু চোখে তাকাল।

কন্ডাক্টর ছাড়ার পাত্র নয়। সে আগেই নেমে এসেছে। সাধনকে কটাক্ষ করে বলল, 'শুধু ঘন্টা মারলেই হবে? সব দিক খেয়াল রাখতে হয়। দিলি তো টায়ারটাকে চোট খাইয়ে।' সাধন দেখল একটা ছুঁচলো খোয়াপাথর ঢুকে গিয়েছে টায়ারে। স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে ওটা বের করে এনে সে ড্রাইভারের মুখের দিকে তাকাল।

পুটুবাবু গম্ভীর মুখে বলল, 'গাড়ির কাজে চোখ কান হাত মুখ পা সব দরকার। এলার্ট না হলে বিপদ হবেই। যা, দাঁড়িয়ে না থেকে ছাদ থেকে টায়ারটা নামা। দড়িটা বাসের ভেতরে আছে' ওটা নিয়ে আয়। নাহলে অত ভারী টায়ারটা নামাবি কি করে?'

কন্ডাক্টর রাগে ফুঁসছিল, সে সাধনকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'জানিস, তোকে বেচলেও একটা টায়ারের দাম হবে না। একটু যদি নজর রাখতিস তাহলে টায়ারটার ক্ষতি হ'ত না। আর মাঝপথে এত হ্যাপা পোহাতে হোত না।'

বাসের ভেতর থেকে দড়িটা নিয়ে লোহার সিঁড়ি বেয়ে তরতরিয়ে ছাদে উঠে এল সাধন। টায়ার নামান রিস্কি-কাজ। পাংচারের সময় বাস-খালাসীর দৈহিক তাগত জাচাই হয়ে যায়। একখানা টায়ারের নাট-বল্টু খোলা-লাগানো মুখের কথা নয়।

ড্রাইভার আঙুলের টোকা মেরে অন্য টায়ারটার হাওয়া পরখ করল। কন্ডাক্টরকে নিচু গলায় বলল, 'টায়ারটা এখন না পাল্টালেও চলত। অন্যটায় হার্ড-পাম্প আছে, ওটা দিয়ে কাজ চলে যেত।'

—'না, না রিস্ক নিয়ে লাভ নেই। চাকা খোলা থাকলে যাওয়ার পথে গ্যারেজে ফেলে দেব। তাছাড়া মালিক জানলে ঝাড়বে। কি দরকার বেফালতু ঝামেলা ঘাড়ে নেওয়া।'

কন্ডাক্টরের কথায় ড্রাইভার আর কিছু বলল না। টায়ারটা নামিয়ে বাসের নিচে সটপাট শুয়ে পড়ল সাধন। জ্যাক্ না ফিট্ করলে চাকা খোলায় অসুবিধা। পুটুবাবু তুড়ি মেরে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে বলল, 'শালা, রাস্তার অবস্থা দেখ—যেন দাদ হয়েছে।'

তার কথায় সায় দিয়ে কন্ডাক্টর, বলল 'টাকা মেরে ফাঁক করে দিলে রোডের কাজ আর হবে কি করে? পিচ বিক্রির টাকায় বাবুদের দোতলা ঘর উঠেছে হাই-স্ট্রীটে।'

একজন যাত্রী রসিকতা করে বলল, 'সবই উপরওয়ালাদের দয়া। রাস্তার যা হাল হয়েছে তাতে গোরুর গাড়ি চলার অযোগ্য। কে বলবে এটা ন্যাশানাল হাইওয়ে?'

যাত্রীটার কথায় সায় দিল পুটুবাবু, সরকারের সমালোচনা করে বলল, 'যে যায় লঙ্কায়,

সে হয় রাবণ।'

একজন কুড়ি একুশ বাইশ বছরের ছোকরা সে যাচ্ছিল কৃষ্ণনগর এমপ্লয়মেন্ট একসচেঞ্জে কার্ড করাতে, রেগে মেগে বলল, 'দেশটাকে ভূতে ধরেছে। ভূত ছাড়ানোর তেমন ওঝা কোথায়?'

বাসের তলা থেকে বেরিয়ে এসে প্যান্ট-শার্টের ধুলো ঝাড়ল সাধন। চাকা খুলে চাকা পাল্টাল দ্রুত। নাটগুলো টাইট দিয়ে যন্ত্রপাতিগুলো রেখে এল সিটের নিচে। ড্রাইভার 'পাইলট' লেখা দরজা খুলে উঠে এল নিজের জায়গায়। ভিড় বাসটায় তিল ধরানোর জায়গা নেই। বাসের টেপ-রেকর্ডারে মান্না দের একটা ক্যাসেট বাজছিল ঃ প্রতিটি মানুষের জীবনে প্রেম আসে। ...যখন এই গানটা শোনে তখনই সাধন কেমন উন্মনা হয়ে পড়ে। আজও তার একই দশা হ'ল। কন্ডাক্টর কাছে ছিল। সে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'তোর আর থাকার দরকার নেই এদিকটা আমি সামলে নেব। তুই বরং ছাদে যা। ছাদের কালেকশানটা সেরে ফেল...'

খোড়ে নদীর উপর দিয়ে বাসটা যখন যাচ্ছিল তখন ঝিলমিল রোদে শীতের বংশ বলতে নেই। নদীর কাছে আসলে সাধনের কেমন ঝিমুনী আসে শরীরে। জলীয়হাওয়ায় আরাম খোঁজে মনটা। শহরে ঢোকার মুখে জলঙ্গী নদীটা ক্যালেন্ডারের ছবির চেয়েও সুন্দর। ব্রীজ পেরলেই উইমেন্স কলেজ স্টপেজ। কলকল হাসতে হাসতে মেয়েরা নেমে যায় সেখানে। পুরো বাসটা অর্দ্ধেকের বেশী খালি হয়ে যায়। সাধনের মনে হয়, বাগান ভর্তি ফুল কেউ যেন জোর করে তুলে নিয়ে গেল। বাসটা যেন সেই খাপছাড়া বাগান!

কালেক্টরী আসার আগে হাত দেখিয়ে রানিং বাসে উঠে এল মালিক। ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে তবু এখনও রানিং বরাসে উঠতে কষ্ট হয় না। মালিকের সাথে চোখা-চুখি হতে কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করল সাধন। দেখেও না দেখার ভান করে ভেতরে ঢুকে গেল মালিক। উপেক্ষায় সাময়িক নিস্তেজ হয়ে যায় সাধন।

হাই স্ট্রীটের দু'ধারে বেশ জবরদস্ত জ্যাম। ফুটপাতে মানুষের বিরামহীন চলা। এত মানুষের নিঃশ্বাসে নিজেকে মিশিয়ে দিতে ভালো লাগে সাধনের। কালিগঞ্জে এই সুযোগ নেই যা কৃষ্ণনগরে আছে। সাধনের অনেকদিনের ইচ্ছে, যদি ভগবান দিন দেয় তাহলে বারদোলের মেলায় ময়নাকে নিয়ে আসবে। স্টুডিও-তে গিয়ে ছবি তুলবে। সিনেমা দেখবে পাশাপাশি বসে। পর মুহূর্তে সে বড় মনের দিক থেকে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। ময়না কি কৃষ্ণনগর অব্দি আসবে? তার দৌড় তো দেবগ্রাম অব্দি। যদি কোন কারণে ময়না আসে তাহলে সাধন তাকে খোড়ে নদীর ধারে নিয়ে যাবে। তার যত কথা আছে সব নিঃশেষ করে ময়নাকে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে। যদি সম্ভব হয়, যদি মনে বল পায় তাহলে ঐ দিন সে ময়নার হাত দুটো ছুঁয়ে দেবে—যা আজও হয়নি ছ'মাসের মেলা-মেশায়। তারপর হোটেলে মাংস-ভাত খেয়ে লাস্ট-বাস ধরে ফিরে যাবে গ্রামে।

ড্রাইভারের ধমক খেয়ে সাধন বড় রাস্তার দিকে তাকাল। একটা রিক্সা রাস্তার মাঝামাঝি এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে বেকায়দায়। পুটুবাবু 'এয়ারব্রেক' মেরে থামিয়ে দিয়েছে

বাস। ঝাঁকুনী খেয়ে রাস্তার মাঝখানে বাসটা বেখাপ্পা দাঁড়িয়ে।

মালিক টিকিটের হিসাব মেলাচ্ছিল তর্জনীতে থুতু লাগিয়ে। সাধনের দিকে আগুন উগরান চোখে তাকাল। থতমত খেয়ে বাস থেকে নেমে পড়ল সাধন। দু'হাতে রিক্সটা সাইডে সরিয়ে দিয়ে সে আবার উঠে এল বাসে।

পুটুবাবু হর্ণ মেরে খেঁকিয়ে উঠল, 'তালকানা।'

মালিক এগিয়ে এল সামনে, চশমার কাচ মুছে বলল, সব দিক খেয়াল রাখতে হয়। গেটে দাঁড়ানো হাওয়া খাওয়ার জন্য নয়।'

মালিকের যা মুড এখন ছুটির কথা বলা যায় না। ময়নার চিঠিটার দিকে নজর যেতেই অভিমানে ঠোটটা কেঁপে উঠল সাধনের। মুখের ঘাম প্যান্টের পেছনে মুছে নিয়ে সে দেখল ক্যাশ বুঝে নিয়ে মালিক নেমে যাচ্ছে রানিংয়ে। এতক্ষণের ভাবনাগুলো সুতোর গিঁটের মত জড়িয়ে গেল মগজে।

বাস-স্ট্যান্ড থেকে বাস ছাড়বে ঠিক দশটায়। তার আগে পেট্রোল পাম্পে যাবে বাস। তেল ভরে আবার ফিরে আসবে স্ট্যান্ডে। হোটেলে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে ওরা তিনজন বসেছিল পিছনের লম্বা সীটে। কন্ডাক্টর তার চোয়াল বসা মুখ নাড়িয়ে বলল, 'মালিক না তো একটা চশমখোর। ওয়ান পাইস ফাদার-মাদার। এমন হাড়কিপটে মানুষ আমি লাইফে দেখিনি। পাই-টু-পাই হিসাব নিয়ে চলে গেল। একটা পান খাবারও পয়সা নেই।' পুটুবাবু আর সাধন চুপচাপ শুনছিল। কন্ডাক্টর তার গায়ের সোয়েটার খুলে বলল, 'শালার গরম দেখ! কে বলবে শীতকাল? যত গরম এই কৃষ্ণনগরে। এই পাপী জায়গায়—'

সাধন বলল, 'কর্কটক্রান্তি রেখা কৃষ্ণনগরের উপরে দিয়ে গিয়েছে। ভূগোল বইতে পড়েছি। যার জন্য কৃষ্ণনগরে একটু গরম বেশী।'

পুটুবাবু ভূগোলের মধ্যে গেল না। রাগে তার ভেতরটাও জ্বলছিল। মালিক তাকেও ধোঁকা দিয়েছে। বেতন বাড়ানোর পুরনো আব্দারটা এখনও মেনে নেয়নি মালিক। নাক কুঁচকে পুটুবাবু বলল, 'দুনিয়ার সব মালিকই এক। কেউ জোঁক, কেউ হাঙ্গর। ভেবেছিলাম, আজ একটা ভুটিয়া সোয়েটার কিনব—তা-ও হ'ল না। যা ছিল সব ঝেড়ে-ঝুড়ে নিয়ে গেল। উল্টে লেট রানের জন্য চোখ রাঙ্গিয়ে গেল যেন আমি শালা তার বাপের ধারি। দেব যেদিন মাল টেনে বাস খাদে নামিয়ে সেদিন বুঝবে। এখনও ব্যাঙ্ক লোন শোধ হয়নি, বুঝবে ঠ্যালাটা।'

কন্ডাক্টর ডিবা থেকে চুন বের করে খৈনী ডলছিল। সাধন তাকিয়েছিল সেইদিকে। এই খৈনী খাওয়া নেশাটাকে সাধন একদম সহ্য করতে পারে না। বাসের কাজে ঢোকার পর থেকে সে বিড়ি-সিগারেট খায় তার মাড়ির চারপাশটা ক্ষয়া। ঘুম থেকে উঠলে বিশ্রী একটা গন্ধ লেগে থাকে মুখে। বিড়ি সিগ্রেট খেলেও একধরণের বাজে গন্ধে মুখটা ভরে থাকে যা একেবারে অসহ্য।

প্যান্ট কাচতে গিয়ে পকেটে সিগারেটের টুকরো পেয়েছিল সুষমা। সেই টুকরো মা-

ও দেখেছিল। খাওয়ার সময় তার মা সতর্ক করে বলেছিল, 'মদই তোর বাবাকে অসময়ে শেষ করে দিল। নাহলে কতই বা বয়স হয়েছিল ওর...'

ঠিক দশটার সময় স্ট্যান্ড থেকে বাস ছেড়ে দিল। ত্রিশ টাকা পুটুবাবুর কাছ থেকে হাওলৎ নিয়ে সুষমার জন্য ওষুধ কিনে এনেছে সাধন। আজ লাস্ট-ট্রিপ সেরে সে বাড়ী যাবে। ওষুধগুলো পৌঁছনোর দরকার। প্রায় দিন পনের হ'ল সে বাড়ি যায়নি। বাড়ি গেলে ড্রাইভার-কন্ডাক্টরের অসুবিধা হয়। তাদের ফাইফরমায়েশ খাটার লোক থাকে না।

বাহাদুরপুর ছাড়িয়ে এসে রাস্তা একেবারে ফাঁকা। পুটুবাবু গাঁই-গাঁই করে বাস ছোটাচ্ছে। টায়ারের সাথে লেপটে উড়ছে ধুলো-খড়কুটো। কপালের দু'পাশটা দপ্‌দপ্‌ করছিল সাধনের। কি মনে হতে একটা ঘন্টি মেরে বাসটা থামাল সাধন। পুটুবাবু নেমে এল সঙ্গে সঙ্গে।

—'কি হলো রে?'

সাধন বলল, 'রাস্তা খারাপ। টায়ারটা একটু চেক করব। পিচ গলছে। টায়ারে খোয়া আটকে গেলে পাংচার হাওয়ার চান্স আছে।''

খুশী হল ড্রাইভার। লম্বা স্ক্রু-ড্রাইভার হাতে চাকা চেক করে এল সাধন। ফিরে এসে সে দেখল একটা অর্জুনগাছের ছায়ায় পুটুবাবু দাঁড়িয়ে, সিগ্রেট ধরিয়ে ফকাফক টানছে। গাছটার গায়ে একটা সিনেমার রঙিন পোস্টার সাটান। নায়িকার হাত ধরে নায়ক ছুটে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে তারা? সাধনের হঠাৎ মন কেমন করে উঠল। বাসে রানিং-বেল দিয়ে সে ভাবল, খোলা আকাশের নিচে সব মেয়েই কি প্রবাহিত নদী?

চার

বিকেলে দেবগ্রামের চৌরাস্তার মোড়টা বেশ জমজমাট।

বাস থেকে নেমেই পুটুবাবু এক কাপ চায়ের জন্য কাতর হয়ে পড়ল। দেবগ্রামে আসলে ভদ্রলোকের চায়ের ক্ষিদেটা বেড়ে যায়। কোনমতে বাসটা কালীগঞ্জ রাস্তার একপাশে দাঁড় করিয়ে পুটুবাবু আর সময় নষ্ট করল না। শীতের বেলা তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়।

সাধনের চোখ অন্য নেশায় ঘুরছিল। তার মন বলছিল, আজ ময়নার সাথে দেখা হলেও হতে পারে। মাঝে-মধ্যেই বন্ধুদের সাথে ময়না আসে 'বলাকায়' সিনেমা দেখতে। তখন দেখা হলেও ময়না কোন কথা বলে না। আড়চোখে তাকিয়ে অল্প হেসে না চেনার ভান করে দূরে সরে যায়। ময়নার এমন সলাজ চাহুনী সাধনের ভাল লাগে। বুকের ভেতরটায় গুড়গুড় শব্দ হয়, আকাশকে মনে হয় কত নীল!

আজ পুটুবাবু চায়ের দোকানে না গিয়ে দশ হাত সামনে দাঁড়ান ম্যাটাডোরটার দিকে এগিয়ে গেল। ম্যাটাডোরের ঝামেলায় লাইনে টিকিট বিক্রি কমেছে। মালিককে বললে মালিক বোঝে না। বাস-টাইমের আগে-ভাগেই ম্যাটাডোর সব প্যাসেঞ্জার তুলে নিয়ে পালায়। যাত্রীরাও বাসের জন্য বে-ফালতু সময় নষ্ট করে না। মালিকের ধারণা, টিকিট

বিক্রি ঠিকই আছে, টাকাগুলো চোপাট করে দিচ্ছে বাসের-স্টাফ।

রাগটা অনেকদিনের।

পুটুবাবু ছুটে গিয়ে ম্যাটাডোর ড্রাইভারের কলার চেপে ধরল। সক্রোধে বলল, 'বাসের আগে কোন ম্যাটাডোর যাবে না। যদি যায় তো বাস-টাইমের পরে যাবে।'

ম্যাটাডোর ড্রাইভার হোমরা-চোমড়া যুবক। পুটুবাবুর চোখ রাঙানীকে পাত্তা না দিয়ে বলল, 'যাবে, একশ বার যাবে। রাস্তা কারোর বাবার কেনা নয়।'

—'তুই আমার বাবা তুললি?' সময় নষ্ট না করে সজোরে একটা ঘুষি লাগিয়ে দিল ম্যাটাডোর-ড্রাইভারের মুখে, 'আজ তোকে আমি মেরেই ফেলব। আয়, শালা। বড্ড বাড় বেড়েছিস। আজ সব তেল শুকিয়ে ছেড়ে দেব। এতদিন কিছু বলিনি—মুখের খাতিরে ছেড়ে দিয়েছি। আজ আর আমি ছাড়ব না, একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়ব।'

কলার ছাড়িয়ে ম্যাটাডোর-ড্রাইভার রুখে দাঁড়াল পুটুবাবুর সামনে। নাক দিয়ে গল গল করে রক্ত বেরুচ্ছে। রক্ত দেখে মাথাটা খারাপ হয়ে গেল ছেলেটার। সে হাওয়ার বেগে ছুটে গেল গাড়িতে। একটা মাঝারী মাপের রড় বের করে এনে ঝাঁপিয়ে পড়ল পুটুবাবুর উপর।

পাশেই দাঁড়িয়েছিল সাধন। বাড়াবাড়ি দেখে সে দাঁড়িয়ে গেল সামনে। কনডাক্টর ম্যাটাডোরের ডালা খুলে প্যাজেঞ্জার নামাতে ব্যস্ত। তার এদিকে খেয়াল নেই।

সাধনকে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে দেখে ম্যাটাডোর-ড্রাইভার বলল, 'সরে যা সাধন। বন্ধু বলে কিন্তু পার পাবি না। শালা, ড্রাইভারের আজকে গুষ্টির ষষ্ঠীপূজা করে ছাড়ব। কৃষ্ণনগর থেকে এসে এখানে মস্তানী দেখাচ্ছে। ভেবেছে, গাঁয়ের ছেলে বলে আমরা একেবারে ভেড়া। দেব যেদিন স্বর্গে তুলে বুঝবে।'

সাধন সরল না। তাকে জোর করে সরিয়ে দিল রঘুনাথ। কন্ডাক্টর পয়সার ব্যাগ নিয়ে ম্যাটাডোর থেকে লাফিয়ে পড়েছে নিচে, 'তবে রে শালা এতদূর স্পর্ধা। পুটুদার গায়ে হাত তুললি? দাঁড়া, তোর মজা দেখাচ্ছি।' উবু হয়ে চোখের নিমেষে একটা আধলা ইঁট তুলে নিল কন্ডাক্টর।

ম্যাটাডোর ড্রাইভার রঘুনাথ পিছু হাঁটবার ছেলে নয়। সে-ও রড বাগিয়ে একপা-দু'পা করে এগিয়ে এল কাছে।

রাগ দেখে পুটুবাবুর হম্বিতম্বি কোথায় ঢুকে গিয়েছে। একপা দুপা পিছু হাঁটছিল সে।

গলার শির ফুলিয়ে সাধন বলল, 'অনেক হয়েছে, আর এগোলে কিন্তু ভাল হবে না। সব বাড়াবাড়ির একটা শেষ আছে। দোষ করবি তুই, আবার উল্টে চোখ রাঙাবি? ভেবেছিসটা কি বলত?'

রঘুনাথ ঢেলার চেয়েও কঠিন চোখে তাকাল। মাটিতে রডের বাড়ি মেরে বলল, 'দালালীপানা ছুটিয়ে দেব। চাক ঘুরনো কুমোর তুই এই লাইনের কি বুঝিস রে, সরে যা বলছি। বাস খালাসির তেজ দেখ যেন রাবণের ব্যাটা।'

খালাসী শব্দটা সহ্য হয় না সাধনের। মাথাটা চোঁ-করে ঘুরে গেল তার। নাক-কান-চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল মুহূর্তে। পুরুষবিক্রমে এগিয়ে গিয়ে রঘুনাথের হাতের রডটা কেড়ে নিল সে। পটুবাবু দাঁত মুখ কিড়মিড় করে বলল, 'আচ্ছাসে ধোলাই দে শালাকে। তারপর যা হয় দেখা যাবে।'

রঘুনাথের দানব-শক্তির কাছে সাধনের শক্তি কিছু নয়। অল্প সময়ের মধ্যে হাওয়া বইলে উল্টো দিকে। ম্যাটাডোরের-হেল্পার কানু দূর থেকে ছুটে এসে সজোরে একটা লাথি মারল সাধনের তলপেটে। ভারসাম্য হারিয়ে দূরে ছিটকে পড়ল সাধন। অনেক চেষ্টা করেও মাথাটা তুলতে পারল না সে। শুয়ে শুয়ে দেখল গোলাকার ভিড়ের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে ময়না। তার পাশে আরও দু'জন মেয়ে।

সাধনের পায়ের তলার মাটি যেন সরে যাচ্ছিল ক্রমশ। দ্বিতীয়বার তাকাতে সে আর ময়নাকে দেখতে পেল না। শেষবারের মত কানু তার মাথাটা রাস্তায় ঠুকে দিয়ে গালাগালি দিয়ে চলে গেল হিন্দি সিনেমার ভিলেনের মত।

কানু চলে যেতেই কন্ডাক্টর টেনে তুলল সাধনকে। বিড়বিড়িয়ে বলল, 'তোর কি তুলোর শরীর, ঐ প্যাংলাটাকে দিতে পারলি না ঘা কতক।'

ড্রাইভার গম্ভীর মুখে এগিয়ে এল সাধনের কাছে। পায়ের ধুলো ঝেড়ে সাধন তখন কিছুটা ফিট। ড্রাইভার তাকে উৎসাহ দেওয়ার ভঙ্গিমায় বলল, 'সাব্বাস সাধন। তোর হিম্মৎ আছে বলতে হবে। আজ থেকে তোকে আমি চেলা করে নিলাম। কাল তুই ষ্টীয়ারিং ধরবি, আমি তোকে শেখাব।'

যন্ত্রণা ভুলে অবাক চোখে সাধন তাকাল।

পটুবাবু বলল, 'দেখছিস কি। পটু হালদারের এক বাপ, এক জবান। নড়চড় হবে না।'

দত্ত ফার্মেসী থেকে আয়োডীন লাগিয়ে ফেরার সময় ময়নার সাথে সাধনের দেখা হ'ল লাইট-পোষ্টটার নীচে। চোখাচুখি হতেই ময়না বলল, 'সাধনদা-একটু দাঁড়াও।'

—'কিছু বলবে?' অপরাধীর মত তাকিয়ে থাকল সাধন।

ময়না বলল, 'তোমার চোখের কাছটা ফুলে গিয়েছে। টকসাইড নিয়েছ? না নিলে নিয়ে নিও। নখের আঁচড়ে বিষ থাকে। তাছাড়া শয়তানের নখে বিষের পরিমান বেশী থাকে।'

—'তুমি কি সিনেমায় এসেছিলে?' অন্য প্রসঙ্গে যেতে চাইল সাধন।

—'না আমি তোমার সাথে দেখা করার জন্য দেবগ্রাম অব্দি এসেছি। তুমি কি আমার চিঠিটা পাওনি?'

—'পেয়েছি।'

—'কি ভাবলে?'

—'এখনও কিছু ভাবিনি।'

মনমরা চোখে ময়না তাকাল। মুখ নিচু করে বলল, 'আমার খুব বিপদ। তোমাকে

সব খুলে বলা দরকার। কিন্তু সময়ই পাচ্ছি না যে তোমাকে বলব। আচ্ছা চিন্টুদাকে তুমি চোনো?'

—'চিন্টুদাকে চিনব না! ও তো এখন গ্রামের মাথা।'

—'ঠিক ধরেছ। ওর জন্যই আমার চাকরিটা হয়েছে। চিন্টুদাই তো এম এল এ'কে বলে কয়ে সব কিছু ঠিক করে দিল। কিন্তু...'

—'এর মধ্যে আবার কিন্তু কি? চাকরিটা তোমার খুব দরকার ছিল।'

ময়না ফ্যাকাসে চোখে তাকাল, বলব না বলব না করেও বলে ফেলল, 'তুমি আমাকে ভালবাসো, সেই জন্য কথাটা তোমাকে বলা দরকার। চাকরিটা পেয়েছি ঠিকই কিন্তু চাকরির বিনিময়ে চিন্টুদা আমাকে...।' কথা শেষ না করে ফুঁপিয়ে উঠল ময়না, 'আমি নষ্ট হয়ে গিয়েছি। আমি নষ্ট মেয়ে। এর পরেও কি তুমি আমার সাথে মিশবে?'

জোরে হর্ণ বাজাচ্ছিল পুটুবাবু, হর্ণের শব্দে ময়নার কথাগুলো ভাল মতন শুনতে পেল না সাধন। বাস ছাড়ার আর দেরী নেই। লালগোলা প্যাসেঞ্জার অনেক আগেই পলাশীর দিকে চলে গেছে। ব্যস্ত গলায় সাধন বলল, 'চলো বাস ছেড়ে দেবে।

বাসে এসে ময়নার সাথে একটাও কথা হয় না সাধনের। হাটগাছায় আসতেই শ্যালো-মেশিনের শব্দ ভেসে এল হাওয়ায়। কচি গমের দোলানীতে একটুও সুখ পেল না সাধন। ময়নার কথাগুলো ঘুরে ফিরে মনে পড়ছিল। চোখ নয়, মনটাই টাটিয়ে উঠছিল যন্ত্রণায়। চিন্টুদাকে গ্রামের সেরা ছেলে বলেই সে জানত। তার জানাটা কত ভুল।

রাতে কিছুতেই ঘুম আসছিল না সাধনের। সনাতন লাস্ট-কারের সময় স্ট্যান্ডে আসেনি। যার-জন্য সুষমার ওষুধগুলো কুন্ডুমশায়ের তাকের উপর সাজান আছে। সুষমা আপেল খেতে ভালবাসে। অথচ আপেল আনতেই ভুলে গিয়েছে সে। পুটুবাবু মদ খাওয়ার সময় কাছে ডেকেছিল সাধনকে। পিঠে হাত রেখে বলেছিল, 'খুব লেগেছে তাই না। কিছু মনে করিস না। বাস-লাইনটাই এইরকম।'

পুটুবাবুর কথা শুনে ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠেছিল সাধনের। চোখ দুটো ছলছল করছিল জলে।

পুটুবাবু বলল, 'ভুলে যা সাধন, ও নিয়ে আর ভাবিস না। যা হবার তো হয়ে গিয়েছে। মন থেকে সব মুছে ফেল। নাহলে কষ্টে পাওয়াটা বাড়বে।

অনেকক্ষণ পরে সাধন বলল, আমি সব ভুলে গিয়েছি। ড্রাইভারদা।

—তাহলে তোর চোখে জল কেন? মোছ, মুছে ফেল...। পুটুবাবু বলল, 'তাকে একটা গেলাস আছে পেড়ে আন। আজ আর একা খাব না। তুই-ও খাবি। যে লাইনের যে রেওয়াজ।'

অনেক রাত অব্দি মদ খেয়ে বেহেস্ত মাতাল হয়ে শুয়ে পড়ল সাধন। কিন্তু দু'চোখের পাতা এক হ'ল না। বারবার করে ময়নার কথাগুলো মনে পড়ল, 'সাধনদা, অন্যের বমি পরিষ্কার করা তোমার কাজ। একাজে তোমার কোন ঘৃণা নেই দেখছি। তুমি কি পার না আরেক বারের জন্য এমন কাজ করতে?'

সাধন বিড়বিড়িয়ে বলল, 'পারব ময়না, পারব। মানুষ পারে না, এমন কি কাজ আছে?'

মে, ১৯৯১

চরণ

খোলস ছাড়ানো কেউটের মত আর একটা সকাল।

শীত হাওয়ায় সজনে ফুল টুপটুপিয়ে ঝড়ে পড়লে স্ফূর্তি বাড়ে ছাগলছানার। আর ক'দিন পরে আমড়াগাছ পোষাক পরবে কচি পাতার। যমুনার মনে সুখের শিশির। লগায় করে পাতা ভেঙে দেবে ছাগলছানাদের। লেজ নাড়িয়ে, মুখে গাঁজরা তুলে তিড়ং-বিড়িং নাচতে নাচতে পাতা খাবে ছা'গুলো।

এমন সুখের ছবি চরণের বিসদৃশ। হুঁকরে উঠে বলে, যমুনে রে! পিঁড়ায় ছাগল লাফালে বংশ লোপ পায়। বাতি দেওয়ার কেউ থাকেনি।

ভরা পেটে হাত বুলিয়ে যমুনা ভরা ভাদোর নদী, তবু অসহায় চোখে তাকায়। ছলছলে চোখে ভয়ের প্রচ্ছায়া। বেড়া থেকে আইড়ি ডালটা টেনে এনে সে ছাগল গুলোকে খেদায়। এমন দৃশ্যেও চরণ বড় মনমরা। বউটা তার কাছে সুখ চেয়েছিল, পায়নি। পাওয়ার মধ্যে কেবল ঐ সাত মাসের পেটটা। তবু সোহাগী বউ যমুনা, তাকে নিয়ে চরণের হুমড়ে পড়া সংসার।

আইড়ি-ডালটা দূরে ছুঁড়ে হাঁপানো গলায় যমুনা বলে, আমি মরি মরব তবু, পেটেরটাকে মারবোনি। ওগো, বাঁশের এট্টা কোঁড়া ভেঙে গেলে বাঁশেরও দুঃখ হয়— আমি তো মানুষ।

—সে তো হাজার কথার এক কথা। চরণ যমুনার হাত ধরে, বউ রে, অভাব মানুষের তাবিজ নয়। বর্ষাকালটা আস্তে দে, তোরে আমি কানপাশা গড়িয়ে দেব। মড়ক লাগলে আমারে আর দেখে কে? ছেরানী রোগে ভাগাড় তখন জমজমাট। খাল ছাড়ালেই পয়সা, একেবারে কড়কড়ে নোট। কে তখন আর মহাজনের পায়ে তেল দিতে যায়? দেখিস, আমার কথাটা মিছে হবে না।

পুরো বর্ষাকালটা সাবাড়। হেমন্ত পেরিয়ে শীত এল। ভাগাড়ের ঘাস কচি কাঁচা। ডোবার জলে শ্যাপলা-শালুক-কচুরিপানা। তবু একটা গোরু-ছাগলের দেখা নেই। তা বলে আশা ছাড়েনি চরণ। তখন ঠ্যাংয়ের উপর ঠ্যাং দিয়ে গ্যাট্‌সে বসে ঝোলা গুড় দিয়ে রুটি খাওয়া। সময়ে-অসময়ে একটু-আধটু তাড়ি, হাঁড়িয়া। খুব বেশী হয়ে হলে গ্যাঁজরা গুড়ের মদ, চোলাই কিংবা বাংলা। বিধি চাইলে কি না হয়? খসখসিয়া কপালও চক্‌চকায়।

শীতের হাওয়া ভোঁতা ক্ষুরের মত চিরে দেয় গাল। ছেঁড়া তুষের চাদরটা গায়ে জড়ালেও শীত ভাবটা যায় না। তখন দু'হাতের তালুতে মুখটা চেপে ধরে চরণ। কাঁচা পাকা দাড়ি নাড়া-জাগান হেমন্তের মাঠ। কতদিন ছুর (দাড়ি কামানো) হয়নি। একটা ব্লেডপাত চার আনার কমে হয় না। ফলে থ্যাবড়া নাকের গোল মুখটা চষা জমিন। ফুটা

নাকের নিচে ডাকাতপ্রমাণ গোঁফ। মন ভাল থাকলে ঐ পুরু গোঁফে ছাগলের চর্বি ঘষে চরণ। এতে নাকি চিকনাই বাড়ে গোঁফের।

যমুনা মুখ ভেংচে রগড় করে বলে, তোমার কি ঘেন্না লাগেনি গো। চর্বি ঘষলে কটা মেরে যায় গোঁফ। খারাপ দেখায়।

দেখতে খারাপ দেখালেও চরণের কিছু করার নেই। তার বাপ ঠাকুবদা ঘষত, সে-ও ঘষে। এতে খারাপ লাগলে কি এসে যায়? বাপ-মায়ের প্রথম সন্তান বলে তার নাক-কান ফুঁড়িয়ে দিয়েছে ধাইবুড়ি। ক্ষামি হলে নাকি যমেও ছোঁয় না। গোঁফ কামালে চরণ আর চরণ থাকে না, পচা কালবাউস। তখন সার্সিতে নিজেকে সে চিনতে পারে না। কেমন গোরুচোরের মত মুখ। থলথলে চেহারায় মেয়েলী ছাপ।

এসব কথা বুঝিয়ে বলতেই যমুনার সে কী হাসি, পারো বটে তোমরা মরদরা!

প্রতিদিন যা করে চরণ আজও তার ব্যতিক্রম হয় না। গামছা ছেড়ে পরনে তার ঢোলা খাকি প্যান্ট, হাঁটু অব্দি ঝুল। গায়ে ফাটা ফুটো হলদেটে গেঞ্জি। চরণ যে গাঁ ঘুরতে বেরিয়েছে এই হ'ল তার নিশানা। হাতে একটা লাঠি,.লাঠিটা তার বাপের। মরার পরে এই একটা জিনিস চিতায় দেয়নি চরণ। লাঠি ঠুকতে ঠুকতে গাঁ ঘুরতে যেত সে। পরনের লেংটি কাপড় তাজা রক্তে ভেজা। অর্শ ছিল বাপটার। সেই অর্শই কাল হ'ল তার। চরণের অর্শ নেই, কাশব্যামো। শীত-বর্ষায় হাঁপানির টান ওঠে। যমুনা তখন রসুনতেল বুকটাতে ডলে দেয়। কখনো মধু দিয়ে তুলসীপাতার রস, কখনো বাসক পাতার রস। চরণ কোঁত-কোঁত করে গেলে। বেঁচে থাকতে তার বড় সখ। সেই সখের জন্য তার হাতে, গলায় এমনকি কোমরেও ছোট-বড় মাদুলি। পীরবাবা থেকে শুরু করে ওঝাগুণিন কাউকে সে বাদ দেয়নি। তবু সে ফাটা গলায় বলে, বুঝলি রে যমুনে, এ রোগ সারার নয়। এ রোগ সারে চিতায়।

যমুনা হাত চাপা দেয় চরণের মুখে, অমন অলুক্ষুণে কথা বলো না গো, আমার বড় ভয় করে। চরণ হাসে হা-হা, ভয় করলেই ভয় নাহলে জগৎ-সনসার জয়। জন্মেছি, মরবো তো একদিন। তবে পেটের জ্বালায় মরলে সে দুঃখ রাখবো কোথায়?

এই এক ভয় চরণের। গাঁ জুড়ে এখন আকাল। ভোট চুকতে মানুষগুলো মিয়ান মুড়ি। গাঁয়ের মাতব্বর অনাথবাবু তার কাছে একজোড়া জুতো পায়। ভাগাড়ে মোষ পড়লে মালিককে একজোড়া জুতো দিতে হয়। অনাথবাবুর মোষ, জুতো তার হক। কিন্তু চামড়াটা জোর করে ছাড়িয়ে নিল আতর আলী মহাজন। খিস্তি দিয়ে বলল, একটা চামে কি দাদনের টাকা শোধ হয়? ফির আসব, ফির নিব। ভাগাড়ের পুরা চাম আমার।

অভাবে পড়লে আতর আলী-ই ভরসা। হাত পাতলে সে তাকে ফেরায় না। গঞ্জে তার চামড়ার কারবার রমরমা। এ অঞ্চলের সব খাল-ছাড়ানো মানুষগুলো আতর- আলীর ট্যাকে গোঁজা। তার শকুন চোখ. শেয়াল বুদ্ধি। ক্ষুর-চাকু আর চ্যাতরা পাথরটা বাঁধতে গিয়ে মানুষটার ক্ষেপা দৃষ্টি তাকে তাড়া করে। গলা শুকিয়ে ঘড়ঘড়ে বিশ্রী এক শব্দ হয়।

যমুনা বলে, কি হ'ল গো, জল খাবা?

ঘাড় ঝুঁকায় চরণ, টিনের গেলাসে জল এনে দেয় যমুনা। জল খেয়ে স্বাভাবিক হয়

চরণ। মেজাজ বুঝে নিচু গলায় বলে, ঘরে এক মুঠো চাল নেই। পারলে চাট্টিখানি গোম এনো। গোম ভাজি খেয়ে আচ দিনটা কাটিয়ে দেবো।

চরণ আকাশ-পাতাল ভাবে। বেঁচে থাকার জন্য মানুষটাকে কি না করতে হয়। শুধু খাল ছাড়িয়ে জাত ব্যবসায় এখন আর পেট চলবে না। চরণ তাই বেতের কাজটা শিখে নিয়েছে। এ কাজে পয়সা আছে, কিন্তু পুঁজি চাই। চরণের কোন পুঁজি নেই। অনাথবাবু পঞ্চায়েত থেকে টাকা দেবে বলেছিল। কিন্তু কোন মুখ নিয়ে বাবুর কাছে যাওয়া যায়? গেলেই তো বাবু খালি পা দেখায়, চরণ রে, এখনো তুই জুতো জোড়াটা দিলি না? ভাগাড়ের খাজনাটাও দিলি না। এসব কাজ কিন্তু মোটেই ভাল নয়। এর ফল খারাপ হবে। কালুটা ঘুরঘুর করছে ভাগাড়ের লোভে। ভোটে সে আমাদের হয়ে খেটেছে। ভ্যান-রিকসো করে বুথ অব্দি লোক নিয়ে গিয়েছে বিশ-খেপ। একটা পয়সাও চায়নি।

—দেব বাবু, সময়টা বড় খারাপ যাচ্ছে গো...

—সময় কার ভাল যায়? সময় তো এমনি কেটে-কুটে যায়। তা ছাড়া তোর তো কোন খারাপ সময় দেখি না। সময় খারাপ হলে কোন মানুষটা দুটো বিয়ে করে? রাঁঢ় পোষে?

এই এক কথায় চরণ কুপোকাৎ। বাবুরাও জেনে গিয়েছে যমুনা তার রাঁঢ়। আসলে সূর্য উঠলে কখনো বগল চাপা দিয়ে রোখা যায় না!

বেতের ব্যবসায় চরণের বরাত এখন চালুনীর উপর সর্ষে। বেতের অভাবে নতুন ধামা বুনতে পারে না। তাই ফাটা ফুটো সারে। ধামার মুড়ো ভেঙে গেলে তিন টাকা। নতুন করে ছাইতে গেলে দশ-বারো টাকা। যন্ত্রপাতিও সব কিনতে পারেনি। টাকা কোথায়? মহাজনের কাছে ধার চেয়েছিল। চামড়ার মহাজন রেগে-মেগে বলেছে, বেত ব্যবসায় মন দিলে ভাগাড় কাটবে কে? দাদনের টাকা তিন মাসের মধ্যে শোধ না দিলে তোর চালাঘরের বাতা আমি খুলে আনব। কেউ আমাকে এটকুতে পারবে না।

এই ভয়টা রাতের ঘুম পাতলা করেছে চরণের। চাঁদিতে তার একছটাকও চুল নেই, শুধু পেছনপানে খামচা খামচা চুল। সেখানে বহুবার হাত পড়েছে মহাজনের। কঁকিয়ে উঠে চরণ বলেছে, ছাড় গো বাবু, বড্ড লাগে। তোমার ধার আমি যে করেই হোক শোধ দিব। চুলটা ছাড়ো। ওগুলান উঠে গেলে যমুনা যে আমার হাতের বাইরে চলে যাবে।

হাঁটতে চলতে এই কথাগুলোই মনে পড়ে চরণের। ভয়ে কাঠ হয়ে যায় শরীর। এ গাঁয়ের দু'জন মানুষের মুখ সে দেখতে চায় না, দেখলে দিন ভাল যায় না। অনাথবাবু জুতোর জন্য পাগল। বলে, জুতো না পেলে তোরে একদিন জুতাব। জুতিয়ে মুখ ভেঙে দেব। যতসব ঠকবাজের বাচ্চা। আর মহাজন? সে তো সেয়ানার সেয়ানা। ঘরে না পেলে সাইকেল হাঁকিয়ে সে ভাগাড় অব্দি চলে আসে তাগাদায়। চরণও কম চালাক নয়। সুযোগ পেলে সে-ও দিনচরা শেয়ালের মত সুড়সুড় করে নিজেকে লুকোয় পোদ্দারদের আখক্ষেতে। বাবুদের বিশ বিঘার চর সেখানে। ছাতি সমান আখগাছ। ঢ্যাঙা পাতার আড়ালে চরণকে কে খুঁজে পায়? মহাজন ফিরে গেলে সে আবার হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে আসে

বাইরে। বুক চিত্তান উবির (কাছিম) মত আকাশ দেখে।

খিরিযগাছের পাশ দিয়ে চড়া পড়া পথটা মিশেছে মোরাম ফেলা পথে। এখানে আসলে আকাশ যে অপরাজিত নীল তা বোঝা যায়। পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ সর্বত্র নীল মেঘের যাতায়াত। চরণের চোখে আকাশের রং নীল নয়—কালো। শুধুই কালো কালো ফোঁটা। সেই কালো ফোঁটাই বরাত ভাল হলে ডানা মেলে উড়োজাহাজের মত ওড়ে। একটা, দুটো... কত। শকুন আর শকুন। ভাগাড়খেগো শকুন।

আকাশে শকুন দেখলে এই বয়সেও মাথার ঠিক থাকে না চরণের। হাত উঁচিয়ে কণ্ঠা কাঁপিয়ে ডাকে, আয় বাপ, নেমে আয়। উপর আকাশ থিকে নিচ আকাশে নেমে আয়। আমারে পথ দেখিয়ে ভাগাড় পানে নিয়ে চল। তোরা ভিন্ন আমার যে আর কেউ নেই, বাপ!

দুঃখ চরণের শরীরের ঘাম, লেপটে থাকে ছাড়ে না। দুই ছেলে ভিটেপানে আসে না। বাপকে দেখলে রাগে তাদের গা-জ্বলে। বলে বেড়ায়, বুড়ো বয়সে বাপের আমার ভীমরতি ধরেচে। নাহলে মেয়ের বয়সী মেয়েকে কেউ রাঁঢ় পোষে!

ছিঃ-ছিঃ, এমন কথা কানে শোনাও পাপ। চরণ আর মাথা তুলে হাঁটতে পারে না। এর চেয়ে ভাগাড়ের শকুনগুলো ঢের ভালো। তাকে দেখলে মাথা নিচু করে সরে দাঁড়ায়। আত্মীয়ের চোখে তাকায়। যমুনা গর্ভবতী। তার পেটে তো অমন আর একটা শকুনের ছা। দুনিয়াতে শকুন ভরে গেলে কোথায় দাঁড়াবে চরণ?

আজ আকাশে শকুন নেই। শকুন থাকলেও কুয়াশায় তা দেখা যায় না। শুধু ঘোড়ানিমের ডালে বসে কাকটা ডাকে—কা-কা। এতদূর থেকে কাকটাকেও ভালমতন দেখতে পায় না চরণ। নজর ঘোলা হলে দুনিয়া ঘোলা। চোখ রগড়ে, পিঁচুটি মুছে চরণ ভাবে, সন্তান কখনো শকুন হয়, নাকি সে নিজেই শকুন? তুলসীগাছের হর পাতাতেই এক বাসনা।

অনাথবাবু বলে, তোদের খোলমকুচি জীবন। জলের উপর কাতিয়ে মারলে ছড়ছড়্। একটু এদিক-ওদিক হলেই ভুস করে জলের গভীরে, তখন আর কেউ হদিস পায় না। চরণের বড়ব্যাটা বলে, খোলামকুচি তো খোলমকুচি! তা বাবু, হাঁড়ি ভাঙাও খোলমকুচি, লোহার কড়াই ভাঙাও খোলামকুচি। এই খোলামকুচি, শরীলে যেদিন গাঁথবে সেদিন একেবারে রক্তারক্তি ধনুস্টঙ্কার। তখন জান-প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

বাপের পেশায় ছোট বড় কেউ এল না। তাদের শুধু মগজভর্তি রাগ। ফুঁসে উঠে বলে, তোমার ভাগাড় তুমি সামলাও। তোমার ঐ ক্ষুর-চাকুতে আমাদের কোন লোভ নেই। ছোটটা আরেক কাঠি উপরে। সে বলল, সদরে আমি কার্ড করিয়েচি। পিওন পোস্টে ঢুকে গেলে বাবুদের মতন আসব-যাব।

ভাগাড় আগলে চরণের এখন দিনগত পাপক্ষয়। যমুনার মন ভালো থাকলে সে-ও অনেক স্বপ্ন দেখে। ভরা পেটে হাত বুলিয়ে বলে, আমার ছানাপুনা হলে তারে আমি চাম কাটতে পাঠাবোনি। যে কাজে মান নেই সে কাজে আমার সন্তান নেই। ছেঁড়া শাড়ির ফাঁক দিয়ে তখন উঁকি মারে পেঁপে রঙের স্তন। তবু বউটার স্বপ্ন দেখা থামে

না। তার দিঘল চোখে কালো হরিণীর মায়া, কাজল নদীর জল। চরণ ভ্যাল ভ্যাল করে দেখে, ভয়ের কাঠব্যাঙটা বুকের ভেতর লাফায়। ঠোঁট ফুলিয়ে যমুনা কাঁদে রাতে। হাঁটুর উপর হাঁটু, অবিকল শঙ্খ লাগা সাপ। পায়ের বুড়ো আঙুলে কামজ্বর। নাভিকুন্ডের চারপাশে সিরসিরানি ঘাম। ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, তুমি আমারে টেনে আনলে এই জন্যে? তোমার এত খোঁচা মারা কথা আমার সহ্য হয় না।

—তোর তো কুনো অভাব রাখিনি। ছেলে চেয়েছিস ছেলে দিয়েচি। এর পরেও তোর আশ মেটে না।

যমুনার তবু আশ মেটে না। বলে, পেটেরটাকে আমি বাঁচাতে চাই।

—ওসব কাক-শকুনকে বাঁচিয়ে রেখে লাভ কি? বড় হলে বলবে, বাপ খেতে দে। তখন?

যমুনার ছলছলান চোখ, চরণ তখনই কসাই। তবু ডুকরে উঠে বলে, আমি চাইনে আর একটা শকুন আমারে খুঁবলে খাক। যমুনে রে, ও পেট তুই ধসিয়ে ফেল।

.—জীব হত্যা মহাপাপ। যমুনা কত বোঝায়। দু'চোখে অনবরত শিশিরপাত।

তরলা বাঁশের চেয়েও সাদাসিদে মেয়ে যমুনা, ফাড়ালে ফাড়ে— ম্যাচিস্ কাটির চেয়েও নরম। প্রথম দিকে চলছিল ভালো। কমদামী রেডিও'তে দু'বেলা হিন্দী গান। বিবিধ- ভারতী, রোববারে বোরোলিনের সংসার। বুকের উপর রেডিও নিয়ে যমুনা সত্যিকারের যমুনা নদী। কালো রেডিওটা বুকের ঢেউয়ে ভেসে যাওয়া কালো পান্‌সী। হাবলু তাকে এত সুখ দিতে পারেনি। আসলে সে একটা কচি খোকাও কত রাত জেগে দিতে পারেনি। মেয়েরা কি শুধু খাওয়া-পরা চায়? মানুষজীবন সে তো একটা গাছ। ফল-ফুল না আসলে কি তার দাম? তখন চন্দনকাঠও পিটুলিকাঠ। শানবাঁধান ঘাটও মরা ঘাট। জ্যোৎস্না রাতও শোকের রাত।

সাত বছরে বড় হাঁপিয়ে উঠেছিল যমুনা। তাই পালিয়ে আসা। চরণও তক্কে-তক্কে ছিল। ছুঁক ছুঁক করত হাঁড়ি খাওয়া কুকুরগুলোর মত। পাট ছাড়াতে গিয়ে যমুনার সাথে চরণের ভাব-ভালবাসা। ভিজে ভাত, শুকুই পোড়া আর আলুমাখা নিয়ে যমুনা রোজ আসত ডহরতলায়। হাবুল পাট কাঁচত, পাট ছাড়াত ডোবার জলে। পাশাপাশি চরণ। হাসি ছুঁড়তেই সে হাসি ফিরিয়ে দিল যমুনা। রাঙা ঠোঁট তখন থরথর। শেষে একদিন শুনশান আখখেতে চরণের সাথে হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়া, লুঠ হয়ে যাওয়া। অজ্ঞানে নয়—সবকিছু সজ্ঞানে। তাই এখন আর দুঃখ করার কিছু নেই। চরণ যখন চ্যালাকাঠে পিঠে দাগ বসিয়ে মারে তখন চোখ ফেটে জল আসে যমুনার। পুরুষ মানুষের ভালবাসা শুখা মাটির মতন, কপাল ঠুকলে শুধু চাক্‌ড়া চাখ্‌ড়া দাগ, বদরক্ত।

জাড়াগাছের বেড়ার ধারে এক 'ফালি উঠোন। তার সামনে চরণের চালাঘরের ঝিঁঝিকানা খুঁটি-বাঁশ, দড়ি-কাঠ, বাতা-গজাল সবারই দিন ফুরনো দশা। কোনদিন যে হুমড়ে পড়বে তা আগাম বলা ভার।

চালটা ছাইবে কি দিয়ে? যার জমি নেই, তার তো খড়ও নেই। ঘর থাকলেও ঘরের মাথার ছাদ নেই। শুখা পেটে ভাত নেই। ভাতের দেশে ভাতের বড় আকাল! ক'দিন

আর আটা সিজা খেয়ে বাঁচা যায়? পেটের দায়ে সেই কালো কোকিল-রেডিওটা বেচে দিয়েছে চরণ মাত্র ষাট টাকায়। যমুনা তখন ঘরে ছিল না, নাইতে গিয়েছিল পুকুরঘাটায়। গা ধুয়ে ফিরেই যখন দেখে জলচৌকিতে রেডিওটা নেই তখন গলা ফাড়িয়ে, সুর করে মড়া কান্না কাঁদল।

চরণ তাকে কত বুঝিয়েছে, কাঁদিসনে যমুনা। তোরের আমি সোন্দরপারা এডিও কিনে দিব। বর্ষাকালটা আসতে দে। বুড়ি গাংয়ের বাঁধটা ভাঙতে দে। বান-বন্যা হলে মড়ক না হয়ে যাবে কোথায়? বুড়োমা থানে মানত করেচি, মড়ক হলে বাজা বাজিয়ে পূজা দিব। তুই কি ভাবিস মা আমার কথা রাখবে না?

নাকের সঁকড়ি মুছে ফুঁপিয়ে উঠেছে অবুঝ যমুনা, মিচে কথা। মিচে কথায় কাগের গু। এই বলে আবার ঝিঁঝি ডাকার মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদা।

দিনভর পেটে ভাত ছিল না চরণের। খালি পেটে ঝরা রসের গাদ ওঠা তাড়ি। মাথায় ঘুঘুরো পোকার যাতায়াত। নেশা ধরতেই রাগ চড়ল ব্রহ্মতালুতে। বউটার চুলের মুঠি ধরে ঘা কতক চড়চাপাটি। ঠেলা মেরে ফেলে দিতেই কঁকিয়ে উঠেছিল যমুনা, ও গো, তোমার পায়ে পড়ি গো, আমারে তুমি আর মেরো না। পেটে যে আমার শত্রু কোঁকায়। আজ তিন মাস থিকে আমার অক্তস্রাব হয় না।

আর মারতে পারেনি চরণ, হাত দুটো কাটাগাছের ডাল। ছুটে গিয়ে, ডোবা থেকে তুলে এনেছে আঁজলা ভর্তি জল। বউটার চোখে-মুখে ছিটে দিয়ে বলেছে, চল, ঘরে চল। আমার মাথায় হাত দিয়ে বল ত, যা বলছিস তা ভুল হবার নয়।

এসব আবেগের দিন এখন শুখা পাতা। সাত মাসের পেট নিয়ে যমুনা যখন ভোরবেলায় উঠোনময় গোবরছড়া দেয় তখন তার রক্তহীন শরীরটার দিকে তাকাতে পারে না চরণ। দুটো পেটই যখন সে পালতে পারে না তখন আর একটা পেট ডেকে এনে কি লাভ? গরিব ঘরের সব পেটই পাতনা-গভীর। সময়মত দুধ না পেলে কোলের খোকা কাঁদবে। সে কান্না তো অবিকল শকুনের কান্না।

যমুনাটা একদম খিদে সহ্য করতে পারে না। ভার গতর নিয়ে সে যায় ধান কুটতে মোড়ল বাড়িতে। মোড়ল গিন্নি এক কাঠা খুদ-চাল দিলে যমুনা মাটির হাঁড়িতে ফুটিয়ে নেয়। ভাঙা চালের ভাত নুন দিয়ে মেখে খেলে সজনেশাকের ভাজিও লাগে না। চরণ খায়। খাওয়ার সময় প্রায় দিনই তার নজর চলে যায় যমুনার চোখের নিচে। কালো হাঁড়ির পেছন যেন যমুনার চোখের নিচে ঘসটান। দু'গাল বেয়ে কসি আমের কষ। খাওয়া থামিয়ে যমুনার হাত ধরলে সে হাত ছাড়িয়ে নেয় না বউটা। ধরা গলায় বলে, দেখো, খোকা আমাদের পয়মন্ত হবে। ওর দয়াতে ভাগাড় তোমার শূন্য যাবে না।

দাসপাড়া পেরিয়ে এলেই চারা অশোথ তলায় শীতলাবুড়ির থান। সীতাহারের চেয়েও সুন্দর রাস্তাটা সোজা চলে গিয়েছে পলাশী হয়ে রেল-লাইন বরাবর। পিছনপানে ব্রহ্মানীতলা, হরিনাথপুর।

—মা রে, মুখ রাখিস মা। আচ যেন খালি হাতে ফিরে আসতে না হয়। এই হ'ল চরণের প্রণাম করার বাধা গদ। অশোথ গাছের পাতা কাঁপে হাওয়ার ধমকে। বিড়বিড়

করে ঠোঁট কাঁপে চরণের। কাঁধের উপর পাকা বাঁশের লাঠিটা ঠকঠক করে নড়ে। বেতে-ধামায় ঠোকাঠুকি। সে যেন পয়সার টং-টং আওয়াজ শোনে।

পয়সা তার জন্য মুখ উঁচিয়ে বসে ছিল। দেখামাত্র ভট্চায বাড়ির থান কাপড় পরা বুড়িটা ডাকে, এই চরণ শোন-শোন...

দাঁড়াতে হয় চরণকে অথচ দাঁড়াবার তার মন নেই। অনাথবাবুর বাড়িটা কটা বাড়ির পিছনে, দেখা হলে সকালবেলাটা একদম মাটি। উশখুশিয়ে বলে, আইজ্ঞে মা, তাড়া আচে। যা বলবার এট্টু ঝটপট বলুন। আমাকে যে অনেক দূর যেতে হবে?

—ঘোড়ায় কি জিন দিয়ে এসেছিস্?

চরণ ঘাড় কাত করে, আইজ্ঞে তা বলতে পারেন। তা মা, কাজটা কি শুনি?

—কাজ আমার মাথা! বিরক্তিতে গলা চড়ায় বুড়িটা, খোঁচা মেরে বলে, তা বাবা, সেদিন যে ঠাকুরের ধামাটা সারলি, দু'দিন না যেতেই তার মুড়ি খুলে গেল। দুটো টাকা গুনে দিলাম, এই কি তোর ধর্মের কাজ হলো? ঠাকুরের কাজে ফাঁকি দিলে ফাঁকে পড়বি বাছা। তার রোষ থেকে বাঁচাতে পারবিনে।

ভয়ে শুকনো হয়ে যায় চরণের খোঁচা দাড়ি মুখ। কাঁঠালতায় পুঁটলি নামিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে। মনে মনে বলে, মহাফ্যাসাদ তো। একেবারে সাতসকালে বামনীবুড়ি দিল ফাঁসিয়ে। পুরনো কাজে নতুন করে পয়সা হয় না। বামুনবুড়ি পিঁপড়ের পেছন টিপে খায়। ওর হাতে ছাই সরে না। ধামাটা চার হাত তফাতে নামিয়ে রেখে বলে, ভাল করে সেরে দে বাছা আর যেন না খোলে।

চরণ চর্মকার। তার গায়ের ছোঁয়া লাগলে বুড়িকে নাইতে হবে। অথচ তার হাতের ধামায় ঠাকুরবাড়ির পুজো হবে। এসব ভাবলে দুঃখের মধ্যেও হাসি পায় চরণের। তবে সবাই তো আর বামুনবুড়ির মত নয়।

ধামাটা সেরে চরণ একটা বিড়ি ধরায়। বার দুয়েক কেশে পেশাদারী চালে বলে, আর দুটা' টাকা দিন বুড়িমা। মুড়োটা বাঁধতে আমার ঘাম ঝরে গেল।

—দু'টাকা। কোথায় পাবো রে বাবা! ...দাঁড়া দেখছি...

কথা না বাড়িয়ে ঘাড় কুঁজো করে ঘরে ঢুকে যায় বুড়িটা। ফিরে আসে কোঁচড়ে দু'খাবলা মুড়ি নিয়ে।

—গামছা পাত।

বড় করে গামছা পাতে চরণ। তোল্লা করে গামছায় মুড়ি ঢেলে দেয় থানকাপড়ের বুড়িটা। গামছার সঙ্গে হাতের যেন ছোঁয়া লাগে না, এমন আড়ষ্ট একটা ভাব।

চরণ কাচুমাচু মুখে বলে, আইজ্ঞে মা, ঘোড়া দিলেন চাবুক দিলেন নাই?

—তার মানে?

হে-হে করে তরমুজ বিচি দাঁত দেখিয়ে রগড় করে হেসে ওঠে চরণ। বলে, মা গো, শুখা মুড়ি চিবাতে পারিনে। ঢোক গিললে গলায় ছাতুর মতন এটকে যায়। টুকে পেটালী দিলে মন ভরে খাওয়া যায়।

—পাটালী নেই রে বাবা। এবার মেঘলায় সব ঝোলা গুড়।

সেই একই রকম বিনয় গদগদ হেসে ওঠে চরণ, আইজ্ঞে, তাই-ই দিন। ঝোলা গুড় তো ঝোলা গুড়ই সই...

বেলা যত বাড়ে, আতর আলী মহাজনের লাল চক্ষু তাড়িয়ে মারে তাকে। মা ভাগাড়চন্ডী যদি মুখ রাখে তাহলে আজকের ক্ষেপের চামড়াটা মহাজনের মুখের উপর ছুঁড়ে ফেলে দেবে সে। দাদনের টাকাটা শোধ না হলে তার আর কোন নিস্তের নেই। মানুষের চামড়ায় শঙ্খের জ্বলন সহ্য হয়, আতর আলীর কথার কামড় সহ্য হয় না। লোকটার সুঁচলো মুখ, খ্যা-খ্যা করে হাসে। বলে, তোর আবার টাকার অভাব! যার তিন তিনটে ভাগাড়— সে যে চাম পায় না ইটা আমার বিশ্বাস হয় না। তুই বেটা কামকুঠিয়া। দিনরাত মাগের কাছে ঘেযটে থাকলে চাম তো শ্যাল-শকুনে খেয়ে লেবেই।

টাকা থাকলেই মানুষ আজকাল বড় মানুষ। চরণ হা করে শোনে। হাত কচলায়।

—বাবু, দিব গো বাবু দিব। আর কটা দিন সময় দিন। পাতলা দাড়িতে হাত বুলিয়ে আতর আলী তখন সিদ্ধিদাতা মহাপুরুষ। চিবিয়ে-চিবিযে বলে, কবে আর দিবি? তোর চেহারার যা অবস্থা কোর্নদিন অক্কা পেয়ে ফোক্কা না দিয়ে চলে যাস!

এই এক ভাবনা চরণকেও কাবু করে দেয়। সেদিন কাশির সঙ্গে রক্ত বেরল। বেয়াড়া কাশি। কিছুতেই আর থামতে চায় না। হাড়পাঁজরা কাঁপিয়ে চোখে জল এনে দেয় হারামী কাশিটা। ডাক্তার বলেছে, ভাল-মন্দ খেতে। খাবে কি করে? নুন আনতে পান্তা ফুরলে ভালমন্দ আসবে কি করে?

মোক্ষদাকে কাল-রোগের কথা বলতেই বুড়িটা চোখ ভিজিয়ে কাঁদল। খুঁট থেকে দশটা টাকা ধবিয়ে দিলে বলল, আর নেশা-ভাং করোনি, এ শরীলে নেশা-ভাং ক্ষরিস সাপের বিয।

বুড়ি গাংয়ের বাঁধের উপর হুমড়ে পড়েছে আকাশ। জলের আয়নায় চরণ দেখে উড়ো মেঘের যাতায়াত। জায়গাটা গাঁয়ের মাথা। সেলুন, ডাক্তারখানা, ভুষিমালের দোকান কোন কিছুই বাদ নেই। চরণের চোখ জল চলে যাওয়া কাঁকড়া গর্তের পাঁক ঘাটা ধ্যাবড়া চ্যাং মাছটার মুখে। সাবধানী পায়ে নামতে গেলেই ছড়াৎ করে চ্যাংমাছটা কচুরিপানায় ঢুকে যায়। ভাঙা মনে সে ব্রজেনবাবুর হোমিওপ্যাথি দোকানের সামনে দাঁড়ায়। জাংয়ের কাছে পুরনো দাদটা চুলকে ওঠে বারবার। সে যেন ঘোড়া দেখে খোঁড়া অথচ পকেট তার ঠনঠনিয়া মাঠ। মা বুড়োমার নাম নিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে সে ডাক্তারের সামনে দাঁড়ায়। চশমা লাগিয়ে ব্রজেন ডাক্তার ভারিক্কী গলায় শুধায়, তোর আবার কি হলো রে?

চরণের হাত কচলান থামে না।

ডাক্তার বলে, কি হয়েছে বলবি তো? অমন কুকুরের মত কুঁইকুঁই করে লেজ নাড়ালে কি চলবে? তা বাবা ঝেড়ে কাশো দিনি?

হাত কচলে চরণ বলে, আজ্ঞে বাবু, দাদ।

—কোথায়?

—গোপন জায়গায়।

সংকোচের কারণ বুঝে ব্রজেনডাক্তার হা-হা করে হাসে। চরণ গড়াড় করে বলে

গায়, বাবু গো, রাতে বড় কুটকুটায়। হাঁটতে গেলে খিঁচ ধরে টানড়ায়। রস কাটে। সেই গতসালে পাট কাচতে গিয়ে পচা জলে হয়েছিল। তারপর আর সারেনি।

—কিছু লাগিয়ে ছিলি?

—হ্যাঁ বাবু। ব্যাটারী ভাঙা।

ব্রজেন ডাক্তার হাসতে হাসতে বলে, গর্দভ কোথাকার!

ঘাড় ঝুঁকায় চরণ। ডাক্তারের পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে দুখ-সুখের কথা বলে অনেকক্ষণ। মন দিয়ে সব শোনে ডাক্তার। চরণের মন তখন দাসপাড়ায় ভাঙা বাড়ির দাওয়ায়। খুঁটিবাঁশে হেলান দিয়ে বসে আছে যমুনা। পেটের ভেতর সাত মাসের ছানা। চরণ কি করবে, বলবে কি? ঠোঁটের কাছে চুলবুল করে কথা। বলতে গিয়ে বলতে পারে না।

ডাক্তার শুধায়, কিছু বলবি?

ঘাড় বাঁকায় চরণ, টুকে সিধারে চলুন। আমার দুটো কথা আছে। বাবু গো, মহাফ্যাসাদ! এসব কথা সবার ছিমুতে বলা যায় না। বউটার আমার—

—কি হয়েছে তার?

চরণ সংকোচে বলে, পেট হয়েছে বউটার। বলেই সে থেমে গিয়ে ব্রজেন ডাক্তারের চোখের দিকে তাকায়। ডাক্তার ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে বলে, এ তো ভাল কথা। দেশের জনসংখ্যা বাড়ল। তুই-ও আর একবার বাবা হবি।

—আমি বাবা হতে চাই না?

—কি আশ্চর্য!

চরণ উবু হয়ে পা'টা ধরে ফেলে ডাক্তারের। ভিজে গলায় বলে, দুটা পেটই পালতে পারিনে, বাড়তি পেটটা ধসিয়ে দিন। ভগবান আপনার ভাল করবে। মজুরি হিসাবে পুরা একটা খালের দাম আমি দিয়ে দিব।

—শেষে তুই আমাকে খুনী সাজাবি? ব্রজেন ডাক্তারের চড়া গলা, পারব না যা। ছেলেপুলের বাবা হয়ে এ কাজ আমার দ্বারা হবে না। আমি পুরিয়া বেচে পেট চালাই, আমার অত টাকার উপর লোভ নেই।

—বাবু, ইটা বড় মিচে কথা। টাকার লোভ নেই—এমন মানুষ আচে?

—তুই এখন ভাগ তো।

চরণ তবু নড়ে না চড়ে না। হাঁ-করে মুখের দিকে তাকায়। ডাক্তার তাকে বুঝিয়ে বলে, এই নে, দাদের পুরিয়া। টক-ঝাল বেশী খাবি নে। টক-ঝাল খেলে ওষুধে কাজ হবে না। তোর বউয়ের ব্যাপারটায় আমার কিছু করার নেই।

হতাশ হয়ে চরণ যখন ফিরে যাচ্ছল তখন গলা উঁচিয়ে ডাক্তার ডাকে, শোন শোন।

চরণ সেই একই ভঙ্গিমায় লাঠিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়।

ডাক্তার বলে, ওষুধ নিলি পয়সা দিলি না? ভিজিট না দিস, কমসে কম ওষুধের দামটা দে। ওষুধ আমাকে যে কিনতে হয়।

—আজ নেই বাবু, উধার থাকল।

—তাহলে একটা কাজ কর। আমার ঘরের সামনে কুকুর মরেছে। হাওয়া মারলে দুর্গন্ধ ছড়ায়. কুকুরটা তুই ভাগাড় অব্দি ফেলে দিয়ে আয়। আর শোন, এর জন্য তোকে আমি পয়সা দেব না, ওষুধের দামের সাথে কর্তন হবে।

স্বার্থ ছাড়া আর কোনকালে কোন কাজ হয় না। এটা চরণের অভিজ্ঞতা। সে বলে বেড়ায়, টাকায় কাঠের পুতুল হা করে। টাকা নেই যার, জগৎ ফাঁকা তার। টাকায় খোলামকুচি হয় সোনার কুচি। এসব ভাবতে ভাবতে কুকুরের পায়ে রশা বেঁধে হিড়হিড় করে টানতে থাকে চরণ। তার এই টানার বুঝি শেষ নেই। যত টানে ততই ধুলোর উপর সরসর করে সরে যায় মরা কুকুরের লাশ। দুর্গন্ধ ভাসে হাওয়ায়।

শীতের এই সময়টায় গ্রামের পথঘাট বড় মনমরা। চারিদিকে শোক-বিরহের ছায়া। যে গাছগুলোর পাতা নেই তাদের আকাশের দিকে মুখ। চরণ দেখে। বেদম হাসি পায় তার। পচা ভ্যাদভেদে কুকুরের লোভে মাছি উড়ে আসে চাক-চাক। এতে চরণের কোন অস্বস্তি হয় না। এসব তার গা সওয়া। লোক যা বলে বলুক, এই গন্ধ তার খুব চেনা। বদ গন্ধের জন্য মন খারাপ করে চরণের। রশাটা পথের ধুলোয় বিছিয়ে দিয়ে একটা ঢেলা তুলে নেয় চরণ। থোক-থোকা আমড়াগুলো আঙুর ফলের মত ঝোলে। নিতাই কলুর মা'টা বড় কৃপণ। চাইলেও দুটো দেয় না। বলে, গাছটা বেচে দিয়েছি যে। আমি খালি আগলদারী করি। সেই কচি আমড়ার সময় থেকে কলু বুড়ির এক রা। আমড়া বুড়োল, এখনও সেই এক রা। এদিক সেদিক তাকিয়ে ঢেলাটা তাক করে ছুড়ে দেয় চরণ। শিলাবৃষ্টির মত ধুলোয় ঠিকরে পড়ে আমড়া। হাঁটু ভেঙে সেগুলো ব্যস্ত হাতে পকেটে পুরে নেয় চরণ। ভাবে, একটা কাজের কাজ হল। বউটা পোয়াতী। টক আমড়ার নুনচাখা করে খেলে পেটের ছানাটাও দুটো খেতে পাবে। অরুচি ঘুচবে বউটার। আর পেটের ছানাটাও ছাইগাদার মানকচুর মতো বেড়ে যাবে দ্রুত। কিন্তু এতে তার কি লাভ? বড় হয়ে এ ছেলেও তো তাকে দেখবে না। ভিনো হয়ে চলে যাবে অন্যত্র। শকুন যে এক জায়গায় স্থিতু হতে জানে না। ভিন্ন-ভিন্ন ভাগাড়ের খোঁজে সে সর্বদা উপর আকাশে ওড়ে বেড়ায়। উপর আকাশে উড়লে নিচের আকাশের কথা মনে পড়ে না। এটাই নিয়ম। চরণ এই নিয়ে আর মন খারাপ করে না।

ভাগাড় যতদূর, নরক ততদূর নয়। তবু, এই জায়গাটায় আসলে চরণের বেঁচে থাকার আগ্রহটা তীব্র হয়। মাথার উপর ভগবানের আকাশ, আকাশে মোমবর্ণ মেঘ। রোদ থাকলে হাজার কিসিমের আলোর প্রতিফলন। তখন মনে হয় না এত অসুখ অতৃপ্তি আর ক্ষুধা নিয়ে বেঁচে আছে সে। দুরের তেঁতুল গাছটায় কানের মাকড়ির মতো দোলে ডাসা তেঁতুল। ক্ষুদে পাতাগুলো যেন এক একটা সুখের বিছানা। সামান্য হাওয়ায় কত সুন্দর দোলে। বাবুই, বন চটুইরা তাদের নাগর, সারাক্ষণ পাতার কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফাস কথা বলে। রোজই পাতা ও পাখির গোপন পীরিত দেখে চরণ। তখন যমুনার উপর তার কোন রাগ থাকে না। মাঝে পুকুরের গোল শ্যাপলা ফুলের চেয়েও সুন্দর দেখায় বউটার গোল পদ্মপাতার মুখ। চোখের জলে মুক্তো চমক। কতদিন পেটপুরে দুটো ভাত পায়নি বউটা। শুধু পেয়েছে গেড়ি-গুগলি, আটা ঘাটা, মেটে আলু আর বনকচু ডাঁটার ভাজা।

খুব বেশী হলে খামালু দিয়ে কচুশাকের চচ্চড়ি। তাতে কাঁচা লঙ্কা চেরা আর সামান্য তেলের ছিটে। হাতে কাজ না থাকলে চরণ কি করবে? তার গাট্টাগোট্টা চেহারাটা বুড়ো শিবের চেয়ে জড়-ভরত। কাজ না থাকলে পুরুষ মনে ঘুণপোকার বাসা। বিড়ি ফুঁকে-ফুঁকে পুরো মুখটা তিতকুড়ো। লোক ভাবে কামকুঠিয়া।

বাঁধের উপর থেকে কুকুরটাকে ঠেলা মেরে ভাগাড়ের দিকে গড়িয়ে দেয় চরণ। কেউ যেন বদ গন্ধের শিশি খুলেছে, এমন ভক্‌ভকানো গন্ধ। তবু অস্বস্তি হয় না। খোলা নাকে, নবাবী চালে ভাগাড়ে নেমে আসে সে।

ভাগাড় ঘিরে সার সার বাবলা-খেজুরের গাছ। শুকনো কাঁটার সাপদাঁত বিঘানো মুখ। ঘোড়ানিম আর বুনো জাম গাছের ছায়ায় জায়গাটা একেবারে নিঃঝুম। ভাগাড়ের চারধারে ঢোল কলমীর চিকন-চাকন গতর। ফুলগুলো যে মা ভাগাড়চন্ডীর নথ! এখানে আসলে স্ফূর্তি হয় চরণের। ভাগাড়খেগো কুকুর শকুন কাক সবাই চরণকে চেনে। তারা ওকে জ্বালায় না। ভাগাড়ে আসলে চরণ আর মানুষ থাকে না। মহামানব। রাজা নয়—রাজাধিরাজ। ঘন ঘন বিড়ি টেনে সে মেজাজ দেখায় পশুপাখিদের। বাড়াবাড়ি করলে শুকনো ডাঙায় বাড়ি মারে লাঠির। মুখ ভেংচে বলে, যা, তফাৎ যা। এল্‌লোৎ কুথাকার। চোখের মাথা কি খেয়েছিস তোরা? জ্বালাস নে তো। চামটা ভাল মতন কাটতে দে। ও তর সইচে না বুঝি? দাঁড়ারে বাপ, দাঁড়া। আমি তো মেসিন নই যে ধরব আর ছাড়াবো। খাল ছাড়ানো কি মুখের কথা?

কুকুর যদি ঘেউ ঘেউ করে, চরণ তাকে ধমকাবে, তোরও দেখচি আমার মতন ক্ষিদে। শালা এত ক্ষিদে তো দুনিয়াতে এয়েচিস কেনে? আমাকে দেখে শেখ্। পুরা হপ্তা পেট ভরে আমি খাইনি। আমি কি তোদের মতো রাগে-গরগরাই?

কুকুর থামলে শকুন ডানা ঝাড়ে, অসন্তোষ ফুটিয়ে তোলে চোখে। মরা জীবে তার অধিকার সবার আগে। চরণ হাত ছোঁয়ালে রাগে তারও কণ্ঠা ফোলে। চরণ সান্ত্বনা দিয়ে বলে, ওঃ, তোরও দেখচি পেট খালি! তা বাপু, রাগ করিস না তো। চাম না ছাড়ালে খাবি কি করে? চাম ছিঁড়তে বুড়া দাঁত তোর লড়ে যাবে। তখন দেখবি কেমন কন্‌কনিয়া ব্যথা। শকুনগুলো নড়ে না, গোল হয়ে ঘিরে থাকে চরণের চারদিক। ওদের মধ্যে লালপরা শকুনটা পালের গোদা। তার লাল চোখে রাগ। চরণ হাসতে হাসতে তাকেও সামাল দেয়, তুই তো রাজা শকুন, তোর অত রাগলে চলে? ধৈর্য ধর, এই হয়ে এল বলে। তখন যত পারিস মনের সুখে ছিঁড়ে খাস। আমি তখন আর দেখতে আসব না। তবে সাবধান বাছারা, তাড়াহুড়োতে গলায় কাঁটা ঢুকিয়ে বসিস না। অবেলায় আমি কিন্তু গলায় হাত ঢুকাতে পারব না, বলে দিচ্ছি।

ছাল ছাড়ানোর সময় এইভাবে অনবরত বকে যায় চরণ। কথা না বললে কাজে তার স্ফূর্তি আসে না। যে কাজে স্ফূর্তি নেই, সে কাজ কেমন ন্যাড়া-ন্যাড়া।

শূন্য ভাগাড়ের দিকে তাকিয়ে রক্ত উজাড় দীর্ঘশ্বাস নেমে আসে চরণের। ভাগাড় যে এমন ভাবে ধোঁকা দেয়, স্বপ্নেও ভাবেনি সে। এই নিয়ে পরপর বেশ কয়েকদিন শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিল ভাগাড়। আতর আলী মহাজনের সঙ্গে খালি হাতে দেখা না

হওয়াই ভালো। সময়মত টাকা না পেয়ে মানুষটা ইদানীং মা-বাপ তুলে গাল দিচ্ছে, ঘরের বউকেও বাদ দিচ্ছে না। তার মুখের ভাষা কদর্য, ঝামা ইট— শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়।

গিরগিটির গাছে চড়ার মত তরতর করে বেলা চড়ছে আকাশে। হাতিশুঁড়ের পাতার মতন উড়ো মেঘের রং। এ মেঘে বর্ষা হয়। আর বর্ষা হলেই শীতের দাঁতের ধার বেড়ে যায়। শীত ক্ষেপলে বুড়া-বুড়ির মহা বিপদ। ভাঁটার জলের মতন নিংড়ে নেয় জীবন। এই চ্যাঙড় শীতে বুড়িটা কেমন আছে কে জানে? বহুদিন যাওয়া হয়নি, মুখোমুখি বসে সুখ-দুঃখের কথা হয়নি। তার চোখের দিকে তাকিয়ে এখনো কথা বলতে পারে না বুড়ি।

তার ঐ শুকনো, চিমড়ে বুকে এত অভিমান? না হয় দু'ঘা রাগের মাথায় পিটে দিয়েছিল সে, না হয় যমুনার সঙ্গে তখন একটু-আধটু ঢলাঢলি—তার জন্য এত বড় শাস্তি? এযে লঘু পাপে গুরুদন্ড। যাদের সে জন্ম দিয়েছে সেই ব্যাটারাই পথে-ঘাটে দেখা হলে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। একবার মুখ ফুটিয়ে বলে না, কেমন আছো বাপ? তোমার জন্য মন টাটায়।

বুড়িকে সে ভাগিয়ে দেয়নি, বুড়িই চলে গেল স্বেচ্ছায়। কারোর বাধা নিষেধ সে শুনল না। ছেলেদুটোর বুকেও তখন তুফান। চড়কান মেঘের গলায় বলল, চলো মা, এ পাপের জায়গায় আর নয়। যারে আমরা বাপ বলে জানতাম—সে তো আমাদের বাপ নয়, রাচুয়া চামার। ছ্যা-ছ্যা, এখানে কেউ থাকে?

কথা শুনে দু'কানে আঙুল দিয়েছে চরণ তবু সেই ছেলেদের জন্য মনটা বড় কাঁদে।

বামুনবাড়ির মুড়িগুলো তখনো গামছায় বাঁধা। গামছার গিঁট খুলে গপাগপ গিলতে থাকে মুড়ি ক্ষিদের জ্বালায়। চোখের নিমেষে খালি হয়ে যায় গামছা, যমুনার জন্য দু'মুঠো যে নিয়ে যাবে—সে কথাও সে ভুলে যায়। ডোবার জলে পানা সরিয়ে আঁজলা ভরে তুলে আনে জল। ঢকঢক করে গিলতে থাকে কাদাগোলা জল। তখনই পিছন থেকে চুপি পায়ে ছেঁড়া গেঞ্জিটা খামচে ধরে আতর আলী মহাজন। গাল দিয়ে বলে, আল্লা কসম, দোজকের কীটকে আমি ডোবার জলে চুবিয়ে মারব। বল্ হারামীর বাচ্চা, আমার দাদন কবে ঘুরোন দিবি বল? তোর পিছনে ঘুরতে ঘুরতে গোড়ালী আমার ঘুরে গেল।

যাঁতিকলের ইঁদুরের মত চরণ শুধু ছটফটায়। আতর আলী তাকে হিড়হিড়িয়ে টেনে আনে বাঁধে। র্ভৎসনার গলায় বলে, দেখ রে বাউন্ডুলে চামার, মাঠে কত্তো গোরু চরে, তুই কেন খাল পাস না? তুই কি তালকানা?

কুঁইকুঁই করে চরণ। এমন খোঁচা এই প্রথম নয়, এর আগেও বহুবার হয়েছে। আতর আলী মহাজন মাঠভর্তি গোরু দেখিয়ে বলে, যা খাল ছাড়িয়ে আন।

—জ্যান্ত গোরুর?

—দূর বোকা। তোর কি বেরেন বলতে কোন কিছু নেই? এই নে ধর বিশ টাকা। পাকা কলায় বিষ চটকে পুরিয়া বানিয়ে গোরুর ছিমুতে ধর। গোঁত্ত গোঁত্ত করে খাবে,

আর ধড়ফড় করে মরবে। তাতে তোরও হবে, আমারও হবে।

বিষ টাকায় এত কাঁপুনী, এত ভয় কে জানত! কলাপাতায় বিষ মাখিয়ে চরণ সারামাঠ ঘুরেছে। রোদে পুড়ে পিঙ্গল মুখ তবু গোরুর মুখের কাছে সে পাতা ধরতে পারেনি। মোক্ষদা বলে, গোরু হ'ল মা ভগবতীর রূপ। যার গোয়ালের গোরু সুখী, তার মত সুখী মানুষ আর কে আছে?

চরণের গোয়াল নেই, গোরু নেই। তাই হয়ত সুখ নেই। সুখ না থাকুক তবু সে তো মানুষ। মানুষ হয়ে অমানুষের কাজ করবে কি করে?

রেগে-মেগে আতর আলী বলেছে, ভীতু, ডরপুক। তোর দ্বারা কিচ্ছু হবে না। তুই আমার দাদানের টাকা ঘুরোন দে। শালা হারামীর বাচ্চা নাহলে তোর চামড়া ছাড়িয়ে নেব।

কাতর গলায় চরণ বলে, তাই নাও গো, চামড়া ছাড়িয়ে তুমি আমায় রেহাই দাও।

—তোর ছালের কত দাম? দশ টাকাও হবেনি। ধূর্ত চোখে তাকিয়ে আতর আলী দাঁত টিপে তাকায়, তোর ঢ্যামনামী আমি জানি। বাতাসে আমার চুল-দাড়ি পাকেনি। তিনটে ভাগাড় একসাথে ফাঁকা যায় এ কখনো হতে পারে? দেশে এত মানুষ মরে, গোরুর জান কি তাহলে মানুষের চেয়ে দড়ো? বল্, কোন মহাজনের কাছে চামড়া বিকোস বল্? নাহলে তোর খাল খিচে হাতে দেব—

—ছাড় গো, গর্দানে বড্ড লাগে।

—লাগার জন্যিই তো ধরা। আমি তোর বউ নই যে মালিশ করব। দে, কি আছে দে?

—মায়ের কিরে, কিচ্ছু নেই। আমি ধরম দাসের পো, মিচে কথা বলিনে গো।

কিছু না পেয়ে পুঁটলিটা ছিনিয়ে নেয় মহাজন। কাতর চোখে ক্ষুর-চাকুর দিকে তাকিয়ে থাকে চরণ। আতর আলীর কানে আতর ভেজান তুলো। দেশলাই কাঠিতে দাঁত খুঁচিয়ে বলে, তোর যন্ত্রপাতি সব রেখে দিলাম। কান টানলে মাথা না এসে যাবে কোথায়? আমার নাম আতর আলী। কাকে কি ভাবে টাইট দিতে হয় সব জানি। নাপিতের ক্ষুর-কাঁচি কেড়ে নিলে তার ব্যবসা চলে না। তেল গুটিয়ে সে তখন পোড়া গুকুই। যা, তোকেও আমি ক্ষামি করে দিলাম। যেদিন টাকা দিবি সেদিন এগুলান ঘুরোন পাবি—তার আগে নয়।

চরণ কাঁদো-কাঁদো মুখে হাতাজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে, পেটে লাথ মারোনি গো, গায়ে মারো। বউটার ছানাপুনা হবে, এখন ক্ষুর-কাঁচি কেড়ে নিলে আমি যাব কোথায়?

মুসুরী ভুঁইয়ের আল মাড়িয়ে গট্‌মটিয়ে হেঁটে যাচ্ছে মহাজন, তার পিছনে বিল-ইঁদুরের মত নত মাথায় চরণ। আখের ফুল ওড়ে বাতাসে, শ্যালোমাঠে টাকার জোরে ধানগাছের হৃষ্টপুষ্টো গতর দোলে। কিছুদূরে জল-মেসিন থেকে ছিটকে যাচ্ছে ফিটকিরি রঙের জল।

আতর আলী পায়জামা গুটিয়ে শ্যালো মেসিনের জল খায়। ফুলছাপা রুমালে মুখ মুছে ফিরে আসে চরণের কাছে। একটা বিড়ি গুঁজে দিয়ে বলে, দাদনের টাকা শোধ

দিবি? একটা উপায় আচে, মন দিয়ে শোন।

চরণ হা-করে তাকিয়ে থাকে, ভূতের মুখে রামনাম শুনলে সন্দেহটা প্রগাঢ় হয়।

আতর আলী গলা ঝেড়ে নিয়ে বলে, তোর রাখনীটা তো ভারি সোন্দর! তাগাদায় গিয়ে তার চাঁদমুখ আমি দেকেচি।

চরণ ঘাড় নাড়ে, বোবায় ধরা মুখে কোন ভাষা বেরয় না।

আতর আলী সাহস পেয়ে বলে, যদি পারে তো ঐ বউ-ই তোকে বাঁচাবে। আজকাল চাঁদমুখ আর চাঁদির জয়জয়কার। তোর চাঁদি নেই, চাঁদমুখ তো আচে। কেসনগরে আমার এক জানা-শোনা মহাজন আচে। তার বাসায় তোর বউকে রাঁধাবাড়ার কাজে ঢুকিয়ে দে। মাস গেলে মোটা মাইনে দেবে। বন্ধুর আমার দরাজ মন। দু'সাল হল তার বউটা গায়ে কেরচিন ঢেলে জ্বলে মরেচে।

—শালা, তোমার মতলব আমি বুঝিনে! মনে মনে গাল দিয়ে দেঁতো হাসে চরণ, আইজ্ঞে সবই তো ঠিক। কিন্তু কপালটা আমার পোকাড়ে। বউয়ের আমার পেট নেমেছে, তিন মাস পরে বিয়োবে? এই অবস্থায় বাবু কি তারে ঘরের কাজে নেবে?

চিন্তার হিজিবিজি ভাঁজ পড়ে মহাজনের মুখে। ভুঁড়ি মেরে বলে, পেটটা খসিয়ে দে। গতর থাকলে অমন পেট আবার হবে। আগে তো নিজে বাঁচ, তারপর অন্য কথা।

এবার বিশ টাকা নয়, পঞ্চাশ টাকার কড়কড়ে নোটটা চরণের হাতে ধরিয়ে দেয় মহাজন। খুশীতে ডগমগ স্বরে বলে, এটা কিন্তু দাদন নয়, এটা আমি খুশী হয়ে দিলাম।

ফাঁকা মাঠে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে চরণ। টাকার গন্ধে গা গুলিয়ে বমি আসে তার। চোখের দু'কোনে থেতো হওয়া জল। কানের লতি, নাকের ডগা ছালছাড়ান গোরুর মত লাল। মহাজন গায়ে চাদর জড়িয়ে রাজশকুনের ঢঙে এগিয়ে আসে সামনে। ডানা ঝাপটে বলে, কি হ'ল আবার?

ডানে-বাঁয়ে ঘাড় ঝাঁকায় চরণ। মাথার চুল ছিঁড়ে খন্‌খন্‌ করে কাঁদে, বড় গন্ধ বাবু, আমি আর তিষ্টুতে পারিনে। বমিটা হয়ে গেলে বড় শান্তি পেতাম।

—গলায় আঙুল দিয়ে বমি করে ফেল। এ সন্‌সারে স্ত্রী-পুরুষ যে যার মত গাভীন হয়।

গলায় আঙুল দিলেও বমি হয় না। আসলে আদৌ সে গলায় আঙুল দেয়নি। আঙুল দেওয়ার ভাণ করেছে শুধু। মুড়িগুলো যদি বমি হয়ে বেরিয়ে যায়—শুধু এই ভয়ে সে ওয়াক্‌-ওয়াক্‌ করে। ফাঁকা মাঠে বমির শব্দ ঝড়ের বেগে ছুটে যায়।

সমুদ্র

কেরিপাখির ডাকটা ভারি অদ্ভুত, চিরিক চিরিক করে ডাকে— অনেকটা চড়াই পাখির মত তবে শব্দের তীক্ষ্ণতা বা প্রাবল্যে সে চড়াই পাখিকে হারিয়ে দেয় অবলীলায়। ডাকটা যদিও বা কর্কশ, চেরা চেরা, ছেঁড়া ছেঁড়া তবু রোজ সকালে সমুদ্রচিল নয়— কেরিপাখির ডাক শুনেই দিনের কাজ শুরু করে কেঁচু— যাকে বাঁধ ধারের সবাই বলে 'কেঁচুয়া' ; শুধু টেঁড়ি বলে, কেঁচো কাঁদাখোচা আসলে সে কেঁচুয়া বা কেঁচো নয়, কাদাখোচা বা শামখোল নয়, সে হলো ল্যাক্‌পেকে তরলা বাঁশের মত লগা ঢ্যাং-ঢেঙ্গে মরাটে, কালসিটে হাড়জাগান এক মানুষ। সবার মত তার দুটো হাত আছে, তবে তা বড় রুগ্ন— দুবাহু মেলে দাঁড়ালে কেঁচু অবিকল বকের মত, চোঙা পারা বুকটা তার সর্বক্ষণ ঘড়ঘড় করে শ্লেষ্মায়। বিশেষত, শীত-বর্ষায় তার হাঁপানির টান ওঠে— সমুদ্রে যেমন জোয়ার আসে অনেকটা তেমন, তখন রসুন তেল, জড়ি বুটি সব ফেলনা, টেঁড়ি তখন গাল পাড়ে তার পোকাড়ে ভাগ্যকে, মরা বাপ-মা আর গ্রামসমাজকে। কাগ্‌জা মাছের মত মুখ শুকিয়ে সে তখন এক তাল মাংস ছাড়া আর কিছু নয়, তার আঁচল ওড়ে, বুকের খোলে হাওয়া ঢুকে চুনামাছের মত খল্‌বলায়, ভয়ে জেগে ওঠে গায়ের লোম তবু তার গালমন্দ থামে না, কেঁচুর সাথে বিয়ে না হলে সে আরো সুখী হতো এমন দুর্মর এক ভাবনা তাকে ঢেউ'র মাথায় টেপামাছের মত আছড়েপাছড়ে মারে। মন হল সমুদ্রফেনা, বাতাস দিলে ফুট্‌ফুট্ করে ফেটে যায়, অবিকল বেলুন চুপসানো, শুখা-পোড়াটে বাজপড়া তালগাছ— টেঁড়ি অসার গতর নিয়ে হাই তোলে, নিঃশ্বাসে নোনা হাওয়া অথচ কি উগ্র গরম দেহমন পোড়ে, চুপসে যায় শিরা-উপশিরা— এইসব জটিলতম অনুভব নিয়ে টেঁড়ি বাঁচবে কি করে— দিনরাত খালি এই ভেবেই সে আরো শুকিয়ে যায়।

ঢ্যাঙ্গা বাঁধ চলে গিয়েছে রামনগর-দীঘা। ভুড়ি মগরের পিঠের পাখনার চেয়েও উঁচু বাঁধ, দৃষ্টির মধ্যে নোনা জলের লবণাক্ত শরীর, কলকল ছলছল ঢঙ দেখানো হাসি, তারও দূরে সমুদ্রচিল ওড়ে সাহসী ডানার ছায়া মেলে স্থির আপাতশান্ত জলে। বাঁধের একপাশে বাসরাস্তা, বাসরাস্তা মানে পিচরাস্তা— ভাঙা এবড়ো খেবড়ো, খোয়া উঁচানো মিশকালো পথ যেন কালো হাঙ্গরের সূচলো দাঁত, খালি পায়ে হাঁটতে গেলে টেঁড়ির ভীষণ লাগে সেইজন্য কেঁচু তাকে সাগর পূজার দিন কিনে এনে দিয়েছে লাল প্লাস্টিক চপ্পল— ঠিকমত মাজা ঘুরিয়ে হাঁটলে ঢেউ ভাঙার মত ফটফট শব্দ হয়। বড় হোটেলটার পেয়াদা, যাকে সবাই বলে 'দারোয়ান'— সে ম্যাটম্যাটকরে দেখে আর মনে মনে স্বপ্নরাজ্য তৈরি করে— বিলাসী-কামুক, প্রেমিক রাজা সেজে গভীর ঘনঘোর তন্ময়তায় ডুবে যায়। টেঁড়ি তার কাছে রাণী, সমুদ্রে চরতে যাওয়া টৌটিয়া পাখি, তবু ফারাক সামান্য টৌটিয়া পাখির বাসা নেই, টেঁড়ির একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই আছে।

বাঁধধারে আলো মরে গেলে অন্ধকারের বিশাল ডানা ছেয়ে ফেলে চারপাশ, নীল আকাশ নেমে আসে মাটির কাছাকাছি। তালগাছের ঝাঁকড়া মাথায় আকাশ যেন জিরোয়, অথচ ঐ মগ্ন বিশ্রামের সময় টেঁড়ি মাছ বাছে উবু হয়ে। তার মাথার উপর শুশুকের মুখের মত উঁচু খোপা তালে-তালে শারীরিক ছন্দময়তা হেলেদুলে লহরা কিংবা শাগ্‌নাপাটিয়া মাছের ডাঁই থেকে আলাদা করে বেছে রাখে রূপাপাটিয়া মাছ যেহেতু সে নিজে রূপা পাটিয়া মাছের মত দেখতে হয়ত এই কারণে মাছ বাছার সামান্য আয়ের কাজটা তার ভাল লাগে। কেঁচুর জোয়ান বয়স, চিমড়ে মুখের গোঁফ জোড়া ভোমরার গায়ের চেয়েও কুচকুচে, দু'একটা দুষ্ট ব্রনর দাগ বাদ দিলে তার মুখটাও ঘুরতে আসা টুরিষ্টগুলোর মতন, হয়ত সেই কারণে টেঁড়ির মাছ ঘাটতে গিয়ে ফুরনের কাজ করা তার আভিজাত্যে লাগে কিন্তু বউটা নাছোড়বান্দা হাজার বোঝালেও বোঝে না বরং আগ বাড়িয়ে বলে, যা দু চার টাকা আসে মন্দ কি? টকা-ছকা (ছেলে-মেয়ে) নেই, সময় কাটে না। তুমি তো বালিচড়ায় এঁড়ের মত ঘোরো, আমি শানুক না হয়ে কট্‌রা ব্যাঙ হলে তুমার তাতে ক্ষতি কি?

কোথায় শানুক, কোথায় কট্‌রা ব্যাঙ কেঁচু ভাবে কি দিনকাল পড়ল! এখন নোনা জলে গা ধুলে কুটকুটায় গা, বাবুরা বলে এলার্জি। আসলে তা আমবাতের মতন। টেঁড়ি জানে না ঘরের বৌ হল লক্ষ্মী, লক্ষ্মী না হলে লক্ষ্মী পেঁচা—তার এত দিনমানে ধেই ধেই উড়ে বেড়ানো কাকরা ভাল চোখে দেখে না, ক্ষুরধার চঞ্চু দিয়ে ঠুকরে দিলে তার কি গতি হবে, রক্ত পোছবার মত ত্যানাটুকুও যে তার ঘরে অবশিষ্ট নেই। টেঁড়ি তোয়াক্কাহীন, তার মেজাজ অনেকটা সমুদ্রসাপের মত অন্তমুখী হলেও বাগ পেলে ছোবলাতে সে ছাড়ে না, যেহেতু সাপ তাই বিষজ্বলন দহন সব আছে। অগত্যা কেঁচুই মুখে কুলুপ আঁটে কেননা বাঁধধারের সমাজে সে কেঁচুবরণ হালদার, মনসা পূজা কিংবা গঙ্গা পূজায় ধার দেনা করে হলেও তাকে পাঁচ দশ টাকা চাঁদা দিতে হয় বারোয়ারীতে। সেখানে টেঁড়ি কে, কি তার দাপট দেমাগ ছলাকলা ফস্টিনষ্টি কেউ অত খোঁজ রাখে না।

কেঁচু দুই প্রাণীর সংসার সামলাতে ব্যস্ত, তার হাতে বাঁশের ঝুড়ি, কোমরে বাঁধা গামছা, এই অতি ভোরে শীত শীত লাগে বলে ধুতির চেয়েও পাতলা এক ফেরতা কাপড়। হাজা খাওয়া পায়ে টায়ারের চটি নেই, মোটা দানার বালি ঢুকে সর্বাঙ্গ জ্বলে আর এই অনতিক্রম্য জ্বলনে সে বড় কাহিল হয়ে পড়ে শীত ভাবটা ঘনায়মান মেঘের মত ছেঁকে ধরে, ফলে উত্তাপের জন্য তার বাঁ হাতের দুই আঙুলের ফাঁকে আধপোড়া আগুনমুখো একটা বিড়ি জ্বলে যা কিনা দমে দমে জোনাকির মত আলো ছড়ায়।

কালরাতে যখন বাতাস এলো হুড়মুড়িয়ে, ঘরের বাত্তিটা নিভে যেতেই হাত বাড়িয়েছিল টেঁড়ির দিকে, টেঁড়ি তখন শঙ্খ-লাগা ঢোড়া সাপের মত ফুঁসছে—এই তপ্ত লোহার মত খড়খড়ে হাতটাকে আশা করছিল তীব্রভাবে। লতা যেমন পেঁচিয়ে যায় শুকনো ডালে, শুকনো ডাল যেমন চুপচাপ পড়ে থাকে প্রতিক্রিয়াহীন—কিছু সময় পর চাঁদ ডুবে গেলে, হাওয়া থেমে গেলে সিজান পুঁইডাঁটার মত নেতিয়ে পড়েছিল কেঁচু। টেঁড়ির বুকে তখন উথাল-পাথাল ঝড়, ভূমিকম্প। জোয়ার আসা সাগরের ঠোটের চেয়েও ক্ষুরধার তার ঠোঁট, কেঁচুর বরফগালে সেই ঠোঁটটা স্পর্শ করে বলেছিল, আগে বলোনি কেনে, আগে বলোনি কেনে?

বলেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল চোঙা, ঘর্মাক্ত, নিরুত্তাপ বুকে মাথা রেখে।

চন্দনেশ্বরের মন্দিরে হত্যে দিয়েছিল কেঁচু, মানত করেছিল টেঁড়ির যেন একটা ছুবা (ছেলে) হয়। টেঁড়ি শুনে আর হেসেই বাঁচে না, তার দেহখানা যেন ঝাউগাছ, হাসির গমকে হেলেছে দুলেছে! হাসিতে যে এত নিষ্ঠুর বিদ্রূপ, তাচ্ছিল্য মিশে থাকে সেই প্রথম কেঁচু জানল।

টেঁড়ি অবজ্ঞার স্বরে বলেছিল, শিমুলফুলে কোন সুঘ্রাণ নেই তবু সেই ফুল থেকে তুলো হয়। বলি, তুমি কেমন মানুষ গো - অমন আখগাছের মতন গতর তুমার তবু টুকে রস নেই! একটা সমুদ্র কাঁকড়ার যতটুকু শক্তি থাকে ততোটুকু শক্তিও ছিল না কেঁচুর, সে কেমন ভ্যালভ্যাল করে চেয়েছিল অনন্তনীল, নীল প্রতিবিম্বিত সমুদ্রের দিকে। এই সমুদ্র তার কত চেনা। টেঁড়ি একদিন পর হয়ে যাবে কিন্তু এই সমুদ্রতীর, বালিয়াড়ি, বিস্তীর্ণ জলাভূমি সব তার নিজের হয়ে থেকে যাবে। কেঁচু ভাবে—টেঁড়ি কেন সমুদ্রের মত হল না অথচ নারী মাত্রই সমুদ্র, তার অশিক্ষিত মা বলত একথা। অথচ টেঁড়ি জানল না সেও ইচ্ছে করলে একদিন সমুদ্র হোতে পারত।

কেরিপাখিগুলো উড়ে গিয়েছে বহুদূরে, সমুদ্রচিলের ধূসর ডানায় রোদ পড়েছে সোনালী, বালিয়াড়ি মৌন সাধিকার মত গাম্ভীর্যে ব্যাপ্ত। রোজ এই সময়টায় ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা রঙিন মাছের মত হুটোপুটি খেলে বেড়ায় বালিচড়ায়। তখন সেই বর্ণোজ্জ্বল দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে বিষাদে পরিব্যাপ্ত হয় কেচুর মন। বিগত রাতের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাকে ঠেলে ঠেলে, গলা ধাক্কা দিয়ে পাঠিয়ে দেয় বালিচড়ায়। সমুদ্র যাদের প্রাণধারণের শক্তি, আশা ভরসার স্থল সেই মমতাময়ী সমুদ্রকে সে অবমাননা করতে পারে না, তার হৃদয়ে বাজে। কুণ্ঠাজনিত জড়তায় সে কেমন নির্জীব হয়ে থাকে। অথচ অনতিদূরে ফুঁসে ওঠা, গর্জিত পরাক্রমশালী সিংহের তেজ নিয়ে ক্রুদ্ধ সমুদ্র তার মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করতে সমর্থ হয় না।

টেঁড়ি তো প্রায় বলে, তুমি মানুষ না কাদার ঢেলা—কি বলতো? এমন মানুষ আমি দেখিনি বাপু যার কোনো রাগ নেই, তেজ নেই! এট্টা কেঁচুয়ার গায়ে পা দিলে সেও জল কেটে ছড়ছড়িয়ে ওঠে তুমি কি কেঁচুয়ারও অধম?

টেঁড়ির কথাগুলোয় ধার ব্লেড দিয়ে চামড়ায় ঢ্যাড়াকাঠি এঁকে দেওয়ার যন্ত্রণা, তবু মুখ বুজে থাকতে হয়, কেননা গলায় কাঁটা বিঁধলে তা না নামা পর্যন্ত যে নিস্তার নেই। কেঁচু দুবলা-পাতলা হলেও তার মগজটা অন্য দশ পাঁচটা পুরুষের চেয়ে কোন অংশে কম নয়, সে নারী মন বোঝে, তার প্রতিকারও জানে কিন্তু জন্মগত অক্ষমতাকে সে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে না।

মেছোপাখিদের হৈহুল্লোড়, সমুদ্র ধারের লোম ওঠা কুকুর গুলোর চিৎকার চেঁচামেচি তাকে তটস্থ, তন্নিষ্ঠ করে তোলে সহসা, প্রতিদিন এই শব্দগুলোই তাকে সারণি জালের কথা মনে করিয়ে দেয়। অমনি সে আত্মমগ্নতা কাটিয়ে উৎফুল্ল চোখে দূরের সমুদ্রের দিকে তাকায়, তার চোখে পড়ে কলার মোচার ঠোলের মত ছোট ছোট জেলে নৌকা, আর কিছু রাত্রি জাগরণের ক্লান্ত মানুষের ঘরে ফেরার উদ্দাম চলাফেরা। ভাল লাগে কেঁচুর, তার মধ্যেও

এক মিশ্র প্রতিক্রিয়ার দোলা লাগে. সে হাপুস নয়নে সারণি জালের দিকে তাকিয়ে থাকে আর ভাবে, আজকের প্রাপ্য মাছগুলো চড়া দামে বেচবে দূরের কোন গ্রামে গিয়ে, তারপর লাভের টাকায় সে টেঁড়ির জন্য একটা নতুন শাড়ি কিনবে—আর নিজের জন্য এক শিশি মগর মাছের তেল। রোজ রাতেই তো টেঁড়ি মগর মাছের তেলের কথা বলে, কোন এক সাধুবাবা ঝাউবনের শেষের দিকে তার কুঁড়ে ঘর সে খুব বড় গলায় আশ্বাস দিয়ে বলেছে, মগরমাছের তেল হলো যৌবনবর্ধক। এক শিশি বার টাকা। বার বছর ওষুধ খেয়ে যা-না হবে—এক শিশি তেল মালিশে তা হবে।

টেঁড়ি কথাগুলো শোনার পর থেকেই পাগল, কিছুটা নেশাচ্ছন্ন, বাতিকগ্রস্ত ছিটেল মেয়েমানুষ। বালিচড়ায় যা 'মগরমাছ' সমুদ্র ধারের বাবুসমাজে তার নাম দ্রার মাছ, রোজ দেখে কেঁচু, সারণি জালে ফেঁসে মৃত শিশুর মত কেঁতিয়ে থাকে মন চাইলে অমন একটা চিলা মগর বা করাতীয়া মগর মাছ সে চেয়েচিন্তে এনে আঁখার জ্বালে ফুটিয়ে ফুটিয়ে তেল বের করতে পারে। প্রস্তাবটা টেঁড়ির মনে ধরেনি, সে জোর করে বলেছে, সাধুবাবার তেল মন্ত্রপড়া তেল। এ তেল তুমি পাবা কোথায়? এ-তো সরষে তেল নয় যে দোকান থেকে এক ছটাক কিনে আনবে।

হোটেলের দারোয়ান রামসিং— সে রোজ সকালবেলায় ঢিলেঢালা প্যান্ট পরে ছোটে বালিচড়ায়— সে তালসারি অব্দি যায় তারপর আবার ফিরে আসে, তার সাথে দেখা হয় কেঁচুর ঠিক মাছ কুড়োবার সময়। আজ রাম সিং অনেক আগে, মাজা জলে নেমে সারণি জাল টানছে মাছমারা লোকগুলো—আর ভেজা বালিতে পা ছুঁইয়ে ন্যালা ক্ষ্যাপার মত দাঁড়িয়ে আছে কেঁচু, তার পায়ের গোড়ায় মাছের ঝুড়ি পায়ের চাপে 'টেঁড়িপাড়' খেলছে। রাম সিং হাঁফ ধরা বুকে থমকে দাঁড়াল কেঁচুর মুখোমুখি, শুধোলে, টেঁড়ি আসেনি?

এই রাম সিং মানুষটাকে কেঁচুর মোটে পছন্দ নয়, সমুদ্র ধারের কুকুর গুলোর মত তার খুব ছুঁকছুকানি স্বভাব। সকালবেলায় দেখা হতেই টেঁড়ি কোথায়, কেন আর কি কোন প্রশ্ন ছিল না? কেঁচু নিরুত্তর চোখে তাকাল, রাম সিং ভেজা বালিতে ব্যাঙের ছায়ের মত লাফাচ্ছে।

টেঁড়ি রাম সিংয়ের ভক্ত, কেননা বর্ষাকালে যখন হাতে কাজ থাকে না, ট্যাকের জোর থাকে না—পচা তালপাতার ছাউনি ভেদ করে ভাতের হাঁড়িতে টুপটুপ করে জল পড়ে—যখন মাঠ ব্যাঙের ক্রমাগত সুরেলা ধ্বনিতে ক্ষিদে ভাবটা জলো মশা হয়ে মনের বাদাড়ে পনপনিয়ে ওড়ে, তখন ঐ রাম সিং-ই হোটেলের ঠাকুরকে বলে বাসি খাবারগুলো টেঁড়ির সান্‌কিতে ঢেলে দেয়। টেঁড়ি কাঠ-কয়লা-ঘুঁটে রাখার ঘরে গিয়ে পেট পুরে খায়, রাম সিং গোঁফে তা দিয়ে টেঁড়ির সাথে গল্প করে, গায়ের মশা তাড়ানোর অজুহাতে নরম ফুলের শরীরটাও ছুঁয়ে দেখে তারপর খৈনীর পিক্ ঝেড়ে বলে, হায় রামজী, তুমার এখনো বালবাচ্চা হয় নি! কি বদ্‌নসিব! সাধুবাবার কাছে যাও। সে তুমাকে পথ বাৎলে দেবে।

টেঁড়ি মুগ্ধ চোখে শোনে, তার বুকের ভেতর আনন্দের ঘোড়া লাফায়।

সেই রাম সিং বালিতে দু'বার ডনবৈঠক মেরে বলল, যাই ধুপ চড়চে। টেঁড়িকে পাঠিয়ে দিও। আচ মিলা খাবার বেঁচেছে— সে এসে নিয়ে যাবে। ম্যাচিস কাঠির মত জ্বলে উঠতে গিয়ে ফুঁস করে নিভে গেল কেঁচু, পা দিয়ে লাথ মেরে দূরে সরিয়ে দিল ঝুড়িটা, আবার

কি মনে করে কুড়িয়ে আনল হেঁট হয়ে। এই হেঁট হয়ে থাকাটাই তার জীবন তবু সে মাঝে মাঝে খাড়া হবার চেষ্টা করে কিন্তু কমজোর কোমর, চোঙাপারা বুক— বড় করে দম ধরে থাকলেও ভুস্ করে বেরিয়ে যায়। এই আক্ষেপ নিয়ে সারণি জাল থেকে মাছ ছাড়ায় কেঁচু, তার মাথার উপর রাম সিংয়ের তীক্ষ্ণ লোভী দৃষ্টি চিল হয়ে ওড়ে...তবু সে ভয় পায় না, হাত উঠিয়ে শূন্যে ঘুষি ছুঁড়ে দিয়ে বলে, তফাৎ যা, তফাৎ যা।

চিল তবু ছায়া ফেলে ফেলে ওড়ে, নিরাপদ দূরে দাঁড়িয়ে লুব্ধ চোখে তাকায়, তার ক্ষুরধার চঞ্চু, উদ্ধত ডানা, অগ্নিবর্ণ চোখ—তাকে দেখে মোটেও ভয় পায় না কেঁচু, সে একাগ্র মনে মাছ বাছে, তারপর ওজন সেরে ঝুড়িতে ভরে, কোমরে বাঁধা গামছাটা বিড়া বানিয়ে লগা শরীরে হাঁটতে থাকে দূরের গ্রামের দিকে আর ভাবে—আজ যে করেই হোক এক শিশি মগর মাছের তেল তার চাই, আর চাই টেঁড়ির জন্য একটা নতুন শাড়ি। অনেকদিন বউটা নতুন শাড়ি পরেনি, অনেকদিন তার তালপাতার ছাউনীর নিচে নতুন বস্ত্রের সুগন্ধ ম-ম করেনি। আজ সেই দিন, আজ সেই সুদিন—আজ তার নবজন্মের শুভ সময়। জোরে জোরে পা চালিয়ে কেঁচু বাঁধের উপর উঠে আসে, আঁশটে জলে তার দেহ ভিজেছে সে খেয়াল তার নেই।

দুপুরের অনেক আগে এক ঝুড়ি মাছ বেচে দিয়ে সুখী মনে বটের ছায়ায় বসেছিল কেঁচু। বটগাছ লাগোয়া চায়ের দোকান—বাঁশের বাতার বেঞ্চিতে পা ঝুলিয়ে বসে আছে জনা কয়েক খদ্দের। ঘর খরচের মাছগুলো ঝুড়ির এক কোণে চিকচিকি কাগজে মোড়ান—কেঁচু সেই রূপালীবরণ মাছগুলোর দিকে চেয়েছিল যেহেতু পাঁচমেশেলি চুনোমাছ টেঁড়ি খেতে ভালবাসে এবং তার ধারণা নোনামাছ খেলে বাত হয় না, গা ম্যাজম্যাজ করে না; সেইজন্য পরম আগ্রহে বেছেবেছে মাছগুলো সরিয়ে রেখেছে কেঁচু। দু-একজন খদ্দের চড়া দাম দিতে চাইলেও তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছে—কেননা শুধু টেঁড়ি নয় সে নিজেও তো নোনামাছের ভক্ত। গরিব গুবরোদের জন্য এর চেয়ে সুস্বাদু খাবার আর কি আছে? টকরসায় ভিজিয়ে ফুটিয়ে নিলেই ফাস্‌কেলাস্ খাদ্য, ফি-চাখায় মুঠো মুঠো ভাত পাকস্থলিতে সিঁদিয়ে যাবে। যতদিন সমুদ্র আছে ততদিন সুখের যেন কোন শেষ নেই। টেঁড়ি বলেছিল, সমুদ্র অব্দি রেলপথ হবে, দীঘা থেকে কলকাতা বিল-ছুঁচোর মত ছোটাছুটি করবে রেলগাড়ি, বাবুরা আসবে—বাবুর বৌ'রা আসবে তখন রোজই যেন সাগরমেলা বসবে দীঘার পাড়ে তাতে কেঁচুর কি বরং এ কথা শোনার পর থেকে সে প্রাণে মরে আছে, কেননা রেলসড়ক হলে তাতে সুবিধে যেমন—অসুবিধে তো ঢের। দীঘার মাছগুলো সব চালান যাবে কলকাতায়, কলকাতার ব্যাপারী এসে চড়া দামে কিনে নিয়ে যাবে মাছ তখন তার মত সামান্য একজন মাছের ব্যাপারী কি সাহস পাবে সারণি জালের ধারে কাছে ঘেঁষার। দুঃস্বপ্ন দেখলে মানুষ যেমন কঁকিয়ে ওঠে তেমনি এসব কথা মাঝে মাঝে মনে পড়লে হাওয়া ছাড়া ট্যাপামাছের মত চুপসে যায় কেঁচু—জীবিকালীন জীবনযাপনের গ্লানিময় দুঃখ-দুর্দশার কথা তার চেয়ে কেউ আর ভাল জানে না।

ঐ বটতলায় বসেই কেঁচু অর্ডার দেয় চা-পাউরুটির, গলাটা বেজায় শুকিয়ে এসেছে, ভেতরটা কেমন চড়চড় খসখস করে, সঙ্গে সঙ্গে এক গেলাস জলের কথাও চড়া গলায়

শুনিয়ে দেয় সে। ট্যাকে পয়সা থাকলে গলার জোরও বেড়ে যায়—এটা সে বহুবার প্রত্যক্ষ করেছে এবং মনে মনে খুশী হয়েছে;আজও সেই খুশির রেশ তার মনের আনাচে-কানাচে জড়িয়ে পড়ে। চোখ বুজে আসে আমেজে, এক সমাচ্ছন্ন তন্দ্রায় তার সমস্ত অনুভূতি জুড়ে শান্ত সমুদ্রের গাম্ভীর্য নেমে আসে। এইভাবে চোখ বুজে কতক্ষণ পড়ে থাকত কেঁচু তা-সে নিজেও জানে না, কিন্তু মেয়েলী কণ্ঠের আব্দার জড়ানো গলার স্বরে চকিতে সে চোখ মেলে তাকায়, দেখে মাত্র হাত পাঁচেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে ঘেন্না। ঘেন্নার স্বামী কাঙালী বড়ই সৎ-সজ্জন মানুষ ছিল। যদিও সর্বগ্রাসী অভাব-দরিদ্রতা তাকে কোনদিন মহিমান্বিত করে তোলেনি, নিজেকে বুঝতে শেখার সামান্যতম সুযোগটুকুও দেয়নি। বাঁধের ধারে তার ছিল একটা কুঁড়েঘর, সেখানেই সে ভেদবমিতে মরে, তাকে কেউ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় পায়নি, যেহেতু তার মৃত্যুর অন্তিম ক্ষণটি ছিল ঘনঘোর দুর্যোগের রাত। সকালে ঘেন্না এল কাঁদতে কাঁদতে তখন ঝড় থেমেছে, সমুদ্র ব্যাঙগেলা-সাপের মত হাই তুলছে ঘনঘন, পূবদিকে কুসুম রক্তের সূর্য। তালসারির 'মুড়দার' ঘাটের কাছে সকালেই দাহ করা হলো কাঙালীকে, তার চার ফুট দশ ইঞ্চি মাপের শরীরটা পুড়তে বেশি সময়ও নিল না, মাত্র একটা চারা বাবলা গাছেই তার নাভিকুম্ভু ক্ষিদেয় কুঁচকান পেটের সাথে জড়িয়ে একটা সুপুরির মত হয়ে গেল যা দেখে দু'হাতে মুখ ঢেকে হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছিল কেঁচু। তার আকুল কান্না দেখে শ্মশানযাত্রীরা ভেবেছিল, এরা বুঝি এক মায়ের পেটে দু'ভাই ছিল। সেদিন থেকে ঘেন্না সবার ঘৃণ্য হলো, ভিখারী হলো, তার হাতে এখন ভিক্ষাপাত্র— সে এদোর-সেদোর ঘোরে, কখনো ক্ষুন্নিবৃত্তির অভিপ্রায়ে দেহ দেয় বালিয়াড়ি ঝাউবনে—তার মাথা গোঁজার ঠাঁই জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গেল— সে এখন ছিন্নমূল পথের ভিখারী। তবু তার এখন ন' মাসের পেট, চোখের কোণে রাতের কালি, পা ফাটা, শীর্ণ রোগাটে চেহারা, রক্ত স্বল্পতায় ধোঁকায় তবু একটা প্রাণের ধারক সে— সে এই লবণাক্ত অঞ্চলের অবাঞ্ছিত জননী। তাকে সহসা দেখে কেঁচু কেঁচোর মত গুটিয়ে যায় কারণ ঘেন্নার সঙ্গে দেখা হওয়া মানে নিশ্চিতরূপে তার কিছু আব্দার পূরণ করার দায়িত্বও এসে যায় যেহেতু কাঙালী বেঁচে থাকতে তার ঘরে ওঠা-বসা ছিল নিয়মিত। চা এল, জল এল সঙ্গে সেঁকা পাউরুটি। চা-টা খেয়ে হাফ-পিস পাউরুটি ঘেন্নার হাতে ধরিয়ে দিতেই টেঁড়ির মত অবিকল হেসে উঠল ঘেন্না, সেই বিমল মুগ্ধ হাসি প্রতিফলিত হলো তার চোখে, আশ্চর্য দক্ষতায় ঘেন্না কি করে যেন টেঁড়ি হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। গেরস্থের মত অপার বিস্ময়মাখা চোখ মেলে তাকিয়ে আছে কেঁচু, তার পলকহীন চাহনি সুখী ইলিশের চোখের তারা হয়ে জ্বলছে। এই পার্থিব সুখ কেঁচু চেয়েছিল, পায়নি অথচ না পাওয়ার জন্য তার যতটুকু খেদ বা আপেক্ষ আছে তার মূলে টেঁড়ির প্ররোচনা বা বদখেয়ালই দায়ী।

হাওয়া বয়ে যায় দু'জনের মাঝখান দিয়ে, দূর থেকে ভেসে আসে সারিবদ্ধ ঝাউবনের মাজা দোলানোর উদ্বেলিত শব্দ, আর ঠিক কিছু দূরে আছড়ে পড়ে ক্ষুধিত, ক্রুদ্ধ সমুদ্রের বিশাল গর্জন। আকাশের আয়নায় সমুদ্র যে মুখ দেখে কিংবা আকাশ সঘন মোহনী মুখ দেখে জলের আয়নায়—এই তার্কিক বিচার প্রকটিত হয়ে ওঠে ব্যাপ্ত চরাচরে। তারই মাঝে ঝিঙেফুল রোদ এসে পড়েছে পৃথিবীতে সেই রোদ গায়ে মেখে জীর্ণ শতছিন্ন, মলিন

পোশাকে দেহসম্ভার ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে ঘেন্না যাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া যায় না, যাকে ঘৃণার পরিবর্তে শুধু ভালবাসা যায়— সেই ঘেন্নাকে কেঁচু শুধোল, কোথায় গেছিলে গো বৌদি, তা খপর সব ভালো তো?

যেন একটা হাই উঠে আসে সমুদ্র থেকে, যেন ঘুম ভেঙে সুখের স্বপ্ন দেখে কোন মৎসকন্যা চোখ মেলে তাকিয়েছে ড্যামা ড্যামা তেমন মনোমুগ্ধকর দৃষ্টি মেলে ঘেন্না বলল, তোমাকে দেখতে পেয়ে চলে এলাম ঠাকুরপো। এসে ভালই করেচি, টুকোখানি রুটি তো পেলাম। আঃ, কৎদিন হলো অমন নরম রুটি খাইনি! তোমার ভাল হবে ঠাকুরপো, তা আমি যার জন্য এসেছিলাম এবার সেটা খুলে বলি। .. দেখছে তো আমার অবস্থা—খাওয়া-দাওয়া জোটে না। তাছাড়া অখন তো একার পেট নয়— পেটের ভেতর আর একটা পেট হামলায়। আমি আর তিষ্টুতে পারিনে ঠাকুরপো, ফলের ভারে গাছের যে সর্বনাশ হয়ে যায় তা আমাকে দেখে শেখো। আমি চাইনি অথচ কি করে যে কি হয়ে গেল! যখন টের পেলাম তখন আর জড়ি বুটিতে কাজ চলে না। ঐ ঝাউবন আমাকে শুকুইমাছের মত করে দিল অথচ তুমিই বলো কি ছিল না আমার। আবার একটা হাই উঠে আসে ঘেন্নাব মুখে, সে কথা হাতড়ায়, তার অস্থির চোখ দুটো মাছের ঝুড়িতে, সে কেমন লোভী চোখে তাকিয়ে খড়খড়ে ঠোঁটটা জিভের লালায় ভিজিয়ে নেয় তারপর আব্দার করে বলে, জানো ঠাকুরপো, কৎদিন হলো আমি মাছ খাইনি। সমুদ্র ধারে গেলে চুনো চাঁদা মাছ যে পেতাম না তা নয়। কিন্তু ইচ্ছে করেই যাইনি। ওখানকার কুকুরগুলান বড় লুভা, আমাকে দেখলে তেড়ে আসে। দেহটা ভার হয়েছে, আমি তো সেই আগের মতন ছুটতে পারিনে। তোমার দাদা যেদিন মরল সেদিন আমার পা দুটাও গেল, মোটে জোর পাইনে, কোমরে বেদনা। অমাবস্যা পূর্ণিমায় শুলোয়, আমি কাতরাই। এখন পেটে একটা দস্যি হামলায়, সেই যাতনাও আমি সইতে পারিনে। সময় মত দুটো ভাত পাইনে, আজ দুটো চাল পেয়েচি— ভাবচি ইটের চুলায় ফুটিয়ে খাবো, তাই তোমাকে দেখতে পেয়েই ছুটে এলাম। তুমি তো মাছের কারবারী যদি দুটো মাছ দিতে তাহলে টক রেঁধে খেতাম।

ঘেন্নার হাঁ-করা মুখ, চোখে ভিক্ষাবৃত্তির ছাপ তবু যেন মনে হয় সে পেশাদারী নয়, গ্রাম বাংলার হা-অন্ন মিছিলের একজন। ঘর খরচের মাছগুলো ঘেন্নার হাতে তুলে দিতে কেঁচুর প্রথমে বাঁধো বাঁধো ঠেকে পরে সে নিজেকে বুঝ দেয়—তারা তো রোজ খায়, একদিন নয়তো ঘেন্নায় খেল!

—নাও। প্লাস্টিকের ঠোঙাটা ঘেন্নার হাতে তুলে দিয়ে কেঁচু যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, যেন এই মাত্তর সে সমাপ্ত করল কোন এক মহৎকর্ম। ঘেন্না গেল না, দাঁড়িয়ে থাকল চুপচাপ, তার হাতে রুপালী মাছ, স্বভাবত সে খুশি, তবু সে দুঃখী ম্রিয়মান স্বরে বলল, একটা কথা শুধাই ঠাকুরপো, মনে কিছু করো না। বলি, তোমার ঘরের ঢেঁড়ির কি কোন খবর নেই? তোমারে এট্টা গোপন কথা বলি। দক্ষিণের কালী মন্দিরে একটা সাধু এয়েচে। একবার যাও না ঢেঁড়িকে নিয়ে। অনেকে ফল পাচ্ছে।

কেঁচু কেমন উদাস অন্যমনস্ক হয়ে যায়, তৎক্ষণাৎ বলে, কত জায়গায় ঘুরলাম, ঘোড়া বাঁধলাম, ঢিল বাঁধলাম হত্যে দিলাম, তবু কাজের কাজ কিছু হলো না। মন ভেঙে গিয়েচে

বৌদি, এখন আর ভাঙা মনে ততো বিশেষ জোর পাইনে। তুমি যখন অতো করে বলচো, তখন যাবো একবার।

ঘেন্না চলে যাওয়ার পর তার কথাগুলোই জাবর কাটে কেঁচু, জাবর কাটতে কাটতে সে লতলতে কেঁচোর মত হয়ে যায়—তার আর ঘর ফিরতে মন করে না, বটের ছায়ায় নিশ্চিন্তে সে যেন একটু নিদ যেতে চায়।

বৃহস্পতিবার। রীতিমত সূর্য উঠেছে দাপিয়ে, তার প্রথম কিরণে সদ্য স্নান সারা টেঁড়িকে মনে হয় জলদেবী, তার সামনে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে কেঁচু কেননা বৌয়ের এই মোহিনী রূপ সে যেন এর আগে দেখেনি। তাকে চুপচাপ দেখে টেঁড়ি মহোৎসাহে বলল, কি গো যাবা না? বেলা চড়ে গেলে আমি বাপু হাঁটতে পারবনি। পথ তো টুকে নয়, অনেকটা।

—তা'লে এট্টা সাইকেল চেয়ে নিই। তুই পিছে বসবি, আমি চালাব।

—না না, পায়ে হেঁটেই যাবো। ঠাকুরের কাছে যেতে গেলে কষ্ট করতে হয়। কষ্ট না করলে কেষ্ট যে মেলে না।

দক্ষিণের কালী মন্দির হাঁটা পথে তিন ক্রোশ। নুন ফোটা ধানী জমির হাত উঁচু সরু আল, কোথাও বালি মাটির ধুলো—সামনে কেঁচু, পিছনে টেঁড়ি এগিয়ে চলে কথায় কথায়। কথার নটেগাছটি মুড়িয়ে যায় তবু যেন পথ ফুরায় না, দিকচক্রবালের কোল ঘেঁষে শামখোল ওড়ে অগুনতি। টেঁড়ি উৎফুল্ল হয়ে বলে, দেখো, কত পাখি, ওরা কোথায় যায় গো অমন করে?

কেঁচু তাকিয়ে থাকে, তার চোখের তারায় অগুনতি পাখির ডানা ঝাঁপটানোর ছায়া। এই ছায়া সে টেঁড়ির চোখে প্রায়ই দেখে, শুধু টেঁড়ি নয়— ঘেন্নার চোখেও এমন ছায়া ছড়ানো।

বেলা গড়িয়ে যায়, কালী মন্দিরের দরজায় বিশাল তালা—ব্যর্থ মনে ফিরে আসে ওরা। বাঁধের ওপর উঠে আর পা চলছিল না টেঁড়ির, সে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে, আমার কপালটাই পোকাড়ে! যতভাবি নিজেকে বাঁধ দেব, পারি না। আমার ভেতরেও এট্টা সমুদ্র আচে। সেটা হরসময় ঢেউ ভাঙে, আমাকে ভিজিয়ে দেয়, নোনা জলে আমি ডুবে যাই গো। তারপর সে উতলা হয়ে উঠে, ক্ষোভ সামলাতে না পেরে বলে, কেনে নিয়ে এলো গো মরতে! আমি তো বেশ ছিলাম। আমার পোড়া ঘায়ে তুমি নুনের ছিটে দিলে গো। আমি যে আর আমাকে সামলাতে পারি না। জোয়ারের সময় সমুদ্র কি পারে নিজেরে এটকে রাখতে? বলো, তুমি ঢের বেশি সমুদ্রে যাও, তুমিই বলো?

টেঁড়ি পাগলের গলায় বলে, আমারে বাঁধ দাও নাহলে আমি ঘর ভেসিয়ে চলে যাবো। আর পারি না গো, আর পারি না। এট্টা কাঁচা খোকা তুমি আমার কোলে তুলে দাও। তাহলে আমি আর তুমার কাচে কিছু চাইব না। হা দেখো কত্তো বড় সমুদ্র, সে-ও তো হাজার রকমের মাছ, পোকামাকাড়ের জননী।

টেঁড়ি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, আমার বংশে কেউ অসতী হয়নি, ধর্ম বিলোয়নি তাই আমি পচা মাছের মত বাঁচবো না। চলো দু-জনেই আজ সমুদ্র যাবো। এখন জোয়ারের সময় তলিয়ে যেতে বেশি সময় লাগবেনি।

কেঁচু তো কেঁচুই। বউয়ের কথার অন্যথা করার সাহস নেই, সাধ্যও নেই।

নির্জন বালুচর, ওরা দু-জনে প্রতীক্ষাবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মৃত্যুর অপেক্ষায়। হাজার হাজার ঢেউ হাতির উদ্ধত শুঁড়ের মত ছুটে আসে, কি বিশাল ভয়ানক তার গর্জন অথচ সব গর্জন হম্বিতম্বি, জলোচ্ছ্বাস কোলাহল চাপা পড়ে যায় নবজাতক এক শিশুর কান্নায়। মৃত্যুপণ ভুলে ওরা ছুটে যায় ঝাউবনে দেখে— সদ্যোজাত একটা শিশু, তার বুকের ওপর ভাঁজ করা ঘেন্নার শতছিন্ন কাপড়। ঘেন্না নেই, কোন এক ঢেউয়ের মাথায় সে ভেসে গেছে। সমুদ্র চিরদিনের জন্য কাউকে নেয় না, যদি ঘেন্না ফিরে আসে কোনদিন তাহলে সে দেখবে টেঁড়ির কোলে তার সন্তান হাসছে, খেলছে, যেমন আকাশে চাঁদ হাসে, তারা হাসে— তেমন। ভরন্ত কোলে ভরা সমুদ্রের গতর নিয়ে ঘরে ফিরে আসে টেঁড়ি। তার পিছনে কেঁচু, 'কেঁচুয়া' নয়, যেন আস্ত একটা গ্রহণ মুক্ত মানুষ।

থাবার বাইরে

চৈত্রমাসের খরায় শরীর পুড়ছিল বটার, ঘামের ধারায় মাটি ভিজে ছিল সাড়ে তিন হাত। বটগাছের সম্মুখে যে পুকুরটা তার জল কাকচক্ষু নয়, মেটে রঙা। হাওয়া মারলে পচা গন্ধ ভেসে যায় দূর মাঠে। এ সময় ধানমাঠ ফাঁকা। নুন ফোটা মাটিতে খোঁচা খোঁচা ধানের ন্যাড়া। এ অঞ্চলে মৌসুমী চাষ-আবাদ খুব কম হয়। নোনামাটির পানসে গতর তার জন্য দায়ী। ফলে অভাব-অনটন লেগেই আছে দূরের গাঁ গুলোতে, বটা তেমনিই একটা গ্রামে থাকে। তার গ্রামের পাশ দিয়ে শাড়ির পাড়ের মত সরু একটা খাল, সে জল মানুষে খায় না নোনতা বলে। খালের উপর কাঠপোল। বর্ষাকালে খাল ভরে গেলে সেটাই হলো একমাত্র পারাপারের রাস্তা।

বটা গিয়ছিল ঐ দূরের গাঁটাতে, তা এই কাঠপোল থেকে মাইল পাঁচেকের পথ। চৈত্র মাসের ধুলো ওর পুরো গতরে। গায়ের লোম, মাথার বাবড়ি চুল সবই তাই এখন কটা দেখায়। ক্লান্তিতে নুয়ে গিয়েছে তার মাথা। রোদের ঝাঁঝে বিবশ দেহ-মন। খালধার থেকে পাঁচুয়া খেয়ে সে আর নিজের গাঁয়ে ফিরে যেতে পারেনি, পুঁটুলিটা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়েছে বটগাছের ছায়ায়। পথ ক্লান্তিতে অসাড় দু'চোখে ঘুমের জোয়ার এসেছে তখুনি। হাত পা এলিয়ে সে এখন গভীর ঘুমে লিপ্ত। তাকে দেখে মনে হয়—তার কোন দায়-দায়িত্ব নেই, সে বুঝি একটা লাগাম ছাড়া ঘোড়া। আদপে সে তা নয়। ঘর-সংসার, বৌ-ছেলে-মেয়ে একসময় তার সব ছিল, তখন সে ছিল একটা সুখী গাছ্। এখন শীতের জরিলা হাওয়ায় পাতা ঝরে যাওয়া বিষণ্ণ বৃক্ষ। তার বৌ মতি মরেছে কলেরায়, একমাত্র ছেলে আজ দশ বছর ধরে নিরুদ্দেশ। মেয়েটার বিয়ে হয়েছে দূরের গাঁয়ে, জামাই তার গুণিন কোবরেজ। তারাও ন'মাসে-ছ'মাসে খোঁজ নেয় না, বলতে গেলে পচা সুতোর সম্পর্ক। বটা তাই দুঃখ করে বলে, আর জোর নেই গো। বউ গিয়ে অমার বুক ভেঙেচে, বিটা চলে যাওয়ার পর আমার হাত দুটো মুড়ালো। আর মেয়েটা ছিল লক্ষ্মী। তাকে পরের দুয়ারে ছেড়ে এসে আমি লক্ষ্মীছাড়া হয়েচি গো!

বটার আক্ষেপ বটাকেই মানায়। তার এত বয়স হলো, এই বয়সে যে কোন মানুষ মাঝ-বয়েসী গামার গাছের চেয়েও গম্ভীর। অথচ বটার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ তা উল্টো। সে হলো খোলা মনের মানুষ, তার কোন ঢাকঢাক গুড়গুড় কান ফুঁসলান মতলব নেই। সে আগুনকে বলে, আগুন। জলকে বলে, জল। চুন খেয়ে তার গাল পুড়লে সে কখনো গালের দোষ দেয় না, চুনকে উপুড় করে ঢেলে দেয় সার গাদায়। মতি মরার সময় তাকে কয়েকটা কথা বলেছিল, সে কথা এখনো মনে আছে বটার। বউকে সে জান

দিয়ে ভালবাসত, বৌয়ের শরীর খারাপ হলে সে রেঁধেবেড়ে খাওয়াত। পুকুর থেকে জল এনে দিত স্নান করার। কপাল কামড়ালে দাবিয়ে দিত কপাল। লোক পিছনে টিটকিরি করে বলত, বটা হলো গিয়ে বৌ-পাগলা। যে মানুষটা বৌয়ের সায়া কেচে দেয় সে-কি কোনদিন পুরুষমানুষ হয়? বটা তাদের কথায় হাসত। বলত, নারী-পুরুষ দুটি জাত। বউ হলো গিয়ে গাছের উপর পরগাছা। পরগাছাকে গাছ না দেখলে সে কি কোনদিন মাজা সোজা করে দেঁড়ুতে পারে? বউ তার কাছে পরগাছা নয়, বউ ছিল তার শিরদাঁড়া। বটা বউয়ের নির্দেশমত চলত। বউ প্রায়ই দুঃখে মুখ কাচুমাচু করে বলত, পাঁঠা খাসী করাও—এটায় তোমার পাপ হয়। ভগবানের জীব তাদের ধরে অঙ্গহানি করলে কোনদিন কার পুণ্যি হয় গো? খেতে না পাই সে-ও ভাল তবু তুমি এসব কাজ ছেড়ে দাও।

বৌয়ের মুখের উপর 'না' করার স্পর্ধা ছিল না বটার তাই সে ঘাড় নামিয়ে কুলুপ আঁটত মুখে। মতি বলত, আহা, কচি পাঁঠাগুলো কত কষ্ট পায় গো, দেখলে কষ্টে আমার বুক ভেঙে যায়! তুমি কি ভাবচো, এসব অবলা জীবের দীর্ঘশ্বাস তোমার গায়ে লাগবেনি? লাগবে গো। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর-সন্সার করি, কখন কি বেপদ ঘনিয়ে আসে তা একমাত্র ভগবানই জানে। তাই তোমার দুটা পায়ে পড়ি, ঐ রক্ত জড়ানো পয়সায় আমার কোন দরকার নেই। ভগবান দিলে আপসেই আমার সব হবে। শুধুমুধু টাকার পেছনে ছুটে হোঁচট খেয়ে গা বিদনা করে লাভ কি গো?

বটা মনোযোগ দিয়ে সব কথা শুনত, তার মত নিরীহ শ্রোতা এ অঞ্চলে আর দুটি নেই। তবু কোথায় যেন আত্মসম্মানে ঘা লাগত তার। মতিকে বুঝিয়ে বলত, ভগবান এই হাত দুটো দিয়েচে খেটে খাওয়ার জন্যি। আমি যে বদা ছাঁটাই করি এটা তো কাউকে না কাউকে করতেই হয়। দুনিয়ায় যদি বদা (পাঁঠা) ভরে যায় তাহলে তাদের ডাকে কানে তালা ধরবে, আর ধাড়ীগুলো মনের সুখে চরতে পারবেনি। বদা তাদের দমিই দিবে।

বটার ভালো নাম বটেশ্বর। সে হলো বিভিন্ন পেশার মানুষ ফলে তার সঠিক পেশা কোনটা এখনো পর্যন্ত কেউ জানে না। যখন মাঠে ধান ওঠে তখন বটা হলো ইঁদুরগর্তের মালিক। কোদাল ঝুড়ি আর ঝাঁটা নিয়ে সে আমুনীভুঁইয়ে পাগল নেশায় ঘোরে। তখন তার চোখ চঞ্চল, মন অস্থির। ধাপানো মাথা। ঘাড় কখনো উপরের দিকে তোলে না। অস্থির চোখের দৃষ্টি ইঁদুর ধরা বেড়ালের চেয়ে সতর্ক। একটা ধানগাত (ধানের গর্ত) নজর এড়ালেই তার বিরাট ক্ষতি। ধানের শিস কেটে মেঠো ইঁদুরগুলো বিলমাঠে সব গর্ত করে লুকিয়ে রাখে। সেই ধান তারা অসময়ে রসিয়ে মজিয়ে খায়। বটাও তক্কে তক্কে ঘোরে, ধান ভর্তি গর্ত দেখলেই তার হাতের কোদাল বজ্র-বিক্রমে নড়ে। মাটি সরিয়ে বের করে আনে থোকা থোকা ধানের শিস। সারাদিনে এমন দু-চারটে গর্ত পেলেই তার পেটের গর্তটা ভরে যায়।

মতি গত হবার পর বটার আগের সেই মেজাজ আর নেই। সে এখন খাঁচা ভাঙা পাখি। তার কোন সমাজ নেই, দল নেই, 'রা' নেই। এখন সে একলা থাকতেই ভালোবাসে।

একলা থাকার মোহ মানুষকে অন্তর্মুখী করে দেয়। বটাও তার ব্যতিক্রম নয়। অত বড় মাটির দেওয়াল দেওয়া তার ঘর, ঘরের মাথার উপর টালি বিছানো। উঠোনে আছে তুলসী-মঞ্চ, সেই মঞ্চে সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখাবার কেউ নেই। বটার তো চৌদ্দমাসে বছর। তার ভাতের হাঁড়িটা আগুন-ধোঁয়ায় পুড়ে পুড়ে অশৌচ হাঁড়িগুলোর চেয়েও কালো। সেখানে টোকা মারলে কালি ঝরে পড়ে ঝুরঝুরিয়ে। ঘরটা ঝাঁট দেবার সময় পায় না সে। আর সময় পেলেও এখন তার দমে কুলায় না। ক্লান্তি অলসতায় স্নায়ুগুলো সব শিথিল হয়ে জুড়োয়। তখন দু'চোখ জুড়ে ঘুম আসে। গাছ থেকে দুটো সজনে পাতা পেড়ে ভেজে খেতেও মনে করে না। ক্ষিদে পেটে জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে থাকতেই তার যেন আরাম।

কাল সাঁঝের মুখে মদন এসেছিল খবর নিয়ে। সে গিয়েছিল দূরের সেই গাঁটায়। তার মুখে খবর পাঠিয়েছে বিষ্টু সাউ। মদন সেই সংবাদই আরো ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলল, বটাদা গো, সাউবুড়া তুমারে ডেকেচে। তার ঘরে অখন ছ' ছটা বদা। বুড়া সব কটারে খাসি করাবে। আজকাল বদার চাইতে খাসির দাম বহুত চড়া। বুড়া তো হিসাবী মানুষ। তুমাকে দিয়ে 'ছর' করাবে।

'ছর' মানে 'কামানো'— এখানে 'ছর' মানে 'ছাঁটাই'। পাঁঠাকে ওরা 'বদা' বলে এটা গ্রামীন বেওয়াজ। ছ' ছটা পাঁঠার অন্ডকোষ ছাঁটাই চাট্টিখানি কথা নয়। বরাত ভালো হলে পাঁঠা পিছু দু' টাকা কেউ রুখতে পারবে না। সেই সংগে ছ'টা পাঁঠার অণ্ডকোষ তা-ও পোয়া দেড়েক মাংস। দুটো গোলালু দিয়ে ঝোল রেঁধে খেলে 'ফাস-কেলাস'। ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠেই নিম দাঁতনে দাঁত মেজেছিল বটা। তারপর জল ঢালা ভাত গুলো উদরে ঢুকিয়ে নিয়ে সে আর সময় নষ্ট করেনি। তখন সবে সূর্যের আলো ফুটছে চারদিকে, বাড়ির সামনে পুকুরপাড়ে হাঁসগুলো প্যাঁক-প্যাঁক্ ডাকতে ডাকতে চেপ্টা ঠোঁট দিয়ে চুলকে দিচ্ছিল এনে অন্যের পালক। এই দৃশ্য দেখে রাধারানীর কথা মনে পড়েছে তার। মেয়েটা মাত্র ষোল বছরে মা হল। উনিশ বছরের মাথায় সে এখন তিন সন্তানের জননী। ফি-বছর সন্তান হওয়া তার গতরটা এখন ঝাঁটার কাটি। এই প্রসন্ন ভোরে মুখে খিস্তির বান ডাকিয়ে জামাইকে একটা 'আস্ত বদা' বলে গাল দিল সে। জামাইটা তার বদা-ই। নাহলে কেউ অমন বেয়াক্কেলের মত কাজ করে। হাসপাতালের বড় ডাক্তার বলেছিল, ওটাকে খাসি করে দাও, তেজ কমবে। যেটুকু রক্ত বেরবে তার জন্য একশ চল্লিশ টাকা দেওয়া হবে। দু'একদিন ফল টল খেলে আবার ঘা শুকিয়ে উঠবে। মেয়েটার পানপাতা দুঃখী মুখ দেখে মনে মনে বড় কষ্ট পেয়েছিল বটা। মেয়েটা ঐ হাঁসগুলোর মতোই তার পিঠের ঘামাচি মেরে দিত পাঁচ নয়ার কোণা দিয়ে। আরামে চোখ বুজে আসত তার। ঐ হাঁসগুলো যেমন চোখ বুঁজে পড়ে আছে— তেমন। বাঁশঝাড়টা পেরিয়ে এসে সে ভেবেছিল যদি বিষ্টু সাউয়ের কাছ থেকে বারোটা টাকা বাগাতে পারে তাহলে সে এক পোয়া বুঁদিয়া কিনে নিয়ে জামাইঘর যাবে। ছোট ছোট নাতি-নাতনি আছে, যার জন্য খালি হাতে যেতে লাজ লাগে তার। 'বদা ছর্ হবে গো, বদা, ছর্' বটার ডাকটা

বড় বিচিত্র। তার এই ডাক আশে পাশের গাঁ-গুলোতে বিশেষ পরিচিত। যার ঘরে কচি পাঁঠা আছে সে তখন খাতির করে ডেকে নিয়ে যায় তাকে। বটার তখন একটা পাশ করা ডাক্তারের মত সম্মান। তার পুঁটুলিতে আছে নতুন ব্লেডপাত। ঘষিছাই গুঁড়া আছে কাগজের ঠোঙায়। আরো যে টুকিটাকি কত কি। যার পাঁঠা সে তেলগিনা ভরে তেল দেয়। তেল না হলে শক্ত চামড়া নরম হবে কি করে। সবকিছু হাতের কাছে পেলেই বটা অভ্যস্ত কায়দায়, অনায়াস দক্ষতায় কচি পাঁঠাটাকে শুইয়ে দেয় ঘাসে, তার দু' পায়ের নিচে তখন চাপা থাকে পাঁঠার পেছনের ঠ্যাংগুলো। তারপর, চলে অস্ত্রোপচার। ধার ব্লেডের ছোঁয়ার বেরিয়ে আসে নরম মাংস পিণ্ড, ফিনকি দেওয়া রক্ত দেখে পরিত্রাহী চেঁচিয়ে ওঠে ছাগলছানা। সেই চিৎকার বড় মর্মন্তুদ! প্রথম প্রথম ভয়ে হাত কেঁপে যেত বটার। এখন তার কোন প্রতিক্রিয়াই হয় না। গলগলানো রক্ত দেখে এখন তার মাথাটা আগের মত ঘুরে যায় না। লোকে বলে, কি কঠোর জান গো তুমার বটাদা নাহলে অমন নিষ্ঠুর কাজ কি কুনো মানুষের দ্বারা হয়?

এমন প্রশ্নে আজকাল শুধু পানসে হাসে বটা। ঘাড় নাড়িয়ে যুক্তি দেখিয়ে বলে, ডাক্তার যদি ফোঁড়া কাটতে গিয়ে ভয়ে নাড়ি কেটে ফেলে তাহলে কি কোন কাজ হয়? নাপিতের কাজ হলো চুল কাটা, সে যদি চুল কাটতে গিয়ে কান কেটে ফেলে তাহলে লোক তাকে ছিঃ-ছিকার করে। তেমনি আমার কাজ হলো অণ্ড ছাঁটাই করা, একাজে ডরলে আমার চলে।

বিষ্টু সাউয়ের দুয়ারে বারো টাকাই আদায় করেছিল বটা। তাতেও তার মন ভরেনি। গুঁড়া ছাই শেষ ছাগল ছানাটার কাটা জায়গায় জেবড়িয়ে, মাথায় তেল-জল চাপড়ে সে হাঁপ ছেড়ে বলেছিল, খুড়া গো দুটো ভুজা দাও। খেতে খেতে চলে যাই। তারপর সে সর্তক করে বলেছিল, মেয়েমানুষ যেন তিনদিন নাড়া ঘাটা না করে ছা- গুলোকে। তাহলে পাকবে, ফুলবে, রস চুঁয়াবে। ঘা শুকাতে তিন হপ্তা লেগে যাবে।

বিষ্টু সাউয়ের দুয়ারে পাত পেড়ে খেয়েছিল বটা। তারপর একমাথা রোদে তার হাঁটা শুরু। খালধার আসতেই সেই পুরানো নেশাটা তাকে উন্মনা করে দেয়, পাঁচুয়া ভাটিতে গিয়ে চিকচিকি কাগজে মোড়ানো ছাঁটাই মাংসগুলো পুড়িয়ে চাট বানিয়ে খেয়েছিল সে। বারো টাকার ছ'টাকা সেখানেই সাবাড়। ঘোরলাগা দেহটা নেতিয়ে পড়েছিল তারপর দু চক্ষু জুড়ে অসুরের মত ঘুম।

ঘুম ভাঙল কাঠপিপঁড়ের কামড়ে। তখন পাখপাখালির ডাকে চতুর্দিক মুখরিত। সন্ধ্যার আমেজ ছড়িয়ে পড়েছে পুকুরয়াড়ির চারধারে। একটা ডাহুক দুধফুলকা গাছের ধারে ভীতু পায়ে দাঁড়িয়ে। তাকে দেখে প্রগাঢ় মায়ায় বটার বুকটা ভরে উঠল। ঐ ভীত, সন্ত্রস্ত চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে বটুর রাধারানীর চোখ দুটোর কথা মনে পড়ল। তখন অনুশোচনায় দগ্ধে গেল বুকটা। টাকাগুলো ওভাবে নেশার ঘোরে না উড়িয়ে দিলেই হয়ত ভাল হোত। কিন্তু হাত ফসকানো ঢিল তো আর ফিরিয়ে আনা যায় না। সে ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো পলকে। গাঁয়ে ফেরার আগে সে এক কাপ চা খাবে খালধারের দোকনটায়।

খালধারের সন্ধ্যেটা বড় মনোরম, উপভোগ করার মত সান্ধ্যকালীন পরিবেশ। জগা কেটলিতে জল ঢালছিল বটার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে। জল ঢালা থামিয়ে সে বলল, সাঁঝকালে কুথা থিকে আসচো গো বটাদা? তারপর সে তার আগাপাছতলা দেখে নিয়ে বলল, মেজজটা মনে হচ্ছে ভাল নেই? তা অসময়ে কুথায় গেছিলে গো?

বটা এক কাপ চায়ের কথা বলেই দোকানের পুরনো, ভাঙা নড়বড়ে তক্তাপোষটার নিচের দিকে উদ্বিগ্ন চোখে তাকাল। সেখানে ছিটকালো রঙের বেড়ালটা ইঁদুর ধরেছে, শিকারের আনন্দে কেমন বিচিত্র শব্দ করছিল গায়ের লোম চাগানো বেড়ালটা। ইঁদুরটা ভয়ে কাঠ হয়ে আছে তার থাবার নিচে। নিজেকে ঐ ইঁদুরের সাথে কেমন মিলিয়ে ফেলল বটা। ইঁদুর ছানার ভিতু চোখ তার চোখেও কাঁপুনী ধরিয়ে দিল নিমেষে। সে চায়ে চুমুক দিয়ে নির্লিপ্ত চোখে তাকিয়ে থাকল ঐ দিকে।

জগা শুধালো, কি দেখচো গো অমন খুটিয়ে খুঁটিয়ে?

দায়সারা গলায় বটা বলল, ইঁদুর। তুমার ইখানটায় বড় ইঁদুরগো!

—ইঁদুর-ছুঁচো কোথায় নেই বলোদিনি? ঘর -ঘর ইঁদুর, ঘর -ঘর ছুঁচো! বেড়াল যে কটা আচে তাদের ধারে কাছে কি ইঁদুর গুলান যেতে পারে?

না বুঝেই হো-হো করে হেসে ওঠে বটা, তার বাবরি চুলগুলো হাসি্‌ ালে তালে সিংহের কেশরের মত নড়ে। জগার কথায় কোথায় যে হাসির ইন্ধন ুকয়েছিল তা না বুঝতে পেরে জগাও ম্যাট্‌মেটিয়ে তাকাল। ততক্ষণে ইঁদুরটাকে নিয়ে ‌েবড়ালটা এক লাফে চলে গিয়েছে বেড়ার ধারে। জগার নজর পড়তেই বলল, দেখলো তো, খেল খতম, পয়সা হজম! ইঁদুরটা আর একটু পরে বেড়ালের পেটে চলে যাবে। তারপর মাড় ভাতের মত পচে গিয়ে হজম হয়ে যাবে। এরকম কত ইঁদুর যে বেড়ালের পেটে রোজ হজম হয়ে যায় তার খোঁজ আমরা কেউ রাখি না!

চায়ের দাম মিটিয়ে বটা যখন উঠে দাড়াঁল তখন রীতিমতো অন্ধকার। দু' একটা জোনাকি পিটিরপিটির জ্বলতে জ্বলতে অন্ধকারে বিড়ির ছাই আগুনের মত নিভে যায়। ঝিঁঝির একটানা ডাক ভেসে আসে বাঁধের ঝোপগুলো থেকে। নোনা বাতাসে এসময় ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার মত একধরনের মৃদু আরাম মিশে থাকে। বটা আর দেরী না করে পুঁটুলিটা বুকের কাছে চেপে ধরে কাঠ-পোলটার দিকে হাঁটতে থাকে। তখনই তিন ব্যাটারী টর্চের আলো তার মুখের উপর এসে থেমে যায়। আর বটাও চমকে উঠে থমকে দাঁড়ায় কাঠ-পোলটার হাত বিশেক দুরে। অন্ধকার ঠেলে এগিয়ে আসে লম্বা ঢ্যাঙ্গা একজন মানুষ। তার নাম শ্যামলা। সে কাছে এসে মুখে টর্চ মেরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। তারপর, কঠোর স্বরে জহ্লাদের মতন উৎশৃঙ্খল হাত পা নেড়ে শুধায়, সারাদিন ধরে খুঁজছিলাম, তা কুথায় যাওয়া হয়েছিল শুনি? বটার কমজোরী বুকটা কেঁপে উঠল তার জ্বলন্ত চোখের দিকে তাকিয়ে। থতমত খেয়ে ঢোক গিলে বলল, কুথায় আর যাবো দাদা, গেছিলাম ঐ দূরের গাঁটায়। বিষ্টু সাউ ডেকে পাঠিয়েছিলো।

— তাহলে পকেট নেশ্চয়ই গরম?

এককথায় মুখটা মাটির সাথে মিশে যেতে চাইল বটার, কিন্তু অন্ধকারে তার মুখের হঠাৎ পরিবর্তনটা ধরতে পারল না শ্যামলা। বটাকে মিইয়ে যেতে দেখে সে তার রাগী হাতটা দিয়ে চেপে ধরল বটার পাখির ডানার হাত। সজোরে মোচড় দিয়ে বলল, ট্যাঁকে যা আছে দাও। আজ তুমাকে ছাড়ছি না। কৎদিন হলো বলোতো, আগাম টাকাটা নিয়ে ঘোরাচ্ছো!

শ্যামলার অনুযোগ মিথ্যে নয়। তার কাছে থেকে পঞ্চাশ টাকা আগাম নিয়েচে বটা। কথা দিয়েছিল— হাসপাতালে গিয়ে নিজেই ভাসেকটমি করিয়ে আনবে। তাতে 'কোটা' ভরে যাবে শ্যামলার, আর তার গাঁয়ে গাঁয়ে ঘোরা চাকরিটাও বজায় থাকবে অনায়াসে। ব্লক-মেডিকেল অফিসার বলেছে, পার ক্যান্ডিডেট পাঁচটা করে কেস চাই, না হলে— ব্লকের সিডিউলড কোটা ফিল-আপ করা যাবে না। আর কোটা-ফিল আপ না হলে ফিল্ডওয়ার্কারের চাকরি নিয়ে টানাটানি । শ্যামলার নতুন চাকরি। মানের দায়ে বেগতিক দেখে সে টাকাটা আগাম দিয়েছে বটাকে। আর বুঝিয়ে সুজিয়ে বলেছে, তুমি নিজেই তো একটা ডাক্তার, অপরেশান করাও তুমাকে আর খুলে কি বলব? পিপঁড়ার কামুড়ের মত টুকে জ্বলবে। তারপর সব জলভাত। ব্যাস কাজ হয়ে গেলে তুমি আরো কমসে কম শ টাকা পাবো।

শুধু টাকার লোভে রাজী হয়ে গিয়েছিলে বটা। নাসবন্দীর ক্যাম্প বসেছিল গাঁয়ের হাসপাতালে। সেই উপলক্ষ্যে আরো দু-তিনজন ডাক্তার এসেছিল সদর থেকে। এই কাঠ-পোলটার কাছে সকাল দশটার সময় দাঁড়িয়ে থাকার কথাছিল বটার। শ্যামলা এসে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে। নির্দিষ্ট সময়ে শ্যামলা এসেছিল কিন্তু বটা আসেনি। ভয়ে তার জান এখন আধখানা। সে নিজে শ-শ ছাগলের নাসবন্দী করায় কিন্তু নিজের বেলায় তার এতো ভয়? তিন-চার দিনের জন্য গাঁ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল বটা, শামলার পঞ্চাশ টাকা সে কবে খেয়ে-দেয়ে মৌজ করে উড়িয়ে দিয়েছে। টাকাটা ঘুরোন দিতে পারলে সে বুক উঁচু করে সিধা দেবদারু গাছের মত দাঁড়াতে পারত। কিন্তু যে শক্তি টাকায় হয় সেই শক্তি থেকে সে আজ বঞ্চিত। অন্ধকারে ভয়ে হাত-পা এমন কি কলজেটা কেঁপে ওঠে বটার। তার চোখ দুটো অশুভ লক্ষণের আঁচ পেয়ে লাফিয়ে ওঠে বারবার।

শ্যামলা এ গাঁয়ের ছেলে, সে কিছুতেই ছেড়ে দেবে না বটাকে। আজ নিয়ে দিন পনের সে হন্যে ঘুরছে বটাকে পাকড়াও করার জন্য। অন্ধকারে সে আবার হাতটা মুচড়ে দিয়ে বলল, টাকা ছাড়ো, না হলে আজ তুমাকে ঠেলে আমি খালের জলে ফেলে দেব। আজ কুনো কথাই তুমার আমি শুনবো না। তুমি আমার মান-সম্মানে হেঁসুয়ার কোপ মেরেচো, তুমি আমর পেট নিয়ে ছিনিমিনি খেলেচো, আজ তুমাকে শিবের বাবাও বাঁচাতে পারেবেনি।

হিড়হিড়িয়ে টানতে টানতে খালধারের পাঁকপলিতে বটাকে সজোরে ঠেলে দিল শ্যামলা। অন্ধকারে দণ্ডীকাটা চৌতভক্তার মত সাটপাট ঠিকরে পড়ল সে। তার প্রসারিত হাতের চেটোয় পচা পলি। পায়ের দশটা আঙুল ঢুকে গিয়েছে পাঁকে। চিৎ-হওয়া ব্যাঙের

মত শোচনীয় তার অবস্থা। দু হাতে ভর দিয়ে সে যখন আবার উঠে দাঁড়াতে যাবে তখন ডান পায়ের লাথিতে তার থুঁতনি আবার কাদায় ডুবিয়ে দিল শ্যামলা। রাগে গর্জে উঠে বলল, শালা শুয়োরের বাচ্চা। তুই আমার টাকা হজম করে পালাবি কোথায়? আমি তোর নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে টাকা আদায় করে নেবো। দে আমার টাকা দে। নাহলে তোকে আমি পাঁকেই পুঁতে ফেলব।

চেঁচানোর ক্ষমতা ছিল না বটাব। শ্যামলার লাথিটায় সে বেজায় কাহিল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ট্যাকে মাত্র ছ'টাকা। মাত্র ছ' টাকার কি শ্যামলা তাকে ছেড়ে দেবে? তবু সে পাঁক চুবানো ছড়ছড়ানো চিঁয়ামাছের মত এগিয়ে এসে পা দুটো ধরল শ্যামলার। কাঁপা গলায় ফুঁপিয়ে উঠে বলল, ছেড়ে দাও গো দাদা, তুমার আমি কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দেব। আমি টাকা মারাব মানুষ নই গো, বিপদে পড়ে তুমার টাকা আমি খরচা করে ফেলেচি।

শ্যামলা হলো চাম-এঁটুলি, সে যার গায়ে বসে চট করে ওঠে না। ঐ পাঁক অবস্থায় ডাঙার কাছাকাছি হিড়হিড়িয়ে টেনে আনল বটাকে। তারপর পুরো উদোম করে দিয়ে বটার ট্যাক থেকে ছিনিযে নিল ছ'টাকা। পুঁটুলি কেড়ে নিয়ে ধার ব্রেডপাতিটা হাতে করে বলল, আয় তোকে আমি আজ খাসী করে দিই। অন্ধকারে চোখ জ্বলছিল শ্যামলার। বটা ভয়ে পিছোতে-পিছোতে জাড়াগাছের উপর হুমোড় পড়ল, টর্চের আলো ফেলে ব্লেড হাতে সেইদিকে এগিয়ে গেল শ্যামলা। গলার শিরা ফুলিয়ে হুঙ্কার ছেড়ে বলল, আমার চোখের সামনে থিকে পাল্লা। নাহলে সর্বনাশ করে দেব তোর।

কম্পমান শরীরে কাদামাখা ভুতের মত উঠে দাঁড়াল বটা। জ্বলন্ত চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল তার শরীর। শ্যামলা খেলার-মাস্টারের মত টেনে টেনে বলছিল, উয়ান, টো-থিরি ই-ই। তারপর সে তীব্র বেগে লাথিটা ছুঁড়ে দিল বটার পেছনে। পড়ে যাওয়ার আগে উঠে দাঁড়িয়ে জান বাঁচানোর দৌড় শুরু করল বটা। অন্ধকারে তার কালো ছিপছিপে শরীরটা মিশে গেল পলকে। আত্মতৃপ্তির হাসিতে গলা ফাটিয়ে হেসে উঠল শ্যামলা। খালের জলে তখন ভাটার টান। আঁধারে ভয়ানক রকম কালো দেখাচ্ছিল নুনগোলা জলকে।

সাতদিন ভয়ে ঘর থেকে বেরয় নি বটা, একদিন সে ধরা পড়ে গেল পঞ্চায়েত অফিসের সামনে। তার হাতে তখন মুড়ির ঠোঙা, ধুতির কোঁচড়ে আট আনার আলু আর চার আনার ছাঁচি-পেঁয়াজ। তেল শিশিটা অন্য হাতে ধরা। সেদিন শ্যামলা নয়—সত্যবাবুই তাকে হেনস্থা করে ছাড়ল। রাগে দাঁত কিড়মিড়িয়ে বলল, আমার ছাগল ছা'টা তোর জন্যই মরল তুই তাকে ছাঁটতে গিয়ে কোথায় বিনে কোথায় কাটলি, সেদিন থেকে সে আর উঠে দাঁড়াতে পারেনি। আজ সকালে দেখি মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছে। তা, যা তুই পারিস না তা নিয়ে তোর কেন এই ছলচাতুরি ব্যবসা?

বটার মুখ থেকে একটাও কথাও বেরোয় না। সে শিবিয় গাছের মগডালের দিকে তাকিয়ে থাকে আনমনে। তার দাড়িভর্তি মুখটা সাধুর মত দেখায়। তার নীরবতাই জ্বালা

ধরিয়ে দেয় সত্যবাবুর মনে। ঠোঁট কামড়ে প্রতিশোধ স্পৃহায় জ্বলে উঠল সে, তোর ঐ হাত দুটো ভেঙে দিলে আমার মনটা একটু জুড়াত। ঐ হাত দিয়ে তুই অনেক ক্ষতি করেছিস। দাঁড়া, তোর মজা আমি দেখাচ্ছি। বলেই— মিষ্টি দোকান থেকে সে ডেকে আনল শ্যামলাকে। বলল, তুই এর কাছে কত টাকা পাস?

পঞ্চাশ। সংগে সংগে জবাব দিল শ্যামলা।

সত্যবাবু বলল, আমার ছাগল ছা'টার দামও পঞ্চাশ। সব মিলিয়ে হলো একশো। এতো টাকা এ শালা দেবে কি করে? তার চেয়ে একে বরং হাসপাতালে নিয়ে চল। খাসী করিয়ে যে কটা পাব দুজনে আধাআধি ভাগ করে নেব।

বটাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতেই হলো। একদিন ভর্তি রেখে পরের দিন তাকে ছেড়ে দিল। টিপছাপ দিয়ে বাইরে আসতেই শ্যামলা আর সত্যবাবু ঝাঁপিয়ে পড়ে টাকাটা কেড়ে নিল তার হাত থেকে। বাঁধা দেওয়ার কোন সুযোগ পেল না বটা।

ওরা যখন পিরে যাচ্ছিল তখন বটা কাচুমাচু মুখে বলল, বাবু গরীবের এটা নিবেদন আচে। টুকে দাঁড়াই যাও। ওরা দাঁড়াতেই বটা তার খড়খড়ে হাতটা পেতে দিল ওদের সামনে। ভিখারী গলায় বলল, পাঁচটা টাকা দাও গো বাবু। সেরখানেক চাল এট্টা, ব্লেডপাতি কিনব। এই খরার বাজারে আমাকে তো বাঁচতে হবে! তার কথা শুনে পাঁচটা টাকা শুন্যে ছুঁড়ে দিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল ওরা। হাওয়ায় ওড়া পাঁচ টাকার নোটটা হাত বাড়িয়ে দরে নিয়ে বটা ভাবল, যাক, বাঁচা গেল। বেড়ালের থাবার নিচে সেই ইঁদুর ছানাটার মত সে যে ভয়ে মরে যায়নি, এই রক্ষে!

কুন্তী

'ব্যথা দে মা, ব্যথা দে।' মেনি বুড়ির চাপা গলায় ঘাম ঝরানো উত্তেজনা। শীতের রাতে চামড়া ফুঁড়ে মানুষের যখন ঘাম বেরয়, তখন দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে চরাচরে। চোখ লাফায়, বুক ধড়কায়। কালপেঁচার ডাকে হিমেল রাত নষ্ট মেয়েমানুষের ঢঙে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। বদভাগী মানুষের নিঃশ্বাসের মত হাওয়া ছোটে এদিক-সেদিক। তবু ঘাম ঝরে চাক চাক আঁধারে। সাগরীর বুক-পিঠ-গলা এমন কি উবু হওয়া শরীরে ঘামের ধারা নামে রক্ত জল করা প্রসব ব্যথায়।

প্রসব-ঘরখানা গোয়ালি ঘরের পাশে। দু-একটা জোনাকি উড়ে বেড়ায় অন্ধকারের চোখ হয়ে। মেনি বুড়ি ভরসা দিয়ে বলে, 'ভয় পেওনি বিটি। গর্ভে তোমার সন্তান ছটফটায়। মা হবে গো, বলি—মা হওয়া অত সহজ কথা নয়। মা হতে গেলে দশটা হাতির জোর চাই, আকাশের মত ছাতি চাই। না হলে মা হওয়া যায় না।'

কথাগুলো যাকে বলা, সেই সাগরী তখন প্রায় বেহুঁশ। জল ভেঙেছে ঘণ্টাখানিক পেরিয়ে গেল তবু সন্তান হওয়ার কোন লক্ষণ নেই। মেনি বুড়ির বলিরেখা ফোটা কপালে ভাঁজের পর ভাঁজ। উত্তেজনায় কেঁচোর মতন বেঁচে আছে কপালের শিরা-উপশিরা। বয়স হলে চামড়া যেমন শিরা দেখায়, তেমনি আইবুড়ো মেয়ের পেটও গর্ভের সময় চাপা থাকে না। ছাই দিয়ে আগুন ঢাকে, ভাত দিয়ে মাছ ঢাকে কিন্তু শাড়ি দিয়ে ন'মাস দশদিনের পেট আটকায় না। তবু প্রফুল্লবাবু মেয়ের পাপকে লুকিয়ে রেখেছিল যত্নে, কিন্তু ব্যথা উঠতেই সেই গোপন বেড়া মুখ থুবড়ে পড়ল মেনি বুড়ির দাওয়ায়। মেনি বুড়ি তখন বৌয়ের পাশে বসে আঁখায় শুকনো কাঠ ঠেলে টক রাঁধছে মৌরলা মাছের। টগর মৌরালা মাছের টক খেতে চেয়েছে, তার পেটেও ন'মাসের ছানা—কখন মাথা চাগিয়ে বিপাকে ফেলে দেয় বৌটাকে। ছেলে রতন ঘরে থাকে না, শহরে রিক্সা টানে। এই তো কদিন আগে গাঁ থেকে ঘুরে গেল সে। যাওয়ার সময় কিছু টাকা দিয়ে বলে গেল, মারে, বৌটার তো ছানাপুনা হবে। টাকা গুলান দিয়ে এট্টা সরষে বালিশ গড়িয়ে রাখিস। সর্ষে বালিশে শোওয়ালে কাঁচা খোকার মাথাটা একেবারে তালের মত গোল হয়। বেরেনে চোট না লাগলে সে সন্তান বড় মেধাবী হয়—যার ঘরে রিক্সা টানি সে আমারে বারে বারে বলেছে।

ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে মেনি বুড়ি তো থ। এ-যে গাছে না উঠতেই এক কাঁদি!

—বউটারে দেখিস। শহরের বাসটা হুস করে রতনকে উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। এক রাশ ধুলোর দিকে তাকিয়ে মনে মনে হেসে ফেলেছিল মেনি বুড়ি। রতনের দায়িত্বজ্ঞান, ভাবী সন্তানের প্রতি মমত্ববোধ অবাক করেছিল তাকে। টগরীকে চোখে চোখে রেখেছে মেনি বুড়ি, তার যা লক্ষণ তাতে দিন পনের-র আগে কোনমতেই নাড়ি ছিঁড়বে না। মেনি বুড়ির হিসাব

আজ অব্দি ভুল যায়নি। পায়ের গোছ, ভারী উদর, চোখের চাহনি, হাঁটাচলা আর হাই তোলা দেখে সে প্রসবের দিনক্ষণ বলে দেবে যথাযথ, এক চুলও এদিক ওদিক হবে না। ভেজাল খেয়ে তার চুল পাকেনি, চুল পেকেছে অভিজ্ঞতায়। মাড়িতে দাঁত নেই একটাও, তবু চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ। ব্যথা উঠলেই গায়ের অনেকেই ডেকে নিয়ে যায় তাকে। তাকে নিয়ে যাওয়া মানে নিশ্চিন্তে বাইরে বসে নখ খোটা, 'ট্যাহা-ট্যাহা' শব্দ শোনার জন্য উদগ্রীব থাকা।

প্রফুল্লবাবু গ্রামের প্রধান, মনে দুর্দম রাগ থাকলেও তার কথা ঠেলতে পারেনি মেনি বুড়ি। দাওয়ায় তালাইটা বিছিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'আরাম করে বসো। বউটারে একটু বলে আসি। নাহলে টগর আমার ডর খাবে। পোয়াতী অবস্থায় ডর খাওয়া ভাল নয় বাবু।

প্রফুল্লবাবু বলেছিলেন, 'ব্যাপারটা গোপন রেখো রতনের মা। আমি এখন ফাটা বাঁশের মাঝখানে পড়েছি। না পারছি গিলতে, না পারছি উগরাতে।'

—'সবই বুঝি। কিন্তু দু' ধামা ধান দিতে হবে বাবু। ধাইগিরি ছাড়া আমার তো কোন গতি নেই, তাই আগাম চেয়ে নিচ্ছি। মনে কোন দুঃখ নেবেন না।'

দুই ধামা ধান পৌঁছে গিয়েছে ছিঁটে বেড়ার ঘরে। সাঁঝের মুখে দু-ধামা ধান দেখে আনন্দে আর ধরছিল না টগরের।

—'মাগো, এত ধান কে দিয়েছে?'

— 'সে দিয়েছে কেউ? তোমার খাওয়া নিয়ে কথা, কে দিয়েছে, কোথা থেকে এল সে খোঁজে তোমার দরকার নেই।'

যার নুন খাওয়া তার নুনের দাম ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে মেনি বুড়ি। অভাবী মানুষ সন্ন্যাসী না হলেও কদাচিৎ সততা হারায়। তারা মাটিকে মা স্থানে গড় করে, মাটির মানুষকে দেবতা স্থানে কদর করে। মেনি বুড়ি জানত প্রফুল্লবাবু তার কোনটাও নয়। পঞ্চায়েত প্রধান হওয়ার পর তার শরীর ফুলেছে, চোখে লেগেছে ভারী চশমা— যেটুকু সরলতা ছিল তা ভোটের স্রোতে, ক্ষমতার ঘূর্ণিতে নীরিহ মাছের মত ভেসে গেছে। তবু ধাত্রী বিদ্যায় শুনলে হাজার শত্রু হলেও যেতে হয়। যে বিদ্যের যে রেওয়াজ। মাটিও কখনো প্রসব বেদনায় ভোগে যখন ভুমিকম্প-খরা-বন্যা হয় তখন। মেয়েমানুষের গতর ধরিত্রী মায়ের সমান, দশ মাস দশ দিন পরে তার শরীরেও তো গর্ভ যন্ত্রণার অবর্ণনীয় কম্পন হয়, তা ভুমিকম্পের সাথেই একমাত্র তুলনীয়। এসব মেনি বুড়ির হৃদয়ের কথা। চাপা রাগটা তবু সে কায়দা করে শোনাতে ছাড়েনি, 'বাবু গো, আমার জি-আর-টা কেটে দিলেন?'

বাবু নিরুত্তর।

পঞ্চায়েত অফিসে বাবুর ছুড়ে দেওয়া কথাগুলো মনে পড়ে মেনি বুড়ির।

—'কি করে দেব, তোমার ছেলে তো শহরে রিক্সা টানে। দিন গেলে তার মোটা আয়। তাছাড়া তুমি শক্ত-সমর্থ। ধাইগিরি করে তোমার তো কম ইনকাম হয় না।'

—'তা যা বলেছেন বাবু! ইমকামের তোড়ে ভেসে যাচ্ছি।'

বুকের কাছে ধরা একটা পোঁটলা, প্রফুল্ল বাবু আগে—তার পিছনে ঘাড় গুঁজে মেনিবুড়ি। টগর বলল, 'খালাস হয়ে গেলে চলে এসো মা। বাঁশঝাড় লাগোয়া ঘর, আমার একা থাকতে ভয় করে?'

—'ভয় কিসের গো বউ, তুমি তো একা নও, দোকা।'

ছাঁচিপান দোক্তা দিয়ে সেজে দিয়েছে টগর। তার রসে মেনি বুড়ির ঠোঁট চুপচুপে লাল। প্রফুল্লবাবু মাথায় যেন আকাশ নিয়ে হাঁটছেন। ক্লান্ত শরীর কিন্তু পা দুটো পড়ছিল উটের মতন। কিছুটা এসেই মেনি বুড়ি শুধিয়েছিল, 'ব্যথাটা কার, ঘরের না পরের?'

পরের ব্যথায় ছুটে আসার লোক প্রফুল্লবাবু নয়, তিনি নিজের ব্যথা ছাড়া অন্যের ব্যথা বোঝে না, বুঝতে চান-ও না। রাজনীতি মানুষকে অরাজকতা শেখায়। প্রফুল্লবাবু তার প্রমাণ। কাঁপা গলায় বলেছিলেন, 'ব্যথাটা, ব্যথাটা...'

'কার? বৌদিমণির বুঝি?'

—'না গো রতনের মা, ব্যথাটা আমার, আমাদের সাগরীর...'

মুখ হা, চোখ বিস্ফারিত, বুকের ঘোড়া লাফানো আরো জোরে, মেনি বুড়ির কথা আটকে গেল এতকিছুর পরেও। প্রফুল্লবাবু আঁকড়ে ধরেছেন বৃদ্ধার হাত, 'মেয়েটাকে তুমি বাঁচাও রতনের মা, পেটে একটা প্রাণ নিয়ে সে মরে আছে, তাকে তুমি বাঁচাও। হাসপাতালে নিয়ে গেলে লোক জানাজানি হবে। এসব কথা চাপা থাকে না রতনের মা,, পবন-দেবতার আগে ছোটে। দোহাই তোমাকে, তুমি আর অমত হয়ো না। আমি তোমাকে খুশি করে দেব।'

'খুশি সেই মা হয় যে মা নিজের সন্তানকে আলোর মুখ দেখাতে ভয় পায় না। তা বাবু, তোমার ঘরের সাগরী তো কলেজে পড়ে তার অমন উপকার করল কে?'

—'পার্টির ছেলেটা! খুব ঘন ঘন গ্রাম দেখতে আসত।'

—'ভাল কথা। বিয়ে দিয়ে দাও।'

—'সে এখন ফেরার। মেয়েটা ছ'মাস থেকে ঘরের বাইরে বেরয় না। দিনরাত কাঁদে। ও হয়তো পাগল হয়ে যাবে।'

গ্রামের ভাল মেয়ে সাগরী, ভালো নাম সাগরিকা, সে এখন গোয়ালঘরের পাশের ঘরে, অন্ধকারে কাঁঠাল কোঁয়ার মতন আর মুখটা কষ্ট যন্ত্রণার ঘামে নরম—কাঁদছে, ফোঁপাচ্ছে...দীর্ঘশ্বাস ভাসিয়ে দিচ্ছে বন্ধ ঘরের হাওয়ায়। বাইরে তার বাবা-মা, তীব্র উৎকণ্ঠায়, শুধু বন্দী শিশুর মুক্তি কান্না শোনার প্রতীক্ষায়—

'কি হ'ল গো রতনের মা, চুপ কেন? মেয়েটার আমার হুঁশ আছে তো?' সাগরীর মায়ের ভয়ার্ত গলা একসময় বুজে আসে।'

—'ফল না থাক, গাছ যেন বাঁচে গো! ও আমার একমাত্র সন্তান।'

—'জানি বাবু, জানি। আমার কি হাত? তাকে ডাকুন।'

—'যার কথা বলছো, সে নেই গো মরে গেছে! নাহলে—'

তখনই সোনার তাল রক্ত মাখামাখি হয়ে নেমে আসে ধরিত্রীতে— যেন আঁধার ঘরে জ্বলে উঠল মানিক। নাকি পূর্ণ চাঁদ-নাকি এক টুকরো সূর্য সন্তান! ঠোঁট কামড়ে, হাত-পা শিথিল করে শুয়ে থাকল সাগরী। বিস্ফারিত চোখ মেলে সে দেখতে চাইল ঘর আলো করা সন্তানকে, দেখতে চাইল নিজেকে, মানুষ যেমন প্রগাঢ় যত্নে সার্সিতে মুখ দেখে তেমন। ফসল ভরা মাঠে কৃষাণীর দৃষ্টি যেন সাগরীর চোখে ছোঁয়ান, তৃপ্তি হাসিটুকু হুবহু এক। ঐ আবছা আলোয় সাগরী সাগর হলো, মা হলো, স্নেহময়ী শস্যক্ষেত্রের মত মা হলো।

প্রফুল্লবাবু আশ্বস্ত হয়ে বললেন, 'রক্ত ঢেলাটাকে আমাকে দাও। ওকে আমি ম্যান হোলের ঢাকনা খুলে ফেলে দেব। পাপগাছ বাড়তে না দেওয়ই ভালো।'

—'পাপ? কার পাপ?' সাগরীর মৃদু প্রতিবাদ সামান্য জলরেখার মত মুছে গেল। চোখের জলে ভিজে গেল তার পৃচ্ছিল মুখাবয়ব; সে কাঁদল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, সন্তান বিচ্ছেদ যাতনায়। রাত্রি থমথমে মুখে চেয়ে থাকল সেই নবাগত সন্তানের দিকে। শোকস্তব্ধ সেই দৃষ্টিপাত মেনি বুড়ির বুকের ভেতরে আলোড়ন তুলল, তাকে এলোমেলো ভাবনায় ডুবিয়ে দিল, তার মা মনটাও ডুকরে উঠল প্রিয়জন বিচ্ছেদ ব্যথায়। শিশিরপাতের শব্দ ছাড়া পৃথিবীতে হাওয়া আছে, একটি নবজাতক আর তিনটি ভিন্ন মানসিকতার মানুষের নিঃশ্বাসের শব্দ আছে। সাগরী চোখ মেলে তাকাতে পারছিল না, তার অবসন্ন শরীর পাথরকুচি পাতার চেয়েও ভারী। তবু সে তার সন্তানের দিকে তাকিয়ে ছিল বিপন্ন চোখে, আসন্ন মাতৃত্বের জড়তা কাটিয়ে সে ক্লান্ত দৃষ্টি মেলে চেয়েছিল আঁতুড় ঘরের চাঁদ মুখপানে। প্রফুল্লবাবু লজ্জা -শরমের মাথা খেয়ে মেনি বুড়িকে শুধাল, 'আর তাহলে কোন কিছু বাকি নেই তো? তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করেছো, এবার আমাকে আমার কাজটা করতে দাও। ভোর হওয়ার আগেই সব কাজ আমি মিটিয়ে ফেলব। এতদিনের রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা আজ শেষ হলো। এবার একটু শান্তিতে ঘুমাতে পারব।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে প্রফুল্লবাবু পাষাণ হাত বাড়িয়ে তুলে নিতে চাইল সাগরীর অপাংক্তেয় সন্তানকে, তখনই বিপন্ন মাতৃত্বে ডুকরে উঠল সাগরী, 'তুমি ওকে ছোঁবে না বাবা, ছোঁবে না। আমি ওকে নিয়ে চলে যাবো। তোমার সম্মানে আমি কোন দিন কালির ছিঁটে দেবো না। আমাকে একটু সামলে নিতে দাও, তারপর...'

— 'কোথায় যাবি?' সাগরীর মা ঝুঁকে পড়লেন মেয়ের উপর, 'তোর আস্পর্ধা তো কম নয়। সামনের বৈশাখে তোর বিয়ে। এমন ভালো ছেলে আর পাওয়া যাবে না। দে দিয়ে দে তোর ছেলেকে। আর পারছিনে সাগরী। এবার তুই আমাদের একটু শান্তি দে।'

সাগরী ঝড়ো এলোমেলো গাছের মত কাঁদছে, দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে কাঁচা সন্তান যেন তার কলিজায় হাত রেখেছে পরম ভালবাসায়। সদ্য ভূমিষ্ঠ ছেলেটি তার-স্বরে কাঁদছে, শীতের বাতাস সেই কান্নার ধ্বনিতে আরো গম্ভীর, আরো সূচীভেদ্য স্পর্শময়ী হয়ে উঠছে ব্যস্ত চরাচরে। প্রফুল্লবাবুর নির্বাক, ঘুমহীন চোখে ক্রোধ এবং সম্মানহানির আতঙ্ক। তার চোখ মুখের অবস্থা এতই ভয়াবহ, এতই নির্মম এবং কঠিন কঠোর তার দিকে মেনি বুড়ি তাকাতে পারছে না সাহস করে।

প্রফুল্লবাবু জোর করে সাগরীর কোল থেকে ছিনিয়ে নিলেন চাঁদের টুকরোর মত সাদা ধবধবে ছেলেটাকে। তার পায়ের উপর সমূলে উৎপাটিত অপরাজিতা লতার মত ব্যথাতুর নীল শরীর নিয়ে লুটিয়ে পড়েছে সাগরী, 'বাবা গো, ও পাপ কাজ তুমি করো না। জীবহত্যা মহাপাপ। তার চেয়েও মহাপাপ মায়ের কোল থেকে সন্তান ছিনিয়ে নেওয়া। আমি তোমার মেয়ে, তুমি আমাকে হাজার বার শাস্তি দাও, মাথা পেতে নেব। কিন্তু মা হয়ে জল্লাদের হাতে সন্তানকে কোনদিন তুলে দেব না।'

সাগরীর মা বলল, 'তুই শান্ত হ। ঝড়ের সময় কোন একটা পাড়ে নিয়ে গিয়ে নৌকোকে

বাঁধতে হয়। নাহলে ভরাডুবি হয় মা। তোর বয়স অল্প। একটা ভুলের মাশুল দিতে জীবনটাকে বলিদান দেওয়া উচিত নয়।'

—'উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন তোমার কাছে। আমার সন্তানই হলো সব প্রশ্নের সমাধান।'

—'তোর খামখেয়ালীতে সংসার চলবে না। প্রফুল্লবাবু উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'আমি যাই ভোর হয়ে আসছে। আর দেরী করা ঠিক হবে না।'

—'দাঁড়াও।' টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়াল সাগরী, শাণিত বিদ্যুৎ ভরা আকাশের মত তার মুখ, পাখির মায়ের মত সে দু'হাত মেলে বলল, 'ওকে স্পর্শ করার অধিকার তোমার নেই। জল্লাদ কখনো ফুল ছোঁয় না, পাথর কখনো পলিমাটির মর্ম বোঝে না।'

পুবদিক ফর্সা হওয়ার আগে ওরা সিদ্ধান্ত নিল, সাগরী তার সন্তানের অধিকার ছাড়বে—শর্ত হলো নবজাতককে কোথাও রেখে আসা হবে যাতে ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে গ্রামবাসীরা টের পায় কে-বা কারা ফেলে রেখে গিয়েছে এক জারজ সন্তানকে। যদি কেউ দয়া করে তাকে আশ্রয় দেয়, লালন-পালন করে তাহলে সে কারো না কারোর ঘর আলো করে বেঁচে থাকবে।

প্রস্তাব মত মেনি বুড়ির হাতে তুলে দেওয়া হলো সাগরীর সন্তান।

অশ্রু-সজল চোখে সাগরী বলল, 'মাসী এর যদি কোন গতি না হয় তাহলে সাঁঝের মুখে নদীর জলে ভাসিয়ে দিও। সব ফুল দেবতার পূজায় লাগে না। আমি গাছ পুঁতে ছিলাম কিন্তু ফুলের সুগন্ধ বুকে ভরে ঘ্রাণ নেওয়ার সৌভাগ্য হলো না।'

মেনি বুড়িহারিয়ে গেল আঁধারে। তার ধাত্রীজীবনে এমন ঘটনা এই প্রথম। রতনের বউটার সন্তান হবে দীর্ঘ সাত বছর অপেক্ষার পর। টগরের ক্ষীণতনু ফুলশাখার মত যৌবনদীপ্ত হাসি-মাধুর্যময়তায় ভরা। বউটা একা আছে ঘরে। এই ভরা গতরে একা থাকা বড় ভয়ের, বিপদের। আলপথ পেরিয়ে মোরাম ফেলা পথের উপর উঠে আসে সে। বুকের কাছে ধরা সাগরীর সন্তান। কিছুটা হেঁটে গেলেই স্কুলঘর,—সেখানকার খোলা বারান্দাই হবে আপাতত সাগরীর সন্তানের আশ্রয়স্থান। কাল সকালে যখন ক্ষিদের তাড়নায় ছেলেটি ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠবে তখন নিশ্চয়ই কারো না কারোর স্নেহ দৃষ্টিতে পড়ে যাবে সে। কারোর কি একটু দয়া হবে না, কেউ কি কোলে তুলে নেবে না এই অবৈধ সন্তানকে?

গভীর মমতায়, প্রগাঢ় মাতৃত্বে আদরের চুম্বন এঁকে ইস্কুল ঘরের বারান্দায় ছেলেটিকে শুইয়ে রেখে ঘরে ফিরে এল মেনি বুড়ি। বাঁশঝাড়ের পাশেই তার খড়ের ঘরটা দেখা যায়। গায়ের চাদরটা ভালভাবে জড়িয়ে নিয়ে মেনি বুড়ি শেকল নাড়ে ফাড়ানো বাঁশের দরজায়। সাড়া আসে না। সামান্য ঠেলা মারতেই দরজা হাটখোলা হয়ে খুলে যায়। কুপির আলোয় সে দেখে অচৈতন্য অবস্থায়, রক্ত মাখামাখি হয়ে শুয়ে আছে তার টগর। পাশে নিষ্প্রাণ সদ্যজাত এক শিশু। পাগলের মত ছুটে যায় মেনি বুড়ি, বৌয়ের মাথাটা কোলের উপর তুলে নিয়ে ডাকে, এ বৌ, বৌ গো। তোমার কি হ'ল বৌ?

সাড়া না পেয়ে সে হাত বাড়িয়ে তুলে নেয় মৃত শিশুটাকে। বুকের উপর কান পেতে কলিজার শব্দ শোনার চেষ্টা করে। বৃথা তার চেষ্টা—

ডুকরে কেঁদে ওঠার আগে মেনিবুড়ির মনে পড়ে রতনের কথাগুলো।

রতন ঘরে আসলে কি কৈফিয়ৎ দেবে সে? ছেলের অশ্রুসজল রক্তচক্ষু তাকে কি ক্ষমা করবে?

আর ভাবতে পারছিল না মেনি বুড়ি, ঝিমঝিমান মাথাটা যেন খসে পড়বে মাটিতে এমন শোচনীয় অবস্থা। কোনমতে মৃত শিশুটাকে তুলে নিয়ে সে ছুটে গেল ইস্কুল ঘরের বারান্দায়। ফিরে এল শীতে জুবুথুবু কম্পমান, রোরুদ্যমান সেই নবজাতককে কোলে নিয়ে।

আলো ফোটার আগেই বালির চড়ায় মৃত শিশুকে পুঁতে দিয়ে এল সে। টগরের জ্ঞান ফিরেছে। তার কোলে দেবদূতের মত শিশু হাসছে অবলীলায়। বাঁশবাগানের টিকলি ছুঁয়ে সূর্যের আলো এসে পড়েছে উঠোনে। প্রজাপতিরা উড়ে গিয়ে বসছে ফুলের উপর। পাখপাখালির ডাকে সরব পৃথিবী। টগরের কোলে হাসছে দেবশিশু। এলো চুলে, এলো শাড়িতে টগর এখন পরিপূর্ণ মা।

মেনি বুড়ি, ঝাপসা, ছানি পড়া চোখে দেখল, টগর নয়—সাগরী যেন দুধ ধরিয়ে দিয়েছে তার ছেলেকে। ছেলেটা হাসছে। এক অভূতপূর্ব মাতৃত্বে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে টগরের মরু উষর, নিদ্রারহিত মুখমণ্ডল।

রণক্ষেত্র

বিনজয় নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে বিজয় বললো, মুরগা বাজাব আর কদ্দূর?

—আর বেশি দূর নয় বাবু। রেল বিরিজটা পার করলেই লাউড়িয়া টিপি।

—লাউড়িয়া টিপি!

—হঁ বাবু, লাউড়িয়া টিপি। ফি-বুধবার সেখানে মুরগা লড়াই হয়। বেশ দেখার মতো বটে। আপনার খু-উ-ব ভালো লাগবে।

সিংভূমের এই ছোট্ট শহরটাতে ছ'মাস হলো বিজয় এসেছে। চরণ সেই প্রথম দিন থেকে বিজয়ের বড় অনুগত। বেঁটে-খাটো মানুষটার মধ্যে পাহাড় প্রমাণ সারল্য। মার-প্যাঁচ নেই। লড়াইয়ের মাঠে যাবে বলে সে আজ বিশেষভাবে সেজেছে। ঘাড়ের দু'দিকে ঝোলানো একটা গামছা। মাথায় জবজবে তেল।

খোলা ব্রিজটা যেন সযত্নে শুইয়ে রাখা মৃত্যু-ফাঁদ। বিজয় ঢোক গিলে চরণের দিকে তাকালো। সাহস দিয়ে চরণ বললো, ভয় পাবেননি। এখন কোনো গাড়ি নেই। দেখছেন না, লেভেল কসিংয়ের গেটটা খুলা।

দাঁতে দাঁত টিপে রেলব্রিজটা কোনোমতে পেরিয়ে এলো বিজয়। চরণ তার অনেক আগেই ভিনপাড়ে পৌঁছে গেছে। একমুখ দাঁত বার করে হাসলো—বলছিলাম না, ভয়ের কিছু নেই। শুধু সাহস দরকার।

ভয়ে ছোট হয়ে গিয়েছিল বিজয়ের মুখ। যেন কী একটা জিনিস গলার কাছে ডেলার মতো আটকে আছে। দম বন্ধ করা অবস্থা। একটা ফিলটার সিগারেট ধরিয়ে বার তিনেক কেশে নিয়ে সে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করলো।

দেরি দেখে চরণ বললো, শীতের বেলা খুব ছোট বাবু, তাড়াতাড়ি করুন। ঠিক সময় না গেলে লড়াইয়ের আর দেখবেনটা কী?

রেল লাইনের দু'ধারে পুটুস আর লাল কচার ঝোপ। পাশাপাশি হাঁটছিল বিজয় আর চরণ। দূরের পাহাড়গুলো জ্যালজ্যালে কুয়াশার আস্তরণে ঢাকা। যেন সাদা কাপড়ে ঢাকা থনথনে এক বুড়ি। সেই মায়াবী পাহাড়ের কোলেই ছবির মতো গ্রাম। আঙুল তুলে চরণ বললো, ওই দেখুন বাবু, আমাদের গাঁ। বাপ একটা খাপরার ঘর করেছিল অনেকদিন আগে। সেই ঘরেই থাকি। তবে বড় মশা সেখানে। কামড়ালেই চাকড়া চাকড়া ফুলে যায়। হলুদপানি বমি হয়।

জোরে হাঁটলে চরণের হাত দুটো পেণ্ডুলামের মতো ঝুলতে থাকে। বোঝা যায়, সে বেশ ফূর্তিতে আছে। অবশ্য ফূর্তিতে থাকার কারণ আছে। দু-দুটো বিয়ে তার। প্রথমপক্ষকে ভাগিয়ে একটা রেজা ধরে এনে নতুন করে সংসার পেতেছে। বুড়ো বাপকেও তাড়িয়েছে।

বড় বউ আলাদা, ছোট বউ তিন সন্তানের জননী এখন। সামনের মাসে আবার বিয়োবে। বিজয় জানতো না, চরণের মুখ থেকেই সব শোনো। অফিসে কাজ না থাকলে চরণ প্রায়ই তার সঙ্গে গল্প করে। টিফিনে যখন রুটি আর সজনে শাকের ভাজি দিয়ে দুপুরের খাবার খায় চরণ, তখন তাকে দেখে বড় আশ্চর্য লাগে বিজয়ের। চরণ খাওয়া থামিয়ে বলে—জানেন বাবু, আমার বউ দুটো ঝগড়ুটে কাক। মিলে জুলে থাকতে জানে না। দুটোয় মিলে আমাকে ছিঁড়ে খায়। তার ওপর বাপটাও হয়েছে তেমনি। সোজা কথায় উল্টো মানে করা স্বভাব। আমি আর পেরে উঠি না।

রেল লাইন ছেড়ে চরণ লাফিয়ে উঠে এলো লাউড়িয়া টিপিতে। তারপর বিজয়কে ইশারায় ডাকলো। এবড়ো-খেবড়ো খোয়া পাথর বোঝাই রাস্তায় বিজয়ের হাঁটার গতি মন্থর হয়। রেলব্রিজ থেকে এতটা পথ আসতেই দরদরিয়ে ঘাম ঝরতে থাকে তার। চরণের কথা মতো হাঁপ ছেড়ে কোনো মতে সে টিপি ডাঙায় উঠে এলো। পাশ দিয়ে লুঙ্গি পরা একজন গহনা বাক্স নিয়ে যাওয়ার যত্নে একটা লাল মোরগ বগলদাবা করে টিপিতে উঠে এলো। ভিড়ে মিশে যাওয়ার আগে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে বিজয়কে সে একবার দেখে নিলো।

চরণ বললো, বাবু আসুন। দেখছেন তো কেমন হৈ-চৈ জমজমাট আসর। অনেক আগে থেকেই হৈ-চৈ কানে আসছিল বিজয়ের। বারদোলের মেলার গমগমানিকেও হার মানায়। ঘড়িতে বিকেল চারটে। চরাচর জুড়ে পাকা ধানের হলুদাভ রোদ। শীতের শুরুতেই এই পাহাড়ি অঞ্চলটা প্রাকৃতিক রুক্ষতা কাটিয়ে কুমারী মসৃণতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। চারদিকে যেন উৎসবের সাজ। আনন্দের হিল্লোল।

বড় ভালো লাগছিল বিজয়ের। একজন চোখের সামনে দিয়ে রক্তমাখা একটা মোরগ ঝুলিয়ে চলে গেল। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছিল ঘাসে। কিছুটা যেতেই ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকালো লোকটা। একটা বিজয়ের হাসি উড়ে এসে চরণকে চাঙ্গা করে দিলো। চোখে মুখে উত্তেজনার আভা ফুটে উঠলো। চোখাচোখি হতেই লোকটা ঘায়েল মুরগিটাকে দোলাতে দোলাতে চরণের কাছে ফিরে এসে বললো, 'পারু' মেরেছি চরণদা। রোজ রোজ হেরে যাই, আজ মোক্ষম ঘাই দিয়ে 'মারকিটা' মারলো। একবার উড়েই ফৎ করে কাত্তিটা চালিয়ে দিলো পেটে। রঙ্গুয়া মোরগটা সেই যে ভুঁই নিলো আর ওঠেনি। সত্তর টাকার বাজি। পেয়ে গেলাম—বলেই টাকা বার করে দেখাল।

বিজয় মুগ্ধ বিস্ময়ে কথা শুনছিল ওদের। পারু, মারকি আর কাত্তি—এই তিনটি শব্দ নতুন ঠেকলো কানে। চরণকে শুধোতেই বললো, পারু হলো গিয়ে জেতা মুরগি। এখানে সবাই বলে 'পারু' জিতেছি।

ঘাড় নাড়ে বিজয়। চরণ তার কথার সূত্র ধরে বলে, 'মারকি' হলো 'লড়াকু মুরগা' যে লড়ে জান কবুল করে। আর 'কাত্তি' হলো গিয়ে 'চাকু'। চলুন, ভেতরটায় চলুন, আপনাকে সব দেখাই।

বিঘে খানেক জায়গা জুড়ে নানান বয়সী মানুষের মেলা। জুয়ার ডাইস থেকে শুরু করে—হাঁড়িয়া, মদ, ঘুঘনি-চাট সবই পাওয়া যায় এখানে। হাঁড়িয়া বেচতে আসা আদিবাসী মেয়েগুলো যেন মাঝ জলে খেলে বেড়ানো কইমাছ। তাদের পাশে হাঁড়িয়া, ছাঁকনি, থালা-

বাটি-গেলাস। চকচকে মাটির হাঁড়িতে যেন তাদেরই চোখের জল। আসনপিঁড়ি হয়ে হাঁড়িয়া খাচ্ছিল ক'জন। লড়াইয়ের খবরটা কানে যেতেই হাঁড়িয়ার দাম মিটিয়ে সটান চলে এলো লড়াইমাঠে। মাঠের বাহারও কম নয়। শুকনো বাবলা ডাল কাঁটায় ঘেরা গোল এক টুকরো জমি। তার চারধারে সারসার মানুষ। বাজি লড়ার নেশায় ভেতরে ভেতরে তারা এক একটা আগুন পাহাড়। হাতে চার ভাঁজ করা দশ-পাঁচ টাকার নোট। সিগারেটের মতো ধরা।

চরণ আঙুল উঁচিয়ে বললো, এই হলো লড়াইমাঠ। এখানে মুরগাগুলো দমতক লড়ে। ওদের লড়াবার জন্য ওই যে দেখুন—ওরা হলো কাত্তিয়ালা।

—কাত্তিয়ালা?

—হ্যাঁ বাবু কাত্তিয়ালা। কাত্তিয়ালা মানে চাকুয়ালা। এরা মুরগার পায়ে কাত্তি বাঁধে। ফি-মুরগা টাকা নেয়। সবুজ প্যান্ট আর কালো প্যান্ট পরা দু'জন কাত্তিয়ালা দাঁড়িয়েছিল মুখোমুখি। ওদের দু'জনের হাতেই তাগড়াই দুটো মোরগ। দু'টোর পায়ে ধারালো চাকু বাঁধা। তাদের ঘিরে এখন হল্লা উঠেছে বাতাসে। কালো প্যান্ট পরা মানুষটার হাতের মোরগটা সাদা রঙের। সাদা মোরগটার দিকেই এখন সকলের নজর। বাতাসে ঝড়ের বেগ। ধোপ্-ধোপ্-ধোপ্ চিৎকার ওঠে সমস্বরে। পরমুহূর্তে রঙ্গুয়া-রঙ্গুয়া!

চরণ বুঝিয়ে বলে ধোপ্ মানে সাদা। আর রঙ্গুয়া মানে লাল। সাদা আর লালের লড়াই হবে এখন। মন চাইলে আপনিও বাজি ধরতে পারেন।

লাউড়িয়া মাঠের শুরু যেখানে, সেখানে একটা জলাশয়। জলীয় আর্দ্র হাওয়া উড়ে এসে গায়ে বিঁধছিল। পীত জলে শ্বেতপাথরের নাকছাবির মতো অসংখ্য ফুল। রোদের দ্যুতিতে কী তাদের অহংকার। চোখ ফেরানো যায় না। একটা ডাহুক ভীতু বুকে পোকা খুঁটে খাচ্ছে। গাঢ় সবুজ জলঘাসে তার কচি-কচি পা। ঢেউ উঠছে স্থির বদ্ধ জলে। তখনই পা কাঁপিয়ে দৈত্যের মতো শরীর নিয়ে ছুটে গেল হাওড়াগামী ডাউন ট্রেন। চমকে উঠলো বিজয়, লড়াই মাঠে দারুণ শোরগোল। লাল মোরগটা ঘাড় গুঁজে পড়েছিল মাঠে। সবুজঘাসে লাল রক্ত খুবই বিসদৃশ ঠেকে বিজয়ের চোখে। দু'হাতে সে চোখ ঢাকতে গিয়েও পারে না, হাত উপরে উঠে আবার নেমে আসে কখন।

চেক লিখে টু-পারসেন্ট কমিশন পায় সনাতনবাবু। কন্ট্রাক্টাররা দেয়। সেই টাকা ভাগবাঁটোয়ারা হয় অফিসে। তাই নিয়ে বিবাদ। নিখিলবাবুর গুমরে ওঠা রাগ উপচে পড়লো চায়ের কাপে। কথায় কথায় এক ঘুষি। চেয়ার সমেত ছিটকে পড়লো সনাতনবাবু। তার উপরে চেপে বসলো নিখিলবাবু। দু'জনকে ঘিরে জন কুড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে গোল হয়ে।

এদিকে জুয়ার বাজি নিয়ে লড়াই জমেছে মাঠে। ধোপ নয়, রঙ্গুয়া নয়—একদম জলজ্যান্ত মানুষ। ঘাড় লুললুলে লাল মোরগটা নিয়ে সরে গেল চতুর কাত্তিয়ালা। আঁধার নেমে এলো মাঠে।

চরণ পাশে সরে এসে ফিসফিসিয়ে বলে, বাবু আলো কমে এলো। এবার চলুন ফেরা যাক। দারু হাঁড়িয়া রসা খেয়ে এরা সব মাতলামি করবে। এখানে আর থাকা ঠিক নয়। দেখছেন না ডাইস খেলার ওখানে কেমন ভিড়। সিভিল ড্রেসে পুলিস এসেছে হিস্সা

নিতে। হিংসায় এতটুকু গরবর হলে ওরা ঘোট পাকাবে। ওরা নেমে এলো সেই খোয়া বিছানো পথে। রেল লাইন এখন দুধক্ষরিসের দাঁত। অন্ধকার তার বিশাল ডানা মেলে জননী স্নেহে ঢেকে দিয়েছে শিরকাসাই, শোনুয়া, লোটাপাহাড় আর লাউড়িয়া বস্তির শীত কাতর শরীর। মাজা পড়ে যাওয়া ধানগাছগুলোর জন্য দুঃখ হলো বিজয়ের। শীত হাওয়া এদেরও ক্ষমা করেনি।

একটা সিগারেট ধরালো বিজয়। চরণ তাকে রেল ব্রিজ অব্দি এগিয়ে দিয়ে গাঁয়ে ফিরবে। কিছুটা হাঁটার পর চরণ বললো, লড়াই দেখতে আব ভালো লাগেনি বাবু। ঘরে আমার অষ্টপ্রহর লড়াই-কাজিয়া। বউ দু'টা আগুনের ঢিপি। বুড়া বাপটা নারদমুণি।

চবণেব দু'বউয়ের ছেলে-মেয়ে ডজনের কাছাকাছি। খিটিমিটি লেগেই আছে। পূজা বোনাসের টাকাটা চরণ কারোর হাতেই দেয়নি। শ'খানিক হঁড়িয়া-তাড়িতে ঢেলেছে।

গত সপ্তাহে চরণেব বাবা অফিসে এসেছিল। অফিসের সামনে বসে বসে কাঁদলো লাগাতার। বিজয় পাঁচটা টাকা দিতেই গড়গড় করে রামায়ণ শুরু করলো।

চরণ তাকে খেতে পরতে দেয় না। তিনদিন সে একটা দানাও মুখে কাটেনি। গায়ে ধুন্দুমার জ্বর। ডাক্তার দেখাবার পয়সা নেই।

—এত টাকা চবণ কী করে? বিজয় শুধোতেই, হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো বুড়োটা, সব আমার অদৃষ্ট বাবু! ছোট বউ বেটাটার মাথা খেয়েচে। এখন ভিনো হয়ে খায়। টাকা পয়সা দূরে থাক, খোঁজও নেয়নি।

সিগারেটের ধোঁয়া হাওয়ায় ভাসিয়ে বিজয় হাঁটছিল। লম্বা লম্বা পা ফেলায় চরণ এখন ঠ্যাঙাড়ে। মাঠ থেকে হুড়মুড়িয়ে উঠে আসছিল ভুষোকালি মাখা আঁধার। দূরের পাহাড়গুলো আব দেখা যায় না। কুয়াশার জালে ঢাকাপড়া গাঁওলোয় বেঁচে-বর্তে থাকার আলো দেখা যায় শুধু। মাত্র সাত হাত দূরের চরণকে দেখতে পাচ্ছিল না বিজয়। কিছুটা ভয় মিশ্রিত গলায় বিজয় চরণকে ডাক দিলো। থমকে দাঁড়ালো চরণ। মুখ ঘুরিয়ে শুধোলো, কেমন লাগলো বাবু মুরগা লড়াই?

বিজয় বিস্বাদময় ঢোক গিললো ভালো!

চরণ উৎসাহিত হয়ে বললো, চাইবাসা, পটকা, কিরিবুরু—সব জায়গাতেই মুরগা লড়াই হয়, তবে লাউড়িয়া বস্তির মুরগা বাজারের মতো কোথাও এত জমেনি। এখানে যত ভিন্ন জাতের মুরগা আসে, এমনটা কুথাও দেখবেননি। চরণ দূরের দিকে তাকাল। তার মুখ শুকিয়ে আমচুর। ভয়ে তার কথা সরল না। ফ্যাকেশ দেখাল তাকে।

কী হলো চরণ! বিজয়ের থতমত খাওয়া প্রশ্নে চরণ ম্যাট-মেটিয়ে তাকালো। ঠকঠক্ করে তার পা কাঁপছিল। ডাউন লাইনের উল্টো দিকের জঙ্গলে তার নজর। বিজয় চরণের হাতটা ধরে টানতেই ঝোপ থেকে ঠেলে ঠুলে উঠে এলো একজন। কঙ্কালসার দেহ, নড়বড়ে হাত-পা। ড্যাবা ড্যাবা চোখে রাগের ফুলকি। তাকে দেখে পিছিয়ে এলো বিজয়। কুঁই কুঁই করে বললো, ভয় পাবেননি, ও আমার বাপ। ক'দিন হলো ক্ষেপে গিয়েছে। কালী পুজোর আগে ফি বছর এমন হয়। পুজো চলে গেলে আবার মাটির মতো ঠাণ্ডা। আসলে বাপের উপরে মা-কালী ভর করে। দেখছেন না, কেমন লড়াকু চোখ-মুখ।

কথাটা বুড়োটার কানে যেতেই রাগে গরগরিয়ে প্রতিবাদ করে উঠলো, আমি ক্ষেপিনি বাবু। মুড়দার বেটা আমাকে ক্ষেপিয়ে দিয়েচে। আজ্ঞ তিন রোজ ভুখা। একটাও দানাপানি পেটে পড়েনি। এমন হলে ক্ষেপবোনি তো কী নাচবে?

চরণের মুখ মাটির দিকে নামানো। লজ্জায় সে আর বিজয়ের দিকে তাকাতে পারছিল না। নদীর শব্দ ছাপিয়ে বুড়োটার গলা বাতাসে ভাসলো।

অপ্রস্তুত হয়ে বিজয় বললো, যাও চরণ, তোমার বাবা কী বলছেন শোন। বুড়ো মানুষটা খালি গায়ে কষ্ট পাচ্ছেন। ওঁকে ঘরে নিয়ে যাও।

—সে যাবেনি বাবু, লড়বে। চরণের হাল ছাড়া গলা।

বুড়োটা বিশ্রী একটা খিস্তি দিয়ে রেল লাইনে বার কতক বাড়ি মারলো লাঠির। তারপর ঠ্যাঙাড়ে শরীর নিয়ে তেড়ে গেল চরণের দিকে।

—এ বাপ, আসবানা কিন্তু! আসলে, খোয়া মেরে মাথা ফেটিয়ে দেবো। চরণের হাতে রেল লাইনের পাথর।

. বুড়োটা এক-পা, দু'পা করে এগিয়ে এলো সামনে। .

এক-পা, দু'পা করে পিছিয়ে গেল চরণ। লাঠি বাগিয়ে বুড়োটা বললো, তোর বউ না খেয়ে শুকোয়, ভিখ মাঙে দোরে দোরে—তুই কেমন মুনিস হে! তুই একটা গিধ্যর।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, গিধ্যর চরণ হাঁপাতে থাকে।

লম্বা পাঁপ বাঁশের মতো ঠ্যাঙ নাড়িয়ে ক্রোধে ছুটে যায় বুড়ো মানুষটা। পরনে নেংটির মতো একফালি কাপড়। রাগ ছাপিয়ে জেগে উঠছিল শরীরের সব কটা হাড়।

ফিটফিরি বরণ চাঁদটা মেঘের আড়ালে লুকোয়। নদীকে সাক্ষী রেখে পাড় ধরে ধরে ছুটে যাচ্ছিল দুই 'মারকু'-'ডরকু' মানুষ। অন্ধকারে ক্রমশ মিশে যায় তারা।

এক অসাড় শূন্যতার বুক ভরে যায় বিজয়ের। এ ঘটনার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। তার মনে হলো পৃথিবীর প্রতিটি গৃহকোণে বিপন্ন অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে জীবনবাজি রেখে লড়াই করছে মানুষ। এ লড়াইয়ের কোনো মীমাংসা নেই। জলে ভেজা ছোলার যেমন দ্রুত টাক গজায়, তেমনি লড়াইও অতি দ্রুত ছড়িয়ে যাওয়া কোনো ছত্রাক। মানুষের বুকে জায়গা করে নেয় চটপট। নিজস্ব ডালপালা বিস্তার করে মানুষের রক্তে শেষ দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকে।

তাহলে শান্তি কোথায়? হাহাকারে ভরে ওঠে বিজয়ের ভেতরটা। তার তো নিজস্ব ঘর আছে, স্ত্রী আছে। চাকরি আছে। সেখানে তার ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না। গতকাল বিকেলে তার ছ'বছরের মেয়ে বিনতা পাশের ফ্ল্যাটের কৃষ্ণমূর্তির মেয়ের সঙ্গে খেলা করতে গিয়ে তাদের একটা জাপানি পুতুল ভেঙে ফেলে। ফলে যা হয়, দুবাড়ির বউতে ঝগড়া, মুখ দেখাদেখি বন্ধ। মিসেস কৃষ্ণমূর্তি এখন আর অরুন্ধতীদের বাড়িতে আসে না, অরুন্ধতীও যায় না।

মিস্টার কৃষ্ণমূর্তি, এখন বিজয়কে এড়িয়ে চলেন। চাপা একটা অসন্তোষ তার চোখে-মুখে প্রত্যক্ষ করেছে বিজয়। কৃষ্ণমূর্তি আজও ইতোয়ারি বাজারে গায়ে গা-লাগিয়ে কাঁচা লঙ্কা কিনলেন, লঙ্কা ভেঙে ঝাঁঝ পরখ করলেন, তবু ভুল করে একবারও বিজয়ের সাথে

নিত্যকার অভ্যাসমতো দেশের অরাজকতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা কিংবা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে কথা বললেন না। বিজয়ও বলেনি। অরুন্ধতী সারা রাত ধরে তার মনে শুধু বিষ ঢুকিয়েছে।

এসব কিছু ভুলে বিজয় একটা সুস্থির নিঃশ্বাস ফেলতে চাইলো। আকাশের দিকে একবার তাকালো। স্তূপ মেঘের বংশ নয়, নিকষ কালো মেঘে বিদ্যুৎ-এর দাগ, মেঘে মেঘে সংঘর্ষ। আগুন আলোর ঝলকানি। চরণ কিংবা তার বৃদ্ধ বাবার বিরুদ্ধে এখন বিজয়ের কোনো অনুযোগ নেই। যা স্বাভাবিক তাই যেন হয়েছে। লাল মোরগ কিংবা কালো মোরগ যখন পাশাপাশি দানা খুঁটে খায় তখন তাদের মধ্যে একে অন্যকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে শেষ করে ফেলার কোনো প্রবণতা থাকে না। তাদের লড়াইয়ের মাঠে উস্কে দিলে তারা তখন ভাসমান আগুন হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। দাবানল সৃষ্টি করে। এর পেছনে কার ইশারা কাজ করে? দূরে দাঁড়িয়ে থাকা কাত্তিওয়ালা? দাঁতে দাঁত ঘষে বিজয়। সহ্য করতে পারে না চাকু বাঁধা সেই নিষ্ঠুর ধান্দাবাজ লোক দুটোকে। কানের দু'পাশ গরম হয়ে ওঠে মুহূর্তে। লাউড়িয়া মুরগাবাজারের যাবতীয় ধ্বনি, শব্দ, হৈ-হট্টগোল তার মগজের ভেতর তালগোল পাকাতে থাকে।

ধোপ্-ধোপ্-ধোপ্।

রঙ্গুয়া-রঙ্গুয়া-রঙ্গুয়া।

মাথা নিচু করে দ্রুত হাঁটতে থাকে বিজয়। লড়াইভূমির উপর সে যেন এক পলাতক সৈনিক। তার সামনে পেছনে, ডানে-বাঁয়ে অদৃশ্য কাত্তিওয়ালারা ঘোরা ফেরা করছে। তবু সে মাথা উঁচু করে পেরিয়ে আসে রেল-ব্রিজ। তার ভয় করে না। অন্ধকারের মধ্যে তার চোখ দুটো খুঁজতে থাকে আলোর উৎস। আলোর আশ্রয়।

পশু বিষয়ক

সেই সকাল থেকে প্রাণবায়ু বের করে কাতরে যাচ্ছিল পশুটা। বাতাসে তার ভয়ার্ত, চেরা চেরা আর্তস্বর।

দাড়ি কাটা থামিয়ে পাঁচিলটার দিকে তাকাল পরমেশ। এ সময় আমগাছে মুকুল আসে, সজনে ফুলের গন্ধে ভরে থাকে বাতাস। সময়টা সুখের। অথচ হাইড্রেনের পচা পাঁকের দুর্গন্ধ ভেসে এল বাতাসে।

পাশের ঘরে স্টোভে চা বসিয়েছে নীলা। পাম্প-দেওয়া স্টোভের হিস্‌হাস্‌ শব্দ ছাপিয়ে পশুটার গোঙানী বিষ ঢেলে দিচ্ছিল কানে। গত রাতে ঝড় বয়ে গিয়েছে ফুলবাগানটার উপর দিয়ে। পুরো বাগান ঘিরেই সবুজ হত্যার চিহ্ন। দেখলে মনটা টাটিয়ে ওঠে।

আয়নাটা নিজের কাছে টেনে নিয়ে পরমেশ বাগানটার দিকে তাকাল। দোপাটি ফুলগুলোর ঝরা পাঁপড়ি তখন রঙিন ফড়িং হয়ে বাতাসে উড়ছে, গোলাপ গাছগুলোর ডালপালা চুরচুর শরীর যেন সদ্য খুন করা যুবকের লাশ। একধরণের বিপন্ন অস্থিরতায় চোখ সরিয়ে নিল পরমেশ। তখনই কঁকিয়ে উঠল পশুটা। একবার নয়, অন্তত বার দশেক।

রান্নাঘর থেকে চায়ের কাপ হাতে তড়িঘড়ি ছুটে এল নীলা। তার পিঠ লতান ভেজা চুলে চঞ্চল পারদচুর্ণের মত স্নানের জল। বাগানের তুলসী গাছটার চেয়েও মলিন মুখে শুধাল, অমন করে কে কাঁদে গো?

চায়ে চুমুক দিয়ে নিষ্পলক তাকাল পরমেশ। থমথমে বাতাস এখন শব্দহীন।

পাশে সরে এল নীলা। সাদা গোলাপ কুঁড়িটার দিকে তাকিয়ে শরীরের স্পর্শ দিয়ে বলল, অ্যাই শোন, কাল রাতে আমি একটা সাদা হাতির স্বপ্ন দেখেছি। এইটুকু বলেই সে থামল। তারপর ঢোক গিলে বলল, জান তো, হাতিটা আকাশ থেকে সরাসরি নেমে এল আমার কোলে। একেবারে দুধের মত সাদা। আর কি নরম!

তাৎপর্যপূর্ণ ঢোক গিলল পরমেশ। ইদানীং বিচিত্র সব স্বপ্ন দেখছে নীলা। বিয়ের সাত বছর পরে কোল ভরাট না হলে সব মেয়েরই স্বপ্ন দেখাটা বেড়ে যায়। নীলার দিকে তাকিয়ে পরমেশ বুঝতে পারল তার চোখের তারা কাঁপছে। ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে কেমন সংকুচিত দেখাল চোখ মুখ। অবুঝের মত নীলা তখনও তাকিয়ে আছে একদৃষ্টিতে। তখনই বাতাস কঁপিয়ে ভেসে এল সেই স্বর। কান্নার প্রলেপ দেওয়া ধ্বনি। সাদা হাতির কথা বেমালুম ভুলে গের নীলা। উস্‌খুসিয়ে বলল, কে কাঁদে গো অমন করে?

পাঁচিলের ওপিঠে রাঙাকচা, হাড়মট্‌মটি আর আশশ্যাওড়ার বন। ঘন বাঁশঝাড় ক্রমশ

এগিয়ে আসছে পাঁচিলের দিকে। দিনের বেলাতও সেখানে মেঘকালো আঁধার। গা-ছমছম্ পরিবেশ। নীলার ভয় ডর নেই। বলল, চল না গো, দেখে আসি।

বারান্দা থেকে নেমে এল পরমেশ। সামনে নীলা, পিছনে সে। হাঁটতে হাঁটতে পরমেশ অনুভব করল, গত সাত বছরে তার হাঁটার শক্তি অনেকটা কমে গিয়েছে। কোন কাজে আগের সেই উৎসাহ নেই। সব যেন কেমন ফ্যাকাসে আর অনুজ্জ্বল। এই অনুজ্জ্বল নিষ্প্রভ সময়ের জন্য সে কেবল বাবলুকেই দায়ী করে।

দুই.

পশু পাখির সেবা-যত্ন করা নীলার বহুদিনেব সখ। পরমেশের প্রথমপক্ষের ছেলে বাবলু তাকে কখনো সেবা করার সুযোগ দেয়নি। 'মা' বলে ডাকতে হবে বলে হোস্টেলে চলে গেল সে। যাওয়ার সময় বাবলুর অপমানসূচক কথাগুলো এখনো ঘায়ের মত লেপ্টে আছে নীলার গায়ে। পরমেশ তখন বাবলুর তিন হাত দূরে দাঁড়িয়ে চুপচাপ সব শুনছে। এমন প্রতিবাদহীন .মানুষ নীলা বুঝি জম্মেও দেখেনি! চল্লিশ পেরিয়ে দ্বিতীয়বার বিয়ের পিঁড়িতে বসলে মানুষ যে অমন ভেড়া হয়ে যায় নীলা সেই প্রথম জানল। শুধু এই এক দু:খে নীলা হৃদয় নিংড়ে কাঁদল। পরমেশ তাকে সান্ত্বনা দেয়নি। স্বতঃস্ফূর্ত কান্না অনেক সময় সান্ত্বনার মতো। কাঁদতে কাঁদতে নিজেকে সামলে নিয়েছিল নীলা। মেনে নেওয়া এবং মানিয়ে নেওয়া তো সংসারের ধর্ম।

পরমেশ সব বুঝত। বুঝেও অবুঝের ভান করত সে। এই ভানটাই তার রক্ষাকবচ। বাবলুর ভুল বা দোষ যাই হোক না কেন ওসবই তো তার নিজের ভুলের জন্য। ঝোঁকের মাথায় সে হয়ত নীলাকে বিয়ে করে ভুলই করেছে। এখন সেই ভুল সংশোধনের কোন সুযোগ নেই। বাবলুর জন্য নীলাকে সে ত্যাগ করতে পারে না। এটা অসম্ভব। বাবলু তার জেদ নিয়ে হোস্টেল আছে, থাকুক।

বাবলু ছেলেমানুষ নয় অথচ ছেলেমানুষের মত কাজ করত। নীলা কিছু বললেই তার রাগ। মোটেই সহ্য করতে পারত না নীলাকে। নীলা যেন তার শত্রু। নীলা যতটা সহজ হ'ত ঠিক ততটাই কঠিন হয়ে উঠত বাবলু।

এই বাবলুই একদিন দুধের গ্লাস ছুঁড়ে কপাল ফাটিয়ে দিল নীলার। ইচ্ছাকৃতভাবে আছড়ে ভাঙল ফুলদানি। বাবলুর রাগের কারণ হ'ল নীলা তার মায়ের জায়গাটা দখল করে নিয়েছে সহজে। তার মায়ের চওড়া সোনার হারটা নীলার গলায় শোভা পাক এটা বাবলুর পছন্দ নয়। মায়ের জায়গায় নীলাকে সে কোনমতে মানিয়ে নিতে পারে না। আপোসের সহজ পথে সে হাঁটতে শেখেনি। সে চায়—নীলা এই সংসার ছেড়ে অন্যত্র চলে যাক, তাদের পিতা-পুত্রের সংসারে নীলার যেন কোন অধিকার না থাকে।

বাবলুর মনের ইচ্ছে যখন পূর্ণ হল না তখন সে পাড়া প্রতিবেশীর কাছে তার সৎমায়ের নামে নিন্দে, অপপ্রচার শুরু করল। জগৎজুড়ে সৎমায়েদের বদনাম। নীলা দমে গেল। সুযোগ বুঝে একদিন ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল বাবলু। এতে আরও ভেঙে পড়ল নীলা। বাবলুর উপর তার দায়িত্ব আছে—সেই দায়িত্ব বাবলু তাকে পালন করতে

দিল না। নীলা হেরে গেল। লোকলজ্জার ভয়ে ভেতরে ভেতরে শুকিয়ে গেল সে। বাবলু যে এঁটো পাতার মত তাকে দূরে সরিয়ে রাখল, শুধু এই এক ভাবনায় বিযাক্ত কোন গাছের মত নিজেকে আড়াল করে রাখল নীলা। একা থাকলে বাবলুর ক্রোধী মুখটা তার মনে পড়ত। মাথার ভেতরে সহস্র চিন্তা-ভাবনার জটগুলো শাখা প্রশাখা বিস্তার করে নির্জীব অসহায় করে তুলত তাকে। বাবলু যে রাতে চলে গেল সে রাতে প্রবল শ্বাসকষ্টে শয্যা নিতে হল পরমেশকে। খবর পেয়েও বাবলু এর না। বাবলুর ব্যবহার থেঁতলে যাওয়া শামুকের চেয়েও বেশি কষ্ট পেয়েছিল সে। বাবলুর খোঁচামারা কতাগুলো ধারাল কাঁচি হয়ে নীলার কণ্ঠনালী কেটে দিত হামেশা।

ভাঙা পাঁচিলের কোণটার কাছে দাঁড়িয়ে কোনমতে চোখটা মুছে নিল নীলা। গত রাতের ঝড়জলে মাটির স্যাঁতসেতে ভাব যায়নি। ঘাসের ভেতর লুকিয়ে আছে জল। এ জল যেন লুকনো চোখের জলের মত। সময় নষ্ট না করে গুটি গুটি পায়ে ডোবাটার দিকে নেমে গেল পরমেশ। ভয়ে জড়োসড়ো বাচ্চাটাকে দূর থেকে দেখে কষ্ট হল নীলার। মনে হল সপ্রাণ একতাল কাদা। অবহেলা আর আনাদরের চূড়ান্ত সাক্ষী। এই মৃতপ্রায় পশুটাকে সে যে করেই হোক বাঁচাবে। এক অদম্য জেদে নিচের ঠোঁটে দাঁত বসিয়ে দেয় সে। উবু হয়ে দু'হাতে বাড়িয়ে বাচ্চাটাকে তুলে নিল পরমেশ। মৃতপ্রায় পশুটার দু'চোখ-ভর্তি পিচুটি, যেন কোন দুরারোগ্য রোগে কাহিল।

নিঃশব্দে ডোবা থেকে উঠে এল পরমেশ।

নীলা শুধাল, কিসের বাচ্চা গো?

কাদা-মাখামাখি বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে পরমেশ বলল, শুয়োরের। মনে হয় হাড়িপাড়ার কেউ ফেলে দিয়ে পালিয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে, বাচ্চাটা অসুস্থ। বাঁচবে না।

আঁৎকে ওঠার চোখ করে নীলা তাকাল, কে বলল বাঁচবে না! একে আমি যে করেই হোক বাঁচাবো। নীলার কথায় জেদের আভাস, উত্তেজনায় গলার শিরা ফুলে উঠছিল। অবশেযে ব্যস্ততা ফুটিয়ে বলল, তাড়াতাড়ি চলো। আহা, কি কষ্ট পাচ্ছে গো বাচ্চাটা, চোখে দেখা যায় না!

চশমার কাচে রোদ পড়ে জ্বালা জ্বালা করছিল পরমেশের চোখ। সেই রুক্ষ চোখের দিকে তাকিয়ে নীলা জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, বাবলুর কথা তোমার মনে পড়ে না?

পরমেশ শান্ত চোখে তাকাল। সে চোখে কষ্টের গুঁড়িগুঁড়ি ধুলো। থমথমে গলায় বলল, যার্ব বলে যে যায় তাকে তো আর ফিরিয়ে আনা যায় না! তার কথা ভেবে শুধু দু:খ পাওয়াটাই সার হয়—

নীলা আকাশের দিকে তাকাল। নীল নীল আকাশে কোথাও মেঘের কোন চিহ্ন নেই! রোদ ঝলমলে উজ্জ্বল এক আকাশ।

পরমেশ সেই আকাশের দিকে তাকিয়ে বুকের ভার লাঘব করতে চাইল, জানোতো, বাবলুটা একবার মরতে মরতে বেঁচে গেল। আমরা সবাই ধরে নিয়েছিলাম ও আর বাঁচবে না। টিটেনাসের লাস্ট স্টেজে পৌঁছে কেউ কি বাঁচে? অথচ, বাবলু বেঁচে গেল। ওর বেঁচে ওঠাটাই আশ্চর্যের!

তিন.

কাৎ হয়ে শুয়ে থাকা শরীর থেকে ভাঙা কার্ণিশের মতো ঝুলে ছিল পেটটা। এত রুগ্ন কৃশ অসমর্থ পশু পরমেশ যেন এর আগে দেখেনি। কিছুটা হেঁটে আসতেই ঝাঁকুনী দিয়ে কেঁপে উঠল পশুটা। ক্রমে তা সংক্রামিত হ'ল পরমেশের শরীরে। পশুটার চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে মায়ার রোগক্লিষ্ট চোখ দুটোর কথা তার মনে পড়ল। অভিশপ্ত স্মৃতি ঘুরে ফিরে আসে।

'বাবলুকে দেখো।' মৃতশয্যা এই ছিল মায়ার শেষ উচ্চারণ। মায়ার শেষ দুটি শব্দ এখনও পরমেশের কাছে নিঃশ্বাস ফেলার মত টাটকা। মায়ার শেষ কথা যে রাখতে পারেনি। বাবলুর চপল ক্রোধই এর জন্য দায়ী। সে জানত, বাবলু চলে যাবে। সে পাখি খাঁচার জীবনে সন্তুষ্ট নয় তাকে সোনার শিকল দিয়ে বাঁধলেও সে অসুখ। রক্তের সম্পর্কটা এখন সাদা কাপড়ে কলার কষ, যতদিন অস্তিত্ব ততদিন কলঙ্কচিহ্ন। বাবলু এখন ফেরারি। হোস্টেলে থাকাকালীন সে নিজেকে নোংরা পথে টেনে নিয়ে যায়। থানা-পুলিশ এবং জেলা প্রশাসন তার পেছনে। যে কোনদিন গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তারা বাবলুকে ফিরিয়ে দেবে। তখন? থানার ওসির জেরার সামনে মাথা হেঁট হয়ে গেল পরমেশের। একজন ক্রিমিনালের বাবা হওয়া যে কত জ্বালার তা সে হাড়ে হাড়ে জানে। ওসির শাসানী এখনও সে ভোলোনি। পোড়া পেট্রোলের ধোঁয়া উড়িয়ে থানার জিপ ফিরে যেতেই আড়ালে গিয়ে চোখ মুছেছে পরমেশ। ভেবেছে, বাবলু আসলে এবার সে তাকে ধরিয়ে দেবে। যা ভাবা যায় তা কি করা যায়? গত মাসেও বাবলু ধূর্ত চিতার মতো কোয়ার্টারে এসেছে সন্তর্পণে। রাতের অন্ধকারে তাকে হঠাৎ চিনতে পারেনি নীলা। গত সাত বছরে বাবলুর চেহারায় বিরাট পুরুষালী পরিবর্তন। দেবদারুর চেয়েও দ্রুত দীর্ঘায়িত হয়েছে তার শরীর। ডিম্বাকৃতি মুখে ঘন চাপ দাড়ি। চোখে মুখে কুটিলতা। হাসিতে প্রস্থর কাঠিন্য। সরলতার শেষ অংশটুকু নিঃশেষিত সেই কর্কশ, কুপিত মুখ থেকে।

নীলা বাস্তবিক ভয় পেয়েছিল—তুমি, তুমি এখানে?

—কেন আসতে নেই বুঝি? জুতো সমেত শোবার ঘরে ঢুকে এসেছিল বাবলু, তারপর দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে লাফ দিয়ে পেড়ে এনেছিল তার মৃতমায়ের ফটোটা। —ভাগাড় থেকে ফটোটা আমি উদ্ধার করলাম। আমার মা আপনাদের দীর্ঘশ্বাসের কারণ হোক, এ আমি চাই না।

তোমার বাবা এলে কি বলব? নীলার ভয়ার্ত প্রশ্নে সামান্যও বিচলিত হয়নি বাবলু। শুকনো ঠোঁটে ক্রুর হাসি ছড়িয়ে বলেছিল, বলবেন, এমনি করে মায়ের সবকিছু আমি নিয়ে যাব। আই হেট মাই ফাদার।

যাওয়ার আগে নীলার গলার হারটা খুলে নিল বাবলু। তাচ্ছিল্য মাখিয়ে বলেছিল আমার মায়ের সোনার হারটা আপনার গলায় মানায় না। পরের জিনিস পরেছেন, আপনার কি একটুও লজ্জা নেই? পরমেশ সরকারকে বলবেন এমন একটা হার গড়িয়ে দিতে।

নীলার তখন মাটিতে মিশে যাবার অবস্থা। দু'চোখ ডুবে আছে জলে। বাবলু উপহাসের গলার বলেছিল, কাঁদুন। প্রাণ খুলে কাঁদলে বুক হাল্‌কা হয়।

বুক হাল্‌কা করে শ্বাস নেয় পশুটা। নীলা বুড়ো আমপাতা দিয়ে চেঁছে দিচ্ছিল তার গায়ের কাদা। বাবলুকে সে ভুলতে চাইছিল। কিন্তু বারবার করে বাবলুর ক্রুদ্ধ মুখটা ভেসে উঠছিল মনে।

চার.

তিন বালতি জলের ঝাপটায় শুয়োরের বাচ্চাটার গা থেকে কাদা ধুলো বালি ধুয়ে মুছে পাতলা চামড়া, হাড়-পাঁজরা এবং পাঁজরার ভেতরের হৃৎপিন্ডের ধুঁকধুকানী স্পষ্ট দেখতে পেল নীলা। মায়া হল। হাওয়া বইলেই থরথরিয়ে কেঁপে উঠছিল পশুটা। গাঁজরা ভর্তি মুখ। লতলতে লাল জিভ মুখের বাঁ পাশে নেতিয়ে। ছাইবর্ণ চোখের কোণে হলুদাভ পিচুটি। তাকালে গা ঘিন-ঘিনিয়ে ওঠে। উৎকন্ঠা নিয়ে এসবই দেখছিল নীলা। যে কোন অশুভ মুহূর্তে বাচ্চাটা মারা যেতে পারে। নীলা এ বিষয়ে নিশ্চিত। তখন ঐ নিথর দেহটা নিয়ে সে কি করবে? মৃত্যু তার কাছে ভয়ের বিষয়। মৃত্যু এবং মৃত্যু সংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনা সে স্পষ্টত: এড়িয়ে চলে। আজ অব্দি সে কোন নিকট আত্মীয়র মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেনি। মৃত্যুশয্যার পাশে সে কোনদিন দাঁড়ায়নি। ভয় তার শ্বাসনালী অবরুদ্ধ করে দেয়। চন্দনা পাখিটার মৃত্যু সে দেখেনি। মৃত্যুর পরে তার কম্পনহীন শরীরটা কেবল স্পর্শ করেছিল। ডাঁশমাছি আর পিঁপড়ের লোভ সর্বস্ব চাহুনি থেকে পাখিটাকে বুকে তুলে নিয়ে উদগত কান্নায় ভেঙে পড়েছিল সে। মৃত্যুর শীতল থাবা তাকে বিচলিত করে তুলেছিল।

পরমেশের মুখে তার প্রথমা স্ত্রী মায়ার মৃত্যু বর্ণনা শুনেছে সে। শুনে শিহরিত, বাকরুদ্ধ হয়েছে। মায়া যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে তখন তার অশ্রুপূর্ণ চোখ দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে নিঃশ্চুপ হয়ে গিয়েছিল মুহূর্তে। মায়ার দু'চোখ তখন বরফের চোখ। দু'হাত দিয়ে চোখ দুটো বুজিয়ে শিশুর কান্নায় ভেঙে পড়েছিল পরমেশ।

কামিনী গাছটার ছায়ায় দাঁড়িয়ে মনোরম সকালে অদৃশ্য এক ভয়ের ঝাঁকুনীতে কেঁপে গেল নীলা। বাচ্চাটার লুললুলে জিভ যেন যমরাজের রক্তচক্ষুর চেয়েও লাল! চারদিক থেকে ছুটে আসছিল ভয়ের বাতাস। সজনে ডালে একটা কাক কা-কা করে ডেকে উঠল। কাকটাকে তাড়িয়ে দেওয়ার সাধ্যটুকু নীলা হারিয়ে ফেলেছে।

পরমেশ বলেছিল, দাউ দাউ চিতার ভেতর থেকে মায়া উঠে দাঁড়িয়েছিল উর্ধ্বমুখী। শ্মশানযাত্রীরা মায়ার ঝলসান শরীরটা লাঠি দিয়ে পিটিয়ে আবার চিতায় গুঁজে দিয়েছিল।

ঘন্টাখানিক আগে সাইকেল নিয়ে পরমেশ চলে গিয়েছে ব্লক অফিসের পশু ডাক্তারের খোঁজে। যাওয়ার সময় নীলাকে বলে গিয়েছে—বাচ্চটাকে চোখে চোখে রোখো। দেখো যেন কুকুরে না নিয়ে যায়। আর হ্যাঁ, পারলে ওর মুখে জল দিও। মরার সময় বাচ্চাটা যেন তোমার হাতের জল পায়।

নীলা সেই তখন থেকে বাচ্চাটার পাহারায়। নড়ে-চড়ে শুতে গিয়ে ব্যর্থ হল বাচ্চাটা,

তার রুগ্ন শরীর এখন. একতাল কাদা।

নীলা শহরে মানুষ। বস্তিতে, অলিতে-গলিতে, পার্কে, হোটেলের আবর্জনা স্তূপে, হাইড্রেনে, ডাস্টবিনের আশে-পাশে সে নানা রংয়ের শুয়োর দেখেছে। ঐ একটি কাঙ্ক্ষিত দৃশ্য কামিনীগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে মনে মনে সাজিয়ে নেয় সে। স্তনভারে ন্যুব্জ মাংসল একটা ধাড়ী শুয়োর দুধের পানা বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে আস্তাকুঁড়ের পাশে। পাঁচ ছটা বাচ্চা চুক্‌চুক্‌ করে দুধ খাচ্ছে, তাদের মুখ মর্তি গরম দুধের সফেদ ফেনা।

পাশের কোয়ার্টারের রমলাদি তাকে প্রায়ই শোনায় তার আট মাসের বিশু নাকি দুধে গোঁতা মেরে ভরপেট দুই খায়। মাঝে মাঝে গোলাপী মাড়ি দিয়ে কামড়ে দেয় দুধের বোঁটা।

একথা শুনে শিরশির করে নীলার সর্বাঙ্গ, রোমাঞ্চিত চোখ মেলে সে তখন বাসিফুলের নিষ্প্রভ চাহনিতে রমলাদির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ধিক্কার জড়ো হয় মনে। পতিত জমির জালি না আসা কুমড়োলতার মতো মনে হয় নিজেকে। বয়সের সিঁড়িগুলো কি দ্রুত দীর্ঘশ্বাসের ঢেউ ভাঙে ফল ফুল না আসা দেহ সুষমায়। তার তখন কান্না পায়। নিজেকে আড়ালে এনে সে তখন বাঁধভাঙা জলস্রোতের আবেগে ঝাঁকুনী দিয়ে কাঁদে।

পরমেশের আফশোষের শেষ নেই। সান্ত্বনাবাক্যে সে তখন বোঝাতে চায় নীলাকে— চলো একবার কলকাতা থেকে দেখিয়ে আনি। এবার আর গাইনো নয়—হোমিওপ্যাথি। শুনেছি, হোমিওপ্যাথিতে নাকি কাজ হয়।

নীলার শরীর জুড়ে তখন কেবল তছনছ, ধস নামার শব্দ। পরমেশ বলে, এসব নিয়ে আর ভেবোনা। ভগবান সবাইকে সবকিছু দেয় না। তুমি যদি বলো তো হাসপাতাল থেকে একটা আনওয়ানটেড বেবি নিয়ে এসে মানুষ করি। সে তোমাকে শেষ বয়সে দেখবে।

—বাবলুই যখন দেখল না তখন ঐ সব ছেলে কি আমাকে দেখবে? ভেতর থেকে একটা চাপা হাই উঠে আসে নীলার। বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানো তার বহুদিনের সখ। ছোট বোন মুক্তা দেখতে শুনতে ভাল ছিল বলেই অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের এক বছরের মধ্যে কোল জুড়ে দেবদূতের মতো শিশু। মুক্তা তখন মুক্তো নয় একেবারে খোলা ঝিনুক। অন্তর্বাসের হুক আলগা করে ছেলেকে দুধ দিতে গিয়ে সে প্রায়ই তার দিদিকে করুণার চোখে দেখে। নীলা কি সবার কাছে হেরে যাবে?

শুয়োরের বাচ্চাটা ক্ষুধার্ত দৃষ্টি মেলে মুখ ফাঁক করে শ্বাস নেয়। প্রগাঢ় মাতৃত্বের অর্বাচীন আনন্দে নীলা সেই শুয়োরের বাচ্চার মুখে চামচে করে দুধ ঢেলে দেয়। বাচ্চার লতলতে জিভে ফোঁটা ফোঁটা দুধ যেন নীলারই শরীর নিঃসৃত নির্যাস। নীলা কাঁদছে। ফুলে ফুলে উঠছে নাকের পাটা, বক্ষস্থল।

সামনের আমগাছটার মুকুল এখন গুটি আমে রূপ নিয়েছে। ঘন সবুজ পাতার আড়ালে বসে একটা 'খোকা হোক' পাখি গলা ফাটিয়ে ডাকছে। হলুদ রোদে জ্বলনের তীব্রতা ছিল না তবু নীলার ভেতরটা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেল। এ ঠাট্টা আর সহ্য

হয় না।

—দূর হ। ঢিল মেরে পাখিটাকে তাড়াতে গিয়ে নীলা দেখে তার সামনে মূর্তিমান যমের মত দাঁড়িয়ে আছে বাবলু। একটা দেশলাই কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁটছিল সে। ঠোঁটে বিযাক্ত হাসি।

—এবার আবার কি নিতে এসেছ? হাঁফ ছেড়ে নীলাই প্রথম কথা বলল, আমার তো আর কিছু নেই।

গনগনে স্বরে বাবলু বলল, বাবা কোথায়? তার সাথে আমার বোঝাপড়া আছে।

—তোমার বাবা বাড়িতে নেই। কোন কিছু বলার হলে আমাকেই বলো।

—আপনি কে?

রক্তময় চোখে তাকায় বাবলু—আপনাকে বলতে আমার বয়ে গেছে। ঝি—ঝিয়ের মত থাকুন। বেশি বাড়াবাড়ি করলে রেজাল্ট কিন্তু খারাপ হবে।

তখনই ঝাঁকুনী দিয়ে বমি করল শুয়োরের বাচ্চাটা। অম্লগন্ধে ভরে গেল ফুলের বাগান। নাকে সুগন্ধি রুমাল চেপে তাচ্ছিল্য মিশিয়ে বাবলু বলল—বাঃ, এটাকে আবার কোথা থেকে আমদানি করলেন? এর যে দেখছি কলেরা হয়েছে।

সাত বছর আগেকার সেই নম্র লাজুক মুখচোরা বাবলুর সাথে এখনকার বাবলুর কোন মিল নেই। এ যেন বিসর্জন দেওয়া কার্তিক কাঠামো। হাড় চামড়ায় ঢাকা একটা দেহ। দু'চোখের নিচে কালি। জিনস্ প্যান্টের এখানে সেখানে ছোপ ছোপ নুন ওঠা ঘাম। ডিম্বাকৃতি মুখটায় শয়তানসুলভ গোঁফ দাড়ি। হাসলে মুখের দু'পাশে গভীর দুটো ভাঁজ পড়ে। ক্রুরতা, নিষ্ঠুরতার সাক্ষাৎ প্রতিভূ যেন!

নীলা লক্ষ্য করল বাবলুর বুক পকেটে সিগারেটের প্যাকেট, হয়ত ইচ্ছাকৃতভাবে দেখানোর জন্য ওটা ওখানে রাখা। দেখেও না দেখার ভান করে চোখ ঘুরিয়ে নিল নীলা। বাবলু চিবিয়ে চিবিয়ে পরিহাসের ছলে বলল, এক গেলাস জল দিন তো—বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। ঠোঁট কামড়ে বাবলুর দিকে চেয়ে থাকল নীলা। মৌনতা, উপেক্ষা নিমেষে ক্ষেপিয়ে দিল বাবলুকে। জুতোর টো-তে গোলাপ গাছটা মাড়িয়ে শক্ত গলায় সে বলল—জল না থাকলে, একটু আগুন দিন সিগ্রেটটা ধরাই।

অপমানে নীল হয়ে যাওয়া নীলা ফুঁসে উঠল অকস্মাৎ, আগুন একবারই দেব। তবে, এখানে নয়—চিতায়।

—বাঃ, ডায়ালগখানা তো খাসা দিলেন। অবিচলিত উত্তর দিল বাবলু। নীলা যেন চোখের আগুনে ছাই করে দেবে বাবলুকে, তেমন রণচণ্ডী চোখে তাকিয়ে বলল—ভুলে যেও না, আমি তোমার মা। মাকে সম্মান দিতে শেখো।

—মা! ফাইন বললেন তো! মুহূর্তে বেঁকে গেল বাবলুর ঠোঁট, বেশ্যার আবার মা হবার সখ হয়েছে দেখছি। তা বেশ—তা বেশ—

—কি বললে? দাঁতে দাঁত চেপে বাবলুর দিকে ঝুঁকে পড়ল নীলা। বাবলু আবার সেই একই কথা রসিয়ে রসিয়ে বলল।

কথা শেষ করতে পারেনি বাবলু তার আগেই ঠাস্ করে একটা চড় তার কানের

কাছটা ছুঁয়ে এল সজোরে। পতনোন্মুখ বাবলু রুখে দাঁড়াল কোনমতে, আপনি আমাকে মারলেন, আপনার স্পর্ধা তো কম নয়!

—স্পর্ধার তুমি কি দেখেছো? হিংস্র নেকড়ের চেয়েও ক্ষিপ্র গতিতে বাবলুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল নীলা। অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না বাবলু। হিপি চুলের মুঠি ধরে নীলা তাকে টেনে আনল বাগানটার কাছে। একেবারে শুয়োরের বাচ্চাটার কাছে শুইয়ে দিল তাকে। নীলার মনে হল, এরা দু'জনে দুই প্রজাতির জীব হলেও পাশবিকতার দিক থেকে এরা একই মেরুতে দাঁড়িয়ে। দুজনেই অসুস্থ। একজনের রোগ শরীরের, অন্যজনের মনের। এদের দু'জনেরই যথাযথ চিকিৎসার প্রয়োজন।

—আমাকে ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন বলছি। নাহলে কিন্তু ভাল হবে না!

বাবলুর ধমকে একটুও ভয় পেল না নীলা। তার নরম হাত দুটো তখন ধাতব কোন সাঁড়াসী। রক্তমাংস হাতের ফাঁসে বেকায়দায় আটকে পড়ে কঁকিয়ে উঠল বাবলু। তার আর্তনাদে ভয় পেয়ে গঙিয়ে উঠল শুয়োরটা।

বাবলুর মনে হল নীলা কোন মানবী নয়—অলৌকিক শক্তিধারিণী কোন দেবী। দেবী দুর্গা! নাহলে, নারী শরীরে তার অসুর শক্তিকে কব্জা করার এত শক্তি কোথায় পায় ভাতের ফেন ঝরানো এই কোমল দুই হাত!

নিজের অক্ষমতায় হাঁপিয়ে উঠে একসময় হাল ছেড়ে দিল বাবলু। তার ঠোঁট, মুখ, কপালের সবখানে আঘাতের সুস্পষ্ট চিহ্ন। নখের আঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত মুখ। জায়গায় জায়গায় লাল হয়ে ফুলে আছে ছ্যাঁচা মাংস। রক্তকষে বীভৎস দশা। মাটিতে পড়ে যাবার আগে নীলা তার পতনমুখী মুখটাকে ঠুসে ধরল মাটিতে।

চুলের মুঠি ধরে সক্রোধে বার দুই উপর নিচ করে নীলা বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলল, সাত বছর ধরে অনেক সয়েছি, আর নয়। এবার তোমাকে উচিত শিক্ষা দেব।

শুয়োরের বাচ্চাটা কঁকিয়ে উঠছিল শরীর-নিংড়ানো যন্ত্রণায়। অনুনয়ের গলায় বাবলু বলল, আমাকে ছেড়ে দাও ছোট মা, আমি আর কোনদিন এখানে আসব না।

বাতাসে যখন দুটো প্রাণীর আর্তনাদ ভাসছে তখন পশু ডাক্তারকে নিয়ে বাগানে ঢুকে এল পরমেশ। হন্তদন্ত হয়ে বলল, কোথায়, বাচ্চাটা কোথায়?

আঙুল উঁচিয়ে দু'জনকেই দেখিয়ে দিল নীলা। একটু কাঁপল না তার হাত। অনাহুত মাতৃত্বের সার্বজনীন আবেদনে চোখে জল নিয়ে সে বাবলুর পাশে এসে দাঁড়াল। ধরা গলায় বলল, এই পশুটাকে আগে দেখুন ডাক্তারবাবু। বড্ড মার খেয়েছে। দেখছেন না কেমন ধুঁকছে!

হপ্তা গোলামী

তিতা বড়ি মুঠা মুঠা খেয়েও জ্বর ধরেনি জোব্‌নীর। তিন দিনের জ্বরে আধখানা দেহ নিয়ে সে যখন ঘুম থেকে উঠল তখন পুরো মুখটাই তিতা। মাথায় পাথর বাঁধা ভার। ঘাড়ের কাছটায় চিমড়ান ব্যথা। চোখ খুললেই কট্‌ কট্‌ করে চোখের জমি। তাকাতেও সাধ যায় না। আলসেমি আর ম্যাজ ম্যাজানিতে গুলিয়ে ওঠে গা-গতর। এমন ভার শরীর নিয়ে কেউ বাহ্যি যায় না, কাজে যাওয়া তো দূরের কথা। জোব্‌নী শাড়ি গুছিয়ে ঘুল্‌ঘুলিয়া খিড়কি দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। তার বুড়ি মা লারানী এঁটো বাসন ধুচ্ছিল বস্তির সরকারি কূয়ায়। নরম রোদ তেল মাখার মতো মিশে গিয়েছে জামুন গাছের পাতায়। দূরের শাল গামার বনটায় কুয়াশার চিহ্ন নেই। বিজা গাছের পাতা থেকে রোদ চুইয়ে পড়ছিল পাকা সড়কে।

আর বসে থাকা যায় না। খনি খাদের ঘন্টি হতে এক ঘন্টাও বাকি নেই। দাঁতন করে কাজে যেতে হবে জোব্‌নীকে। আজ হপ্তার শেষ দিন। কামধান্দা শেষ হলে হপ্তা দেবে ঠিকেদারের ক্যাশবাবু। রেশন মিলবে, রেশন না নিলে পুরা হপ্তা খাবে কি? হাওয়া খেয়ে তো বাঁচা যায় না!

তিন দিনের জ্বরে তার তিন অবস্থা। বস্তি বুড়া তার মাকে বলেছিল, লারানীরে, তোর বিটির গায়ে বদ্‌ হাওয়া লেগেচে। গুণিন বদ্যি করা। বাপ মরা মেয়ে তোর! পাপের হাওয়া লাগলে বাঁচানো মুশকিল।

বস্তি বুড়ার কথায় ভয়ে সজিনা ডালের মতো ভেঙে গিয়েছিল লারানী। ভয়টা তার বিভিন্ন কারণে। জোব্‌নী ছাড়া তার কেউ নেই মাথার উপর। গতর পড়েছে বহুকাল। জোব্‌নীর খাটুনীতে সে দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পায়। বুড়াটা খাদে লোহা-পাথর কাটতে গিয়ে পাথর চাপা পড়ল। সেদিন থেকেই মেয়েটার মাথায় ঝুড়ি পাছিয়া। একটা মরদের সমান খাটে। সকাল থেকে সন্ঝা তক্‌ হাড্ডি জল করে খাটলেও কোন বিরক্তি নেই। সর্বদা হাসি হাসি মুখ। সেই সুনার ফুল হলুদ হাসিতে লারানীর এখন আর মরতে মন চায় না। এই ছোট কুঁড়েঘরটাই তার স্বর্গ!

মেয়ে হাসপাতাল থেকে বড়ি এনেছিল গাদা গুচ্ছের, সেসব খেয়েও যখন নরম পড়েনি তখন নিরুপায় হয়ে লারানী ছুটে গিয়েছিল গুণিন দুয়ার। গুণিন ফর্দ লিখে দিয়েছিল। হলদী গুঁড়া, আরুয়া চাউল গুঁড়া, কালা গুঁড়া। মান্দা ফুল আর সিঁদুর ছাড়া মুরগা পূজা হবে না। সব জোগাড় করেছিল লারানী। গুণিন খরাবেলায় এসে মুরগা জবাই করেছে উঠোনে। সর্ষে পোড়ার ছিটে দিয়েছে। বলছে, কোন দোষ নাই তোর

বিটির। যা ছিল সব তাড়ায়ে দেলাম।

এর পরেও জ্বর যায়নি জোব্‌নীর। রাত হলে তেড়ে ফুড়ে জ্বর আসে। সকাল হলে গা একেবারে ঠাণ্ডা, ঘাম দিয়ে জ্বর উধাও। দুব্‌লা শরীর নিয়ে কাজ কামাই দেয়নি মেয়েটা। ঠিকেদারের কাজে কামাই দিলে বদনাম। ছাঁটাই হলে আঙুল চুষতে হবে তখন।

জোব্‌নী মুখ ধুয়ে, শাড়ি পাল্টে, বিড়া বসানো ঝুড়িটা নিয়ে যখন বাইরে আসবে, লারানী তখন বলল—খেয়ে লে বিটি। খালি পেটে কুথায় যাবি? মাথা ঘুরে পড়ি গেলে কে তোরে দেখবে?

খাওয়ায় মন ছিল না জোব্‌নীর। মায়ের কথায় তাকে রুখতেই হ'ল। রাতে একটা দানাও মুখে কাটেনি। শালবনটার কাছে ট্রাক থেকে নেমেই টল্‌তে টল্‌তে সে বস্তিঘরে ঢুকেছে। গায়ে হাত দিয়ে লারানী বলেছিল—ইস, তোর গায়ে যে খুব তাপ বিটি! মায়ের কথায় ছল্‌ছল্‌ করেছে চোখ। আরাম খুঁজেছে পরিশ্রমী গতর।

ঠিকেদারের কাজে ফাঁকি দেওয়ার কোন সুযোগ নেই। ফি-দলেই কুলি কামিনদের সর্দার আছে। তারা কাজ বুঝে নেয়। দু-এক ঝুড়ি মাল কম হলে ফের বয়ে আনতে হয় খনি- খাদ থেকে। লোহা পাথরের কাজে গাঁইতি, বেল্‌চা, বিড়া ঝুড়ির যেমন কোন বিশ্রাম নেই তেমনি রেজা কুলির তাদেরও রেহাই নেই!

পাহাড়ের কাজে, খাদের কাজে শরীর কমজোরী হলে আয়ও কমে যায়। রেশন কেটে নেয় ঠিকাদার। হপ্তাভর খাটলে এক হপ্তার খোরাকী। না খাটলে বেবাক ফাঁকা। তখন পেটে জলপট্টি দিয়ে তোল্‌ (শাল বিচি) সিজিয়ে খাওয়া। নিষ্কম্মা মানুষের মতো এদিক সেদিক ঘোরা। মায়ের মুখ চেয়ে জোব্‌নীকে আসতে হয় কাজে। সে নিজের পেট নিয়ে ভাবে না। বীর সিং খাদে পাথর চাপা পড়তেই তাকে খাদের কাজে আসতে হয়। খনি এলাকায় আইবুড়ো মেয়েদের কাজের অভাব হয় না। ঠিকাদারের ট্রাক ড্রাইভার পরদিনই তাকে ডেকে নিয়ে গেছে খাদে। খাতায় নাম উঠিয়ে শ'টাকা পাইয়ে দিয়েছে। আবার পৌঁছেও দিয়ে গেছে ঘর অব্দি। ড্রাইভার ছোকরাটা ভাল। শাল গাছের চেয়েও টান টান তার শিরদাঁড়া, কথাবার্তায় পুরুষালী চমক আছে। সে এখানকার লোক নয়। ঘর তার কলকাতায়। পেটের ধান্দায় এখানে ছিট্‌কে এসেছে।

ড্রাইভারবাবু না থাকলে জোব্‌নীর কপালে কাজটা জুটত না। ক্ষতিপূরণ বাবদ একটা পয়সাও সে পেত না। খাদে লোহা-পাথর কাটতে গিয়ে বাপ মরল। তার সংকারের যাবতীয় খরচ ঠিকেদারবাবুর দেওয়া উচিত। এ কথা সর্বপ্রথম ট্রাক ড্রাইভারই সকলের কানে কানে মন্ত্র পড়ানোর মতো পড়িয়ে দেয়। বেগতিক দেখে ঠিকেদার জিপ নিয়ে এসেছিল খনিতে। তার হাতে মান্দার ফুলের মালা, রজনীগন্ধার ডাঁটি। সংকারের সমস্ত খরচ এক কথায় দিয়েছিল। ঠিকেদার বাবুর তখন ঢেঁকিগেলা অবস্থা।

শাল বাগানের পশ্চিমধারে বীর সিংকে গোর দিয়ে এসে গাড়ির সিটে বসে নাদান ছেলের মতো চোখের জল ফেলেছিল ট্রাক ড্রাইভার। আশে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোও চোখের জল আটকাতে পারেনি। বীর সিং ছিল খনি এলাকার পুরানো

লোক। বড় পরোপকারী, কাজ পাগল মানুষ। হপ্তাভর কাজ করেও তাকে কেউ কখনো হাঁপিয়ে উঠতে দেখেনি। তবু, খাদের কাজ থেকে রেহাই চাইত মানুষটা। বলত, খাদের কাজ খুন চুষে লেয়। পানি করে দেয় রক্ত। এমন খাটুনির কাজ করলে বেশি দিন কেউ বাঁচবেনি।

ঠিকেদারবাবু হপ্তা শেষে যে কটা টাকা হাতে তুলে দেয় তার হিসাব পাই-টু-পাই মিলিয়ে নেয় সে। পাহাড় ভাঙার কাজে যে ঘাম নুন ঝরে, তার হক পয়সা কোন ঠিকেদারই দিতে পারবে না।

লারানী মেয়েকে কাঁঠাল বিচি ভাজির সাথে এক তাটি (বাটি) হাঁড়িয়া দিল খেতে। বলল, খেয়ে নে। পেটে কিছু না থাকলে ওষুধে কাজ দেয়নি। আর না খেলে খাটবি কি করে?

চোঁক চোঁক করে হাঁড়িয়া খাচ্ছিল জোব্‌নী। এ অঞ্চলের বেশির ভাগ লোকই হাঁড়িয়া খেয়ে দু'চারদিন কাটিয়ে দেয়। খুব কম ঘরেই চুলা জ্বলে। রোদে পোড়া শরীরে হাঁড়িয়া যেন অমৃত সমান পানীয়। ভাত রুটি না হলেও চলবে কিন্তু, হাঁড়িয়া না খেলে হবে না। খাটনির কাজে হাঁড়িয়া হ'ল শক্তির উৎস। লারানী কাঁঠালের বিচা ছাড়িয়ে দিচ্ছিল মেয়েকে। জোব্‌নী মুচ্‌ মুচ্‌ করে চিবিয়ে খাচ্ছিল ভাজা বিচি। মাঝে মাঝে চাখা দিচ্ছিল নিমকে। হাঁড়িয়া চালুনিটা হাতে নিয়ে লারানী বলল—আর এট্টু দিই, পেট ভরে খেয়ে লে। সেই সাঁঝ লাগিয়ে তো ঘর ফিরবি।

মাথা ঝুঁকিয়ে না করল জোব্‌নী। লারানী টিফিন ডাব্বাটা মেয়ের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। শাল গামারের বনটা পেরোলেই চেক্‌পোষ্ট। সেখানে দুটো সেপাই ডিউটিতে থাকে। লোহা খনির দিকে যাওয়া ট্রাকগুলো সব চেক্‌পোষ্টে থামে। গাড়ি চেক হয়। যাওয়া আসার পথে এই এক ঝামেলা। সময় নষ্ট। যাওয়ার সময় ততটা গায়ে লাগে না। ফেরার সময় ক্লান্ত শরীরে বিরক্তি জড়ো হয়। তখন ঘরে ফেরার তাড়া। বাধা নিষেধ ভাল লাগে না।

চেক্‌পোষ্টের কাছে আসতেই রোদের বিষে ঘেমে গেল জোব্‌নী। সিপাইটা তাকে দেখতে পেয়ে চোখে চোখ ফেলে হাসল। পাহাড় এলাকায় রেজারা নাকি শাল গাছের চেয়েও সস্তা। দু'চারটে টাকা হাতে ধরিয়ে দিলেই হ'ল। সিপাইটা রোজ কেমন চোখে তাকায়। জোব্‌নী এসব বোঝে। ভয় পায়। জোব্‌নীর সাথে আরো মেয়ে থাকে বলে সে তেমন সুবিধা করতে পারে না। শামুকের মতো নিজেকে লুকিয়ে রাখে নিজের ভেতরে। হাতের মুঠি শক্ত থাকলে কার কি করার আছে? সে খাটে খায়। তার মেহনতের কামাই। হারামের পয়সায় তার পেট ভরে না।

কলকাতার ড্রাইভারবাবুটা ট্রাক গাড়িটা ভালই চালায়। জোব্‌নী পাহাড় থেকে ফেরার সময় ঐ নির্দিষ্ট ট্রাকটাতেই ফেরে। শাল বাগানের ধারে নামিয়ে দিয়ে ড্রাইভারবাবু চলে যায়। রেল ইস্টিশনের ধারে তার ভাড়া ঘর। কমা আলোয় রোজই চোখে সুনার ফুলের রেণু মিশিয়ে তাকিয়ে থাকে জোব্‌নী। বাবুটা তাকে জান-ধড়কানোর কথা শুনিয়েছে।

যার জন্য মাঘে পরবে নাচের সময় সে কারোর হাত ধরেনি। খনিসর্দার কুঁয়ার নাচের সঙ্গী হতে চেয়েছিল। বুড়া শালগাছটার তলায় সে তার হাত ধরে পাগল নেশায় টেনেছে। জোব্‌নী যায়নি। ড্রাইভারবাবুকে সেও কথা দিয়েছে। কথা দেওয়া মানে ধরম দেওয়া। সর্বস্য দেওয়া।

এতোক্ষণ সড়কের পাশে করম গাছটায় হেলান দিয়ে জোব্‌নী ড্রাইভারবাবুর কথাই ভাবছিল। দিন রাত এই মানুষটাকে নিয়ে তার এখন স্বপ্ন দেখা। এসব কথা ভাবলে সে প্রায়ই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। চোখ বুজে আসে সুখানুভূতিতে। রুখা শুখা পাহাড় দেশটা মনে হয় সবুজ শ্যামল উপত্যকা। কুঁয়ার ড্রাইভারবাবুকে দেখতে পারে না। তার যত রাগ ঐ মানুষটার উপর। অথচ, মানুষটার কোন দোষ নেই। জোব্‌নী নিজে থেকেই মেনে নিয়েছে ড্রাইভারবাবুকে। ড্রাইভারবাবু এক হাত এগিয়ে এসেছে তো জোব্‌নী দশ হাত। বাপ মারা যাওয়ার পরে বস্তির ঝুপ্‌ড়িতে ঘন ঘন আসত ড্রাইভারবাবু। তখন থেকেই দশ লোকের কানাকানি। হাজার নিষেধ সত্ত্বেও কারও কথা শোনেনি। নেশার ঘোরে সন্ধের পরে, ট্রাক নিয়ে আসত সে। চৌক্‌পোষ্টের ওপিঠে ট্রাক দাঁড় করিয়ে বস্তি বাজার হয়ে সোজা চলে আসত তার ঘরে। কেবল একটু মুখের কথা শোনার জন্য তার এই পাগলের মতো ছুটে আসা।

জোব্‌নী বলেছিল, বাবু, তুমি আর এখানে এসো না। মানুষের কু'কথা আমি সহ্য করতে পারিনে। আমার গা জ্বলে। ড্রাইভারবাবু তখন হাসতে হাসতে বলেছিল, কুকুরের স্বভাব কেবল ঘেউ ঘেউ করা আর বাঁদরের স্বভাব দাঁত দেখান, তেমনি মানুষের স্বভাব পরের পেছনে লাগা। এতে যে হের ফের হবে না তার আর নতুন কি?

ড্রাইভারবাবুর সাথে কথা হয়ে আছে আজকের দিনটাই জোব্‌নীর শেষ হপ্তা গোলামীর দিন। কাল থেকে জোব্‌নী আর খাদের কাজে আসবে না। কাল থেকে সে ড্রাইভারবাবুর ঘরনী। বস্তির ঘরটা ছেড়ে দিয়ে বুড়ি মাকে নিয়ে সে চলে আসবে স্টেশনের বাসাবাড়িতে। প্রায় মাস খানেক ধরে বাসা বাড়িটা সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে বাবু। এমন সুখী জীবনের স্বপ্নে চোখে নিদ্‌ আসে না। এই সুখের কথা মাকে সে এখনও মুখ ফুটিয়ে বলতে পারেনি। কুঁয়ার হাজার টাকা বুড়ি মায়ের পায়ের তলায় নামিয়ে রেখে জোব্‌নীকে ভিক্ষে চেয়েছে। বুড়ি মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কুলুপ এঁটেছে মুখে। মেয়ে যা ভাল বুঝবে সেটাই তার মেনে নেওয়া উচিত। আগের মত সহজ সাদা সিধে যুগ আর নেই। অসহায় মুখ নিয়ে কুঁয়ার ফিরে গিয়েছে তার ডেরায়। যাওয়ার সময় বলেছে, কাজটা ভাল হ'ল না মাসি। পরদেশী মানুষ জলে ভাসা কাঠের মত। সম্পর্কে পচন ধরলে পথে বসে কাঁদ্‌বা।

জোব্‌নী বলেছে—সে আমার বোঝা আমি বইব। নিজের চরকায় তেল দাওগে যাও। পরের পেছনে লেগে কোন লাভ হবেনি।

এরপরে আর কুঁয়ার সেখানে দাঁড়ায়নি। টাকার বাণ্ডিলটা রুমালে বেঁধে নিয়ে ঘাম মুখে হারিয়ে গিয়েছে গলিতে। সেদিন থেকে জোব্‌নী ভেবেছে অনেক। তার শুধু ভাবনাই

সার। কাজের কাজ কিছু হয়নি। ড্রাইভারবাবু বারবারই তাকে হারিয়ে দিয়েছে। তার দিকে সমর্থনের পাল্লাটা ঝুঁকে গিয়েছে। আর সেই ভাবনাতাড়িত মন নিয়ে অসহায় হয়ে গিয়েছে জোব্‌নী। সে জানে, ড্রাইভারবাবুর গোঁ বুনো হাতীর গোঁকেও হার মানায়। যা বলবে তা করে দেখাবেই। তাতে জান যায় যাক। ঠিকেদারবাবুকে পাহাড়ের ঢাল্ খাদে নিয়ে গিয়ে উলটে দিতে চেয়েছিল ট্রাক। শেষে হাতে পায়ে ধরে ঠিকাদারবাবু ক্ষমা চায়। প্রাণ ভিক্ষা মাঙে। রেজা কুলির বিপদ আপদ হলেই নিজের কাজ ফেলে ছুটে আসে ড্রাইভারবাবু। সবাই যেন তার আপনজন। আগে রেশন নিয়ে খনি অঞ্চলে কত ঝুট্‌ঝামেলা হোত। ড্রাইভারবাবু নাক গলাতেই সব ঠাণ্ডা। হপ্তা দেওয়া নিয়ে আর কোন ঝামেলা হয় না। ক্যাশবাবু ঐ লোকটাকে দেখলে কেঁচোর মতো গুটিয়ে থাকে। তার তিড়িং-বিড়িং কথা সব হাওয়া হয়ে যায়। ক্যাশবাবুকে মজদুরের পয়সা মারা নিয়ে খাদে ফেলে বেদম পিটিয়েছিল ড্রাইভারবাবু। জোব্‌নী গিয়ে না ধরলে রডের ঘায়ে রোগা টিং টিংয়ে মানুষটা হয়ত জান হারাত। সেদিন ড্রাইভারবাবুর রাগ দেখে জোব্‌নীও ভেতরে ভেতরে ভয় পেয়েছিল। পর মুহূর্তে ভেবেছিল, পুরুষমানুষের রাগ আর মেয়ে মানুষের লজ্জা হ'ল শরীরের অলঙ্কার। এ দুটো না থাকলে মানুষ আর গরুর কোন ফারাক থাকে না।

আজ চেকপোষ্টে ট্রাক আসে আধ ঘন্টা দেরী করে। ট্রাক্ বোঝাই রেজা কুলি। ঘ্যাচ্ করে ব্রেক কষে ট্রাকটা থামতেই পেছনের ডানা খুলে দিল কুঁয়ার। দু'বার ওঠার চেষ্টা করেও জোব্‌নী যখন উঠতে পারল না তখনই বলিষ্ঠ লোমশ হাতটা বাড়িয়ে দিল কুঁয়ার। বলল, হাতটা ধর। আমি তোরে টেনে তুলব। ভয় পাস্‌নে।

তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে হাতটা সরিয়ে দিল জোব্‌নী। ছেঁচ্‌ড়ে-ছেঁচ্‌ড়ে কোনমতে উঠে এল ট্রাকে। টিফিন ডাব্বা থেকে কিছুটা হাঁড়িয়া চলকে পড়ল সড়কে। লোহা কাঠের ঘষটানীতে ছড়ে গেল বুকের কিছুটা। ঘাম লেগে জ্বলছিল জায়গাটা।

কিছুক্ষণ পরেই গোঁ-গোঁ শব্দে শালবনের ভেতর দিয়ে ছুটে চলল ট্রাক। পাহাড়তলীর পাখিগুলো ভয়ে ডানা ঝাপ্‌টিয়ে উড়তে লাগল আকাশে। ঘূর্ণি হাওয়ায় খসে পড়ল আমলকী গাছের পাতা। রোদ শিরা ছেঁড়া রক্তের মতো ফিনকি দিয়ে অশন গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে নেমে এলে মাটিতে। বড় বেহায়া এই রোদ। কোন বাধা নিষেধ শোনে না।

কুঁয়ার এগিয়ে এসে ক্রুদ্ধ আহাশত চোখে জোব্‌নীর দিকে তাকাল। বুকের ঘাম হাতের তেলোতে মুছে বলল, তোর ভারী দেমাক। এ দেমাক থাকবেনি জোব্‌নী। মানুষের সব দিন সমান যায় না, মনে রাখিস কথাটা।

জোব্‌নী উত্তর না দিয়ে দূরে ধোঁয়াশা পাহাড়টার দিকে তাকাল। রাতের জ্বরের-জড়তা এখন আর নেই। ঘাম্ দিয়ে হাল্‌কা লাগছে শরীরটা। কুঁয়ার একটা চুট্টা ধরিয়ে চলে গেল সামনে। সোমবারী তাকে দেখে শরীর দুলিয়ে হাসছে। রুমালটা দলা পাকিয়ে সে ছুঁড়ে দিল কুঁয়ারের বুকে। সেই ঘাম ভরানো রুমালে চুমা খেয়ে ট্রাকের পাটাতন থেকে লোহাধুলো তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল সোমবারীর দিকে। দু' চোখে হাত ঢেকে শরীর

দুলিয়ে চিহড়লতার মতো হেসে উঠল সোমবারী। মেয়েটার নষ্ট হ্যাংলামী খাদের সবাই জানে। ভাতার খেদানো মেয়েটা এখন ফি-মাসে মরদ পাল্টায়। দেখেশুনে গা জ্বলে গেল জোব্‌নীর। মেয়েরা পাঁচুয়া হাঁড়ির বাখর বড়ি। তারা পচা ভাতের মতো অতো সস্তা নয়। সোমবারীকে হাজার বোঝালেও বোঝে না। বাটি বাটি হাঁড়িয়া খেয়ে সে মরদগুলোর সাথে মাতলামী করে। খাদটার ওপিঠে গিয়ে শরীর জুড়িয়ে ফিরে আসে। এসব কাজে মেয়েটার কোন ভয় ডর নেই। সররকারী হাসপাতালে টাকার লোভে সে পেট কাটিয়েছে, তার আর কোনদিন সন্তান হবে না।

জোব্‌নীর মনটা সোমবারীর টুকরো টুকরো কথায় বিষিয়ে উঠছিল। মেয়েটার হাসি পচা মৌলফুলের চেয়েও ফ্যাকাসে তবু জোর করে হাসছে। চোখের পুত্‌লি নাচিয়ে কথা বলাটাও অসহ্য। মেয়ে গতর কি এতোই সস্তা? চোখ ঘুরিয়ে নেয় জোব্‌নী। এদের থেকে পালিয়ে গিয়ে এই বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ছট্‌ফটিয়ে ওঠে তার মনটা। ড্রাইভারবাবুর সাথে মেলামেশা হওয়ার পর থেকে জোব্‌নী যেন নিজেকে একটু অন্যরকম ভাবে। লোহাখাদের হপ্তা গোলামী ছাড়া সে আর নিজেকে তেমন বেশি এই সমাজের সাথে জড়ায় না। কারোর দোরে ঘুরতে গেলে সবাই তার বয়ে যাওয়া নিয়ে জ্বালাতন করে মারে। কুঁয়ারটা বস্তিশুদ্ধু রটিয়ে বেড়িয়েছে—ঠিকেদারের ড্রাইভারের সাথে জোব্‌নী নাকি ঘুরতে গিয়েছিল ছোট ঝোরাটার কাছে। ড্রাইভার নাকি কচড়া তেল নিংড়ানোর মত জোব্‌নীর সব কিছু নিংড়ে নিয়েছে।

তার বাপ বীর সিং বলত—বিটিরে হপ্তা গোলামীর শেষ নেই। আমাদের খুন পসিনা, পাহাড়-জঙ্গলে হপ্তা গোলামীর মু'বাজা। কে যে বাজায় আমরা তা জানিনে। পেটের দায়ে শুধু ছুটে যাই। দু' চারটে টাকার জন্য প্রাণপাত করে খাটি। তবুও তো দু' বেলা হাঁড়িয়াও জোটে না। এ দুঃখের কথা কাকে বলি বল্?

বাপটা ঠিকেদারের হপ্তা গোলামীর থেকে নিস্তার পেতে চেয়েছিল। এমন ক্রীতদাস সুলভ জীবন ভাল লাগত না তার। বাপটা বড় দিল্ খোলা মানুষ ছিল। চাঁদনী রাতে গাশুি রুতু (আঁড় বাঁশি) নিয়ে চলে যেত থোকা থোকা হলুদফুল ফোটা সুনার গাছটার গোড়ায়। রুতুতে (বাঁশিতে) ফুঁ দিয়ে ফাগুন মাসের বনভূমি কাঁপিয়ে করুণ একটা সুর খেলত পাহাড়তলীর চারধারে। সজিনাফুল জ্যোৎস্নায় সেই করুণ কোমল সুর ঝর্ণার ঢলের মতো গড়িয়ে যেত স্বাধীনভাবে—যেখানে হপ্তা গোলামীর দীর্ঘ নিঃশ্বাসের কোন যোগসূত্র ছিল না। জোব্‌নী অনুভব করত, তার বাপের সেই স্বাধীন উদারচেতা সত্ত্বাটাকে। বস্তির জীবনে যার কোন মূল্য নেই। গাশুি রুতুটাকে ফেলে তার বাপ বুকে পাথর নিয়ে মরল। বাপের সেই রক্তমাখা থেঁতলান বুকের উপর আছাড় খেয়ে কেঁদেছিল জোব্‌নী। সেদিন সেই দুঃসময়েও কুঁয়ার তাকে পশুর চোখে দেখ্‌ছিল। কৃত্রিম শোকের হাওয়া উড়িয়ে হাত ধরতে চেয়েছিল তার। সেদিনের সেই ভাণ-ভণিতার হাতটাকেও সরিয়ে দিয়েছিল জোব্‌নী।

হপ্তাগোলামী থেকে মুক্তি চেয়েছিল বাপ। গাশুিরুতু, জোব্‌নী, লারানী, ঝুপড়ি ঘর,

খনি-খাদ সব ফেলে ঐ ধোঁয়াশা মেঘের আড়ালে কোথায় যেন লুকিয়ে গেল বাপটা! শত ডাকেও সাড়া মেলে না আর। শোকধ্বনি প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসে। বুক ভরে যায় বিষাদে। জমি-জমা থাকলে খনি-খাদে কোনদিনও পাথর ভাঙতে যেতো না তার বাপ। পাথর ভাঙার কাজে বুক ভেঙে যায়, ভার বইতে বইতে কোন ফাঁকে মেরুদণ্ডটা ঝুঁকে যায় ঠিকাদারের পায়ে। খনি অঞ্চলের সবাই বলে, যতদিন পাহাড়, ততদিন আহার। যতদিন তাগদ ততদিন নগদ। হপ্তাগোলামী শির ঝুঁকানো সেলামী।

খনি-খাদে খাটতে খাটতে ঝুলকালি হয়ে গিয়েছিল বাপটার শরীর। খাটনীর অনুপাতে খাবার-খাদ্য মেলেনি। তিনটে পেট তাকিয়ে থাকত একটা আয়ের দিকে। বর্ষায় খাদে জল জমে। ঘরে বসে দিন কেটে যায়। তখন হাঁড়িয়া পানিও মেলে না। মাণ্ডিয়া রোটি, তোল্- সেদ্ধ যোগাড় করতেই প্রাণপাত হয়ে যায়। খনি এলাকা তখন হাহাকারের এলাকা। অসময়ে দাদন দিয়ে ঠিকেদার কিনে রাখে মানুষের মাথা। সেই মাথা গরম হাওয়া বইলেই ঝুড়ি ঝুড়ি খনিজ লোহা-পাথব তুলে আনে পাহাড় পাথর ফাটিয়ে। চক্রাকারে ঘুরতে থাকে নিপীড়িত জীবন-যাপন। ছোটবেলা থেকেই জোব্‌নী দেখছে এই জীবনধারার কোন পরিবর্তন নেই। খাদ যেন অহরহ মানুষগুলোকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। সেই ডাককে অগ্রাহ্য করার হিম্মৎ কারোর নেই। পাহাড় কাটতে গিয়ে কোন ফাঁকে মানুষগুলোও পাহাড়ের মত নির্দয় হয়ে যায়—এ হিসাব এখনো মেলাতে পারেনি জোব্‌নী। বাপের জন্য তার কষ্ট হয়। বাপের মরা মুখটা মনের কোনে ঘাই দেয়।

ট্রাক ছুটছিল সাঁই সাঁই করে হাওয়া কেটে, ধুলো উড়িয়ে। জোব্‌নীর চুল উড়ছিল পাহাড় ডিঙানো হাওয়ায়। চোখে-মুখে ছাঁট লাগছিল উড়ন্ত ধুলোবালির। খস্‌খস্ করছিল মুখের চামড়া। এক ধরণের রুক্ষ্মতায় ভরে উঠছিল—গা-হাত-পা। মন ভাল না থাকলে চারপাশের স্বচ্ছ সৌন্দর্য খারাপ দেখায়। রোদের যা দাপট তাতে দুপুর অব্দি কাজ চালানোই বিরাট ঝামেলার। এই সাতসকালে রোদের দাপটে পিচ গল্‌ছে রাস্তার। চ্যাট্ চ্যাট্ করে তরল পিচের উপর গড়িয়ে যাচ্ছে চাকা। ট্রাকটা বাঁক খেতেই ময়ূর টিপিটা নজরে পড়ল জোব্‌নীর। অমনি সুখের শিহরণে চল্‌কে উঠল মন। পাহাড় ভেঙে বৃষ্টি নেমেছিল সেদিন। বৃষ্টিতে পাহাড়ী পথ সাপের পিঠের চেয়েও পেছল। দু'পাশের বনাঞ্চল ধুয়ে যাচ্ছিল অসময়ের বৃষ্টিতে। খালি ট্রাকে জোব্‌নীকে মাঝপথে তুলে নিয়েছিল ড্রাইভার। বলেছিল, আমি তোমার শত্রু নই, বন্ধু। দু'দিন পরে তুমি যার ঘরের রাণী হবে আজ তার পাশে বসলে তোমার মান যাবে না।

ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে পাল্লার দিকে সেঁটে বসেছিল জোব্‌নী। যেন বেগতিক দেখলেই পাল্লা খুলে ঝাঁপিয়ে পড়বে নিচে। ড্রাইভারবাবু তার কোন অসম্মান করেনি। টিপিটার সামনে আসতেই ড্রাইভারবাবু তার কাঁপা হাতটা ছুঁয়ে দিয়েছিল আবেগে। হাতটা সরিয়ে নিতে গিয়েও সরিয়ে নিতে পারেনি জোব্‌নী। আঠার মতো সেঁটে গিয়েছিল হাতটা। থর থর করে কাঁপছিল ভীতু হরিয়াল চোখ। বাইরে তখন দুটো ময়ূর বৃষ্টিতে পেখম মেলে ভিজছে। ষ্টার্ট বন্ধ করে ড্রাইভার বলেছিল, দেখ, দেখ কি সুন্দর ময়ূর দুটো!

আমরা যদি ওদের মতো হতাম!

ভবিষ্যৎভাবনার আবেশে চোখ বুজে এসেছিল জোব্‌নীর। চট করে কথা বলতে পারেনি। চোখ ভিজিয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ছুঁয়ে দিয়েছিল ড্রাইভারবাবুর হাত। পাহাড়ের মাথার উপর মেলে ধরা কালো শাড়ির মতো তখন উড়ে বেড়াচ্ছিল কৃষ্ণকায় মেঘ। সেই মেঘ এত নিষ্ঠুর, ভয়াল, ভয়ংকর যার দিকে তাকালে ভয়ে ছোট হয়ে আসে মন।

লোহাখনিতে কাজের শেষ নেই। গাঁইতি বেল্‌চার ধাতব শব্দে মুখরিত চারপাশ। খাদে নামার আগে জোব্‌নী খোঁজ নিয়েছিল ড্রাইভারবাবুর। খুব সকালে ট্রাক বোঝাই লোহা পাথর নিয়ে রেল-ইস্টিশানে বেরিয়ে গিয়েছে সে। ফিরতে বিকেল গড়াবে। রেলইয়ার্ড থেকে আজ লোড করা হবে মালগাড়ি। সেখানেও কুলি-কামিনের ভিড়। প্রায় শ'খানেক রেজা কুলি দিনরাত ঝুড়ি ঝুড়ি লোহা-পাথর ভরছে ওয়াগনে। ভরা ওয়াগন যাবে স্টিল প্ল্যান্টে। ঠিকেদারের চারখানা ট্রাক রোজ এ লাইনে বার তিনকে যাওয়া আসা করে। খনিজ লোহা খাদ থেকে স্টেশনে বয়ে নিয়ে যায় ট্রাকগুলো। রেল ইস্টিশান আট মাইলের পথ। এই যাওয়া-আসা, মাল্‌ বোঝাই, মাল নামানো, ওয়াগন ভরা সবই ঠিকেদারের দায়িত্ব। বছরের প্রথম থেকেই কাজের ঠিকে নেয় তারা। সরকারীবাবুদের সাথে ঠিকেদারের লোকের কোন সম্বন্ধ নেই।

শেষ ঝুড়িটা কোন মতে বয়ে আনতেই ঘাম ছুটে যায় জোব্‌নীর। কুঁয়ারের চ্যালা-চামুণ্ডারা শয়তানের গাছ। লোহা-পাথর তার ঝুড়িটায় বেশি বেশি করে ভরে দেয়। এসব তাদের ইচ্ছাকৃত বদ্‌মায়েশি। কাজের ফাঁকে দু'তিনবার জল খেয়ে গলা ভিজিয়েছিল জোব্‌নী। কুঁয়ারের লোক এসে তাকে ধমকে গেছে। বলেছে, কাজে ফাঁকি দেওয়া? দাঁড়া বাবুর কাছে বলচি! কুঁয়ার নিজেও এসেছে। তার জ্বর-জ্বালা চোখ-মুখের অবস্থা দেখে দরদ দেখিয়ে বলেছে, যা, আজ তোর ছুটি। ঘর যা। ঘরে গিয়ে আরাম লে।

কুঁয়ারের কথা কানে তোলার অর্থ—কুয়োর জলে ঝাঁপিয়ে পড়া। শেষ দিনে সে কারোর দয়া চাইবে না। কুঁয়ার তবু বলেছিল, তোর শরীল খারাপ। মিছিমিছি কেন কষ্ট করবি। ঘর যা। আমি ঠিকেদারবাবুকে বলে দেব। মুজুরী কাটবে না।

জোব্‌নী তার কথায় গলে যায় নি। চোখ-মুখ শক্ত করে বলেছে, খনি-খাদে আজ আমার হপ্তা গোলামীর শেষদিন। আজকের মতো যা বলার তুমি বলে নাও। কাল থিকে আর বলতে পাবা না।

—তার মানে?

—মানেটা খুব সহজ। কাল থিকে আমি আর কাম-ধান্দায় আসবোনি।

—কুথায় যাবি?

—দেখি, কুথায় যাওয়া যায়।

আসল কথাটা নিজের ভেতর লুকিয়ে রেখেছিল জোব্‌নী। আজব কোন জন্তু দেখার চোখে তাকিয়ে ছিল কুঁয়ার। তার সেই পলকহীন হাবা-গোবা চোখের দিকে তাকিয়ে হাসি চাপতে পারেনি জোব্‌নী। ঠোঁট টিপে বলেছিল, বিশ্বাস হলোনি তো! ঠিক আছে

বেলা গড়াক। তখন টের পাবা—সত্যি না মিথ্যে।

সজারু মাংসের চাট্ দিয়ে জোব্‌নীকে হাঁড়িয়া খেতে ক্যানটিনটার পিছু পানে ডেকেছিল কুঁয়ার। জোব্‌নী যায়নি। সোমবারী তার পিছ্ পিছ্ গেল। যাওয়ার সময় ঠোঁট উল্টে তাচ্ছিল্য করে বলল, কাকের গায়ে ময়ূরের পালক—দেখা যাক কি করে ময়ূর হয়?

কথাটায় আহত হ'ল জোব্‌নী। তাকে নিয়ে খনি অঞ্চলে এ ধরণের ঠাট্টা এখন মুখোরোচক চাট্। ড্রাইভারবাবুর নাম জড়িয়ে সহলীরা কত কথা যে বানায়! সব শুনে গা জ্বললেও চুপ করে থাকতে হয়। লোকে যা বলে, তার সবটা তো মিথ্যে নয়। সমাজের লোক ছেড়ে সে পরদেশী এক পুরুষের প্রেমে মজেছে—এটাই যেন তাদের অসন্তোষ আর বিতৃষ্ণার মূল কারণ। কেউ-ই সহজ ভাবে মেনে নিতে পারে না এই মেলামেশাকে। তাদের ভাব ভালবাসা যেন সবার চক্ষুশূল।

দমে যাওয়ার মেয়ে নয় জোব্‌নী। সবার কথা সে সহজ ভাবে নেয়। নিজের জাতের মানুষগুলোর অতৃপ্ত দীর্ঘশ্বাস তাকে কখনো ব্যাকুল করে না। অন্য পরিবেশে বেড়ে ওঠাটা পাপের নয়। যারা তাকে কৃমিকীট ভাবে ভাবুক। সে একটা পরদেশী মানুষের কাছে পেখম তোলা ময়ূরের চেয়েও সুন্দর। যে তাকে মর্যাদা দেয়, ভালবাসে, সম্মান করে—নিজের করে নিতে চায়, তার কাছে সে উইঢিপির উইয়ের মতো লুকিয়ে রাখবে না নিজেকে। উদার আকাশের মতো সে মেলে ধরবে তার সুখ-দুঃখ, হাসি-আহ্লাদ। পরদেশী সেই মানুষের কাছে আর কোন গোপনীয়তা নয়, লজ্জা-সংকোচ নয়।

ড্রাইভারবাবু বস্তি বাজারে সাঁঝ লাগার মুখে ট্রাক নিয়ে অপেক্ষা করবে। এমন সিদ্ধান্ত দু'জনে মিলেই নিয়েছে। ইষ্টিশনের বাসা-ঘরে যাওয়ার আগে মায়ের কাছে রেশন, টাকা-পয়সা দিয়ে যাবে জোব্‌নী। পরে এক সময় এসে মাকে নিয়ে যাবে। যাওয়ার সময় মাঘ পরবের মেলায় কিনে দেওয়া ড্রাইভারবাবুর সেই ঝলমলে শাড়িটা সে পরে নেবে। ঐ লাল চিকচিকানো রং ঝলমলে শাড়িটা পরলে তার রূপ-যৌবন রোদ পড়া জামুন পাতার চেয়েও সুন্দর দেখায়। তখন হা-মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে ড্রাইভারবাবু। তার চোখের ভাষার নরম ছোঁয়ায় খুশির বন্যা বয়ে যায়।

বাপ যা পারেনি মেয়ে হয়ে সে তা করে দেখাবে। হপ্তাগোলামীর থেকে নিষ্কৃতি চেয়েছিল বাপ। মৃত্যু অব্দি চেষ্টা করেও তা পায়নি। বিফল হয়েছে। পেটের মতো শত্রু আর কেউ নেই। এই মহাশত্রুকে সামাল দেওয়াই একটা জোয়ান মরদের জীবনভর লড়াই। এই লড়াইয়ে কেউ হারে, কেউ জেতে। হার-জিৎ নিয়েই জীবন। একটা নোংরা নালা থেকে জোব্‌নী যেন নদীতে মিশছে—এমন তরতাজা হাসি ফুটিয়ে সে ক্যাশবাবুকে বলল, বাবুগো, খাতা থেকে আমার নামটা কেটে দিন। কাল থিকে আর আর কাজে আসবোনি। জোব্‌নীর কথা শুনে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়েছিল ক্যাশবাবু। তার চোখ দুটোয় বিস্ময়ের ঘন মেঘ। মেয়েটা বলে কি? বুকের পাটা তো কম নয়? খনি-খরা এলাকায় থেকে একথা বলার সাহস ক'জনের আছে?

টাকাটা গুণে নিয়ে জোব্‌নী আর দাঁড়ায়নি। খনি-খাদ থেকে উঠে এসে বড় হালকা

লাগছিল নিজেকে। ঠোঁটটায় অকারণে হাসির ছোঁয়া, বুকের ভারী পাথরটা নেমে গিয়ে খলখলানো স্রোত। চন্দনা পাখির মতো শিস দিয়ে বাতাস ভরিয়ে দিতে ইচ্ছে হল তার। হপ্তা গোলামীর শিকল ছিঁড়ে সে যে এমন মুক্তির আস্বাদন পাবে, আবার যে নতুন করে বেঁচে উঠবে—এসব যেন দিনের আলোয় বিশ্বাস হয় না।

শালবন থেকে পালিয়ে আসে হাওয়া। সেই হাওয়া ঘাম শুষে নেয় শরীরের। মুক্তির আনন্দে পাহাড়তলী, শাল-গামারের বন রোদ শুষে নিয়ে বিছিয়ে দিয়েছে স্বল্প আলোর বিছানা। টিকাল পাহাড়ের কোলে রামধনু ফুটেছে বনভূমির অপার সুন্দর শরীরের সীতাহার হয়ে। রঙের ছটায় ফাগুন ভাব জমিয়েছে গাছে-গাছে, পাতায়-পাতায়। মিষ্টি একটা সুবাসে ছেয়ে আছে খনি অঞ্চলের বাতাস। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুক ভরে শ্বাস নিল জোব্‌নী। কাল থেকে সে আর কাজে আসবে না—এই ভাবনাটা তার শিরায় শিরায় ছড়িয়ে দিল হাজার ঝর্ণার শিহরণ। মুখের তেতো ভাবটা নিঃশেষিত হয়ে সে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। এখন থেকে তার কোন অসুখ নেই। সে আকাশে ডানা মেলে দেওয়া স্বাধীন পাখি। তার মন ড্রাইভারবাবুর হৃদয়খাঁচায় আত্মসমর্পণের জন্য আকুলি-বিকুলি করছে।

বস্তি বাজারে এসে সে একটা মিঠা পান খায়। ঠোঁট রাঙিয়ে আপন খেয়ালে হাসে। আজ আর বাড়ি ফেরার কোন তাড়া নেই। আজ সে একা নয়, দোকা। আঁধার পথে বিপদ আসলে, ড্রাইভারবাবু ছাতি ফুলিয়ে সামলাবে এবার থেকে।

হরিতকী গাছে হেলান দিয়ে সে যখন সুখের কথা ভাবছিল, তখনই বস্তি বাজারে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে এল খনি হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স। আশপাশের লোক সব হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার গায়ে। চোখের পলকে সার্কাসের তাবুর মতো ভরে উঠল জায়গাটা।

কুঁয়ার তাকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল সামনে। বলল, ময়ূর টিপিটার কাছে ট্রাক উল্টে জখম হয়েছে ড্রাইভার। তার পা দুটো একেবারে আলু ছ্যাঁচা। কেটে বাদ না দিলে জানে বাঁচবেনি।

ঠোঁট কামড়ে ভয়ার্ত চোখে তাকায় জোব্‌নী। এগিয়ে যাবে তেমন ক্ষমতাও যেন তার নেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝড়ে বিপন্ন চিহড়লতার মতো কাঁপছিল সে।

কুঁয়ার পরম নির্ভরতায় জোব্‌নীর হাতটা ধরল। দুঃখী গলায় বলল, সবই ভাগ্য। ড্রাইভারের দুটো পা' না থাকলে তার বেঁচে থাকা না থাকারই সমান।

কুঁয়ার ভেবেছিল জোব্‌নী হয়ত বিপদের সময় তার হাতটা আঁকড়ে ধরবে বিকল্প অবলম্বন ভেবে। কিন্তু পাহাড় দেশের মেয়ে জোব্‌নী কঠিন পাথর চোখে তাকাল। কুঁয়ারের লোমশ হাতটা ঘেন্নায় সরিয়ে দিয়ে সে গাড়িটার দিকে ছুটে গেল।

ড্রাইভার দু'পায়ে মারাত্মক জখম নিয়েও পুরোমাত্রায় হুঁসে ছিল। জোব্‌নী সামনে দাঁড়াতেই থর থর করে কেঁপে উঠল তার সমস্ত শরীর। শরীর ভাঙা কান্নার তোড়ে জোব্‌নী বলল, এখন আমাদের কি হবে বাবু? হপ্তাগোলামীর খাতা থেকে আমি যে নাম কেটে দিয়ে এলাম।

ড্রাইভারবাবু ধীর-স্থির চোখে জোব্‌নীর দিকে তাকাল। খাঁচা পালান পাখির মতো

ভয়ে কুঁকড়ে আছে জোব্‌নীর চোখ। ভবিষ্যৎ চিন্তায় কালো হয়ে গিয়েছে সুনার ফুল মুখ।

কুঁয়ার এগিয়ে এসে বাহাদুরীর গলায় বলল, ভাবিস নে জোব্‌নী। কালই আমি হপ্তা খাতায় ফের তোর নাম তুলে দেব। হাজার হোক তুই আমার স্বজাতের মেয়ে!

যন্ত্রনায় নীল হয়ে যাচ্ছিল ড্রাইভারবাবুর জখমী শরীর। দাঁতে দাঁত ঘসে সে কুঁয়ারের দিকে আগুন উগ্‌রে তাকাল। জোব্‌নীর নরম হাতটা নিজের হাতের মুঠোয় এনে কর্মক্ষম গলায় বলল, দরকার হবে না। পা দুটো গেলেও হাত দুটো আমারএখনো অক্ষত আছে। এই স্টিয়ারিং ধরা হাত দিয়ে আমি তোকে আগলে রাখব। পরম নির্ভরতায় চোখ বুজে এল জোব্‌নীর। চোখের জলে ঘামের গন্ধ পেল দু'জনেই।

আগোলদার

অন্ধকারে পথ হাঁটছিল ধর্মপদ আর জিতুয়া।

কিছুটা এসেই পথ ফুরিয়ে শুরু হয় জঙ্গলের দুয়ার। দুজনেই বনের ভেতর ঢুকে এসে তরাস চোখে তাকায়। ধর্মপদ ভয় তাড়াতে বার দুই কাশে। কাঁধের গামছাটা বাঁ কাঁধ থেকে ডান কাধে ফেলে আঁধারের দিকে তাকায়। আঁধারের কোনো রূপ ছিল না, শুধু পচা পাঁক! দল বেঁধে নেমে আসা বুনো হাতির কুচকুচিয়া আঁধার। গাছপালার দম নেওয়া ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই জগতে। আকাশটা উল্টানো কড়াই, সাদা পাথরের চুমকি ছিল না তাতে।

কিছুটা এগিয়ে আবার থমকে দাঁড়ায় ধর্মপদ। শীতের হাওয়ার ঝট্‌কা বড় কাতর ক'রে তোলে তাকে। দাঁতে দাঁতে লেগে যাওয়ার উপক্রম। হাতে টিমটিম করে জ্বলে একটা ডিম লাইট। আলোটা কুসুম রঙা। শুধু পথ দেখা যায় আর কিছু নয়। শীত পড়লেও এ অঞ্চলে সাপ-খোপের উৎপাত আছে। তাছাড়া পাথুরে পথ। দাঁতাল হা-মুখ নিয়ে শুয়ে থাকে পাথর। বেকায়দায় পা পড়লে আর রক্ষে নেই, একেবারে রক্তারক্তি। থ্যাতলান মাংস। কন্‌কনায়, শুলোয়। রস কেটে ছ্যাঁচা জবাফুলের মত পচতে থাকে মাংস। এক কথায় হিতে বিপরীত।

দ্রুত হাঁটছিল ধর্মপদ, তার একটা পা খোঁড়া। ফলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, লেংচে লেংচে পথ চলতে কষ্ট হচ্ছিল। মাঝে মাঝে হাওয়ায় কেঁপে যাচ্ছিল ডিবরির শিখা, দাপনার আড়াল দিয়ে বাতিটার ধুকপুক জীবন বাঁচাচ্ছিল সে। রাঁধাবাড়ার কাজ সারতে আজ অনেক দেরি হয়। একলা হাতে হাঁড়িশালের কাজ চটপট হয় না। জিতুয়াটা হা-ডু-ডু খেলে এসে ঘুমাচ্ছিল মোষের মত। ছেলেটা ভাত রাঁধতে জাউ করে ফেলে ভাত। ফেন ঝরাতে হাত পোড়ায়। এই ফাল্গুনে ছেলেটা একুশে পড়ল তবু যদি একটু হুঁস থাকত। নানা কারণে ধর্মপদর সুখ নেই। ডিবরির শিস বাড়িয়ে সে আর একবার পিছন ফিরে তাকায়। ছেলেটা ঘুমের ঘোরে হাঁটছিল। আসার সময় কাঁচাঘুম থেকে তুলে এনেছে তাকে। নিরঞ্জন মোড়ল কড়া ধাঁচের লোক। কাজে ফাঁকি দিলে তার হাড়পিত্তি জ্বলে। মানুষটার মন সন্দেহে ভরা। নিশুতি রাতে তিন ব্যাটারির টর্চ নিয়ে সে পশ্চিম বাঁধের কোলে কোলে ঘোরে। সন্দেহ হলে সিধা গাছপানে ফোকাস মেরে দেখে। মাচানে থাকলে ভাল নাহলে পরের দিনের রাত উজগার মেহনতটাই বাদ। তাই দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছিল ধর্মপদের পা। রাত বলেই গতি স্বাভাবতই কম। রাতে সে ভাল চোখে দেখে না। বয়স বাড়ার পর থেকেই ডিমার দু'পাশে খয়রেটে আংটি। লোকে বলে, ছানি পড়েচে বুড়াটার।

ও আবার আগোলদার, হুঃ!

লোকের কথা কানে তোলে না নিরঞ্জন মোড়ল। সে বলে, পুবনো চাল ভাতে বাড়ে। বুড়া হাড্ডির তাগৎ বেশি।

এক কথায় কথার দফা-রফা। ধর্মপদ জানে, এখানেও বাবুর চতুর চাল। সে বুড়া হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু ছেলে তো জোয়ান। তার চোখ সাফা, মাথায় বুদ্ধিও আছে। গতরটায় দশটা মোযের শক্তি। এমন জোয়ান আগোলদার গাঁঘরে কটা আছে? বাপের ঘাটতি ছেলেই পুষিয়ে দেয। এমন ক্ষেত্রে কোনো কথাই চলে না। নিরঞ্জন মোড়ল নিশ্চিন্ত। পশ্চিম বাঁধের ক্ষেতগুলোতে হাতি কেন, একটা চোর-ছ্যাচ্চোরও ঢুকতে সাহস পায় না। জিতুয়ার ডাকে মাঠ কাঁপে। জঙ্গলের হাওয়া থেমে যায়। বুনো হাতির দলগুলো পাহাড়ী ঢলের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাবে, ফিরে যাবে কিনা। জিতুয়া একাই একশ। এ গাঁয়ের লোক জানে, আঁধার রাতেও চোখ জ্বলে ছেলেটার। হাতের নিশানাও অব্যর্থ। মাঠ-জাগালীর কাজে জিতুয়া থাকলে ভয়-ডর কম। তবে ছেলেটার জেদ ভুবনছাড়া। পার্বতীর নিষেধ সে শুনত না। ধানে রঙ ধরলে তার মন আর ঘরে বসে না। ছট্‌ফটায়। ছেলের এক-গোঁ দেখে মুখ ভার করে পার্বতী, কথা বলে না। তার স্বভাব পাথর নয়, ভুকুটিলা। অল্প আঘাতেই মনের জোরটা পলকা কচুডাঁটি। বউটা অসময়ে বাতি নিভিয়ে সংসার আঁধার করে মহারানীর মত চলে গেল। বুড়া গাছের কোটরে এখন শুধু কেউটে সাপের আঁধার।

যত এগোচ্ছিল, তত চেপে আসছিল বন। তীব্র হচ্ছিল ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ডাক। ঘন বনের দাঁত থাকে, হা থাকে, ক্ষিদে থাকে। বাগে পেলে বন মানুষও খায়। খুন চোষে। এতদিনের যাতায়াতে এসবই ধর্মপদর অভিজ্ঞতা। জিতুয়াটা সাথে থাকলে তার সাহস আকাশছোঁয়া। বনকে বলে, তু কে রে? আমি সব। আর হাতিগুলো হাতি নয়, চুহা! কলজেয় এক ফোঁটা ভয় নেই, চওড়া ছাতি, ল্যাংড়া পায়ে ছোটার মত করে হাঁটে। সাহস একেই বলে! সাহসের নাম জিতুয়া।

ছেলে বড় হলে বাপ হয়ে যায় ছেলে। ছেলে ঘরের আগোলদার। কর্তা। জিতুয়া আগোলদার, ধর্মপদ আগোলদার। একজন ঘর বন ক্ষেত সামলায়। অন্যজন শুধু নিজেকে। কুসুমগাছের ওমে দাঁড়িয়ে ডিবরি দুলিয়ে ধর্মপদ পিছিয়ে পড়া জিতুয়াকে ডাকে। পাতলা কাচ ভেদ করে আলো ঠিক্‌রায় জঙ্গলে। ধর্মপদ বোঝার চেষ্টা করে বনের ভাষা। আঁচ করে, বিপদ আছে কিনা। বিপদের গন্ধই আলাদা। বিপদের হাওয়াই আলাদা। ডিব্‌রি জ্বলে। গমগমিয়ে ওঠে জিতুয়ার গলা, আগে বাড়—

ধর্মপদ এগোয় না, দাঁড়িয়ে থাকে। হাতের লাঠিটায় থুতনি চুবিয়ে জিরেন নেওয়ার ঢঙে দাঁড়িয়ে থাকে। হাওয়া এসে তাকে ছোঁয়। চিহড়লতা তাকে ছোঁয়। পায়ের চাপে পিষে যায় গেঁধাপাতা। জিতুয়া বলে, চল্ বাপ, খপ্ খপ্ চল্।

তাড়া ধর্মপদরও আছে। মোড়লের কথা তার সহ্য হয় না, মরে যেতে ইচ্ছে করে।

জিতুয়া বলে, মরব কেন? যতদিন পারি দাপিয়ে বাঁচব। মোড়লমশাই কে? উটা

তো চামার। চামারের কথা গায়ের পোকা ঝাড়ার মত ঝেড়ে দে—

ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বিলকুল বোকা বনে যায় ধর্মপদ। জিতুয়ার চোখে মোড়লমশাই কৃমি-কীটের মত। ইদানীং একটা দোনলা বন্দুক নিয়ে বিকেলবেলায় মাঠ দেখতে আসে মোড়লমশাই। ডাকপাখি নয়, উড়ুলপাখি নয়—বনচটুই মারে ছররা গুলিতে। বাহাদুরী গলা হুক্রে বলে, এম্ দেখলি! এক গুলিতেই তিনটা!

জিতুয়া চটে না। সে হাতের গুলতি তাক করে পটাপট্ ঘাড় উলটে দেয় পাখিগুলোর।

নিরঞ্জন মোড়ল অবাক, চোখ গহীরাতলা। বন্দুক নামিয়ে মুখের দিকে তাকায়। জিতুয়ার গম্ভীরর গলা, আমার চাম-ভেঁটুল, তুমার বন্দুক। দরকার পড়লে ভেঁটুল টোটা হয়। ঢেলামাটিও পাথর হয়। পাথরও দেবতা হয়।

হাওয়ার শিসে শ্যামের বাঁশী নয়, রাবণের হাসি। শীত মিশে গাঢ়ত্ব বেড়েছে কুটিল হাওয়ার। লোকালয়ের বাতিগুলো জঙ্গলের মাঝখান থেকে চোখে পড়ে না। উঁচু লম্বা গাছগুলো বিলীন ক'রে দিয়েছে নদীর ধারের চালাঘরগুলোকে। এবারও খরানিতে নদী শুকিয়ে জলকষ্টে ধুঁকল, গাঁয়ের বউ-ঝিরা বালি খুঁড়ে জল আনত নদীর মাঝ থেকে। এমন দুর্দিনে নিরঞ্জন মোড়লের বড় ছেলে গাঁয়ের ভাঙা চাপাকলটার নাট-বল্টু খুলে পাচার করে দিতে চেয়েছিল লোহাওয়ালার কাছে। তার মদ-মহুয়া খাওয়ার পয়সার অভাব। জিতুয়া তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে অমাবস্যার রাতে। হিড়হিড়িয়ে টেনে নিয়ে যায় মোড়লের বাড়িতে। মোড়লের মুখ তখন শিকড়ের গন্ধে মাথা নোয়ানো জাতসাপ। কাঁচুমাচু মুখে বলেছে, ছেড়ে দে জিতু। তুরে আমি বক্‌শিস দিব। ছেলেটা আমার পাঁঠা। খালি অন্ন ধসায়। উরে আমি ভগবানের নামে উৎসর্গ করেচি—

বন বেশিদূর এগোয় না, এগোলেও বনের শেষ আছে। খাড়া পথটা লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে আসে ধর্মপদ। আর পোয়াটাক পথ হাঁটলেই চাতরা জল। জল পেরোলেই পশ্চিম বাঁধের শুরু। তখন চোখ খুললেই শুধু ধানক্ষেত আর ধানক্ষেত। ভোজনা, গয়াবালী, সীতাশাল, কলমকাঠি—কত রকমের যে ধান! আলের নিচেই মা লক্ষ্মীর দুধের গতর। ঘুমে জড়িয়ে আসা চোখ, হাইতোলা নিদ্রাতুর মুখাবয়ব। কি মায়া যে ঐ পলকা কাঁচা সোনা ধানে! শিস যেন কচি হাতের সুড়সুড়ির দেওয়া আদর। ধর্মপদর পা ভিজে যায় শেষ শরৎ-এর শিশিরে।

ফি-রাতে ডাঙা ভুঁইটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বুকটা টাটিয়ে ওঠে যন্ত্রণায়। যন্ত্রণাটা ছেলের সামনে লুকাতে চায় ধর্মপদ। শ্যাকুলগাছের কাঁটায় জড়িয়ে যাওয়া ধুতির মতন যন্ত্রণাটা পেঁচিয়ে থাকে শরীরে। পাতলা রক্তে রাগের আঁচটা উসকে ওঠে তখন। শুয়ে থাকা, দাঁড়িয়ে দোল খাওয়া হেসে কুটিকুটি হয়ে লুটিয়ে পড়া মাঠ ভর্তি ধানগাছগুলো বাপ-ঠাকুরদার কথা মনে করিয়ে দেয়। ডাঙা ভুঁইটা নিজের দখলে রাখতে পারেনি সে। বন্দক দিয়েছিল পেটের তাগিদে। আর ছাড়াতে পারেনি। আসলের চেয়ে সুদ বেড়ে হয়েছে তিনগুণ। টিপছাপ দেওয়া কাগজটা হাতে ধ'রে থরথর করে কেঁপেছে ধর্মপদ। নিরঞ্জন মোড়ল গুন্ডিপনা চিবিয়ে বলেছে, তোর জমিন তু ঘুরোন নে। আমার টাকা

কড়ায়-গন্ডায় মিটিয়ে দে।

ধর্মপদ পারেনি। সে বছর থেকে ডাঙা জমিটার মালিক নিরঞ্জন মোড়ল। ধর্মপদ সেখানে জনমুজর খাটে। বীজতলা তৈরি করে, চারা ধানের আঁটি বাঁধে। নিজের জমিতে মানুষ দিনমজুর হয়ে গেলে সে দুঃখ রক্তে ঘাই তোলে। তাই পনের কাঠা ভুঁই যত দ্রুত পেরনো যায় ততই মঙ্গল। ধর্মপদর পা দেবে যায় আলের ঘাসে, শিশিরে হড়কে যায়। চক্‌চক্ করে ওঠে চোখের দু'কোণ। অন্তর্গত কান্নার বেগটা শত চেষ্টা করেও চাপা দিতে পারে না। বাপ-ঠাকুবদাব কথা মনে পড়ে। দুটো হালিয়া মই টানছে কাড়ান মাঠে। কাদা জলের ছিটে। মইযেব বশা ধরে দাঁড়িয়ে আছে সে আর তার বাপ। অতদিন পরে সেই কাদা জল চোখের কোণে!

পিছনে ঘুরে জিতুয়া শুধোয়, কি হলো, বসে পড়লি যে! উঠ্। হাতটা বাড়িয়ে দেয় সে বাপের দিকে। বলিষ্ঠ, পুরুযালি হাত। এই হাতের দিকে তাকিয়ে ধর্মপদ আবার স্বপ্ন দেখে মাটির। পাথর কঠিন হাতটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে সে। বলে, বেটা রে, তুরে এট্টা কথা বলি—

জিতুয়া তাকিয়ে থাকে পোড়াখাওযা মুখের দিকে। কান্নার বেগটাকে দমন করে ধর্মপদ বলে, বেটা, ই ডাঙা ভুঁইটা মোড়ল কত্তা আমার থিকে ঠকায় নিলো। তু এট্টা কিছু বেবস্থা কর।

— সে কথা আমি জানি। রাগে জিতুয়ার চোখ থেকে ঠিক্‌রে আসে আগুন।

অস্বস্তিতে চোখ নামিয়ে নেয় ধর্মপদ। ভাঙা স্বরে বলে, ভাদোর মাসে অষ্টমীর দিন তু হলি। সে দিনটায় জিতুয়া ঠাকুরের পূজা-পাঠ হয় ঘরে-ঘরে। তুর মা আহ্লাদ করে নাম রাখল—জিতুয়া। সেই থিকে ফি-ভাদোর মাসের অষ্টমীর দিন উপাস দিত তুর মা। নিষেধ করলেও শুনতোনি। বলত—বেটা আমার জোয়ান হয়ে জমি ঘুরোন নিবে। দেখো না কেনে—উয়ার চক্ষু দুটো অবিকল জিতুয়া ঠাকুরের মতন! সেই আশায় বাপ, আমি এদ্দিন বেঁচে আচি। ইবার তু এট্টা কিছু কর!

জিতুয়ার নিষ্পলক দৃষ্টি ধর্মপদকে সান্ত্বনা দেয় না। সে আরো জোরে হাতটা আঁকড়ে ধরে বলে, তুর মায়ের কথাটা ইবার তু রাখ। বড় দুখ্ লিয়ে অভাগীর বিটিটা মরল!

শিশমগাছের কাছাকাছি হেঁটে এল বাপ-বেটায়, কারোর মুখে টুঁ শব্দ নেই। হাওয়া মারলে ধানগাছগুলো কাঁপে—সেই দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে জিতুয়া। মাঠের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভেসে আসে মাঠজাগানী মানুষের গলা। বাপের হাতটা ঝাট্‌কা দিয়ে সরিয়ে- জিতুয়া উষ্মা ঝরায় গলা, এখুন কেন্‌দে কী লাভ? বুনো হাতি খেদাস—সামান্য এট্টা মোড়ল খেদাতে পারিসনি? ছ্যা, ছ্যা! ধর্মপদ ধুঁকায়—সে অনেক কথা বাপ। আমার না আচে ট্যাক্‌বল, না আছে লোকবল। মোড়লকত্তা হাঁ-কাড়লে শ'টা লাঠি আমার মুন্ডু ফেড়ে দিবে।

—দিলেই হল! গাঁয়ে কি বিচার নেই?

—বেচার? ধর্মপদ হাসতে গিয়েও হাসতে পারে না, গলার কাছে পুঁটলির মত আটকে

যায় কথাটা। আল্‌গা গলায় বলে, চ রাত বাড়চে।

রাগে গর্জে ওঠে জিতুয়া, চোট খাওয়া ভাম্বুর মত ফোঁসে। খপ্‌ করে ধর্মপদর হাতটা ধরে হিঁড়হিঁড়িয়ে টেনে আনে ডাঙা ভুঁইয়ে। তারপর জামার পকেট হাতড়ে বের করে আনে ম্যাচিস্‌টা। ধর্মপদর হাতে ম্যাচিসটা ধরিয়ে বলে—লে, কাঠি জ্বেলে আগুন ধরায় দে মাঠে। সব পুড়ে খাক হয়ে যাক্‌। আগুনকে হাতি মাত্রই ভয় পায়। ধর্মপদ মা লক্ষ্মীর গায়ে আগুন ধরাতে পারে না। হাত থেকে ঠিকরে পড়ে দেশলাই। ।ধিক্কার দেয় জিতুয়া—জানি, তু পারবিনে। ডরপুঁক কেঁচুয়া। যা,..দূর হাট। জিতুয়া ঠেলা মেরে সরিয়ে দেয় তার বাপকে। তারপর নিজেই তুলে নেয় দেশলাই। জ্বালতে যাবে তখনই সর্বশক্তি প্রয়োগ করে ছেলেকে বাধা দেয় ধর্মপদ। বলে, গুস্‌সায় মা লক্ষ্মীর গায়ে আগুন ধরিয়ে কী লাভ? আগুনে ফসল পোড়ে, মাটি পোড়ে না। ধানগাছগুলো বুকে চেপে ধর্মপদ হু-হু করে কাঁপে, তুর মা, এট্টা ধান খসে পড়লে কুড়িয়ে রাখত যতনে।

—সেই জন্যিই মা'টা না খেতে পেয়ে মরল! জিতুয়ার গলার তীব্র শ্লেষ, মোড়লকত্তার বউটা তারে খাটিয়ে খাটিয়ে মারল। শেষ দিন অব্দি এক ফোঁটাও সুখ পায়নি মা'টা।

ধর্মপদর মুখে কুলুম আঁটা। ছেলের অঙ্গার চোখের দিকে সে আর তাকিয়ে থাকতে পারে না। ধীরে ধীরে ঘাড় কুঁজো করে উঠে আসে আলে। জিতুয়া তাকে মোক্ষম জায়গায় ঘা দিয়েছে। তিন বছরের লুকোনো ঘা'টা থেকে রক্ত-পুঁজ বেরয় হরদম। পার্বতীর মরার বয়স হয়নি, অথচ অসময়ে কাশরোগ নিয়ে চলে যেতে হয় তাকে। চোত-বোশেখ দুটো মাস শুখা মাস। তখন গুধলিদানা, মাড়ুয়া কিংবা বাজরা সবই আক্রা। দুবেলা পেট ভরানো সে এক ঝক্‌মারি কাজ। শুখা মাসে কৎদিন আর মহুয়া সিজা খেয়ে বাঁচা যায়? গুঁদুলিবিচার ক্ষীর বানিয়ে পার্বতী যখন থালায় ঢেলে দিত তখন সে আর চোখের জলকে শাসন করতে পারত না। আড়ালে সরে গিয়ে কাপড়ের খুঁটে মুখ ঢেকে কাঁদত। এইভাবেই সে একদিন মোড়লবাড়ির পেটভাতার কামিন হয়ে যায়। এবং এইভাবেই সে একদিন মোড়লবাড়ির সার গাদায় মড়ে পরে থাকে। তার মুখের দু'পাশে গাজ্‌রা আর রক্ত। ডাঁশমাছি, গুব্‌রেমাছি আর খুনচাখা জঁধা।

শিশমগাছের গুড়িটা কেরোসিন ড্রামের চেয়েও মোটা। জাপটে ধরে ওঠা যায় না। দশ হাত খাড়া গুঁড়িটায় কাঠ-পিঁপড়ে ওঠে নামে স্বচ্ছন্দে। জিতুয়া পিঁপড়ের চেয়েও খরগতিতে জাপটে সাপটে উঠে আসে, কিন্তু ধর্মপদ পারে না। ওঠার চেষ্টা করলেই বুক ছড়ে যায়, হাত পা কাঁপে। ওঠার সুবিধার জন্য গিঁট বাঁশের ঠেকুয়া। গিঁটে গিঁটে পা দিয়ে উপরে উঠে আসে ধর্মপদ। তার পিছু পিছু উঠে আসে জিতুয়া।

গাছের ঘুম ভেঙে গেলে গাছও চঞ্চল হয়ে ওঠে। মানুষের মত সেও শাখা-প্রশাখা নাড়িয়ে তার অনিচ্ছার কথা প্রকাশ ক'রে। পাশাপাশি দুটো মোটা ডালে দুটো বাঁশের মাচা। মাচার উপরে আউড়ের গদী। তার উপরে চট। চটের উপরে কাঁথাকানি। জিতুয়া গিয়ে পাশের ঝোরা থেকে কলসিতে করে বয়ে আনে খাওয়ার জল। তারপর কলসিটা কায়দা মতন বেঁধে রাখে গাছের ডালে। বিড়ি ধরিয়ে বাপ-বেটায় নির্নিমেষ তাকিয়ে

থাকে দিগন্ত ছুঁই ছুঁই ধানক্ষেতগুলোর দিকে। ভরাক্ষেত ভরা যুবতীর চেয়েও লাজুকরাঙা। কামাতুর হাওয়ার ছলা-কলা তার বিশেষ পছন্দ নয়; অভিমানে লুটিয়ে পড়ে লাবণ্যময়ীর শরীর। ধর্মপদ চেয়ে চেয়ে এসবই দেখে। এও এক সুখচারণ নেশা। এই বৃদ্ধ বয়সেও তার ঘোরলাগা চোখ, নেশাচ্ছন্ন মাদকীয় অনুভূতি। ক্রমে দু'চোখে জড়িয়ে আসে ঘুম ঘুম আচ্ছন্নতা। সেই স্বর্গীয় ঘোরের মধ্যে সে দেখতে পায় সবুজ শাড়ি পরে আলের উপর খোলা চুলে কমনীয় দেহলতায় দোল দিয়ে হেঁটে আসছে পার্বতী। তার গলায় ভাদোর মাসের রাত উজাগারা জিতুয়া পূজার গান, বাতাসে ভাসে বউটার লাজুক ক্ষীণ উপোসী সুর ঃ

নিদ শুয়েচে চক্ষুভর/উঠে দেকি শূন্য ঘর/ ভাদর মাসের জিতুয়া মোর লাচতে লাচতে যায়/দুধ্ ঘাসের নোঙরে বেটার পা ভিজ্জে যায়।

জিতুয়া নিজের মাচায় স্থির, অনড়, রাগ ছোবলায় বুকের ভেতর। সে চেয়ে থাকে দূরের বনভূমির দিকে, যেখানে আঁধারের ঘনত্ব বাড়িয়ে শুঁড় উঁচিয়ে অতর্কিত হামলার জন্য শরীর তাতিয়ে নিচ্ছে দাঁতাল পশুগুলো। দৃষ্টির মধ্যে এলেই জমাট বাঁধা অনঙ্গ আঁধারের মাঝে ও পশুগুলোকে সে ঠিকঠাক চিনতে পারে। তখন আর্তচিৎকারে, ফসলের আদিমটানে চারপাশ হল্লায় মুখর করে তোলে জিতুয়া। জেগে ওঠে নিশুতি রাতের গাছ। আগুন জ্বলে ওঠে। বেজে ওঠে টিক-ক্যানেস্তারা। কেউ কেউ সচল কালো ঢিবিগুলোর দিকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দেয় বিষাক্ত তীর, বল্লম। গাছের গোড়ায় এসে ঊর্দ্ধমুখী শুঁড় প্রসারিত করে পশুগুলোও ক্রোধের আগুন ঝরায় চোখে। এ যুদ্ধ মানুষের সাথে পশুর। পেটের টানে দুজনেই নেমে আসে সমতলে। কেউ ডাঙায়, কেউ মাচায়। কেউ আলে, কেউ ধানক্ষেতে। কেউ আগুন হাতে, কেউ তীর-ধনুক হাতে। মানুষ চায় পাহাড় সরাতে। পাহাড় চায় সমতলের দখল নিতে। এ যুদ্ধ দখলীকরণের যুদ্ধ। জিতুয়ার তাই-ই মনে হয়। চোয়াল শক্ত করে সে তাকিয়ে থাকে অদৃশ্যে দাঁড়িয়ে থাকা সেই পশুটার দিকে, যার গায়ে বুনো হাতীর বল নেই, বীরত্ব নেই, অর্থই যার বলের কেন্দ্রবিন্দু। ঐ কালো জীবগুলোর সাথে তার যে বড় মিল! জঙ্গলের দাঁতাল হাতি যদি মানুষের সমাজে ঢুকে যায়, তার মত বিপজ্জনক পরিস্থিতি আর কিছু নেই। বুনো হাতি ধরা কঠিন কাজ। হাতের মুঠি শক্ত করে জিতুয়া প্রতিজ্ঞা করে—যেভাবেই হোক, সে বুনো হাতি ধরবেই।

গামছায় বাঁধা রুটি গুড় ভাগাভাগি করে খায় বাপ-বেটায়। রাত বাড়ে। দূরের মহুয়া-গাছের ঝাঁকড়া ডালপালার ভেতর থেকে কে যেন শীত কাতুরে গলায় চিল্লিয়ে ওঠে, কাকা হো, কাকা হো-ও-ও-ও।

ধর্মপদ রুটি চিবাতে চিবাতে কান খাড়া করে শোনে। গলার স্বর চিনে সেও প্রত্যুত্তর ফিরিয়ে দে, গণ্শা, গণ্শা হো-ও-ও-ও।

এইভাবে এক গাছ থেকে আরেক গাছে ছড়িয়ে যায় ধ্বনি, শব্দের বর্ণমালা, হৃদয়ের উত্তাপ এবং খণ্ডযুদ্ধের সংকেত। ভারি হাওয়ার শীতার্ত গন্ধ হুতুম পেঁচার মত উড়ে বেড়ায় এক গাছ থেকে আরেক গাছে। টিম্ টিম করে ডিবরির আলো জ্বলে। পাহাড়

বনভূমির দিকে মুখ করে বসে থাকে কয়েকজন হা-অন্ন নিশাচর মানুষ, আগোলদার। ধীরে ধীরে তেল ফুরিয়ে আলো কমে আসে ডিব্‌রির। উজ্জ্বলতা হারায় রাত জাগা চোখ। এক সময় ঘুমে কাদা হয়ে যায় শরীর। ঘুমের কোলে ঢোলে পড়ে অরণ্য প্রকৃতির মানুষগুলো।

সবাই ঘুমোয়, শুধু জেগে থাকে জিতুয়া। রাত তাকে মানুষের দুঃখ-বেদনার কথা শোনায়। টুপটাপ শিশিরপাত মায়ের ভেজা চোখ দুটিকে মনে করিয়ে দেয়। তার মা বলত, জিতুরে, তুর চোখ দুটোই কাল। এ চক্ষু দিয়ে তু আগোলদার হবি কী করে? আগোলদার হতে গেলে যে অন্ধা হতে হয় বাপ! জিতুয়া অন্ধ হতে পারে না। সে চেয়ে দেখে, হরতকী আর চারা ত্রিফলা গাছগুলোকে তছ্‌নছ্ করে প্রায়ই সমতলে নেমে আসে বুনো হাতির দল। আঁধারেও সে স্পষ্ট দেখতে পায় পশুগুলোকে। পুরো গ্রামটাতে তাদের আধিপত্য। কে রুখবে পাগলা হাতির দল?

সঙ্গী-সাথীরা অবাক গলায় বলে, জিতুরে, তুয়ার চক্ষু বটে, আঁধার রাতে তুর কী চক্ষু জ্বলে?

জিতুয়া হা-করে তাকিয়ে থাকে তাদের মুখের দিকে। সহজ সরল চোখগুলোর দিকে তাকিয়ে তার ভাষা সরে না। আক্ষেপে শুধু হাত কামনায়। মনে ভাসে প্রহ্লাদ কবিয়ালের গান, চক্ষু থাকিতে লজর নাইকো যার / বলি ভাই, পুকাড়ে কপাল তার/ হাড় থাকতে কেঁচুয়া স্বভাব যার / বলি ভাই, অন্ন জোটে না তার....

ধর্মপদ নাক ডাকে। রাত বাড়ে। রাতের কালো ছায়ায় ডুবে যায় গাছপালা, নদীনালা, ধানক্ষেত আর ভুকুটিলা। ঘুমের রেণু এসে জড়ো হয় চোখে। চোখের পাতায় ঘুম মায়ের আদর হয়ে শুয়ে থাকে। হা-ডু-ডু খেলা পরিশ্রান্ত দেহটা একটু আরাম খোঁজে। গায়ের চাদরটা আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে নিয়ে মোটা ডালটায় আরামে ঠেস দেয় জিতুয়া। ছোঁয়াচে ঘুম এক শরীর থেকে আরেক শরীরে বাসা বাঁধে। তখনই পাশের জঙ্গল কাঁপিয়ে ধূমল ছায়ার মত সার সার নেমে আসে বুনো হাতির দল। তাদের চোখেও আগুন, ক্ষুধা। জিতুয়া চিৎকার করে, বাপ, বাপ গো-ও-ও।

—সনাতন কাকা। কাকা গো-ও-ও-ও।

—বলাইদা। বলাইদা—আ-আ-আ-আ।

—পরিমল, পরিমল রে-এ এ এ। হাতি নেমেচে। খেদা, খেদা।

কেউ জাগে না। শব্দময় পৃথিবী থেকে মানুষের শব্দ আসে না। শুধু ভেসে আসে তছনছ আর ধ্বংসের শব্দ। জিতুয়ার আর সহ্য হয় না। উত্তেজিত হাতে তুলে নেয় তীর ধনুক। ছিলা বুকের কাছে টেনে সে দেখে ধূমল বাহিনীর পুরোভাগে হা-হা ক'রে হাসছে নিরঞ্জন মোড়ল। তার হাতে দোনলা বন্দুক। বন্দুকের নল তাক্ করা জিতুয়ার চোখে। আর দেরি করে না জিতুয়া, ছিলা টেনে ছেড়ে দেয় তীর।

তীব্র এক আর্তনাদে ঘুম ভেঙে যায় বনভূমির। নীরবতা খান্ খান্ ক'রে মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে মানুষের কণ্ঠস্বর, আর্তনাদ আর তাজা রক্তের গন্ধ। জেগে ওঠে

পাহাড়, গাছগাছালি আর মানুষ। নিদ্রাকাতর চোখে গাছ থেকে কাঁদতে কাঁদতে নেমে আসে ধর্মপদ। সনাতন, পরিমল, বলাই—সবাই তাকে সান্ত্বনা দেয়। তাদের সান্ত্বনা বাক্যে ধর্মপদর মন মানে না। সে শুধু ভাবে, এত হুঁশিয়ার বেটাটা গাছ থেকে ঘুমের ঘোরে পড়ল কী ভাবে?

পথর-চাটানে শোয়ানো জিতুয়ার দেহ। বুকের হাড়কটা কঠিন পাথরে ভেঙে গেছে পাটকাঠির মত। নাকে মুখে তাজা রক্তের ধারা। ছেলের মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে ধর্মপদ হাউ-হাউ করে কাঁদে। প্রলাপে-বিলাপে ভরিয়ে তোলে বাতাস।

জিতুয়া ঘুম জড়ানো চোখে বলে, কাঁদিস নে বাপ। বড় বেথা বুকটায়। তু আমারে হাসপাতালে নিয়ে চল। আমি মনে হয় বাঁচবোনি—

পরিমলের ভ্যান্-রিক্শোয় জিতুয়া যখন সদর হাসপাতালে পৌঁছায় তখন ভোর হয়ে আসছে, সেই কুসুমভোরে জিতুয়া কিছু দেখতে পায় না। খবর পেয়ে মোটর সাইকেল হাঁকিয়ে ছুটে আসে নিরঞ্জন মোড়ল। পুলিস কেস যাতে না হয় তার জন্য ধরাধরি চলে। শেষে হন্তদন্ত হয়ে ফিরে আসে ভ্যান-রিক্শোর কাছে। ধর্মপদর হাতে ঘাট-খরচের টাকাটা ধরিয়ে দিয়ে বলে, নে, রাখ। গরিবগুরবো মানুষ তুই, এতো টাকা কুথায় পাবি? কথাগুলো বলেই সে আর সময় নষ্ট করে না। ধীর পায়ে এগিয়ে যায় জিতুয়ার কাছে। চাদর সরিয়ে মুখটা দেখতে গিয়েই ভয়ে পিছিয়ে আসে দু'পা। আগোলদারের চোখ দুটোকে সে দেখতে পায় না। দু'চোখে তুলোর পুঁটলি বাঁধা। আবাক হয়ে শুধোয়, চোখ, কুথায় গেল জিতুয়া ঠাকুরের চোখ! নাভিমূল থেকে হুশ করে শ্বাস তুলে এনে মোড়ল কত্তা ভাবে, কোথায় গেল টানা টানা, বাঁশপাতা লম্বা, কস্তুরী হরিণ টাঙিধার চোখ দুটো?

ধর্মপদ কপাল চাপড়ে আক্ষেপের সুরে কাঁদে। হা-হুতোশ ছড়িয়ে দেয় ওষুধগন্ধ ভরা বাতাসে। এক সময় চোখের জল মুছে ধরা গলায় সে বলে, বাবুগো, বেটা আমার মরার সময় বলল, আগোলদারের চক্ষু দুটাই আসল। ই চক্ষু তুই হারাস নে। তাহলে বুনা হাতিগুলানরে কে চেনাবে, কে ঠেকাবে? তাই বেটার কথা মতুন ডাক্তার উয়ার চক্ষু দু'টো উপড়ে লিয়েচে।

নিরঞ্জন মোড়লের কথা সরে না, ঘ্যাড়ঘ্যাড় করে গলা। পাংশু মুখটা কাজুবাদামের মত বেঁকে যায় ভয়ে। দুটো চোখ হাজার চোখ হয়ে তাড়া করে তাকে। বাতাসে সুর ভাসিয়ে ধর্মপদ কাঁদে, এমন গর্বের কান্না সে কোনোদিন কাঁদেনি।

কটাশ

পুকুরেরি পাড়ে খড়িবেড়ার ধারে / হংস বসিয়া ছিল / কটাশ আসিয়া পটাস করিয়া হংস লইয়া ..... / গেল গো-ও-ও।

হাটবারে পোলধারে ভাঙা হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইছিল ভাকুকানা। লোকে তাকে কানা বলেই জানে কিন্তু ব্যাঙা জানে ভাকু কানা নয়—অন্ধ। জন্মান্ধ নয়, বসন্ত তার চোখ খেয়েছে। মুখে গা-গতরে জন্মদাগের মত বসন্তদাগ। ঘাম লেগে চিক্‌চিক্ করছিল তামার পয়সার মত দাগগুলো। ব্যাঙা যাচ্ছিল পার্টি অফিসে, সাঁঝবেলায় গানটা কানে যেতেই থমকে দাঁড়াল সে। ভাকুটাকে এ গাঁয়ের কেউ দেখেও দেখে না, সবাই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। অনেকে আবার এড়িয়ে চলে। এড়িয়ে চলে—পয়সা দিতে হবে এই জন্য। ব্যাঙা পকেট হাতড়ে একটা চার আনা থালায় ছুঁড়ে দিতেই ভাকুর হারমোনিয়ামের ব্লো-করা থেমে যায়। গামছায় মুখের ঘাম মুছে তাকাবার চেষ্টা করে। পারে না। চোখের পাতা দুটোয় অল্প-বিস্তর পিচুটির জড়াজড়ি, দেখলে গা রি রি করে। ঘেন্না হয়। দশ বছর আগেও ভাকুর গতর ছিল ভীমের মত। এখন পাকাটি, হাড়খাঁচা জাগা বিসর্জন দেওয়া কার্তিকঠাকুরের কাঠামো। পিট্‌পিট্ করে সে যখন তাকায় তখন লোক ভাবে—ভাকু হয়ত দেখতে পায়। বসন্তের পরে, সে হয়ত দেখতে পেত, কিন্তু এখন সে এক ছটাকওদেখে না। বিশেষত রাতকালে তার বড় অসুবিধে। লাঠি ছাড়া চলতে পারে না। অনেক সময় লাঠি হড়কে সে খাদ ডহরে, খানাখন্দে পড়ে যায়। তখন তাকে দেখলে মায়া হয়। মনে হয় এই বুঝি মানুষজীবন।

ভাকুর যা ছিল সব গিয়েছে, এখন তার আর কিছু নেই। থাকার মধ্যে আছে এক সোমত্ত বোন। তার নাম অহল্যা। পিছুটান বলতে ঐ বোনই। নাহলে ভাকু হয়ত কোথাও ভেসে যেত, যে দিকে তার দু'চোখ যায়। বোন যেন বগলা ধরার ফাঁস। ভাকুকে বকের মত ধরেছে। ফাঁস ছিঁড়ে পালিয়ে যাবে ভাকুর তেমন ক্ষমতা নেই। তাই হারমোনিয়াম আর লাঠি নিয়ে সে হাটবারে আসে পাকার পোলে। অহল্যা তাকে পোলটার বাঁ-ধারে ছেঁড়া চট পেতে বসিয়ে দিয়ে যায়। বেলা ডুবলে ঘর-সংসারের কাজ সেরে অহল্যা আবার তাকে নিয়ে যায়।

আজ হাটবার বলে ভাকুর তাড়াতাড়ি আসা। অহল্যার গায়ে ধুম জ্বর। সে আসতে পারেনি। ভাকুকে খালধার অব্দি এগিয়ে দিয়েছে কমলা। তারপর সে বাস ধরে চলে গিয়েছে শহরে। কমলা রোজই শহরে যায়। শহর ছাড়া গ্রামে তার মন ধরে না। গ্রামকে সে ঘেন্না করে। চোখ-মুখ বেঁকিয়ে, ঠোঁট উল্টে সে প্রায়ই বলে, গ্রাম আমাকে কি দিয়েছে

যে গ্রাম ধরে আহ্লাদ করে বসে থাকব? গ্রামের অবস্থা এখন উপরে ঢোল, ভিতরে পোল (ফাঁকা)। এখানে থাকলে না খেতে পেয়ে মরে যাব ভাকুদা। তোমাকে তো দেখছি, দু'বেলা তোমার হাঁড়ি চড়ে না। তোমার বোনটা একটু লজ্জা ঢাকতে লুগা (কাপড়) পায় না।

ভাকু শোনে। শুনতে-শুনতে তার কান বয়রা। পোলের ধারে বসে দাপনার বাড়ি মেরে সে তার সুরেলা গলায় দরদ মিশিয়ে সুর ভাসিয়ে দেয় হাওয়ায়—বাবুগো, কটাশ ধরো, কটাশ মারো, ...কটাশের জ্বালায় বাঁচি না।

কটাশ হল ভাম। ধূর্ত, সুযোগসন্ধানী পশু। জলে-স্থলে-বৃক্ষে সর্বত্র তার বিচরণ। ব্যাঙা গানটা শোনে, সুরটা নতুন ঠেকে কানে। শুধোয়—ভাকুদা, এ গানটা কি নতুন তুললে?

ভাকু হাসে। পাতলা দাড়িতে নখ চালিয়ে ঘামাচি খোঁটে। শুকনো ঢোকটা গিলে নিয়ে মিহি গলায় বলে, তুললাম। গাঁয়ে যে এখন কটাশ ঘোরে। জেলে বস্তিতে মুরগির ছা নিয়ে পালাল, সেয়ানাটারে কেউ ধরতে পারলোনি। বড় জ্বালাচ্চে গো ব্যাঙাবাবু। আমার চক্ষু নেই, চক্ষু থাকলে এর একটা বিহিত করতাম। তোমাদের তো চক্ষু আছে, দেখ না ফাঁদ পেতে ধরতে পার কিনা!

ব্যাঙা ভাবে ভাকুর সরস কথা। অবাকও হয় কিছুটা। এই অন্ধ মানুষটা যেন অন্ধ নয়। সব দেখতে পায়। না হলে কি করে জানল কটাশের কথা? তার কি দিব্যচক্ষু আছে!

পাকার পোলের হাট সাঁঝের বেলায় ভাঙার মুখে। মাঠ থেকে উড়ে আসছে হাওয়ায় সবুজেটে গন্ধ। এই শরত মরসুমে হাওয়ায় শীত থাকলে ধানের বুকে থোড় আসে। শীত গাঢ় হলে নবান্ন হয়। তখন ভাকুর একটু সড়গড় অবস্থা। মানুষের হাতে পয়সা থাকলে দান খয়রাতি করার বাসনা জাগে। এদিক থেকে শহর অনেক এগোনো। সেখানে পয়সা ওড়ে বাতাসে। বাবুগুলোর মন জল ছুঁইছুঁই ফড়িং। হাত পাতলেই পয়সা। সাঁঝ হলে হাট ঝিমায়, হাওয়া ভারি হয় কিন্তু টিনের থালায় পয়সা কোথায়?

হারমোনিয়ামের ব্লো-টেনে ভাকু জোর গলায় গায়, পটাশপুরের কটাশ গো, ধড়িবাজের রাজা / কুঁকড়া ধরে, মৎস্য মারে / তার হবেনি সাজা? বলি চলো গো, চলো গো-ও-ও / কটাশ ধরিতে এ-এ-এ।

ব্যাঙার পায়ে যেন বাবলা-আঠা, সে গানের মজায় নড়তে-চড়তে পারে না। ভাকু থালাটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, ব্যাঙাবাবু, গুনো তো কত পয়সা হলো। আধা সের চালের দাম উঠে গেলেই ঘর চলে যাব। সেই দুপুর থেকে চেঁচিয়ে গলায় আর দম নেই গো। বুকে মনে হয় কাশ-ব্যামো হয়ে যাবে।

—সর্বমোট এক টাকা পঁয়ত্রিশ। ব্যাঙা অবাক গলায় বলে।

ভাকু কেমন মন্নার মত হাসে। বলে, এত কমে তো হবেনি। দাঁড়াও গো, আর এট্টু জোরে চেঁচাতে হবে। নাহলে তেল-নুনের যে খরচা হবেনি।

ভাকু গান গায় উদাত্ত গলায়। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে ব্যাঙা। গাঁয়ে এখন পঞ্চাশ পয়সায় এককাপ চা। এক তাড়া বিড়ি পাঁচ সিকে। এই যদি আয়ের বহর হয় তাহলে অন্ধ মানুষটার চলে কি করে? মানুষ তো হাওয়া খেয়ে বাঁচতে পারে না। দু'বেলা ভাত রুটি চাই। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ব্যাঙা এসবই ভাবছিল। ছকু সাউয়ের সাথে এই নিয়ে তাব তীব্র মত বিরোধ। ছকু বলেছিল, তোর অতো ভাবনা কিসের রে? ভাকুটা ডাকু, দিন গেলে ওর ইনকাম কত্তো জানিস?

ব্যাঙা ফ্যালফ্যাল কবে তাকিয়ে ছিল, এক টাকা পঁয়ত্রিশ পয়সা!

—ঠিক। ওর বোনের আয়টা ধর?

— বোনের আয়?

ছকু সাউ খালপাড় কাঁপিয়ে হা-হা করে হাসে, বাচ্চা আছিস। বুঝবি নে এসব কথা। অহল্যাটা শহরে যায়। চিং হলে কি পয়সার অভাব হয়?

ব্যাঙা সেদিন একটা থাপ্পড় মেরেছিল ছকুকে। পাঁচ আঙুলের দাগটা মিলিয়ে গেলেও ছকু সাউ সে রাগ এখনো ভোলেনি। আজ লাইব্রেরিতে পঞ্চায়েত মেম্বারদের মিটিং। বিচার হবে—ছকু বনাম ব্যাঙা। বিচারে রায় যাইহোক এর জন্য ব্যাঙাব কোন দুশ্চিন্তা নেই। অহল্যার নামে অপবাদ তার গায়ে সহ্য হয় না। মেয়েটাকে সে বুকে গামছা জড়ানোর বয়স থেকে দেখছে। বছর দুই হলো ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে। চোখে-মুখে প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত গাম্ভীর্য। অভাব তার মানসম্মানে একটুও কালির আঁচড় লাগায়নি। দেখলে যাকে শ্রদ্ধা করতে মনে চায়—তার নামে কুৎসা? ছকুটা কি ভাবে নিজেকে? মেম্বার হয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান? যেমন কুকুর তার তেমন মুগুর না হলে চলে? ভাবতে-ভাবতে ঘেমে যাচ্ছিল ব্যাঙা। অস্বস্তি এড়াতে সে উসখুশিয়ে বলে, বিড়িটা নেবাও ভাকুদা? সুর থামিয়ে হাত বাড়িয়ে দেয় ভাকু। বিড়িটায় ফুঁ দিয়ে ধুলো ঝেড়ে আগুন জ্বালায় মুখে। ধোঁয়া ছেড়ে কাতর গলায় বলে, বিড়ি টানলে দম পাইনে, আর দম না থাকলে সুর চড়ায় ওঠে না। আজকাল চড়া সুরের বাজার, কেউ আর 'রাধিকার মান ভঞ্জন' শুনতে চায় না।

ব্যাঙা বলে, ঠিক বলেছো। তোমার বাবা গাইত, 'শোন বাঙালি চোখ মেলে চাও সামনে ভীষণ খাদ'—এখন সে গান কোথায়? এখন তো এক দো-তিন-চার পাঁচ-ছয় ....ধারাপাত। শুনে শুনে কান পচে গেল।

হুস করে নাভিমূল থেকে শ্বাস তুলে আনে ভাকু। মলিন হেসে বলে, আমার হারমোনিয়ামটা ফুটো-ফাটা। সেই বাবার আমলের। ব্লো' টানলে হাওয়া বেরিয়ে যায়, রীডগুলোও ত্যাড়া-বেঁকা। এ সব বাদ্যযন্ত্র দিয়ে কি গান হয় ব্যাঙাবাবু? তাই তোমার কাছে আমার এট্টা নিবেদন। শুনো তো বলি—

ব্যাঙা বিড়িতে দম দিয়ে বলে, বলো বলো, তোমার কথা শুনবো না মানে?

ভাকু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়, আমি তো শিল্পী। এটা তো মান?

—মানি বই কি? একবার নয়, হাজার বার মানি।

—তুমি মানলে কি হবে ছকুবাবু তো মানে না?

—ছকু না মানল তো কি এসে যায়?

—যায় গো, যায়! ভাকু ফ্যাকাসে চোখে হাসে। সে-ই তো পঞ্চায়েতের মাথা। আমি তাকে বড় মুখ করে বললাম—বাবু, আমি তো শিল্পী। আমার হারমোনিয়ামটা সারাবো, আমারে কিছু টাকা দাও। শুনে, ছকুবাবু রেগে টং। বলল, ফড়িংয়ের সখ হয়েছে পাখি হওয়ার। তা বাবু, কথাটা আমার বড্ড গায়ে বিঁধেছে। সময় আসলে বাবুর কথার আমি জবাব দেব।

—জবাব কি তোমার কাছে আছে?

—আলবাৎ আছে। কোলকাতার অপেরা এসেছিল দলে নিতে। শুধু বোনটার কথা ভেবে আমি যাইনি।

—গেলেই পারতে?

— সে তো জানি। কিন্তু আমি গেলে বোনটারে কে দেখবে? আমি ছাড়া যে ওর কেউ নেই। কথাগুলো বলতে গিয়ে ছলছলিয়ে ওঠে ভাকুর চোখ। গামছায় চোখ মুছে নিয়ে সে বলে, ছাড় সে সব কথা। এবার কাজের কথায় আসি। তা, তুমি এখন যাচ্চো কোথায়? ফেরার সময় আমার কাছে হয়ে যেও। অহল্যাটা আজ আসতে পারবেনি? তুমি আমারে এট্টু চর অব্দি পৌঁছে দিও। বিড়িটা ফেলে দিয়ে ভাকু মনমরা চোখে তাকায়। খালপাড়ে তখন ভাঁটার টান। মাটি চেঁছে নিয়ে জল সরছে সরসর। ছড়ছড় করে কাদা মাটিতে শরীর লেপটে হেঁটে যায় ডরাচিঁয়া, লালচিঁয়া, পিঠালিচিঁয়া মাছ। তারা ভয়ানক চালাক, পাঁক লাগায় না। ভাকু বলে, ছকুবাবুটা চিঁয়ামাছের মতন। বড় ধূর্ত। তার হাব-ভাব মতি-গতি কিছু বোঝা যায় না। সেদিন আমাকে এগিয়ে দেবে বলে কানকুলগাছের ঝোপের কাছে ছেড়ে দিল। সারাটা রাত আমি আর পথ খুঁজে পাই না। কেবল হাতড়ে মরি। ভাগ্যিস লাঠিটা ছিল, অশোথতলায় পড়ে রইলাম।

—তুমি ওরে কিছু বললে না?

—বলেচি, বললে ও হাসে। ওর হাসি আমার সহ্য হয় না। ভাগ্যিস আমি চক্ষে দেখি না। দেখলে হয়ত ফাটাফাটি হোত। এরপরে অনেকক্ষণ ঝিম ধরে থাকে ভাকু। শীতল ছোঁয়া লাগতেই সে অনুভব করে সাঁঝ নামছে। গায়ের গেঞ্জিটা টেনে-টুনে হাঁটু অব্দি নামায়। থালার পয়সাগুলো জড়ো করে সে হাতের মুঠোয় আনে। কখনো ডান হাতটা হারমোনিয়মের রিডের উপর রেখে সে উদাস ভঙ্গিতে বসে থাকে দূরের দিকে মুখ করে। তার বসে থাকার ভঙ্গিটা এত বিচিত্র যে কেউ দেখলে ভাববে ভাকুটা নিশ্চয়ই দেখতে পায়।

ব্যাঙা পোড়া বিড়িটা ফেলে দিয়ে অন্তরঙ্গ গলায় বলে, ভাকুদা, অমন করে কি ভাবো?

ভাকু শ্বাস নিয়ে বলে, ভাবি তো অনেক কিছু কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয় না। বুঝলে ভাই, ভাবনা হল গিয়ে অলকলতার মূল, ডুমুরের ফুল। যত ভাববা ততোই

ডুবে যাবা ভাবসাগরে। মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় জানো? আমি যদি সমুদ্র হতাম, আমি যদি আকাশ হতাম? তা ভাই, বলতো দেখি—কথদিন আমি আকাশ-সমুদ্র দেখিনি। আমার মনটা বড় টাটায় গো! ভাবি কোন পাপে, কার অভিশাপে আমার এমন দশা হল?

ঘণ্টা তিনেক রোদ খেয়ে ঝিমিয়ে পড়েছিল হাট। ভাকুর গলাও পরিশ্রান্ত। ভিন্-গাঁয়ের ব্যাপারীগুলো চলে যাচ্ছিল দোকান গুটিয়ে। চোঙা মাইকে তখনও ইঁদুর মারার বিষ, আর কৃমির ওষুধের বিজ্ঞাপন। ভাকু শোনে। তার শোনাটা এত রক্তজ— সে যেন ইঁদুরের বিষ বেচতে আসা রোগা প্যাংলা উলঝাল মানুষটাকে দেখতে পায়। ইদানীং শব্দ শুনে, মুখের ভাষা শুনে, মেঘের গর্জন শুনে, হাওয়ার ইশারা বুঝে সে তার দেখার চাহিদাটা মিটিয়ে নেয়।

আগে সে একটু-আধটু দেখত, এখন আর একদমই দেখতে পায় না। এর মূলেও সেই ছকু সাউ আর তার পোকাড়ে ভাগ্য। লাইব্রেরির সহযোগিতায় হাটখোলায় ছানি কাটানোর ক্যাম্প হ'ল। ডাক্তার এল শহর থেকে। বিনা পয়সায় চোখে অস্ত্রোপচার হবে। দৃষ্টিহীন তার দৃষ্টি ফিরে পাবে। ছকুবাবু এসে বলল, চলো ভাকুদা, চোখটা একবার দেখিয়ে আসবা। বিলাত ফেরৎ ডাক্তার, বিনা পয়সায় এমন সুযোগ আর পাবা না।

অহল্যা তখন বারে বারে নিষেধ করল, যেও না দাদা। চোখ বলে কথা। যেখানে-সেখানে না দেখানই ভাল। সব গেলে ফিরে পাবা— চোখ গেলে পাবা না। চিরজীবনের মত আপসোস থেকে যাবে তোমার।

ছকুবাবু তো রেগে আগুন। বলল, মেয়েছেলের বুদ্ধি একেই বলে! সাধে কি তোরা এগার হাত কাপড়ে ল্যাংটো।

অহল্যার জিভ কাটা যায় লজ্জায়। সে আর ছকুবাবুর চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারে না। অথচ দিব্যি হ্যাংলা চোখে ছকুবাবু তাকিয়ে থাকে তার দিকে। মানুষ বুঝি চোখ দিয়েও মানুষ খায়, চোখের ক্ষিদে বুকে এলে ঝড়-তুফান বয়ে যায়। অহল্যা তেমন ধারা মেয়ে নয়। সে চোখ নামিয়ে ভীতু শরীরে ঢুকে এসেছে ঘরে। গলগলিয়ে ঘামে ভিজে যায় তার বুকপিঠ-গলা। নাভিকুণ্ডের কাছে ঘামের দলা চোখের জলের মত কবোষ্ণ তাপ ছড়ায়। তারপরের দিনই ভাকু গিয়ে চোখ কাটায়। দিন সাত পরেই ভাকু কানা থেকে অন্ধ হয়ে যায়। ছা-পোষা গরীব মানুষ থেকে দৃষ্টিহীন ভিখারি হয়ে যায়। শেষে বাবার ফেলে যাওয়া সিংগল-রিডের হারমোনিয়ামটাই তার দিনযাপনের চাবিকাটি হয়ে দাঁড়ায়। তাকে দৃষ্টিহীন করার পেছনে ছকুর কি স্বার্থ ছিল? অহল্যা কি অতই সস্তা? সে জেলে বস্তির মেয়ে, জলে যায়, মাছ ধরে কিন্তু জল কখনো তাকে গিলে নিতে পারে না। জলে হাঙর-কুমীর থাকলে তা জেলেবস্তির মেয়েগুলোর কাছে গিরগিটি-টিকটিকি। ছকুটা বোকার বোকা! তার টোপ্ না খেয়েই মাছ পালিয়ে যায় গভীর জলে। তবু আশা ছাড়েনি সে। হুইলে ঢিল দিয়ে শেষ বেলায় খেলিয়ে তুলবে এমন একটা সুপ্ত আশা। এমন আশায় বুড়ো হালিয়ার গোবর, ছেলি-নাদ।

চোয়াল শক্ত করে ভাকু বলে, ছকুবাবুটা ভীষণ সেয়ানা। সে ভাবে, সে একাই মানুষ আর সব ছাগল। সে হলো চতুর পুতুলওয়ালা—আমরা হলাম তার হাতের পুতুল। কিন্তু ও জানে না—রশি একদিন ছিঁড়ে যায়, পুতুল একদিন হাতের বাইরে চলে যায়।

ব্যাঙা কথার মাথা-মুণ্ডু কিছু বোঝে না। সে বলে, তোমার রাগের কারণটা খোলসা করে বলো তো শুনি।

ভাকু হাসে, ও কিছু না। রাগের আবার কারণ থাকে নাকি? মাথা গরম হলে মানুষ আনশান বকে। পেট গরম হলে ঘন ঘন বাহ্যি যায়। দেখ না খালটারে। জোয়ার আসলে—ছলাৎ-ছলাৎ রাগ। জোয়ার ঠাণ্ডা হলে—ভাল মানুষ—কিচ্চু জানে না।

ব্যাঙা হাসে, শ'কথার এক কথা। তবু বলি কি ভাকুদা—ডালের মধ্যে কালা আছে। তুমি যত ঢাকতে চাও ততই তার রূপ-মহিমা ফুটে বেরয়। হেঁয়ালী ছেড়ে বল দেখি আসল কথাটা কি?

ভাকু মাথা চুলকোয়। ভাবে, বলবে না। শেষে বলেই ফেলে। ছকুবাবু অহল্যার জন্যি একটা ছাপা শাড়ি পাঠিয়েছে কমলার হাতে। বলেছে, রিলিফের মাল। বাড়তি ছিল তাই দিয়েছে। তা তোমারে শুধাই, রিলিফে কি আজকাল ছাপা শাড়ি দেয়, আতর শিশি, স্নো-পাউডার? তা ব্যাঙাবাবু, আমরা গরীব বলে কি আমাদের কোন মান-ইজ্জোত নেই! আমরা কি একেবারে খোলামকুচি, ঠাণ্ডা লুচি? যদি এমন ভাবো তাহলে ভাবনাটা ভুল। যুগ পাল্টেচে—মন পাল্টাও। নাহলে ধাক্কা খেয়ে ভেসে যাবে, থৈ পাবে না। আমরা তখন পাড়ে দৌঁড়িয়ে হাসব—থুঃ, থুঃকার করব। তখন কিন্তু দোষ দিও না।

ব্যাঙার কথা সরে না। সে বোকার মত তাকিয়ে থাকে নিষ্পলক। ছকুটা পঞ্চায়েতের মুখ ডুবাল। এক বালতি দুধে সে যেন এক ফোঁটা লেবুর রস। তার কথায় কাজে কোন সামঞ্জস্য নেই। স্বার্থ যেখানে সেখানেই ছকু। স্বার্থ না থাকলে তার টিকিটিও দেখা যায় না। অহল্যা তাকে দু'চোখে দেখতে পারে না। ছায়া মাড়ালেই গা ঘিনঘিনিয়ে ওঠে মেয়েটার। সে বলে, মানুষের চোখে ধুতরার বিষ থাকে তা তোমায় না দেখলে জানতে পারতাম নি। তুমি না মানুষ, না পশু—দু এয়ের মাঝামাঝি কিছু একটা। তাই তোমাকে দেখলে আমার জানটা খাবি খায়। দোহাই ছকুবাবু, তুমি আমার ছিমুতে এসোনি। তুমি তাকালে সাগর শুকিয়ে চড়া পড়ে যায়—মানুষের বুক সে তো তুচ্ছ নদী-নালা।

অহল্যার কথায় ছকুবাবু হারে না, দমে না। হাসতে থাকে, হা-হা। হাসিতে ভুবন কাঁপিয়ে বলে, মেয়েমানুষের কথায় আমার কোন হা-হুতোশ নেই। নারী আমার কাছে তরবারি। আমি ঢাল নই, মজনু নাগর। আমার মুখে বিষ ঢেলে দিলেও আমি বলব, 'অহল্যা, অহল্যা।'

—অত যখন কুরকুরানি তাহলে বিয়ে কর। তোমার বাবারে বল কন্যা দেখতে।

—বিয়ে করলেই জীবন শেষ। পুরুষজীবন তো কলাগাছের মতই। মোচা বেরলেই মরল। আমি হলাম চন্দনগাছ। সুগন্ধ বিলোবো, তোদের কপালে তিলক হয়ে সারা জীবন কাটিয়ে দেব। আমাকে ঘষে-ঘষে তোরা ফায়দা তোল। ক্ষমতায় থাকা অব্দি আমি

তোদের সব সুযোগ-সুবিধা দেব। ছকু সাউয়ের হাত ধরলে জাউ খাবিনে, পোলাও খাবি। খেয়াল রাখিস কথাটা।

শহর থেকে ফেরার পথে সেদিন ভ্যান-রিকসায় বসে অহল্যা সব বলেছে। কাঁদতে কাঁদতে চোখের জল মুছেছে বার বার। সেই একই কথা, ব্যাঙাদা গো, তোমার দুটা পায়ে পড়ি, ছকুবাবুরে তুমি বুঝিয়ে বলো , ওর দিকে তাকালে আমার দম আটকে যায়। দেখবা, কোনদিন আমি মরে পড়ে আছি খালধারে। তখন আমার আত্মা তোমাদের সবাইকে দুষবে।

হাট ভেঙে গেলে ভাকু চলে আসে চা-পান-বিড়ির দোকানে। ব্যাঙা চলে যায় সিধা লাইব্রেরিতে। অনেকদিন সে রাগে-অভিমানে লাইব্রেরির দিকে আসে না। কত কষ্ট করে, কত শ্রম দিয়ে দিন-রাত এক করে খেটে সাত বছরে মোটামুটি ভদ্রস্থ করেছে লাইব্রেরিটাকে। সরকারি টাকা পেয়েছে তারও অনেক পরে। সরকারি অনুদান পাওয়ার পরে ভিড় বেড়েছে লাইব্রেরিতে। ছকু সাউ সাধারণ সম্পাদক। পল্টু মান্না সভাপতি। আর ব্যাঙা সেই ব্যাঙাই! তবু তার দরদ কমেনি। টিটকিরি মারলে সে বলে, মা সৎ মা হয়, বাবা কোনদিন সৎ বাবা হয়? বাবা তো বাবা-ই।

লোকে বলে, খাসা কথা। তা বাপু ব্যাঙা, তোমাদের ছকুবাবু যে লাইব্রেরির টাকা মেরে সব সাফ করে দিল। তোমরা কি তাহলে দালানটাকে পাহারা দেবা, বইয়ের বদলে থাক থাক ইঁট সাজিয়ে রাখবা? আগে খবরের কাগজ আসত তিনটা এখন আসে একটা—এটা কি নেয্য হ'ল?

ব্যাঙা কোন জবাব দিতে পারে না। ছকুকে বললে সে বলে, বাপের পেছনে ত্যানা নেই, বেটা তার বেলবটম্ পরে ঘোরে। এখন তিনটে কাগজের দামে একটা কাগজ—একথা কি পাবলিক জানে? তোর কাছে দেখি সবাই কাঁদে অথচ আমার কাছে কাঁদে না। কাঁদলে হারামিগুলোর চোপা ভেঙে দেব।

কথা-এখানেই শেষ নয়, আরো আছে। ছকু সাউ সদর থেকে ভিডিও এনে রিডিং রুমে বসিয়েছে। সবুজ পর্দা টাঙিয়ে এখন ভিডিও শো হয় দু'বেলা। বাংলা বইয়ের বাজার নেই, তাই হিন্দি বই। গভীর রাতে গাঁয়ের উঠতি চ্যাংড়াগুলো দশ টাকা রেটে টিকিট কেটে ব্লুফিল্ম দেখে। সেদিন থানার গাড়ি এসে পাছায় রুলের বাড়ি মেরে, হিপিচুলের মুঠি ধরে কয়েকটাকে তুলে নিয়ে গেল। তবু যদি শিক্ষা হোত! ছকুটার টাকার গরম। সে সব কটার জামিন এনেছে। সামনে ভোট। সে এখন জনপ্রিয় দলনেতা। ছেলেগুলো জেনেছে, এসব ব্যাঙার কাজ। ব্যাঙাটা ঈর্ষায় জ্বলছে। লাইব্রেরির ভাল হোক ব্যাঙা চায় না। চাইলে লাইব্রেরিকে এমন বাঁশ দেয়?

ব্যাঙাকে সন্দেহ করার অনেক কারণ আছে ছকুর। সেদিন কথায় কথায় ব্যাঙা বলল, রিডিং রুমে ভিডিও বসিয়ে তুমি ভাল করোনি ছকুদা। এতে গাঁয়ের মেয়েগুলো আর বই নিতে আসবে না। তাছাড়া হৈ-হট্টোগোলে আর যাইহোক পড়াশুনার কাজটা হয় না।

—কি আমার পড়াশুনো রে! ছকু শরীর বেঁকিয়ে সাপের মত মোড়া মেরে উঠেছিল। কে কত পড়ে সব আমার জানা আচে। সব তো কোকশাস্ত্র পার্টি। ওদের জন্যি অত ভাবলে লাইব্রেরির ইঁট বেচতে হবে।

ব্যাঙা বলেছিল, ভিডিও না বসিয়ে খেলার মাঠে তুমি কলকাতার যাত্রা আনতে পারতে, তাতে আরো বেশি লাভ হোত।

—লাভের গুঁড় পিঁপড়ে খায়। তাছাড়া যাত্রা আনবি টাকা কোথায়? তোর যত সব, ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা। বাজে কথা খালের জলে ফেলে দে।

এরপরে চটে উঠেছিল ব্যাঙা, চোখ-মুখ লাল করে বলেছিল, গাঁয়ের লাইব্রেরিতে এসব খ্যামটা ধান্দা ভাল দেখায়নি ছকুদা। তুমি এসব বন্ধ করো। এতে গাঁয়ের ক্ষতি। লোকে থুতু দেবে গায়ে।

ছকু নির্বিকার মুখ করে হেসেছিল। লোকেরই শুধু মুখ আছে, আমার কি মুখ নেই? লোক থুতু দিলে আমিও দেব। থুতুতে ভরিয়ে দেব হাটতলা। কথায় কথা বেড়ে যায়। লাইব্রেরির মেম্বার ভজন আসে হাঁপাতে হাঁপাতে। পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে সে বলে, আমি রিজাইন দেব। ছিঃ, এমন এললোৎ জায়গায় কেউ থাকে?

ছকু দমে না। চোখে আগুন ফুটিয়ে বলে, দে না রেজাইন। তোরা সবাই রেজাইন দিলে আমার কিচ্ছু যায় আসেনি। আমি যেই ছকু সাউ, সেই ছকু সাউই থাকব। খাল থেকে দু'ডিবা জল তুলে নিলে খালের জল কমে যায়, না শুকিয়ে যায়?

এরপরে ব্যাঙার কোন কথা থাকে না, দাঁতে দাঁত টিপে সে শুধু দাঁড়িয়ে থাকে। ভিডিওতে এখন গান হচ্ছে জমকাল। বই ভাণ্ডার মুখে। চোঙা মাইকে ফুঁ দিয়ে আওয়াজ পরীক্ষা করে কে যেন বলছে, আসন ভূমি মাত্র দেড় টাকা। চেয়ার তিন টাকা। আসুন, দেখুন মন মাতানো রঙিন হিন্দি ছবি। নাচে-গানে ভরপুর। ফাইটিংয়ে চুরচুর .... ইত্যাদি।

ছকু রাগে গজরাতে গজরাতে চলে গেলে ঘন অন্ধকার নেমে আসে পোলের উপর। সমুদ্রগামী বাসটা ধুলো উড়িয়ে যায় হাটখোলায়। খালের জলে তখন নীল বড়ি গুলো যাওয়ার মত আঁধার। ব্যাঙার মনে হয়, এই সব বাসগুলো হলো যত নষ্টের গোড়া। শহরের বদ হাওয়া বয়ে এনে উত্ত্যক্ত করে গাঁ। মাত্র আট মাইল দূরে শহর। শহরের কাছে গ্রাম হলে কি গ্রাম তার সতীত্ব হারিয়ে ফেলে শহরের হ্যাংলা কামুক ঠোঁটে, বিষাক্ত দাঁতের দংশনে?

রামুর চায়ের দোকানে কটাশ নিয়ে জোর আলোচনা হয়। ছকু আলোচনায় যোগ দেয় না। লোক বলে, কটাশ ঢুকেছে গো পটাশপুরে। সাবধান!

চা-দোকানী রামু বলে, কটাশের কয়রা চোখগুলান গোল-গোল, অবিকল মানুষের মত। খড়িবেড়ার ধারে আমি তাকে চরতে দেখেছি। কি বলব গো দাদা, কটাশ আমার কুঁকড়া ছাটাকে ধরে নিয়ে পালাল।

তারিণী খুড়া আফসোসের গলায় বলে, কি বলব গো দুঃখের কথা। আমার ঘরের মাদী হাঁসটা ডিম পাড়ছিল। ইয়া বড় বড় ডিম গো। কটাশ তার ডিম খেয়েছে। শেষে

কিনা হাঁসটারে নিয়ে পালাস।

রতন বলে, কটাশের ভয়ে আমার নোতুন বউটা সাঁন্ঝকালে গা ধুতে যেতে পারে না। কটাশটা বউটাকে ঝোপের আড়াল থিকে দেখেচে। বড় বে-শরম কটাশ গো! উয়ার কুনো লাজ-লজ্জা নেই!

সব শুনে ব্যাঙা বলে, ঘাবড়িওনা। আমি নাইলন রশা কিনেছি এক সের। ফাঁস বুনছি, দু'একদিনের মধ্যে হয়ে যাবে। এমন জব্বর ফাঁস বানাবো—কটাশটা একবার এট্‌কে গেলে ওর বাপের সাধ্য নেই যে পালায়!

তারিণী খুড়া বলে, কটাশ আমি জীবনে বহু দেখেচি বাপ। উগুলান বড় ইতর প্রাণী! সাবধানে ফাঁদ পেত বাপ। কেমড়ে দিলে রক্ত ঝরবে, উয়ার দাঁতে বড় বিষজ্বালা।

ভাকুর গামছায় বাঁধা তপ্‌ড়া মাছের শুকা, লাল আলু, কাঁচা মরিচ আর দু'পোয়া চাল। হাটে আজ ইলিশের চালান ছিল প্রচুর। বরফকল বন্ধ। মাছ চালান যায়নি। ভাকুর ইচ্ছে ছিল, একটা নোনা ইলিশ কেনার। কিন্তু হারমোনিয়াম বাজিয়ে, গান গেয়ে সে হাট-খরচের পয়সাটাও তুলতে পারেনি!

সাঁঝ লাগার মুখে ছকু এসেছিল। ভাকুকে মিষ্টি দোকানে ডেকে নিয়ে গিয়ে দুটো জিলিপি আর শ'গ্রাম বুঁদিয়া দিল। তারপর খিরিষ গাছতলায় দাঁড়িয়ে ভাঙাহাটের দিকে তাকিয়ে বলল, ইবার হাওয়া খারাপ ভাকু। তোকে ভোট নিয়ে গান বাঁধতে হবে যাতে আমরা জিতি।

ভাকুর অবাক করা চোখ-মুখ। দো-টানায় পড়ে বলে, অমন কঠিন কাজ কি আমার দ্বারা হবে?

—তোর দ্বারা না হলে বিশ্ব-সংসারে কারোর দ্বারা হবেনি। তুই শুধু বুক ঠুকে লেগে পড়। তোর হারমোনিয়াম সারানোর খরচ আমি দেব। এই নে ধর, আগাম দশটাকা।

ভাকু টাকাটা নিতে চায়নি, জোর করে হাতে গুঁজে দিল ছকু। বলল, আরো দেব। গান বাঁধ, তারপর।

বাঁধের উপর উঠে এসে ব্যাঙাকে কথাগুলো বলার জন্য চুলবুল করে ভাকুর ঠোঁট। তবু সে ব্যাঙাকে কথাগুলো বলতে পারে না, যদি কিছু ভাবে এই ভেবে নিজেকে লুকিয়ে রাখে যতনে। ব্যাঙা আর ছকুর সম্পর্ক আদায় কাঁচকলায়। এ গাঁয়ের সবাই জানে, ব্যাঙাটা বড় স্পষ্টবাদী। অন্যায় দেখলে সে তার নিজের বাপকেও ছাড়ে না।

বাঁধের উপর পাশাপাশি হাঁটে ওরা দু'জন। দু'ধারে বাবলা আর টেঁকাটি গাছের বেড়া। ফণীমনসার ঝোপ নুয়ে পড়েছে পথের ধারে। তাদের কাঁটা বোঝাই গাছগুলোয় পা পড়লে আর রক্ষে নেই! ব্যাঙা ভাকুর হাতটা ধরে টেনে আনে মাঝপথে। আবার ঘাড় ঝুঁকিয়ে ধীরে-ধীরে হাঁটতে থাকে ওরা। কিছুটা এসে ভাকু বলে, ব্যাঙাবাবু এট্টা নিবেদন আচে। বলেই সে অভ্যাসমত ব্যাঙার মুখের দিকে তাকায়, গাঁয়ে আর ভাল লাগেনি থাকতে, আমি ইবার শহরে চলে যাবো। এখানে থাকলে পেট চলেনি, কতদিন আর আধপেটা খেয়ে বাঁচব?

গিরি পুকুরের কাছে দাঁড়িয়ে ব্যাঙা একটা বিড়ি ধরানোর চেষ্টা করে। খালধারের হাওয়ায় ম্যাচিস কাঠি বার বার নিভে যায়। ভাকু বলে, আমায় দাও দেখি ধরাতে পারি কিনা।

একবার ঘষা মারতেই বারুদ জ্বলে ওঠে। ব্যাঙা বলে, তোমার হোত গো ভাকুদা, শুধু ভগবান তোমার চোখ দুটাই কেড়ে নিল।

ওরা যখন কথা বলছিল তখন জেলে বস্তির মাথার উপর কাজুবাদাম রঙের চাঁদ। উল্টা পাল্টা হাওয়ায় খালের জলে ধবলা মেঘের সাঁতার কাটার শব্দ। ব্যাঙার খুব আপসোস হয়—ভাকুটা এমন দৃশ্য দেকতে পায় না বলে।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছে অহল্যার। রাতে সে সাবু ফোটান নয়, তর্কি (তরকারী) দিয়ে ভুজা (মুড়ি) খেল। অনেক রাতে ভাকু যখন হারমোনিয়াম নিয়ে দাওয়ায় এসে বসল তখন জ্যোৎস্না বান ডেকেছে জেলে বস্তিতে। আকাশের চাঁদটা ঘুরতে ঘুরতে ঠিক একেবারে তরলা বাঁশঝাড়ের ডগালে। কঞ্চি আর বাঁশপাতার ছায়ায় চাঁদটাকে বড় দুঃখী মনে হয়, যেন ঠিক তার বোনেরই মত। অহল্যার ঘুম আসছিল না বলে সে তার দাদার পাশে এসে বসে। অমনি ভাকু হাতড়ে অহল্যার হাতটা ধরে, গায়ের তাপ পরখ করে বলে, জ্বর নেই তো! কাল তোরে আমি ভাত দিব। আজ রাতটা কষ্টে মষ্টে চালিয়ে দে। আমি বুঝিরে, ভাত না হলে মানুষ দম পায় না।

অহল্যা চুপ করে থাকে। পুরো জেলেবস্তি যেমন থমথমে তেমন থম্‌থমানো গম্ভীর ভাব তার চোখে মুখে। জ্বর ছাড়তে মাথার ভার লাঘব হয়ে মনটা বেশ ফুরফুরে লাগে। ধারালো চোখে-মুখে এত কিছুর পরেও তেলঘাম প্রতিমার লাবণ্য। ভাকু দেখতে পায় না, শুধু ছুঁয়ে ছুঁয়ে অনুভব করে কত সুন্দর বোন তার। দু'বেলা যদি দু'মুঠো খেতে পেত তাহলে ছড়ছড়ে ইল্‌শা মাছের চেয়েও ডগ্‌মগ্‌ স্ফূর্তির ডিঙা হোত। সমুদ্রধারে ঘর। বস্তি যখন ঘুমিয়ে পড়ে, সমুদ্র তখন জেগে পাহারা দেয় ঘরগুলো। অবিরাম সমুদ্র ঢেউয়ের আছাড় পাছাড় শব্দ। রাত বাড়ে, সমুদ্র কখনো দু'চোখের পাতা এক করে না। দিনভর রাতভর জেগে থাকে। জেগে জেগেই হাওয়াকে সে তার সুখ-দুঃখের কথা বলে। আগে রোজ অহল্যা আর কমলা যেত সমুদ্রধারের মাছখটিতে মাছ বাছতে। কমলা মাছ বাছার কাজ ছেড়ে দিল হাসতে হাসতে। অহল্যাও সেই থেকে আর যায় না। সমুদ্রধারে গেলে বাবার কথা তার খুব মনে পড়ে। সে তখন খুব ছোট, সবে জ্ঞান পড়েছে। তার বাবা সমুদ্রে গেল ইলিশমারীর জাল নিয়ে। তিনটা নৌকা পাশাপাশি। সাথে সাতদিনের চাল-ডাল-জল সব। নিম্নচাপে সমুদ্র হ'ল উথাল-পাথাল। নৌকা ডুবল। কেউ ফিরে এল না। বালুচড়ায় অহল্যা তখন বুকে গামছা জড়িয়ে খেলছে, ঝড় জল সরে গিয়ে রোদ উঠেছে কমলালেবুর মত। বস্তির মুরুব্বীদের মুখ থেকে সর্বপ্রথম দুঃসংবাদটা বয়ে আনে ভাকু। ঘরে এসে বলতেই সমুদ্রপানে মুখ চেয়ে জ্ঞান হারায় তার মা। বুড়া কবরেজটা খবর পেয়ে আসে। নাড়ি টিপে বলে, ভাকুরে, সব শেষ। ইবার তোরা ভাই-বোনে অনাথ হলি, নিজেরা নিজেদের সামলা।

সেদিনের কথা এখনও মনে আছে অহল্যার। জ্বর-জ্বালা হলে এসব কথাই বেশি করে তার মনটাকে খুব্লায়।

আজ সকালে কমলা এসেছিল দেখতে, হাতে এক ঠোঙা নেশপাতি। ঘরে ঢুকেই সে কটূ মন্তব্য করল, একি হয়েছে রে তুর চেহারা! ভাকুদা বুঝি তোরে খেতি দেয় না? চোখের কোণে কালি পড়েচে, গাল মুখ বসে গিয়েচে। কিরে জ্বরের মধ্যে তোর বুঝি শরীল খারাপ?

সহসা অহল্যা কোন উত্তর দিতে পারেনি। পরাণদা ছিল মাটিব চেয়েও ঠাণ্ডা মানুষ। সমুদ্র তাকেও খেল। তবু কমলা তার শাঁখা ভাঙেনি, সিঁদুর তোলেনি। শাঁখা-সিঁদুরের দোহাই দিয়ে সে যা এখন করে বেড়ায় তা চোখে দেখাও পাপ। অহল্যা কিছু বললে কমলা হাসে। তার চোখের কোণে এক তিল দুঃখ নেই, একধরণের বন্য আদিমতা। বিল-ভাসা মাছের মত কমলা এক জায়গায় তিষ্ঠুতে জানে না, থিতু হতে জানে না। সে হাসতে হাসতে চোখের তারা নাচিয়ে বলে, যতদিন যৌবন, ততদিন মৌ-বন। মধু ফুরালে কেউ তোরে পুছবেনি। তখন চোয়াল বসবে, মাথার চুল ফাঁকা হবে, গা-গতরে চর্বির চাদর। সমুদ্র কাছিমগুলার মতন তুই নড়তে-চড়তে পারবিনি। সবাই তোরে লাথ মেরে চলে যাবে। তখন পারবি সইতে, পারবি চোখের জল এঁট্‌কাতে? পারবিনে। আমি তো মেয়ে, সোমত্ত মেয়ের মন বুঝি। কথা শেষ করেই দুটো দশ টাকার নোট অহল্যার হাতে গুঁজে দিয়েছিল কমলা। নিচু স্বরে বলেছিল, নে, টাকাগুলান যত্ন করে তুলে রাখ। ভাকুদার এখন ইনকাম খারাপ। তোরও ভাল-মন্দ খাওয়ার দরকার। এ সময় টাকাগুলান কাজে লাগবে।

—এ কার টাকা? তুমি কি আমাকে হাওলাৎ দিলে? অহল্যার কথা শুনে কমলা খিল খিল্ করে হাসে, তার নাভির নিচে সমুদ্রফেনার চেয়েও নরম মাংসগুলো থল্ থল্ করে নড়ে। অহল্যা দেখে, স্বপ্ন দেখার মত মনে হয় তার। ক'বছরে কমলার কত পরিবর্তন! পরাণদা বেঁচে থাকতে তার চেহারা ছিল লহরা-শুখার মত চিমড়ে! এখন যেন টক-রশায় ভেজানো রূপা-পাটিয়া মাছ। শুধু শাড়ি পরা নয়, নখ চুল সবখানেই তার পরিবর্তন।

টাকাটা ঘুরিয়ে দিয়েছিল অহল্যা। বলেছিল, দরকার নেই দিদি। হাওলৎ নিলে দেব কি করে? তুমি তো ভাল মতই জান দাদার কত আয়!

কমলার হাসিটা উত্তরোত্তর বাড়ছিল, এ টাকা তোকে ফেরৎ দিতে হবেনি। এটাকা তোর টাকা।

—আমার টাকা!

—হ্যাঁ রে, তোর টাকা! তুই তো ইবার মহারাণী হবি। ছকুবাবুর নজর পড়েচে তোর উপর। আমারে বলেচে, রাখ্‌নী রাখবে তোকে। তুই রাজি হলে চালাঘর ভেঙে টালির ঘর তুলেদেবে ইখানে।

কমলা প্রস্তাবটা দিয়েই হাসতে-হাসতে চলে গিয়েছিল, অহল্যার তখন ফাঁকা ঘরে

গলায় ফাঁস গলিয়ে ঝুলে পড়তে মন চায়। জেলে বস্তিতে ছকুবাবুর ঘোরা-ফেরাটা ইদানীং খুব বেড়েছে। সামনে ভোট বলেই তার সব অজুহাত মানিয়ে যায়। কিন্তু অহল্যা কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারে না ধূর্ত লোকটাকে। শয়তানের চোখ দেখলেই তার খিদের পরিমাণটা বোঝা যায়। ছকুবাবু ভাবে, অহল্যা হয়ত আকাশ-খোলা সমুদ্র, লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে সাঁতার কেটে মজা লুটতে চায়। জুড়াতে চায় কাম-যাতনা।

যত রাত বাড়ে চাঁদটা সমুদ্রে ঘুরতে আসা মেম-সাহেবের মত ধব্ধবিয়ে হেসে ওঠে আকাশে। চাঁদের আলোয় বাঁশঝাড়, কচুবন, পথঘাট এমন কি ডাঙাপড়িয়ার মাঠটাও ছবির মত দেখা যায়। এমন জ্যোৎস্না রাতে অহল্যাদের চালাঘরটার কংকাল শরীর দেখা যায়। হাওয়ায় মড়মড়িয়ে ওঠে পচা বাঁশ। বিচুলি উড়ে যায় বাতাসে। ভাকু হারমোনিয়াম বাজিয়ে গুন গুন করে সুর ভাঁজে। ছন্দ পটিয়ে সে গানের কলি বানায় আপন মনে। 'দীন-দুঃখীকে কম্বল, চিড়া-ভেলি গুড়। ছকুবাবুর দয়াল শরীল নিবাস পটাশপুর।' গানের কথাগুলো অহল্যার কানে গেঁথে যেতেই ভয়ার্ত চোখে দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভাকু হারমোনিয়ামের ব্লো-করা থামিয়ে শুধোয়, হ্যাঁরে, কেমন লাগল সুরটা?

অহল্যা হাঁপায়। রাগে উত্তেজনায় তার ঘেমো শরীরটা ধুঁকায়। কোনমতে শ্বাস টেনে নিয়ে সে বলে, দাদা গো, এ গান বাঁধা তোমার ঠিক হয়নি! যে মানুষটা মানুষকে সাঁতায়, (উত্যক্ত করে) তাকে তোমার গলার সুরে ঠাঁই দেওয়া পাপ। এ গান তুমি গলা থেকে মুছে ফেল নাহলে জ্যোৎস্নার রঙও কালো হয়ে যাবে।

এমন জোরালো প্রতিবাদ অহল্যার কাছ থেকে আশা করেনি ভাকু। কিছুটা অপ্রস্তুত গলায় সে বলে, ছকুবাবু আমায় টাকা দিয়েচে। বলেচে, ভোটের গান বেঁধে দিলে তোরে অফিসের কাজে ঢুকিয়ে দেবে। এমেলের সাথে তার কতো জানা-শোনা। এ মাসের একুশ তারিখে মিটিং আছে হাটখোলায়। তখন গানগুলো গাইতে হবে আমাকে। এমেলে সাহেবের পছন্দ হলে তোর চাকরী একেবারে পাকা।

অহল্যা ফুঁপিয়ে ওঠা গলায় বলে, আমি বুঝি তোমার পথের কাঁটা? নাহলে শেষ পর্যন্ত তুমি ছকুবাবুর পায়ে মাথা নোয়ালে? যে মানুষটাকে ঘেন্না করতেও ঘেন্না হয় শেষ পর্যন্ত তুমি তার হাতে হাত মেলালে?

ভাকু অহল্যার প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারে না। শুধু কাঁপা হাতে অহল্যার হাতটা ধরে বলে, সব তোর জন্যি বোন। আমি তো দু'চোখে দেখি না, অন্ধ। আমি না থাকলে কে তোকে দেখবে?

অহল্যা কঠিন গলায় বলে, সব মানুষের চোখ থাকে না দাদা। চোখ থাকলেই মানুষ মানুষ হয় না। তোমার চোখ নেই বলে আমার কোন দুঃখ নেই বরং গর্ব হয়। যারা চোখ থাকতেও অন্ধ তুমি তো তাদের মত নও। মাটিরও তো চোখ নেই, তুমি কি ভাবো মাটি দেখতে পায় না?

হারমোনিয়ামটা বুজিয়ে রেখে হু-হু করে অনুশোচনায় ডুকরে ওঠে ভাকু। বলে, চুপ কর অহল্যা, এসব কথা আমি আর সহ্য করতে পারি না। আমি এতদিন ভেবেছি চোখ

গিয়েচে—আমার কাছে পাপ-পুণ্য সব সমান। আজ আমার সেই ভুলটা ভেঙে গেল।

শুয়ে পড়তেই কটাশের গন্ধটা পেল অহল্যা। ভীতু বুকে বাইরে এসে দেখল কটাশ এসেছে। তার চোখ দুটো জ্বলছে, গায়ে বোট্‌কা আঁশটে গন্ধ। কটাশটা কুক্ কুক্ করে ডাকে। ডাকতে ডাকতে এগিয়ে যায় বাঁশঝাড়ের দিকে। অহল্যা দেখল—কটাশের পিছে আর একটা কটাশ। চাঁদের আলোয় তারা জড়াজড়ি করে শুয়ে পড়ল বাঁশপাতার বিছানায়। গর্জে ওঠা সমুদ্রের তেজ নিয়ে ঢেউ ভাঙল শরীরের।

অহল্যার চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল চুয়ায়। কটাশের তীব্র গন্ধটা জ্বালা ধরিয়ে দেয়। নাকে আঁচল চাপা দিয়ে সে ফিরে আসে বিছানায়। সারারাত দু'চোখের পাতা এক হয় না।

একুশ তারিখে এম-এল-এ আসার কথা ছিল, তার সাতদিন আগেই নিম্নচাপ হয়ে গেল সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায়। নিম্নচাপের পরে হতশ্রী গাঁগুলোর দিকে তাকানো যায় না। সর্বত্র ধ্বংসলীলার চিহ্ন, শ্মশান হয়ে গিয়েছে গাঁখানা। যে গাছগুলো এতদিন বিশ্বাস নিচ্ছিল, তারাও ধরাশায়ী। শুধু গাছ নয়—মানুষও ছিন্নমূল। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে ভাকুর। চালাঘরটা ভেঙে পড়েছে মুখ থুবড়ে। ভাকুর হারমোনিয়ামটাও ঝড়-জলে রুটির মত ফোলা, বহু কষ্টে সুর বের হয়।

তিনদিন বড় ইস্কুলের বারান্দায় কাটিয়ে ভাকু যখন জেলে বস্তিতে ফিরে এল তখন চারধারে রোদ উঠেছে সর্ষে ফুলের দ্যুতি নিয়ে। অহল্যার হাতে ভাঁজ করা একটা পলিথিনের ত্রেপল। পঞ্চায়েত থেকে দিয়েছে। ছকু দাঁড়িয়ে ছিল পাকার পোলটার কাছে। একলা বিড়ি ফুঁকছিল। পাশ দিয়ে অহল্যা যেতেই ছকু বলল, দাঁড়া কথা আছে।

অহল্যা দাঁড়াল। চোখে মুখে তার উদ্বেগ, উষ্মা।

ছকু বলল, দুটা মুনিষ পাঠিয়ে দিয়েচি। তারা খেটে খুটে তোদের চালাটা তুলে দেবে। পলিথিনটা চালের উপরে বিছিয়ে দিবি, দিব্যি চলে যাবে। উপর থেকে টাকা আসলে শ'টাকা তোকে পাইয়ে দেব। আর হ্যা, শুন্—কমলাটা বড় ধড়িবাজ। তার সাথে তুই মিশ্‌বিনে। গাঁয়ে তোর একটা প্রেস্টিজ আছে। বেশ্যার সাথে মিশলে লোকে তোকেও বেশ্যা ভাববে।

ঝাঁ ঝাঁ করছিল অহল্যার কান। পলিথিনটা বুকে চেপে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল ঘরে। ছকুবাবুর চোখ দুটো তাকে যেন তাড়া করেছে! চালাঘরের ভাঙা খুঁটিতে হেলান দিয়ে সে চোখ ভাসিয়ে কাঁদল।

কমলা জল নিতে এসেছিল সরকারি কলে। অহল্যাকে দেখতে পেয়ে সে এগিয়ে এসে বলল, তোর দুঃখ চোখে দেখা যায় না। চ আজই তোকে শহরে নিয়ে যাব। দুহাত ভরে পয়সা কামাবি—তখন তোর কোন অভাব থাকবে না। ঠাট্‌সে খাবি ঠাট্‌সে ঘুরবি। ছকুবাবুর কপালে তখন তিন লাথ।

দুপুরে হাঁড়ি চড়েনি, চিড়া আর ভেলিগুড় মেখে খেয়েছে ভাই-বোনে। ভাকু বলে, যা না অহল্যা, ছকুবাবুর কাছ থেকে দশটা টাকা হাওলাৎ নিয়ে আয়। বলবি,ভোটের

গান গেয়ে আমি টাকা শোধ করে দেব।

অহল্যা ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে বলে, মরে গেলেও আমি সেখানে যাব না। তুমি কি চাও টাকা হাওলাৎ আনতে গিয়ে আমি নিজেকে হারিয়ে আসি?

—এ কি বলচিস?

—ঠিক কথা দাদা। ছকুবাবুর জন্য আমি পুকুরঘাটে নাইতে যেতে পারিনে। ও আমার গায়ে কাদা ছুঁড়ে মারে। গম পিষতে আটা কলে যেতে পারিনে। ও আমাকে জোর করে পানের খিলি হাতে গুঁজে দেয়। গিলে খেয়ে ফেল্যার মত তাকায়। এরপরেও তুমি কি করে গাও—'পিতার নাম হেমন্ত সাউ চালের কারবারী / ছেলে তার ছকু সাউ ভোটের বেপারী / বাবু, ভোট দিন গো—গাঁয়ে রাস্তা হবে....।' রাগে গন্‌গন্‌ করে অহল্যার মুখ, সে ক্ষমাহীন চোখে তার দাদার দিকে তাকায়। মুখ থুবড়ে ভেঙে পড়া চালাঘরটার চেয়েও ভাকু যেন বিপর্যস্ত, অসহায়।

ভাকু আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কাচুমাচু মুখে বলে, যেমন দেশ— তেমন ভেশ। আমি তালে তাল মিলিয়ে চলতে চেয়েছি। এখন তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে আমি নিজের অস্ত্র দিয়ে নিজের গলা চুপিয়ে চুপিয়ে কেটেছি। অহল্যারে, আমার সাজা হওয়া উচিত। আমার গলার সুরে লোভ লালসার বেসাতি। তুই আমাকে ক্ষমা কর বোন, নাহলে নরকেও আমার জায়গা হবেনি।

অহল্যা বলে, ক্ষমা বড় কথা নয় দাদা, তুমি যা করেছ—না বুঝেই তো করেছ। মনের শুদ্ধি হলে ক্ষমার কোন প্রশ্নই আসে না।

সাঁঝ লাগার মুখে কমলা আবার এল। সে আসলে সুগন্ধের ঢেউ বয়ে যায় চালাঘরে। ওর মুখে, গলায় পাউডারের ছোপ। পরণে আগুন রঙের শাড়ি, গায়ে দামী একটা ব্লাউজ। অহল্যা দেখল, কমলার পায়ে নতুন ভেলভেটের একটা চটি। চটিটা এই নোনা ধুলোয় মানায় না। কমলাকে দেখা মাত্রই ধক্‌ধকিয়ে ওঠে অহল্যার বুক।

কমলা ঠোঁটে হাসি ঝরিয়ে বলে, চল্‌ না অহল্যা, কেষ্টযাত্রা শুনে আসি। পশ্চিম পাড়ায় জানা দুয়ারে হচ্চে। শহরে দল গাইবে ভাল, চল।

অহল্যা ইতস্তত করে, তার কোন অজুহাত কমলার কাছে ধোপে টেকে না। কমলা জলোচ্ছ্বাস হয়ে ভাসিয়ে দেয় তার অনিচ্ছা। দ্রুত শাড়ি বদলে, ঘরের শিক্‌লিতে কুলুপ এঁটে চালাঘরটাকে পিছনে ফেলে তারা উঠে আসে বাঁধে। শস্যভরা মাঠের চেয়ে কমনীয় তাদের দেহ, চাঁদের আলোয় পরীর মত দেখায়। কিছুটা হেঁটে এসে দুঃখী গলায় কমলা বলে, কটাশটা বড় জ্বালায় রে, তারে আমি সাজা দিতে পারিনে। আমি নিজেকে বড় ভালবাসি, তাই ঝুঁকি নিতে গেলে কল্‌জেটা কাঁপে। ভাবি, সুখের দানা যদি আমায় ছেড়ে যায়।

অহল্যা চুপচাপ শোনে কথাগুলো। শক্ত চোখে সে একবার কমলার দিকে তাকায়। কমলার গাল ছাপিয়ে গলন্ত মোমের মত নেমে আসা চোখের ধারাগুলো তার চোখটাকেও অস্বস্তিতে ফেলে দেয়।

সে ধরা গলায় শুধায়, তুমি কান্‌চো কমলাদি, চলতে চলতে তোমার আবার কি হল?

হাতের উল্টো পিঠে চোখের জল মুছে নিয়ে মলিন হাসে কমলা, আজ কেষ্টযাত্রা। অভাগী রাধিকা কাঁদবে না কি হাসবে? সেকালের রাধা আর আজকের রাধার কত ফারাক বল্ দেখি? একজন বাঁশি শুনে পাগল, অন্যজন পেটের জ্বালায় পাগল। একজন কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা, অন্যজন পয়সার প্রেমে বেশ্যা। একজনকে সবাই পুজো করে, অন্যজনকে লোকে থু থু করে। এরপরে তুই বল্ অহল্যা, আমি কাঁদব না হাসব?

কথায় কথায় পথ ফুরিয়ে আসরে পৌঁছে যায় ওরা। আসরে ঢোকার মুখে ছকুবাবুর সাথে কমলার চোখে চোখে হাসি বিনিময় হয়। শরীরে ঢেউ তুলে নিজের জায়গাটা নিয়ে পৌষবুড়ির মত গ্যাঁট্ হয়ে বসে থাকে কমলা। হাঁটু মুড়ে অহল্যা বসে তার পাশে। তার আয়ত প্রসারিত মুগ্ধ দু'চোখ কৃষ্ণের দিকে নিবিষ্ট। পুষ্পশোভিত দোলনায় দোল খাচ্ছে রাধা এবং কৃষ্ণ। বাঁশীর সুর বাতাসের ডানায় ভর করে সমুদ্রপাখির মত উড়ে যাচ্ছে অনন্ত দিকচক্রবালে। বাতাসে শীতের মূর্চ্ছনা, চরাচরে কমল সুভাষিত স্নিগ্ধতা। সখি পরিবৃতা মধুবন গানের হিল্লোলে মোহিত। ....'আজ কেন গো নিধুবনে/রাধা-কৃষ্ণ একাসনে/ দোলনায় সুখে নিদ্রা যায় গো/ নিদ্রা যায় গো-ও-ও।' গানের সুরে বুঝি যাদু-তন্ময়তা আছে। অহল্যা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিল প্রশস্তিকথন। তখনই একটা খোলামকুচি কেউ তার বুকের উপর ছুঁড়ে মারে। লজ্জায় রাঙা হয়ে যায় অহল্যার মুখ। সে আর মুখ তুলতে পারে না, চোখের তারায় রাজ্যের জড়তা নিয়ে সে আর কৃষ্ণে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে না। তার চোখ নেমে আসে মাটির দিকে, ছুঁয়ে দেওয়া লজ্জাবতী লতার মত সে আর নিজেকে স্বাভাবিকভাবে মেলে ধরতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ যখন কদম্বের ডালে বসে বাঁশি বাজাচ্ছে তখন ছোট একটা গ্যাংটা গুঁড়ি তার মাথায় ধপ্ করে এসে লাগল। হলুদ গোল পাথরটা কাঁঠালীচাপা ফুলের মত বেঁধে থাকে চুলে। এবারের আঘাতটা আগের তুলনায় জোরে। অহল্যা পাথরটা চুলের ভেতর থেকে নিকি খোঁটার মত খুঁটে এনে রাগত চোখে পিছনে ফিরে তাকায়। সে দেখে, ছকুবাবু একদম পিছনে দাঁড়িয়ে গোগ্রাসে তাকিয়ে আছে তার দিকে। চোখা-চোখি হতেই হাতের ইশারা করে ছকুবাবু তাকে ডাকে। অহল্যা ঘেমে যাচ্ছিল, গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল ক্রমশ। রাধিকা যখন যমুনাঘাটে চুপিসারে জল আনতে যাচ্ছে তখনই তৃতীয় ঢিলটা ঠিক তার পিঠের উপরে পড়ে, একেবারে শিরদাঁড়ার মাঝখানে, কনকনিয়ে ওঠে সর্বশরীর। তাকিয়ে দেখে—ছকুবাবু হাসছে, তার হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। ঝ্যাঁকা খেয়ে উঠে দাঁড়ায় অহল্যা। কমলা শুধায়, কোথায় যাচ্ছিস একা একা? দাঁড়া আমিও যাব।

অহল্যা দাঁড়ায় না, রাগে হনহ্নিয়ে বেরিয়ে আসে আসর থেকে। আর একটু হলেই ঝোলান হ্যারিকেন-লাইটটায় ঢুকে যেত তার মাথা। এক পাগল নেশায় ঠোঁট কামড়ে সে ছকুবাবুকে খোঁজে। দেখতে পায় না। বড় বিমর্ষ দেখায় তাকে। উত্তেজিত, অস্থির শরীরটাকে সে কোনমতে টেনে আনে বাঁধের উপর। বুকে হাত দিয়ে সে বুঝতে.পারে—

এতক্ষণের চাপা উত্তেজনায় তার ঘুঘুপাখি নরম কবোষ্ণ বুক দুটো ময়দালেচির মত নরম হয়ে ভিজে গিয়েছে। অহল্যার বুক ছাপিয়ে বেরিয়ে আসে সমুদ্র নিঃশ্বাস। হাঁটুর উপর শাড়ি তুলে সে সরসরিয়ে নেমে যায় খালের জলে। হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে মাথায় চোখে মুখে জল দেয়, দেহ শীতল করে। বাঁধে উঠে এসে সে আবার ছকুবাবুকে খোঁজে। জ্যোৎস্নার আলোয় বুকে থোড় আসা আমন ধানক্ষেত ছাড়া সে আর কিছু দেখতে পায় না। জ্যোৎস্নায় একা হাঁটতে থাকে অহল্যা। গিরি পুকুরের খড়িবেড়ার ধারে সে হঠাৎ দেখতে পায় কটাশটাকে। ক্ষুধায় চোখ জ্বলছিল পশুটার। অহল্যারও চোখ জ্বলছিল দীর্ঘদিনের সংযত ক্ষুধায়। সে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কাঁপা গলায় শুধায়, কি চাও।

পশুটা ঘাবড়ায় না, হাত ধরে টানে। মোলায়েম গলায় বলে, কমলার কাচে শ'টাকা দিয়েছি। কাল সকালে সে তোকে দিয়ে দেবে। আয়....

অহল্যার বুক কাঁপছিল। তবু সে শুধায়, কোথায়?

সাহস পেয়ে কটাশটা তাকে টেনে নিয়ে এল কাঁটা বাঁশঝাড়ের পেছনে। পাতার বিছানায় খসর খসর শব্দ হয়। আকাশের চাঁদ লুকায় লজ্জায়। ধানক্ষেতের হাওয়া থেমে যায়। খালের জল ঢেউহীন। সমুদ্র থেকেও ভেসে আসে না জলোচ্ছ্বাস। যেটুকু বাতাস ছিল তাতে শুধু কটাশের দুর্গন্ধ।

হুঁস ফিরতেই কঠিন ঠোঁট নাড়িয়ে অহল্যা বলে, তোমার টাকায় আমি ছেপ ফেলি। টাকায় সমুদ্রের মাছ পাওয়া যায়, মেয়েমানুষ নয়। তুমি আমাকে ছুঁয়ো না, দূর হটো।

কটাশ বলে, আমি কৃষ্ণ, তুই রাধা। এই বাঁশবন পটাশপুরের মধুবন। আয় বুকে আয়।

ধীরে ধীরে পা টিপে টিপে এগিয়ে যায় রাধা। তার লাজুক চোখে অভিমানী অশ্রুধারা। বাঁশবন নৈঃশব্দময়। দু'হাত দিয়ে টেনে নামায় পুরুষ দেহলতা। ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, আসো, তোমারে আমি চুমা দিই।

তখনই বিনা মেঘে গর্জে ওঠে বজ্র। চাঁদ ঢাকা পড়ে মেঘের আড়ালে। ধানক্ষেতে দৈত্য হাওয়ার উৎপাত। বাঁশঝাড়ে গঙিয়ে ওঠে কটাশ। বলে, ছাড় ছাড় অহল্যা, তুই যে আমার গালের মাংস তুলে নিলি? রক্তে ভিজে যায় ডুমুরের পাতার মত খসখসে গাল। হাতের চেটো গালে চেপে হি-হি করে কাঁপতে তাকে পশুটা। অহল্যার রাগ তখনো পড়েনি, রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে সে বলে—যাও, ক্ষমি করে ছেড়ে দিলাম। এবার গাঁয়ের সবাই তোমাকে চিনবে। শত মলমেও এ দাগ মেলাবেনি।

বাঁশঝাড়ের সরু ঘিঞ্জি পথ দিয়ে প্রাণের দায়ে ছুটতে থাকে পশুটা। তার মুখে একটাই কথা, রাক্ষুসী আমায় খেয়ে নিল গো....! হাসতে গিয়ে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে অহল্যা, তখনো তার দাঁতে রক্তের নোনা স্বাদটা লেগে আছে।

তিনদিন পরে হাটতলায় ব্যাঙার সাথে দেখা হয় ছকুর। ব্যাঙা অবাক হয়ে শুধোয়, ছকুদা, তোমার গালে উটা কিসের ঘা গো?

ছকু চোখ নামিয়ে নেয় লজ্জায়। কোনমতে বলে, কটাশ ধরতে গিয়েছিলাম। কটাশে

কামড়ে মান্‌সো তুলে নিয়েচে।

ভাকুটা হাটতলায় খালি গলায় গান গায় আর দোকান-দোকান ভিখ মাগে। শুধু গানের ভাষাটা সে একটু বদল করে নিয়েছে—পুকুরেরি পাড়ে, কাঁটাবাঁশের ঝাড়ে / কটাশ বসিয়াছিল / হংসী আসিয়া দংশী দিল / ডুমুর খস্‌খসিয়া গাল গো-ও-ও, ডুমুর খস্‌খসিয়া গাল।

পোকাপার্বণ

লারাণীর হা পাটিটা বড়, লোকে তাকে বলে রাক্ষুসী। তার বুড়ি মা বলে, মেয়েমানসের উঁচকপালী মুখ হলে সেই মুখ বড় কু' গায়। লারানীরে, তোরে আমি কত করে বলেচি— অমন ধেই ধেই করে উধ্‌বেড়ালের মতন ঘুরবি নে। শরীল সোমত্ত হলে নিজেরে বাঁধ দিয়ে এটকে রাখতে হয় নাহলে শুক্‌নো ডাঙায় আচাড় খেয়ে মরতে হয়।

বুড়ি মায়ের কথাকে একদম গ্রাহ্য করে না লারাণী, সে হাসে—আর হাসির সাথে সাথে তার আইবুড়ো মুখের দাঁতগুলো লাল মাড়ি দেখিয়ে হা পাটিটাকে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখানোর মত উন্মোচিত করে দেয়। তার বুড়ি মা তখন তেতে উঠে বলে, ঢাক-রে, ঢাক। অমন অলুক্ষুণে হাসি আর হাসিস নে। অমন হাসি হাসলে ধরিত্রী মা ফেটে যায়, জ্যাতা গাছ শুকিয়ে যায়।

বুড়ির একমাত্র মেয়ে লারানী; তার জন্য বুড়ির শুকনো, চিমড়ে বুকে এক ফোঁটাও দয়া-মায়া নেই। থাকবে কেন? যে মেয়ে ডাগর বুক নাচিয়ে ধেই ধেই করে পাড়া চষে, সামন্তদের পুকুরে গিয়ে দুপুরভর সাঁতার কাটে, যে কিনা মহোৎসব খেতে একা একাই মাইল তিনেক পথ চলে যায়—সেই গাছে চড়া দস্যি মেয়েকে সামলে রাখা বুড়ির কম্মে কুলায় না।

হাড়িপাড়ায় গোটা বারো চালাঘর, একেবারে টেঁরের ঘরটা হল বুড়োর খোলঘর। খোলঘরে খোল সারে হলা, তার বয়স পঞ্চাশের উঁপরে—দেখলে মনে হয় ধুঁকো মানুষটা ঘাটের মড়া। তার ব্যাটার নাম পবনা, সে হলো তাগান মাস্টার—এ অঞ্চলের মানুষ ভাগাড়ে চটজলদি চামড়া ছাড়ালে তাকে উপহাস করে কিংবা উৎসাহ দিয়ে 'তাগান মাস্টার' ডাকে। পবনার এখন সময় জোটে না। সিজিনে সে ঢাক-ঢোল বাজায়, মহাদেব-মন্ডপ বাজিয়ে সদরে চলে যায়, সেখানে তার সরকারী কোয়ার্টার আছে, জেলা হাসপাতালের সে ঝাড়ুদার। তবু হলা বুড়োর সংসারে পচা ভাদোরের ধারার মত অভাব লেগেই আছে, সেখানে পবনার ভূমিকা ছাই ফেলতে ভাঙা কুলোর মতও নয়।

হলা বুড়োর খোলঘরে লারানীর বাকি সময়টা কাটে, হলা বুড়োকে সে খুড়া বলে। তামাক সাজা, বিড়ি ধরানোর জন্য কাঠ কয়লার আগুন, তৃষ্ণার জল এমনকি খোলমাটিটা পর্যন্ত লারানী হলা বুড়োর হাতের সামনে যোগাড় করে এনে দেয়, তার খুব ভাল লাগে খুড়ার খোল সারানো দেখতে।

খোলঘর দোচালা, চারধারে হাত চারেক উঁচু কাঁথ দেওয়া দেওয়াল—ফলে হাওয়া আর আলো ঢোকে ভুসভুসিয়ে। খোলঘরের পিছনে ধানী জমিন, বিঘা দশেক.পথ হাঁটলেই ডাঙা পড়িয়ার মাঠ—যেখানে লারানীর বাবাকে দাহ করেছিল গাঁয়ের লোকজনে। খোলঘরের

ডান হাতে কাঁচা কলাঝাড়, কলাঝাড়ের শিকড় ছুঁয়ে দশ কাঠা জল—পুকুরটা এত গভীর যে আস্ত একটা বাঁশ ডুবে যায়, খরানীতে যখন মাঠপুকুরগুলো শুকিয়ে যায় তখন হলা বুড়োর পুকুরে চেত্তলমাছ ডাকে, কাঁচা টাকার মত আঁশ গায়ে নিয়ে পাকুড়িয়া কাতলামাছ খাবি খায়। লারানীর ঘরে সময় কাটে না তাই এসব দেখে হা-পিত্তেশ চোখে। হলা বুড়ো আব্দার করে বলে, কি দেখছিস রে মা-জননী, আয় আমার কাছে আয়। সেই উনোপঞ্চাশ সালের ঝড়ের কথা তোকে বলি, মন দিয়ে শোন।

বুড়োর কাছে ঘেযটে বসে লারাণী, ড্যামা ড্যামা চোখের পুতলি নাচিয়ে বলে, খুড়া, বলো গো, আমার খু-উ-ব শুনতে ভালা লাগে।

শুরু হয়ে যায় ঝড়ের কাহিনী, চালাঘরে সামুদ্রিক ঝড় যেন হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ে, শুধু ঘরে নয়—হলা বুড়োর মগজেও—সে টেনে টেনে বলে, এমন ঝড় আমি দেকিনি মা জননী, হা আমার খোল ঘরে চাঁদি ডোবা জল; কি সোরোত, পা যেন ছিঁড়ে নিয়ে পালায়।...পরথমে হাওয়া এলো সাঁইসাঁই করে, তারপর নোনা জল কে যেন তোল্লা করে ফেলে দিল গাঁয়ের ভেতর। মাটির ঘরগুলো সব মোন্ডার মত গলে গেল, বাঁশঝাড় হুমড়ে পড়ল—গোয়ালের গোরু-ছাগল জল-ঘুঘরোর মত ভেসে গেল। মানুষ যে কতো মরল তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। সব শ্মশান হয়ে গেল, মা জননী!

—কেনে গো খুড়া? কোথাও কিচু নেই, হঠাৎ করে কেনে ঝড় এলো? আর ঝড় যদি এলো তার সাথে কেনে নোনা জল এলো?

—সে অনেক কথা মা জননী, শুনলে গায়ের লোম তোর চেগে উঠবে। খসখসে খড়ি ফোটা দাপনা চুলকে হলা বুড়ো পুরনো দিনে হারিয়ে যেত। মানুষের পাপে মানুষই মরে, একের লাঠি অন্যের বাজে।...ত' যা বলছিলাম হাড়িশাঁই-এ তখন এট্টা বেধবা মেয়েমানুষ ছিল—তার নাম তারামণি। তার স্বভাব চরিত্রি মোটে ভাল ছিল না। তার পেটে সন্তান এলো, সেই সন্তান খালাসও হলো। এবার লুকোবে কোথায়? পথ না পেয়ে সেই রক্ত ঢেলারে সমুদ্রে গিয়ে ফেলে এল। আর যাবে কোথায়? পাপের জ্বালা সইতে না পেরে বুঁজকুড়ি কাটল সমুদ্র। বদলা নিতে সাগর-মাতা উঠে এল ঘরের ভেতর। তাকে ঠেকা দেবে কে, কার এতো বুকের ছাতি দঢ়ো?

এরকম অনেক আজগুবি ঘটনা হলা বুড়োর মগজের ভেতরে সাজানো, লারাণী তার খোলঘরে পা দিলেই হুড়হুড় করে গল্পের ঝাঁপি খুলে দেয় বুড়োটা। সবার মুখ থেকে কল্পকথা শুনতে ভাল লাগে না লারাণীর, ব্যতিক্রম শুধু হলা বুড়ো কেননা হলা বুড়ো যখন জোর দিয়ে বলে, ঐ তারামণির দোষে পুরো দুনিয়া-জগৎ ডুবল তখন ঐ বুড়োটে খয়রেটে বিড়াল কটা চোখের দিকে তাকিয়ে বুকটা বাজপড়া গাছের মত শুকিয়ে যায় লারানীর।

তার বুড়িমা প্রায় বলে, হা-রে লারানী, ঐ ঘাটের মড়াটার সাথে কথা কয়ে তুই অতো শান্তি পাস? বলি, সারাদিন খোল সারতে-সারতে ফুঁস ফুঁস করে কি বলেরে বুড়াটা? বয়সকালে ওর নজরে দোষ দিল। যাবিনে, খবরদার যাবিনে। সাপ বুড়ো হলেও তার

বিষ থাকে। তার চেয়ে তুই ঘরে বসে পিছা (খেজুরের পাতা) কেটে হাচুন বানা। আমি হাটে নিয়ে গিয়ে বেচব। কাজের কাজ হয় তাহলে।

মা-বিটির সংসারে অভাব-অনটন মাকড়জালির মত লেগেই থাকে। বিশেষত বর্ষাকালে হাঁড়ি আর আঁখায় চড়ে না। এখন ভাদোর ফুরিয়ে আশ্বিনের ফুরফুরে আকাশ, মাঠের ঢ্যাঙ্গা আলো দু-একটা কাশফুল লাজুক শরীরে দোলে, তাই দেখে মাঠরাণীর সবুজ গতর হাওয়ায় ফুলে ওঠে, থোড় আসা বুকে তার প্রথম যৌবনের লজ্জা। যে জলাপথ পেরিয়ে ভীতু বুকে কালিয়া-কাঁকড়া বা দুধী-কাঁকড়ারা আলের গর্তে ঢুকে যায়—সেই কাদা পৃচ্ছিল পথে দাঁড়িয়ে লারানী মন কেমন করা চোখে তাকিয়ে থাকে গঞ্জের বাস রাস্তাটার দিকে। পবনা সেবার ভোর রাত্রে উঠে চলে গেল, যাওয়ার সময় দেখা করেও গেল না—এই বেদনাবোধ সর্বদা কেঁচোর মাটি তোলার মত বুকটাকে ভুসভুসো করে দেয় লারানীর, তখন তার অভিমানী চোখ ফেটে জল আসে, পুরুষ্টো ঠোঁট দুটো কেঁপে ওঠে ইচ্ছার বিরুদ্ধে। কি তার দোষ, সেই দোষের কথা সে কেন বলে গেল না। শহরে গিয়ে সব মানুষই বদলে যায়—লারানীকে বলেছে তার সহেলী। তাহলে কি শহরে গিয়ে এই অল্প সময়ে গিরগিটির মত রঙ বদলে নিয়েছে পবনা—ভাবতে গিয়ে লারানীর বুকের গভীরে সূচ ফোঁড়ার যাতনা হয়, সে ঠোঁট টিপে ধরে ভাবে—কি তার দোষ, কেন যাওয়ার সময় পবনা দেখা করে গেল না? এখন ভরা মাঠ, বাতাসে বুনো গন্ধ—আর ক'দিন পরে ঢাকে বাড়ি পড়বে—তখন পবনা কি অতদূর থেকে গন্ধ পাবে—লারানীর কেঁচুয়া মাটি পোড়ানোর গন্ধ? অথচ এই গন্ধটাই বড় ভালবাসত পবনা, জোরে-জোরে শ্বাস টেনে নিয়ে বলত, খোল মাটি যার তার দ্বারা হয় না। তুই যেমন করে যত্ন নিয়ে করিস—তেমনটা আর কেউ করে না। এই মাটি খোলের তালায় জেবড়ে দিলে সুর উঠবে চামড়া কাঁপিয়ে। সে সুর তো আমি নিজের কানে শুনেচি, আঃ মন ভরে যায়, মনে হয় তোর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে চুমা খাই। যে এমন গা সিরসিরানো কথা বলত সে কেন এখন গম্ভীর পুরোহিত? লারানীর বুক ভেঙে যায়, কেঁচোমাটি তুলতে তুলতে চোখ ছাপিয়ে ঝড়ে পড়ে অশ্রুফুল। তার দুঃখ অকপটে সব কিছু বলা যায় না। এক কান থেকে বিশ কান হলে জ্বালা বাড়বে বই কমবে না!

সকালবেলায় বাসি মুখে তার বুড়ি মা বলেছিল, আজ আর হলা বুড়ার দোরে বেগার খেটে কাজ নেই, তারচে যা বেড় থেকে দু' বোঝা খেজুরপত্তর কেটে আন। আজ খরা আচে। পতরগুলো চিরে শুকিয়ে নিলে সামনের হাটটায় ছাচুন (ঝাঁটা) নিয়ে বসতে পারি। তেল-নুনের পয়সাই বা কে দেয়? লারানী মায়ের কথায় গা করেনি, তার মন পড়ে আছে হলা বুড়োর খোলঘরে। সেখানে গেলে তার মনে হয় সে যেন শীতলাথানে এসেছে। পবনার কথা মনে পড়ে না তা নয়, তখন পবনার চেয়ে খোলমাটির দিকে তার বেশী মনোযোগ থাকে।

হলা বুড়োর খোলের কারবার। আশেপাশের গাঁয়ের কীর্তনীয়া, তিলক কাটা বৈষ্ণব মানুষ-ভক্তজন-হরিপ্রেমে মাতোয়ারা মানুষ—সবাই এসে পদধুলি দিয়ে যায় এ চালাঘরে। সকাল থেকে লারানীর তাই কত কাজ, খুড়িমার বয়স হয়েছে, সে এখন সব দিক সামলাতে

পারে না, তাছাড়া তার চোখ দুটোয় ছানি পড়ে দিনের বেলাতেই ঘোলাটে দেখে সব। খোল সারতে যারা আসে তারা গাঁয়ের গুণী মানুষ, তাদের বসার জন্য শেতলপাটী বিছিয়ে দিতে হয় লারানীকে, জল-পান-বিড়ি এরকম আরো অনেক কিছু ফাইফরমাস খাটতে এই লারানীকে। এ সবের চেয়েও আরো মারাত্মক দায়িত্ব হলো মাঠে মাঠে ঘুরে কেঁচোমাটি জোগাড় করা, তা আবার পুড়িয়ে গুঁড়ি চালুনে ছেঁকে ভিজেভাত দিয়ে খোলের 'গাব' তৈরী করা। কাজটা লোকে যত সহজ ভাবে আদৌ ততো সহজ নয়, এটাও এক ধরনের বিদ্যা—যা হলা বুড়ো তাকে পাখি পড়ানোর মত করে শিখিয়েছে এবং শিখিয়ে দেওয়ার পর সে নিজে হাত ধুয়ে বসে আছে এবং গত তিন চার বছর সে নিজে একটা খোলেরও মাটি বানায়নি। ফলে লারানী একদিন রাগ-ঝাল করে না এলে তার খোল কারবার কানা পড়ে যায়, তখন লাঠি ঠুকতে-ঠুকতে হলা বুড়ো যায় ডাকতে।

কেঁচুয়া মাটি আঁচলে নিয়ে লারানী যখন ফিরছিল তখন মেনকার সাথে দেখা হয়ে যায় কচা বেড়ার ধারে, দেখতে পেয়েই মুখে হাসি ফুয়িে সে শুধোয়, বিল মাঠে গে-চিলিস্ন বুঝি? শুন্, তোর সাথে দুটো কথা আচে। টুকে আড়ালে চল, বলবা। বলেই সে পথ থেকে হাত ধরে আড়ালে নিয়ে গেল লারানীকে, শেষে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে, এট্টা খপর আচে, শুনেচিস?

—না তো, কিচু শুনিনি!

—তুই আবার শুনিসনি? কপট অভিমানে মেনকার চোখের তারায় ডাসা কুলের রঙ ধরে, নিচু গলায় দুঃখ মিশিয়ে বলে, ইবার আর মাঠে ধান হবেনি, পশ্চিম থেকে পোকা এয়েচে—পোকায় সব ধান খেয়ে নিল।

—তা আবার হয় নাকি? অবিশ্বাসী চোখে তাকায় লারানী, গলায় ঝাঁঝ ফুটিয়ে বলে, তোর যেমন কথা! ধানে তো বছর বছর পোকা লাগে—তা বলে কি ধান হয় না? এবার যেমন থোড় এসেচে—সবার গোলা ধানে ভরে যাবে।

—তাই যেন হয়। মেনকা হাতজোড় করে কপালে ঠেকাল, মুখ শীতলাথানের দিকে, কেমন ভিজে গলায় বলল, বাবা বলছিলো, ইবার ধান ভাল হলে অঘ্রাণেই বিয়ের কথা পাকা করে ফেলবে। সে-ই যে পানিপারুলের ছেলেটা—যে আমাকে দেখে গিয়েছিল—তাকে আমারও পছোন্দ। গরমেন্টির কাজ করে, টেউনে থাকে। আমার আর গাঁ ভাল লাগে না! ইখানে থেকে থেকে মনটা আমার পুরনা সারগাদার মত পচে গেল। আমি হেঁপসে উঠেচি লারাণী; ইখান থেকে পেলুতে পারলে বাঁচি।

লারাণী মেনকার কথাকে ততো বেশী গুরুত্ব দেয় না। পোকা কোন বছর হয় না? জল থাকলে জলে শুধু মাছই থাকে না, পোকাও থাকে—তেমনি ধান পাকলে পঙ্গপাল আসে—আর পোকা তো অতি তুচ্ছ, তারা তো হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে চলে আসে—কটা দিন ধানের ক্ষেতে জিরেন নিয়ে আবার উড়ে যায় সবুজ প্রকৃতিতে। তবু সেই পোকা মারার জন্য কত রকমের বিষ তেল পাওয়া যায় গঞ্জের বাজারে—তার কটা নামই বা লারাণী জানে? মেনকা চলে যাওয়ার পর লারাণীর ভাল লাগছিল একা থাকতে—এতক্ষণ তার যেন দম আটকে ছিল, তাড়াহুড়োতে সে একটা শ্বাস নিল বুক ভরে তখনই কোঁচড়ের

কেঁচো-মাটিগুলো ভাসিয়ে দিল পবনের ঘাম শরীরের সুগন্ধ। চোখ বুজে এল লারাণীর, প্রগাঢ় আচ্ছন্নতায় মুখ আকাশপানে তুলে সে ভাবতে চেষ্টা করল—হাহাকরে ভরা ফসল শূন্য মাঠের কথা, সেবার পোকা নয় নিদারুণ খরাই জ্বলিয়ে-পুড়িয়ে খাক করে দিয়েছিল ধান মাঠের শ্যামল সবুজ সজীবতা। তখন লারাণীর জ্ঞান পড়েছে, চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে পদ্মকুঁড়ি লজ্জা তবু সে পবনার পিছে-পিছে চলেছে মোহৎসব খেতে এক ক্রোশ পথ পেরিয়ে বামুনপাড়ায়। ব্যাঙাচির লেজের মত বিকেল হারিয়ে গিয়ে সন্ধে নেমে এসেছে, মেঠো পথে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার—বাতাসে সাপদেহের স্পর্শ—সামনে পবনা—তার হাতে সাইকেল দোকানের ফেলে দেওয়া টায়ার পুড়ছে—সেই অস্পষ্ট আলোয়—রবার পোড়ার কুচুটে গন্ধ নাকে পুরে—তারা পথ হাঁটছে—পেটের মধ্যে চাড় বেঁধে আছে মোটা ভাত—খামালু-কুমড়োর ঘন্ট—আর বিরিডাল। সেদিন সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে পবনা তার হাত ধরেছিল কোন এক পাগল মুহূর্তে, আর শুধিয়েছিল, হাঁরে, পেট পুরে খেয়েচিস তো—যদি পেট না ভরে থাকে তা'লে আমার গামছায় পেসাদ বাঁধা আচে—তুই চাইলে সব তোকে দিয়ে দেব।' একথা এখনো মনে পড়ে লারানীর, আর মনে পড়লেই তার বুঁকের ভেতরে কম্প দিয়ে জ্বর আসে, তখন পুরনো কথাগুলো কেঁচোর মাটি তোলার মত অদ্ভুত স্বপ্নিল এক ঘর বানায় বুকের ভেতর, আর তখনি সেই কম্প দেওয়া জ্বরো-জ্বরো অনুভূতিটা কোথায় হারিয়ে যায়, তার বদলে সারা মুখে ফুটে ওঠে খোলের তালায় গাব লাগানোর মত চিরকালীন অনুপম সৌন্দর্য।

খোলঘরে শোওয়ানো ছিল পাশাপাশি পাঁচটা খোল, যে গুলোর শুধু পুরনো গাব ঝেড়ে নতুন গাব করে পুরো দিনের রোদ খাইয়ে 'লয়' বেঁধে দিলেই হলা বুড়োর হাতে নগদ কিছু টাকার আমদানী হবে—যা এই নিষ্ফলা মাসে সংসারের খাঁই মেটাতে কাজে লাগবে। সকাল থেকেই মেঘের মতিগতি এক-গুয়ো পঙ্গপালের মত— যে কোন সময় বৃষ্টির ঝাঁক-ঝাঁক পোকাগুলো উড়ে এসে জুড়ে বসবে পৃথিবীতে। বৃষ্টি-বাদলার দিনে খোলের কাজ প্রাণখুলে মন মত করা যায় না, কেন না ভেজা কেঁচোমাটি আঁখার পাড়ে শুকিয়ে, তাকে গুঁড়ো করে, খ্যাকা বাদ দিয়ে গাব বানানো অনেক ঝামেলার। তবু সকাল থেকে এই নিয়ে মেতেছিল লারানী। হলা বুড়ো তাকে বলল, যা-রে মা জননী, ঘরে ভিজে ভাত আচে, তুর খুড়িমার কাছ থেকে চেয়ে দুটো খেয়ে আয়। না খেলে খাটবি কি করে? গাব তৈরির কাজ তো ফাঁকি দিয়ে হয় না, ফাঁকি দিলে ঠিক ধরা পড়ে, তখন মিঠালা সুর বেরবেনি, চাঁটি দিলে ভ্যাস্‌ভ্যাস্ করবি তালা।

লারানী ঘাড় ঘুরিয়ে হাসল, ঠিকই বলেচো খুড়া, খোলের কাজে ধৈর্যটাই হলো আসল। হুড়বড়ালে এসব কাজ হবেনি।

—হাজার কথার এক কথা। দাপনায় বাড়ি মেরে হলা বড়ো খুশী হয়ে বলল, তোর ধৈর্য আচে, তোর হবে। আমার বেটা তো লবাব বনে গেল, আমি চোখ বুঁজলে খোলের কারবার উঠে যাবে। বড় দুঃখ হয়রে, তিন পুরুষের কারবার, হট্ করে উঠে গেলে মনে মনে আমি শুকিয়ে যাব।

—আমি তা হতে দিবোনি খুড়া?

—তুই পারবি একে ঠেকিয়ে রাখতে? এখন তাসা-ব্যান্ড-ঝুমুর বাজনার দিন। ছেলে-ছোকরারা কেউ খোলের বাজনা শুনতে চায় না। আগে ঘরে ঘরে পুজোআর্চায় হরির নাম সংকীর্তন হতো—এখন কেউ মুড়দার ঘাটে গেলেও খোল বাজায় না। হলা বুড়ো গভীর দুশ্চিন্তায় ডুবে যায়, তার ভাঙা চোরা মুখে ফেঁসে যাওয়া খোলের চাম-তালার অসহায় এক আর্তি। দু'হাঁটু জড়ো সড়ো করে এক অদ্ভুত প্রাগৈতিহাসিক কায়দায় সে শ্বাস নেয়, বুকের হাড়খাঁচা নড়িয়ে শূন্য দৃষ্টিতে অপলক তাকিয়ে থাকে লারানীর দিকে। লারানীর চোখে-মুখে তেলঘাম প্রতিমার মত উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে অপার্থিব এক সৌন্দর্য, তার উঁচকপালী মুখটা তখন স্থল-পদ্মের লাবন্যে ভরপুর। হলা বুড়ো তখন খোলের সিকি বাঁধা থামিয়ে রোজ দেখা ঐ মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, তখনই লারানী শুধায়, খুড়া গো, আচ তুমার কি হলো? সারা ঘরে কাজ ছড়িয়ে, হাত চালিয়ে কাজ কর্নো নাহলে যে গাহাক (গ্রাহক) এসে ঘুরে যাবে।

—হ, হ। হলা বুড়োর হাত আবার যন্ত্রবৎ নড়ে, তুই ঠিক বলেচিস মা জননী, আচ বড় আমার কাজে ঢিলেমী এসেচে। আসলে, শরীল আর পারে না। বেটা ঘর ছাড়ার পর মন ভেঙে গেচে—আগের সেই জোর আর পাইনে।

—তারে তুমি ফিরিয়ে আনো। তোমার এত বড় খোল ব্যবসা—ঠিক মত চালালে তার কোনদিন পেটের ভাতের কমতি হবে না।

কথাগুলো মুখ ফসকে বেরিয়ে যায় লারানীর, আসলে এটা তার মুখের কথা নয়, ভেতরের কথা—যে কথার সে জাবর কাটে অষ্টপ্রহর, আজ তা পাতা ঝরা গাছের মত হলা বুড়োর সামনে ন্যাঙ্গা হয়ে যেতেই মনে মনে লজ্জা পায় সে। হলা বুড়ো শিল পুঁতাটা তুলে নিয়ে বার কয়েক বাড়ি মারল খোল মুড়িতে, তারপর ঝামা ইটে তালা ঘষে বোল তুলল হাতের চাপড়ে। কেঁপে উঠল চামড়ার তালা, তালার মাঝে চিমটে বসে থাকা খোলমাটি বুকের শব্দ তুলল খোলা বাতাসে। শিল নোড়া ঠুকে-ঠুকে সুরটা জুঁতসই বেঁধে ফেলল হলা বুড়ো, তারপর লারানীকে বলল, মা জননীরে, গা' দেখি সেই গানটা?

—খুড়িমা বকবে। ইতস্তত গলায় লারানী বলল, এখন থাক খুড়া, সাঁঝের বেলায় গাইব।

বলতে বলতে গ্রাহক এসে হাজির হলো খোলঘরে।

—বসো গো বাবু। বলেই নড়ে চড়ে বসল হলা বুড়ো। লারানী উঠে গেল বিড়ি-জল আনতে, সেই ফাঁকে মাধব বোষ্টম বলল, মেয়েটা তুমার বড় ন্যাওটা। যখন আসি তখনই দেখি খোলঘরে এটা-সেটা করছে। তা দাদা, এর তো বাপ নেই—তুমার ঘরের পবনার সাথে হাতে হাত মিলিয়ে দিলে খাসা হয়। ফাস্-কেলাস্ মানাবে—একেবারে যেমন হাঁড়ি তেমন সরা।

হলা বুড়ো বুক উজাড় করে কাশল, চোখের কোণে জল এসেছিল কষ্টের, হাতের চেটোয় মুছে নিয়ে বলল, এ একেবারে আমার মনের কথা বলেচো গো। ওর বাপ নেই, আমি ওর বাপের মতন। আমারও বড় প্রাণ চায় ওকে বৌমা করে ঘরে রাখি। মেয়েমানুষের

রূপ তো সব নয়, গুণও দেখতে হয়। যদি গুণের কথা ধরো তাহলে বলব—অমন মেয়ের জোড়া মেলে না গো। দশটা পুরুষের সমান খাটতে পারে। আর খোলের কাজে আমাকেও হারিয়ে দেয়। ওর খোলমাটিতে 'গাব' করলে আমি বড় শান্তি পাই। খোল তখন আমার কথা শোনে।

—তা'হলে আর দেরী কেন? মাধব বোষ্টম বলল, শুভ কাজ ফেলে রাখতে নেই গো, শাস্ত্রে বলে—শুভস্য শীঘ্রম্—

—আমার ব্যাটা এট্টু ত্যাড়া। ওর মতিগতি কিছু বুঝিনে?

—সে ঘর আসে না?

—আসে ন-মাসে ছ'মাসে। আগে খুব ঘন ঘন আসত। এখন মোটে আসতেই চায় না। আক্ষেপে গলা কেঁপে উঠল হলা বুড়োর, কি জানি কি হ'ল ব্যাটার আমার। ওর কথা ভেবে রাতে আমার নিদ্ আসে না।

—যার গায়ে শহরের বাতাস লাগে—সে কি আর গাঁয়ে আসে গো। মাধব বোষ্টম মুখে তুড়ি মেরে ইষ্টনাম স্মরণ করে হাই ছাড়ল, গাঁয়ে এখন আর কিছু নেই। ঘি ছিল একদিন, এখন সেই ঘি পচে গিয়েচে। গাঁয়ে এখন কেবল দলা-দলি, কেমড়া কেমড়ি।

কথার ফাঁকে এল আরো সাত জন—তাদের খোলগুলো সাদা থান কাপড়ে মোড়া, তাদের একজনের সারা গায়ে তিলক আঁকা, খালি পা, ভক্ত-ভক্ত চেহারা। তারা হৈ-হৈ করে শেতলপাটিতে বসল, ট্যাকের বিড়ি বের করে ম্যাচিস কাঠি পুড়িয়ে ধরাল, তারপর ঘন ঘন সুখ টান দিয়ে বলল, হলাদা, তুমার কাচেই শেষ পর্যন্ত আসতে হলো। খোলগুলোয় ছ্যাতা ধরেচে—এগুলো একটু সেরে দাওদিনি। সময় ভাল যাচ্ছে না—'গাঁয়ে নাম-কীর্তন' করা দরকার।

—কেন গো, হঠাৎ আবার কি হলো?

—আমার তিন বিঘা ধান পোকায় সর্বনাশ করে দিল। বুকে আমার পাথর পড়েচে গো, তাই তুমার কাছে হন্যে হয়ে ছুটে এলাম। যে এমন ধড়ফড়িয়ে কথা বলছিল তার নাম কানু হাজরা; এককালে সে 'নাম' গাইত, এখন গঞ্জের বাজারে তার একটা মাইকের দোকান—সে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত হিন্দিগান বাজায়, ক্যাসেট বেচে আর রেডিওর তার ছিঁড়ে গেলে ঝাল দেয়। তাকে এমন কাতরে উঠতে দেখে হলা বুড়ো যে কি বলবে সহসা বুঝে উঠতে পারে না, শুধু ভ্যালভেলিয়ে মুখপানে তাকিয়ে গত বছরের মাছের মারাত্মক ঘা-রোগের কথা শোনায়। গত বছর খরাণীর সময় চ্যাং-ল্যাঠা-মাগুর-শিঙ্গি এমন কি কাতলা-রুই-সিলভার কাপ—মিঠে জলের কোন মাছই ঘা রোগের প্রকোপ থেকে মুক্তি পায়নি। কারোর লেজের পাখনা খসে পড়েছে, কারোর মাথায় দগদগে ঘা—কারোর আবার সারা গায়ে খামচা খামচা খুঁবলান দাগ। দেখে ঘেন্না হয়, মাছ খাওয়ার ইচ্ছেটা মরে যায়। এই নিয়ে পুরো গ্রাম-শহর তোলপাড়, ঘা-রোগের ভয়ে অনেকে আবার মাছ খাওয়াই ছেড়ে দিল। কিন্তু হলা বুড়োর বিচার অন্য, প্রথমে সে ভেবেছিল—পুকুরের জলে দূষণ বেড়েছে তাই বুঝি গরম-গোটা বেরিয়েছে মাছের গায়ে—যা ছোঁয়াচে-এক পুকুর থেকে

হাওয়ায় উড়ে অন্য পুকুরে চলে যায়। তখন লারানী তাকে একটা মোক্ষম কথা বলেছিল, খুড়া গো, এ রোগ যে সে রোগ নয়, এ হলো গিয়ে মাছের মহামারী। এক পুকুরে অতো মাছ থাকলে রোগ হবেনি? তাছাড়া মাছ তো মাছকেই খায়। এ হলো গিয়ে ওদের খেয়োখেয়ির চিহ্ন।

গত বছর বর্ষাকালেও মাছের আকাল; রেডিওতে, খবরের কাগজে ফলাও করে বলা হলো—মাছের এই রোগ সারবে না—এ হলো গিয়ে মাছের ক্যান্সার। কথাটা গাঁ-ঘরে সবার মুখে মুখে রটে গিয়েছিল যে ক্যানসার হলে মাছ তো অতি তুচ্ছ, মানুষও বাঁচে না।

সুচিয়া, সুতারী, বাঁধারী, শিলপুঁতা আর ঝামা ইটের টুকরোটা নিজের কাছে জড়ো করে টেনে এনে হলা বুড়ো কানে গোঁজা আধপোড়া বিড়িটা ম্যাচিস জ্বেলে ধরাল, তারপর ভলভল করে ধোঁয়া ছেড়ে উপস্থিত সকলের মুখের দিকে তাকাল। পুরো গাঁয়ের মাথা মাথা বাবু, ভদ্রলোক যেন জড়ো হয়েছে তার খোলঘরে, ফলে বিড়িতে কষে টান মেরে প্রচ্ছন্ন গর্ববোধে তার অন্তরটা ফুলে উঠল। খোল ব্যবসায় আর কিছু না হোক—হাতের কাজ ভাল হলে গ্রামসমাজে খাতির বাড়ে, বাপ-পিতামহের নাম নিজের নামের পাশে পাশে ঘোরে—যা কানে এলে এই বয়সেও মন্দ লাগে না হলা বুড়োর। পোকার অত্যাচারে মানুষগুলো যেন বিষপোকার দংশনে ছটফটাচ্ছিল; তাদের চাপা উত্তেজনা, উদ্বেগ হলা বুড়াকে স্পর্শ করতেই মনে মনে ভীষণ খুশি হল সে। টিকটিকি যেমন মুখের লালায় পোকা ধরে সুখ পায় এবং নিশ্চিত আরামের চোখে তাকায়—হলা বুড়োর চোখের দৃষ্টি এখন অনেকটা সেইরকম। পোকায় ধরা মানুষগুলো বিষ দেওয়া পোকার মত ঝিম ধরে বসেছিল, তাদের সুখী মুখে গ্রহণ লেগেছে আতঙ্কের। হলা বুড়োর বলার মত জমি-জিরোৎ নেই, ফলে তার চিন্তাটা কম—উল্টে এই সুযোগে সে কিছু কামিয়ে নিতে পারবে। সামনে পুজোর মরশুম—যেহেতু খোল কারবার এখন ঝিমোনোর মুখে—তবু হলা বুড়ো ব্যস্ত স্বরে বলল, আর পারিনে দাদা, খোল কারবারে আগের সেই সুখ আর নেই। এখন এক বিঘোৎ গো-চামের দাম মেলা টাকা, ছেলি-চামে খোলের কাজ হয় না। তাছাড়া, রঙ-মাটি-কাঁকর, মুড়ার সব কিছুরই দাম বেড়েচে। বাড়তি পয়সা চাইতে গেলে বাবু সব খেঁকিয়ে ওঠে অথচ আমিও অপারগ, জোড়হাত করলেও তারা আমার লোকসানের কথাটা বোঝে না।

সবাই মনোযোগ সহকারে শুনছিল হলা বুড়োর কথা, তারা সম্ভবত চালাকিটা ধরতে পারেনি, তাই কেমন মুখ চুপসানো সমব্যথী চোখে তাকিয়েছিল বুড়োর দিকে। মাধব বোষ্টম অনেকক্ষণ কোন কথা বলেনি, সে কুঁচকির কাছে কষটে দাদ চুলকে বিজ্ঞের গলায় বলল, পোকার কথা পুবপাড়াতেও শুনে এলাম। সবাই আতঙ্কে চুপসে আচে। গাঁয়ে পাপ না ঢুকলে এমন বিপদ হোতনি।

—তুমি থামো তো। মাধব বোষ্টমকে জোর করে থামিয়ে দিল ব্রজলাল—সে বেশ গম্ভীর গলায় বলল, পোকা শুধু একটা গাঁয়েই আসেনি, সারা দেশ জুড়ে পোকার উৎপাত। রেডিওতে কাল বলেচে, কীটনাশক ছড়াতে, কিন্তু কীটনাশক ছড়িয়েও কোন ফল হচ্ছে

না। পোকা দিনকে দিন বাড়চে। এক ক্ষেত থেকে আরেক ক্ষেতে ছড়িয়ে পড়চে। এ বড় চিন্তার কারণ। এখন ধানে থোড় আসার সময়—এখন যদি পোকায় সব থোড় কেটে দেয় তাহলে ভাল ধান হবেনি। আর ধান ভাল না হলে দেশে আকাল লাগবে। চালের দাম চড় চড় করে বেড়ে যাবে, মানুষ সব খাওয়া বিনে মরবে।

কানাই মাইতির নামের সাথে কাঁথি কলেজের একটা ডিগ্রী আছে, তার মুদ্রাদোষ হলো খবরের কাগজ না পড়লে ভাত হজম হবে না, সে কথা বলার সুযোগ খুঁজছিল। ব্রজলাল চুপ মেরে যেতেই কানাই মাইতি বেশ ভারিক্কী গলায় বলল, একটা কথা বলি মন দিয়ে শোনো। এত বড় একটা সাদ্দাম হুসেনের যুদ্ধ গেল। বলি সেখানে কি কম বোমা পড়েছে। সেই বোমাগুলোর অ্যাকশন যাবে কোথায়? বাতাসে এখন অক্‌সিজেনের ভাগ কমে এসেছে, ফলে দুনিয়ায় পোকামাকড়ের দাপট বেড়েছে। বলি—নোংরা জায়গায় তো পোকার চাষ ভাল হয়—তাইনা? পুরো পৃথিবীটাতে এখন নোংরা গিজগিজ করছে—পোকা তো হবেই। কানাই মাইতির ভাবগম্ভীর ভাষণ অনেকেই বুঝতে পারে না, কিন্তু ওর কথা যে ছাইগাদায় ফেলে দেবার নয়—এটা বুঝতে পেরে অনেকেই চুপ করে থাকল।

এসব ঘ্যানর-ঘ্যানর হলা বুড়োর ভাল লাগছিল না, সে অভ্যাস মত হাঁটু নাচাতে নাচাতে বলল, তা বাবুসকল, আমাকে এখন কি করতে হবে সেটাই খুলে বলো দেখি। তুমরা কাজের মানুষ, তুমাদের এট্‌কে রাখা তো ঠিক নয়।

ব্রজলাল পানের পিক ফেলে এসে হাতের তেলোতে মুখ রগড়ে বলল, আমরা তুমার কাচে এসেচি ঠেকায় পড়ে। সেই যে কথায় বলে না—ঠেলায় পড়লে ল্যালার (পচা ডোবা) জল খেতে হয়। তা বলচিলাম কি—আমাদের এই সাতটা খোল সেরে দিতে হবে। গাঁয়ে মিটিং হয়েচে—পোকা ঠেকাতে হরির নামের দল ঘুরবে সন্ধ্যা-সকালে। পুবা মাঠ তারা ঘুরে ঘুরে 'নাম' গাইবে। ধূপ ধুনা দেওয়া হবে গাঁয়ের মোড়ে মোড়ে। নাম সংকীর্তনের দলটা ফি-বেস্পতি আর শনিবারে শীতলাথান থেকে বেরুবে পুরা গাঁ ঘুরে, মাঠ ঘুরে—একেবারে খালধারের কাঠপোলের কাছে এসে নাম গান শেষ হবে। দেখা যাক—এতে কোন কাজ হয় কিনা।

কথা শুনে গুম ধরে রাগী হুলো বেড়ালের মত বসে থাকল কানাই মাইতি তারপর রাগে ফেটে পড়ে বলল, গোবরে বিষ দিলে গোরু মরেনি, গোরু যদি মারতে হয় তাহলে মুখে বিষ দাও—তা-না কোথা থেকে 'নামগান' এসে জোটালে! বলি, সায়েন্সের যুগে এসব এখন অচল। 'নামগান' না করে ধানক্ষেতে হাই ডোজের বিষ ছড়ানো ভাল—তাতে কাজ হলে হতে পারে।

ব্রজলালের ব্যক্তিসত্তায় ঘা দিল কানাই মাইতির কথাগুলো—সে ভুস করে তাতা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, নামগানের মাহাত্ম্য তুমি কি বুঝবে হে, তুমি তো সেদিনের ছোকরা, নাক টিপলে দুধ বেরোবে—তার আবার বড় বড় কথা! দু-কলম লেখা-পড়া শিখে এ-যে দেখচি ধরাকে সরা জ্ঞান!

কানাই মাইতি কোণঠাসা হয়ে যেতেই ব্রজলাল বলল, দশ জনে মিলে যেটা রায়

দিয়েচে—সেটা করাই মঙ্গল হবে। গাঁয়ের বিধান না মানলে গাঁয়ের কোন বাঁধন থাকে না। বলেই সে আবার একটা বিড়ি ধরাল, খুক খুক কাশতে কাশতে বলল, পুরো ভাদ্র মাসটা এ গাঁয়ের কেউ আঁশজল ছোঁবে না, শুধু মাছ নয়, মাংস-ডিম সব বন্ধ। পোকা নিধনের যজ্ঞ করা কথার কথা নয়, এখানেও সংযমের পরিচয় দিতে হবে আমাদের, নাহলে বিপদ আসবে—তখন দ্বাপরের কৃষ্ণ এলেও বাঁচাতে পারবে না। তার প্রস্তাব শুনে হলা বুড়ো বলল, এ প্রস্তাব মন্দ নয়। যজ্ঞ করতে গেলে দরকার হলে উপোসও দিতে হবে নাহলে যজ্ঞ করা আর জাঁকজমক করা একই কথা।

—তুমি মুরুব্বি মানুষ, তুমিই ঠিক বলেচো। ব্রজলাল হে হে করে হাসতে হাসতে দলবল নিয়ে চলে গেল; যাওয়ার সময় বলল, ঠিক তিনদিন পরে আসব—খোলগুলো যেন তৈরি থাকে।

সাত-আট দিন পরের ঘটনা।

একদিন খরাবেলায় পাড়ায় ঢোকার সরু পথটায় মেনকার সাথে লারানীর দেখা হ'ল, তখন মাথার উপর ঝাঁঝাল আকাশ, পৃথিবীর হাওয়া গুলোকে তাড়িয়ে কে যেন নিরুদ্দেশ যাত্রায় নিয়ে গিয়েছে—গাছের পাতাও নড়ছে না, ফলে দরদরিয়ে ঘাম নামছিল মেনকার সাজানো শরীর। তার হাতে কাঁসার রেকাবী; রেকাবী ভর্তি কুঁচনো ফল—সে গিয়েছিল শীতলাথানে পুজো দিতে। ক'দিন থেকে রাতে তার ভাল ঘুম হচ্ছে না; দুশ্চিন্তায় কুরে কুরে খাচ্ছে মন, পোকার চিন্তায় কিছুতেই আর ঘরের কাজে মন বসছে না তার। চোখের সামনে ধান গাছগুলো রিকেটগ্রস্থ রোগীর মত ঝিমোচ্ছে হিম ঝরে পড়া সকালে, হাওয়া বইলে আগের সেই চনমনে স্ফূর্তিভাবটা ধানের ক্ষেতে খুঁজে পাওয়া দায়। তার বাবা বলেছে, এ বছরটা পোকায় খেল, আসচে বছর যোগাড়যন্ত্র করে তোরে ঠিক বিদেয় করবো। ঘাড়ের উপর সোমত্ত মেয়ে থাকা নাতো যেন প্রেতনীর ভর করা। কথাগুলো হৃদয় বিদারক, শুনে ঘরের পিছনে গিয়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদেছে মেনকা এবং ঐখানেই সে প্রতিজ্ঞা করেছে—এবার সে ঝোপ বুঝে কোপ মেরে কারো না কারোর গলায় ঝুলে যাবে। বাবার ভরসায় থাকলে তার আইবুড়ো বদনাম আর ঘুচবে না। এবার নিজের পথ নিজেকেই দেখে নিতে হবে।

মেনকা যে বিয়ে পাগলা একথা লারানীর আর জানতে বাকি নেই কিন্তু সব জেনে শুনেও সে মুখে কুলুপ এঁটে থাকে। মেনকার কথা ভেবে তার যে দুঃখ হয় না তা নয়, কিন্তু সে নিজেই তো নিজের জ্বালায় জ্বলছে—এই অবস্থায় অন্যকে সান্ত্বনা দেওয়া সহজ নয়।

মেনকা আঁচলে মুখ রগড়ে দু-কুচি শশা আর একটা মোন্ডামিঠাই ভেঙে লারানীর হাতে জোর করে গুঁজে দিল, তারপর বেজার মুখে বলল, কাল বিকেলে ক্ষেতপানে গিয়েচিলাম। মরাটে ধানগাছগুলোকে দেখে চোখ ফেটে আমার জল এল। পোকায় সব কেটে দিয়েছে রে! কথাগুলো বলেই গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মেনকা শুকনো মুখে তাকাল, আর তাকে দেখে লারানীর মনে হল—পোকায় ধানগাছ নয়—মেনকার বুকটাই যেন ছ্যাঁদা

করে দিয়েছে সন্তর্পণে। খুব কষ্ট হল লারানীর, প্রসাদটা গালে পুরে চিবুতে-চিবুতে বলল, ধানপোকা মানুষের চেয়ে কতো ছোট, ওরা মানুষের বুদ্ধির কাছে পেরে উঠবেনি। আর ক'দিন যেতে দে—ওরা দেশ ছেড়ে সব পালাবে।

—কিন্তু যাওয়ার আগে সব ঝাঁঝরা করে দিয়ে যাবে। বিমর্ষ চোখে তাকাল মেনকা, তারপর গাঁয়ের মানুষকে দোষারোপ করে বলল, এ গাঁয়ে কোনো একতা নেই। সবাই মিলে যখন রায় দিল মাছ-মান্‌সো কেউ ছোঁবে না, তখন সুবোল ডোমের বউটা সাঁঝকালে শুকুই মাছ পুড়িয়ে খেল। ভাবতো, এ কেমন অনাচার? এমন্‌ হলে সব ধ্বংস হয়ে যাবে, কারোর কিচু থাকবে না।

লারানী আমতা-আমতা করে বলল, পোয়াতী বউটা দুটো শুকুই মাছ পুড়িয়ে খেয়েচে—এতে তো কোনো দোষ দেখি না। মাছ্ খাওয়ার সাথে ধানপোকার কোনো সম্বন্ধ নেই, এসব হলো গিয়ে ঐ বুড়ো পুরুতঠাকুরের কারসাজি।

মেনকা আঁতকে ওঠার গলায় বলল, যা বলেচিস—বলেচিস, খবরদার আর এ কথা মুখে আউড়াবি না তাহলে তোর সর্বনাশ হয়ে যাবে। পুরুতঠাকুরকে স্বপ্ন দিয়েছিল—মা শীতলা। বলেচে, যে মাছ-মান্‌সো খাবে তার নাকি খুব ক্ষতি হবে।

—একথা শীতলাঠাকুর বলতেই পারে না। প্রতিবাদে সোচ্চার হ'ল লারানী, এসব বিধান মানুষের উপর একটা অত্যাচার। জোর করে ভয় দেখানোর কু-মতলব।

মেনকা হায়-হায় করে উঠল, তোর জিভ কাঁপল না এতো বড় কথা বলতে? জানিস, মুসলমানরা এক মাস নির্জলা উপোস করে রোজার মাসে, কৈ তাদের তো কোনো কষ্ট হয় না। তারা যদি পারে, তাহলে আমরা কেন একমাস নিরামিষ খেতে পারব না?

—ওটা ওদের ধর্মে আচে?

মেনকা ঝিমিয়ে যাওয়া গলায় বলল, অধর্ম হলেই তো ধর্মের কথা এসে যায়। সেবার খরার সময় নাম সংকীর্তনের দল বেরল, নাম- যজ্ঞ-অষ্টমপ্রহর হলো—তারপরের দিনই তো ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি হলো। মাঝে মাঝে গাঁয়ের বাতাস দুষিয়ে যায়, পুকুরের যেমন জল পচে যায় ঠিক তেমন। তখন দরকার হলো পুরো জলটাই ছেঁচে ফেলা দরকার নাহলে চুনা পাউডার দিয়ে সাফ সুতরো রাখা। এটা যে না করবে তার গায়ে খোস প্যাঁচড়া দাদ হাজা চুলকানি হবে—এ তো জানা কথা।

কোন পার্বণ এলে গ্রামে যেমন সাড়া পড়ে যায়, নদীর জলে যেমন খুশির ঝিলিক ওঠে তেমন একটা চাপা আনন্দময় উত্তেজনা গ্রামের ঘরে ঘরে। সকালবেলায় ঘুম ভেঙে গেলে লারানী শোনে খোল-করতাল-এর সুমধুর ধ্বনি—সে চোখ ডলতে ডলতে বেড়ার ধারে এসে দাঁড়ায়, দেখে—তার মা, খুড়িমা, পাড়ার অন্যান্য বয়স্ক-আধাবয়স্ক মেয়েরা পেতলের ঘটি ভর্তি জল নিয়ে দাঁড়িয়েছে পথের এক প্রান্তে—ভক্তপ্রাণ মানুষগুলোর পা ধুইয়ে শাড়ির আঁচলে মুছিয়ে দেবে তারা। যে দেশের যা রেওয়াজ। লারানী ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে ফেলে, ভাবে—মানুষগুলোর পূণ্য বিলোনোর কি সহজ রীতি। পবনা থাকলে ঠিক ঠাট্টা করে বলত, আমি খোলের শব্দ শুনি মহোৎসব খাওয়ার লোভে। মন্দিরে যাই প্রসাদ

পাবো বলে। ঠাকুর দেখি,. ঠাকুর সুন্দর দেখতে বলে।

হরিনামের দলটা গাঁ ঘুরবে রোদ না চড়া পর্যন্ত; আজ ধানমাঠে যাবে ওরা—ওখানে একটা বেদী প্রতিষ্ঠা করে তুলসী চারা পুঁতে দেবে সেখানে। তুলসী গন্ধ পোকার জন্য ক্ষতিকারক— পুরুতঠাকুরের এটা হল সর্বশেষ উপদেশ।

বেলা বেড়ে যায়; মানুষ কাজ ভুলে হরিনাম নিয়ে মেতেছে, এদিকে খোল সেরে সেরে আরো কুঁজো হয়ে পড়ছে হলা বুড়ো—তার নাওয়া-খাওয়া বলতে গেলে বন্ধ। লারানী গঞ্জের বাস সড়কের দিকে চেয়ে থাকে—তার চোখ সর্বদা খুঁজে বেড়ায় চারা তালগাছের মত ঢ্যাঙ্গা পবনাকে, রাতে হঠাৎ-হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে সে ফুঁপিয়ে ওঠে নীরবে—মনের কোণে কত কথার হুটোপুটি—ভাবে, এবার পবনা আসলে এতদিন যে কথা সে বলতে পারেনি—এবার অকপটে বলে দেবে তাতে আর কিছু না হোক বুকের বোঝা কিছুটা হাল্‌কা হবে।

যত দিন যায় নতুন পার্বণে মেতে ওঠে গ্রাম, আর ধানক্ষেতে রোগাটে ধান চারাগুলো রোদ-জল-বৃষ্টিতে ক্ষয় রোগীর মত ঝিমোয়। শুধু কানাই মাইতি একা একা বিষতেল ছড়ায় ধানক্ষেতে, সে ব্লক অফিসে গিয়ে পোকা প্রতিরোধের নিয়মকানুন জেনে আসে, গাঁয়ের পুরুতঠাকুর তাকে ঠাট্টা করে বলে, পাগল! পিঁপড়ের পাখা গজায় যমের দুয়ারে যাবে বলে।

এমন এক অস্থির সময়ে পবনা এলো। দীর্ঘ দিন জ্বরে ভুগে কৃশ শরীর; জোরে কথা বলতে কষ্ট হয়, হাঁটলে ধড়ফড় করে বুক। সে যেন পোকা লাগা ধানগাছের মতন, তাকে দেখে লারানীর ভেতরটা আঁতকে ওঠে।

পবনা ধুঁকতে-ধুঁকতে বলে, জ্বরে পড়েচিলাম। বাঁচতামই না, মা-বাপের আশীর্ব্বাদে কোন মতে ফিরে এয়েচি।

তাকে লেবুপাতার গন্ধ দিয়ে সরবৎ করে দেয় লারানী, পবনা ঢকঢক করে সরবৎ খায়, হা-বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে লারানী। খাওয়া শেষ হলে কাচের গ্লাসটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে, পবনা শুধায়, তোর কি হয়েচিলো, তোকে কেনে অতো রোগা দেখায়?

মলিন হেসে লারানী বলে, গাঁয়ে এখন পোকার উৎপাত। আমার মনের ভেতরেও পোকা ঢুকেচে, দিনরাত অষ্টপ্রহর কুট কুট করে কাটচে। তা, তুমি এসে ভালোই করেচো—না এলে পোকাপার্বণ দেখতে পেতে নি।

আশ্বিন মাসের রাত, সন্ধেবেলায় গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি হলো আদর করার মত। ভেজা সজনের পাতার মত ঘরের পেছনে ডিম পাড়া মুরগিটা কাটতে গিয়ে ভয়ে কেঁপে যাচ্ছিল লারানী কেননা তখনো বাতাসে খোল-করতালের মহার্ঘ ধ্বনি। ধাড়ী মুরগিটা সে অভাবে পড়েও বেচেনি, তার অনেক দিনের ইচ্ছে—পবনা আসলে নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াবে। সেই ইচ্ছেটা পবনার রোগাটে, মরাটে শরীর দেখে আরো তীব্র হলো, অতি সতর্কতায় বুড়িমাকে খাল ধারে পাঠিয়ে দিয়ে সে খুব যত্ন নিয়ে মাংস রাঁধল কবাটে খিল দিয়ে। রাঁধাবাড়ার কাজ শেষ হতেই নিজের অগোছাল শরীরের প্রতি যত্ন দিল সে, আয়নাটা কুলুঙ্গীর ভেতর

থেকে পেড়ে এনে মাথায় বাসতেল মেখে সে চুল বাঁধল যত্নে, খয়েরী রঙের টিপ পরল কপালে। তার উঁচকপালী মুখটা থোড় আসা ধানগাছের লাবণ্য নিয়ে আয়নার উপর ভাসছে। পুরো শরীর থেকে উঠে আসছে অদ্ভুত চেনা একটা গন্ধ যা খুশির দিনে, পার্বণের শুভক্ষণে প্রায়ই পেয়ে থাকে সে।

গ্রামের রাত। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলেই ঝিঁ-ঝিঁ ডাকা পথঘাট। তবু এই অশান্তির মাঝেই চাঁদ উঠেছে খলবলিয়ে, নীল আকাশে বেলিফুলের সৌন্দর্য নিয়ে ফুটে আছে গোটা গোটা তারা। আঁচলের আড়ালে মাংসের জামবাটি, সুগন্ধ ম-ম করে নাকের গোড়ায়—হাতে তাত লাগে তবু কঠিন সাহসে বুক বেঁধে সে এগোয়। তার একটুও ভয় করে না, বুকের ভেতরটা আঁতকে ওঠে না—মনে পড়ে না হেনস্থা হওয়া সেই পোয়াতী ডোম বউটার কথা। কতদিন বাদে পবনা ফিরে এসেছে গ্রামে, আজ নিয়ে পর পর সাতটা দিন অতিক্রান্ত তবু তাকে নিজের মনমত করে খাওয়ানোর সুযোগই হয়ে ওঠেনি তার। যদি ধরা পড়ে তাহলে বিচার বসবে পঞ্চায়েতে—বাবুরা হয়ত বুড়ি মায়ের জি. আর. টাই কেটে দেবে। তা দিক। বাঁধ ভাঙা জলের তোড় লারানীর বুকের ভেতর। গাছ না বাঁচলে ফল হবে না, গাছকে আগে বাঁচানো দরকাব তাতে তার যত সর্বনাশ হয় হোক। লারানীর শরীর জুড়ে চাপা খুশির উত্তেজনা, বুকের ভেতর প্রতীক্ষার কাচপোকাগুলো কেমন মধুর সুরে ডাকছে—ফুলে ফুলে উঠছে লারানীর বুক-ঠোঁট আর হৃদয়ের চারপাশ।

এত আনন্দ, এত উত্তেজনা সব যেন মুখ থুবড়ে পড়ল হলা বুড়োর উঠোনে যখন সে শুনল পবনা ঘরে নেই, পঞ্চায়েত অফিসের দিকে গিয়েছে। এত মন খারাপের মাঝেও লারানী এই ভেবে সুখ পেল যে এই অল্প ক'দিনে গ্রামের জল-হাওয়ায় পবনা নিজেকে কিছুটা চাঙ্গা করে নিতে পেরেছে, ধীরে ধীরে তার শরীর সেরে উঠেছে—মুখের সেই তাজা হাসিটা ফিরে পাচ্ছে আবার। এ কম সুখের কথা নয় তার কাছে, বিশেষত যাকে ঘিরে তার স্বপ্ন দেখা, খোলমাটি তৈরি করা, খোলের মত ভাবী জীবনের 'লয়' বেঁধে সুনিপুণ ভাবে বেঁচে থাকা। হুড়মুড়িয়ে হাওয়া এল, হাওয়ায় অসংলগ্ন আঁচল ঘসে পড়ল ভেজা পথে—লারানী উবু হয়ে আঁচল তুলে নিয়ে চাঁদের আলোয় নিজেকে দেখল আর একবার, আর তখনই কেমন একটা ঠান্ডা নিঃশ্বাস তার বুক ছুঁয়ে হিমপোকার মত নেমে এল সারা শরীরে ভয়ের শিহরণ তুলে। অব্যক্ত অভিমানে আবার কেঁপে উঠল স্ফুরিত অধর, শক্তিহীন পায়ে সে কোনমতে হেঁটে এল বাস সড়কের কাছে, ভাবল—এই পথ দিয়ে পবনা যখন ঘরে ফিরবে তখনই তার হাতে তুলে দেবে মাংসের বাটি, প্রয়োজন হলে নির্জন স্কুল ঘরের শান বাঁধান মেঝেয় বসে সে তার মনের মানুষের খাওয়া দেখবে।

অনেক সময় ব্যয় হলো; পবনা এলো না—ভাঙা মন নিয়ে সতর্ক দৃষ্টি মেলে সে হেঁটে এল স্কুলের মাঠে। চাঁদের আলো নতমুখ ঘাসের উপর শুয়ে পড়েছে নির্দ্বিধায়, বাতাস চিরে দিচ্ছে সদ্য বেরনো কচি কলাপাতা, ধানমাঠ থেকে ভেসে আসছে পোকার কর্‌র-র-র 'ক-র-র-র' শব্দ। সেই সংগে স্কুল ঘরের পেছন থেকে ভেসে আসে মেনকা আর পবনার অন্তরঙ্গ কথোপকথন। ঐ অত রাতে কোন এক পাগল খোলে বোল তুলেছে,

হরে রাম, হরে রাম। লারানীর বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে হৃদয় ভাঙা আর্তনাদ; সেই চকিত, মর্মভেদী আর্তনাদ চাপা পড়ে যায় মেনকার অতর্কিত আবেগবিহ্বল প্রশ্নে, পবনদা, পোকাগুলো শরীলের মধ্যে কিলবিলায়, ধানমাঠের মত আমি কি তাহলে শুকিয়ে যাবো?

মাংসের বাটিটা ইস্কুল ঘরের দেওয়ালে ছুঁড়ে দিয়ে ঝড়ের বেগে ঘরে এসে ধেনো পোকার মত ছটফটায় লারানী। জল লাগা কেঁচো মাটির মত গলে গলে পড়ে দুঃখ। খালধার থেকে সেই কখন ফিরে এসেছে তার বুড়িমা, মেয়েকে দেখে বলে, খাবি চ।

লারানীর খাওয়ার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এমন পার্বণের দিনে উপোস করে মনে দুঃখ নিয়ে থাকতে নেই, তাহলে যার মঙ্গল কামনায় এই ব্রতযাপন—তার যে সমূহ ক্ষতি হয়ে যায়। লারানী অতোটা স্বার্থপর হতে শেখেনি, খাওয়ার ইচ্ছায় ভাতের গ্রাস মুখে তুলে গন্ধ পেল মাংসের, তখনই বমি না হয়ে টুপটুপ করে ঝরে পড়ল তার চোখের জল। একেবারে ভাতের থালায়। তার মনে হল, এই জল যেন বিষজল—যার ছোঁয়ায় ফসলের প্রতিটি দানা অক্ষত থাকবে এই ঘনঘোর পোকাপার্বণে।